প্রদীপ

সচিত্র মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ সম্পাদিত।

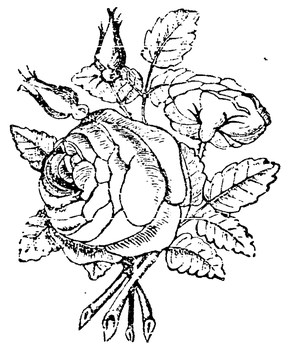

কলিকাতা, ৩, শঙ্কর ঘোষের লেন, "প্রদীপ" কার্য্যালয়

হইতে

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৫—১৩০৬।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

সূচী

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা।
অঙ্গহীনা (সচিত্র গল্প)	...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ	...	১১০
অতৃপ্তি (কবিতা)	...	কুমারী লজ্জাবতী বসু	...	৮৮
অণুবীক্ষণ	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্,এ	...	৩৩৮
অপরিচিত (কবিতা)	...	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	...	২৬৫
অভাব (কবিতা)	...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	...	১৬১
অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ	...	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্,এ বি,এল্	...	৫৭
অষ্টেণ্ড কোম্পানী	...	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি,এল্	...	৫৯০
আচার্য্য ম্যাক্সমূলর (সচিত্র)	...	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্,এ	...	৩২৪
আবাহন (কবিতা)	...	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি,এ	...	৬৮
আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার (লেখিকার চিত্রসহ)		শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৩১৪
আলোক তত্ত্ব	...	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ	...	৩৭৮
ইতর প্রাণীর মুখে মানবীয় ভাব (সচিত্র)		শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি,এ	...	৩৫
উদ্বোধন (সচিত্র কবিতা)	...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ	...	১
উদয়াস্তের চন্দ্র সূর্য্য কেন বড় দেখায় ?		শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় বি,এ	...	৩৩
উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যা কথা	...	শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল্	...	২৯৮
একাকী (কবিতা)	...	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্,এ বি,এল্	...	২৬৭
এলিজাবেথ বেরেট ব্রাউনিং	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি,এল্	...	২৯১
ঐতিহাসিক চিত্র (সমালোচনা)		শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি,এস্	...	১৫৫
ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিমবাবু	...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি,এ	...	২৮০
কলিকাতা ক্রয়	...	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়	...	৩৯৭
ক্ষিতীজস্থ চন্দ্র সূর্য্য বিম্ব বড় দেখায় কেন ?		শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্,এ,	...	৮৯
ঐ	...	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়, বি,এ	...	১৪৫
খুকুমণির ছড়া (সমালোচনা)	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্,এ	...	৩৮৬
গার্সি ব্রত	...	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী	...	৩৫৭
গীত গোবিন্দ (কবিতা)	...	শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী	...	৩৭৭
গুর্জ্জর কাহিনী	...	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	...	২২২
গুর্জ্জর কাহিনী লেখকের নিবেদন		ঐ	...	৩২১
গ্রন্থ সমালোচনা	...	সম্পাদক	...	২৩৪
গ্রন্থি বন্ধন	...	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী	...	৭৫

ঘাসের গোড়া ছিঁড়েছে,
প'ড়েছে সাগরে।
সাগর শুকিয়ে গেছে
মৎস্যের নগরে॥
মৎস্য অবতার
দিতে হ'বে বর।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী,
পূর্ণ হবে ঘর॥

১০

এক কড়া কড়ি নয়, দু কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
এস পৌষ যেও না,
জনম জনম ছেড়ো না।
দুকড়া কড়ি নয়, তিন কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
যদি বা ছাড়িবে তুমি,
পরাণে মরিব আমি।
তিন কড়া কড়ি নয়, চার কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
পৌঝুরী গো এস,
পিঁড়ের উপর বস।
চার কড়া কড়ি নয়, পাঁচ কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী।
হব তব দাসী।
আনন্দেতে ভাসি।
পাঁচ কড়া কড়ি নয় ছ'কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
ভেবেছি মনে.
তুষলা ধন।
ছয় কড়া কড়ি নয়, সাত কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
দিব বিয়ে,
বংশী-বদন।
সাত কড়া কড়ি নয়, আট কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা সোনার পৌঝুরী॥
আয় মা, তুষু,
আয় মা সদন।
আট কড়া কড়ি নয়, ন'কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
মিলাব তোমায়,
বংশী-বদন।
নয় কড়া কড়ি নয়, দশ কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
চিরদিন তুষু,
রবে গো ঘরে।
দশ কড়া কড়ি নয়, কুড়ি কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌঝুরী॥
ব'লেছেন,
হরেকৃষ্ণ হরে।
তুল ভাই কড়ির ঝারা,
মাথার উপর তুল।
সকলেতে বদন ভ'রে
একবার হরি হরি বল॥

১১

চাল গোটাচার রাঁধ না, সখি,
ভাত গোটা দুই খাই,
কড়ির ঝারা মাথায় ক'রে,
বামুন পাড়া যাই॥
বামুন দাদা, বামুন দাদা,
ঘরে আছ গো।
আমার তুষলার বিয়ে,
শনি মঙ্গল বারে॥
পইতা দিতে হ'বে তোমায়,
ভারে ভারে॥

১২

চাল গোটা চার রাঁধনা, সখি
ভাত গোটা দুই খাই।
কড়ির ঝারা মাথায় ক'রে,
তাঁতীপাড়া যাই॥
তাঁতী ভাই, তাঁতী ভাই,
ঘরে আছ গো।
আমার তুষলার বিয়ে,
শনি মঙ্গল বারে।
বারাণসী দিও, তুষলার
মঙ্গল আচারে॥

১৩

চাল গোটা চার রাঁধনা, সখি,
ভাত গোটা দুই খাই।
কড়ির ঝারা মাথায় ক'রে
শাঁখারি পাড়া যাই॥
শাঁখারি ভাই, শাখারি ভাই,
ঘরে আছ গো।

আমার তুষলার বিয়ে,
শনি মঙ্গল বারে।
মনের মতন রাঙ্গা শাঁখা,
দিও তুষুর করে ॥

১৪

চাল গোটা চার, রাঁধনা, সখি,
ভাত গোটা দুই খাই।
কড়ির ঝারা মাথায় করে,
পোদ্দার পাড়া যাই।
পোদ্দার * ভাই পোদ্দার ভাই,
ঘরে আছ গো।
আমার তুষলার বিয়ে,
শনি মঙ্গল বারে।
এক সাজ অলঙ্কার,
চাই তুষলার তরে ॥

এইরূপ "সিন্দূর মসলার" জন্য "বেনে পাড়া," "নানারকম সন্দেশে"র জন্য "ময়রা পাড়া" "দধি দুগ্ধের পশরা"র জন্য "গয়লা পাড়া" "দান সামগ্রী"র জন্য "কামার পাড়া," "মন দশেক মৎস্যের জন্য "জেলেপাড়া" "তুষলার এয়ো কামানে"র জন্য "নাপিত পাড়া" "পাঁচ মন তেলে"র জন্য "কলুপাড়া" "বরাতী রঙ্গের হলুদে"র জন্য "চাষী পাড়া" যাইবার ছড়া আছে।

অধিকাংশ মেয়েলী ছড়ার ন্যায় তুষলার ছড়া অনেক স্থলে অসংলগ্ন ও অর্থহীন। তুষলার পূজা আজকাল প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। অনেক গৃহে আর তুষলার পূজা দেখিতে পাওয়া যায় না। কালের পরিবর্ত্তনে, ইহা লুপ্ত হইলেও হইতে পারে। এই আশঙ্কায়, তুষলার ছড়াগুলি আমরা রক্ষা করিতে যত্ন করিলাম। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীসমাজের বালিকারা বুঝিতে পারিবে, তাহাদের পূর্ব্বতন ভগিনীরা এক সময় কি প্রকার আমোদ উৎসবের অনুষ্ঠান করিত।

এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। তুষলার যে ছড়া প্রকাশিত হইল, তাহাই যে সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে, তাহা নহে। ভাব একপ্রকার হইলেও, রচনার ভঙ্গী নানাস্থলে ও নানা জাতির মধ্যে নানাপ্রকার হইয়া থাকে।

আমাদের এই ছড়াটি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

---

* পোদ্দার অর্থাৎ—সেকরা।

জবালা।

শ্যামতটশালিনী সরস্বতী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। দুইকূলে অসংখ্য তরুরাজি, আকাশ নির্ম্মল, প্রকৃতি হাস্যময়ী। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, নীরব। ক্বচিৎ দুই একটি বনবিহঙ্গের মৃদু কলধ্বনি সেই গভীর নীরবতায় যেন তরঙ্গ তুলিতেছে। সরস্বতীর পূর্ব্ব তটে কুশক্ষেত্র। পশ্চিম তীরে গৌতমাশ্রম।

তখন আর্য্যভূমি আর্য্যমহিমায় মণ্ডিত, আর্য্যগৌরবে গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয় রাজা দেশের শান্তি রক্ষা করেন, বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যে ধনধান্য বৃদ্ধি করেন, আর স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেন। তখন ভারতের ঋষিযুগ, তখন ধর্ম্মের উপনিষদ্ যুগ!

কুশক্ষেত্রে গৃহস্থ ঋষিগণের বাস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর তরুলতায় বেষ্টিত, পুষ্পবনে সুশোভিত। ঋষিগণ, লোকহিতার্থে জ্ঞানানুশীলন করিতেছেন; ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির ব্যবস্থাসকল প্রণয়ন করিতেছেন। মুনিপত্নীগণ গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সন্তান পালন, স্বামীসেবা ও ব্রতাচরণ করিয়া পবিত্র নারীজীবনের আদর্শ দেখাইতেছেন। ঋষিকুমারেরা সুমধুর কণ্ঠে বেদ গান করিতেছেন; অরণ্য হইতে সমিধপুষ্প আহরণ করিতেছেন। কুমারীগণ হোমধেনু দোহন করিতেছেন, বৎসের মুখে নব তৃণ তুলিয়া দিতেছেন; কেহ কেহ বা আলবালে জল সেচন করিতেছেন।

সূর্য্য অস্ত যান। প্রকৃতির মুখে সন্ধ্যার কোমল ছায়া পতিত হইয়াছে। বনভূমি কোলাহলময়, আশ্রমপদ শান্তিময় এবং জগৎ আনন্দময় বোধ হইতেছে। এমন সময় একটি তপঃক্লশা রমণী, আপনার অতি ক্ষীণ দেহযষ্টি বল্কলে আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ললাটদেশে চিন্তাতরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, নয়ন হইতে পুণ্যজ্যোতি নির্গত হইতেছে; সর্ব্বাঙ্গে যেন কোমল লাবণ্য উথলিয়া উঠিতেছে। রমণী অবনত ম মৃদুপদে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

"জবালা, জবালা", ঋষিপত্নী সানন্দকণ্ঠে স্নেহশ্রদ্ধামিশ্রিত সুমধুর স্বরে ঐ নামে রমণীকে আহ্বান করিলেন। "জবালা, জবালা" এই চিরপরিচিত সুমধুর নামে আকৃষ্ট

হইয়া বালকবালিকাগণ খেলাধূলা ছাড়িয়া, যুবতীগণ গৃহকর্ম্ম রাখিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। জবালা ভক্তিভরে বয়স্কাদিগকে প্রণাম করিলেন, প্রেমভরে বয়স্যাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহভরে শিশুদিগের মস্তক চুম্বন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পূত-চিত্তা জবালা সেই পুণ্যাশ্রমে, পুণ্যকথায় পুণ্যময় সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করিলেন।

ঋষিপত্নীগণ বলিলেন, বাছা, তোমায় এ কয়দিন দেখি নাই কেন? তপস্যার কুশল বল! শরীর ত সুস্থ আছে? মনে ত কোনও অশান্তি নাই? চিত্তবিক্ষেপের কোনও কারণ ত উপস্থিত হয় নাই? বালক সত্যকাম ত ভাল আছে?

জবালা সলজ্জ মধুর বাক্যে কহিলেন, মা, আপনার চরণদর্শনে সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়। একটুকু নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন ছিল বলিয়া এ কয়দিন আসিতে পারি নাই। আপনার আশীর্ব্বাদ যাহার নিত্য সহায় তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?

ঋষিপত্নী বলিলেন, আজ ঋষি বলিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি লোকশিক্ষার্থ ছান্দোগ্যোপনিষদের যে উপাখ্যান ভাগ রচনা করিতেছেন, উহা একবার তোমায় শুনাইবেন। তোমার অভিমত জানিলেই উহা শিষ্যবর্গের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

জবালা অতিশয় সঙ্কোচ ও লজ্জার সহিত কহিলেন, গুরুদেব যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমি কি বুঝিব? আমি প্রজ্ঞাহীন, বাসনামুগ্ধ স্ত্রীলোক মাত্র! আমাকে এরূপে লজ্জিত করিবেন না।

ঋষিপত্নী সহাস্যমুখে সাদরে জবালার হস্ত দুখানি ধরিয়া স্নেহময় মধুরবাক্যে কহিলেন, মা, তুমি আর আত্মগোপন করিও না! তুমি আর আপনাকে অসার মনে করিয়া সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিও না। এখন আশ্রমের সকলেই তোমাকে বুঝিয়াছেন। তোমার তপঃপ্রভাবে ও অতুল ব্রহ্মজ্ঞানে কুশক্ষেত্র ধন্য হইয়াছে।

জবালা নীরবে মুখ নত করিয়া রহিলেন। তাঁহার ত জলধারা বহিতে লাগিল। এমন সময় বালক পদামা মা বলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। জবালা বালকের হস্ত ধরিয়া আদর করিলেন। ঋষিপত্নী সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। বালকও তাঁহার পদধূলি লইয়া নম্রভাবে মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঋষিপত্নী কহিলেন, মা জবালা, তোমার সত্যকাম সকল প্রকার অপরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। সেদিন আমাদের ঋষি বলিলেন, উহাকে এখন পরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্রহ্মর্ষি গৌতমের আশ্রমে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য!

সহসা জবালার প্রফুল্লমুখে ঘন বিষাদের ছায়া পতিত হইল, সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। না জানি কি এক অব্যক্ত দুঃখভারে মস্তক নত হইল। তিনি ঋষিপত্নীর কথায় কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া, পুত্রের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনার কুটীরে চলিয়া গেলেন।

জবালা কে, কুশক্ষেত্রের লোকে তাহা জানে না। গ্রামের এক প্রান্তে, সরস্বতীর তীরে একখানি অতি ক্ষুদ্র কুটীর। জবালা তথায় পুত্রসহ বাস করেন। বনফল তাঁহাদের খাদ্য, বৃক্ষবল্কল পরিধেয়, পর্ণকুটীর বাসগৃহ। সরস্বতীর নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া উদ্যানের মনোহর পুষ্প চয়ন করিয়া সুমধুর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যখন এই ব্রহ্মচারিণী জবালা ব্রহ্মোপাসনায় নিমগ্ন থাকেন, তখন বালক সত্যকাম অনিমেষনয়নে মাতার মুখশোভা দর্শন করে; এক অলৌকিক চিন্তায় তাহার মন বিহ্বল হইয়া যায়।

জবালা অবসর পাইলেই কুশক্ষেত্রের বৃদ্ধ ঋষির আশ্রমে যাইয়া পুণ্য কথা শ্রবণ করিতেন, তাঁহাদিগের পবিত্র জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। বৃদ্ধ ঋষি, জবালার ব্রহ্মনিষ্ঠা, জ্ঞানতৃষ্ণা ও মোক্ষকামনা দেখিয়া তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। পরম যত্নে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেন। তিনি কে, কোথা হইতে এখানে আসিলেন, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে জবালার মুখ মলিন হইত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত; সুতরাং আর কেহ সে কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

এখন জবালার জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এখন তিনি বৃদ্ধ ঋষির প্রধান শিষ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। কিন্তু আজিও কেহ তাঁহার পরিচয় জানে না, কেহ তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে না।

যে দিন জবালা ঋষিপত্নীর মুখে পুত্রের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার কথা শুনিয়া আসিলেন, সেদিন, সমস্ত রাত্রি তাঁহার হৃদয়ে

PAGES MISSING

চিন্তাতরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল; কত পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মর্ম্মস্থলে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছিল। অনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্যের বিমল স্পর্শে তাঁহার দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল; সবিতৃ দেবের পবিত্র ভর্গধ্যান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ের বিষাদ অন্ধকার কাটিয়া গেল। কোনও দুরবগাহ্য তত্ত্বের সহসা মীমাংসা হইয়া গেলে লোকের মনে যেরূপ আরাম বোধ হয়, না জানি কোন্ গূঢ়রহস্যের মীমাংসা হওয়াতে জবালার চিত্তও সেইরূপ প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। বালক সত্যকাম এ সকল কথার কিছুই জানিল না। মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে তাহার রজনী অতিবাহিত হইল। মাতার পুণ্য-প্রভাবে তাহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল।

সরস্বতীর অন্যতীরে ব্রহ্মর্ষি গৌতমের পুণ্যাশ্রম। গৌতম ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ কুমারেরা আসিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার যশঃ সৌরভে দিগন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। সবিতার কিরণস্পর্শে আর পূতপবনের মৃদুহিল্লোলে প্রাণিজগৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। গৌতম ঋষি অতি প্রত্যূষে গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সরস্বতীর নির্ম্মলজলে অবগাহন করিলেন। তাঁহার মানস-নেত্রে প্রকৃতি জ্ঞানময়, সবিতা প্রাণময়, চরাচর ব্রহ্মময় বোধ হইতে লাগিল। শিষ্যগণ হোমধেনু দোহন করিয়া, বনান্তর হইতে সমিধকুশাহরণ করিয়া, প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া বেদাধ্যয়ন জন্য আশ্রমতরুমূলে উপবেশন করিলেন।

সেই পুণ্যাশ্রমে পবিত্র বৃক্ষমূলে আজি বড় অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! তেজঃপুঞ্জ গৌতম ঋষি মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসু শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। শিশিরস্নাত আশ্রমতরুগণ, কৌতূহলী শিষ্যের ন্যায় চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদূরে সরস্বতীর মৃদুতরঙ্গনিনাদ, বিহঙ্গের কাকলি শব্দে মিলিত হইয়া, বনভূমিকে যেন সঙ্গীতময় করিয়াছে। গৌতম ঋষি ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট আছেন, শিষ্যগণ সংযতচিত্তে তাঁহার বচনামৃতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তখন সেই নীরব নিস্তব্ধ আশ্রমপদ কম্পিত করিয়া সহসা মহর্ষির গম্ভীর বাণী উত্থিত হইল। গৌতম ঋষি নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ, চিত্ত সংযত কর, ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও!

সহসা মহর্ষির বাক্য অবরুদ্ধ হইল, তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। মহর্ষির দৃষ্টিচাঞ্চল্য দেখিয়া শিষ্যগণও সবিস্ময়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলে দেখিলেন, এক অপূর্ব্বদৃষ্ট তরুণ বালক, ভয়কম্পিত হস্তে অর্ঘ্য ধারণ করিয়া, অদূরে দণ্ডায়মান আছে। বালকের সৌম্য-মূর্ত্তি, প্রশান্ত দৃষ্টি ও বিনম্র প্রকৃতি দেখিয়া মহর্ষির হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন।

তখন সেই বালক, মহর্ষির চরণে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া সুমধুর কণ্ঠে কহিল, ভগবন্ এ দাসের নাম সত্যকাম; কুশক্ষেত্রে আমাদের কুটীর। আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে বাসনা করি। মহর্ষি কৃপা করিয়া আমাকে শিষ্যমধ্যে গ্রহণ করিলে, আমার জীবন কৃতার্থ হয়।

গৌতম ঋষি সস্নেহে কহিলেন, বৎস, তোমার কুশল হউক। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। কিন্তু বৎস, তুমি জান, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় অধিকার নাই। অতএব বৎস, তোমার গোত্র কি, তুমি কোন্ বংশোদ্ভব, তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর।

বালক ধীরে ধীরে উত্তর করিল, ভগবন্, আমার গোত্র আমি অবগত নহি। আমার পিতা কে তাহাও আমি বলিতে পারি না। আমার মা আছেন। অনুমতি করুন্, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য সে কথা আপনাকে নিবেদন করিব।

জননী জবালা প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া সন্তানের জন্য বনফল সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তখনও সত্যকাম গৃহে আসিল না দেখিয়া ঈষৎ চঞ্চলপদে প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় সত্যকাম গৃহে প্রবেশ করিল। মাতা পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া এতক্ষণ সে কোথায় ছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম মাতার শীতল বক্ষে মস্তক রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, মা, আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্রহ্মর্ষি গৌতমের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম আমার প্রতি সবিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিয়া "বৎস, ব্রহ্মবিদ্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিক

* [illegible]

তোমার গোত্র কি, আমাকে বল।" আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য তাঁহাকে সে কথা জানাইব, বলিয়াছি। মা, বল আমার পিতা কে, আমার গোত্রই বা কি?

তখন সত্যপ্রাণা জবালা কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎস, আমি যৌবনে ঘোর দারিদ্র্যপীড়নে বহুচর্য্যা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। তুমি পতিহীনা অভাগিনী জবালার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার গোত্র কি, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

পরদিন শান্ত প্রভাতে পুনরায় শিষ্যগণ মহর্ষিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। সে দিন মুনিকুমারদিগের সামগানে বনভূমি কোলাহলময় হইতেছিল। বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে বসিয়া মহর্ষি সেই প্রিয়দর্শন বালকের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এমন সময় সত্যকাম ধীরে ধীরে যাইয়া মহর্ষির পাদ-বন্দনা করিল। শিষ্যগণ সামগানে বিরত হইয়া সকলে সেই তেজস্বী বালকের দিকে চাহিয়া রহিল। গৌতম ঋষি বালকের শিরঃ স্পর্শ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস, তোমার গোত্র কি?

তখন সত্যকাম নম্রদৃষ্টিতে মৃদুস্বরে কহিল, ভগবন্, আমার গোত্র কি মা তাহা জানেন না। তিনি কহিলেন, "বৎস, আমি যৌবনে ঘোর দারিদ্র্যপীড়নে বহুচর্য্যা করিয়া তোমায় পাইয়াছি। তুমি ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার গোত্র কি তাহা আমি বলিতে পারি না।"

তখন মহর্ষি বিস্ময়দৃষ্টিতে সেই বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আর শিষ্যগণ একে অন্যের প্রতি চাহিয়া বালককে উপহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা সেই অনভিজাত অনার্য্যের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া তাহাকে ধিক্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন উদারচিত্ত গৌতম ঋষি সহসা দণ্ডায়মান হইয়া, সেই অনভিজাত অব্রাহ্মণ বালককে সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস, তুমি সত্যপরা জননীর সত্যকুলোদ্ভব সন্তান, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ! তোমার ন্যায় সত্য-বংশজাত ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারী! *

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

* [illegible]নিষদ্ ৪র্থ অধ্যায়, সত্যকামজাবালসংবাদ।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ।

মহর্ষি বাল্মীকি মহারাজ দশরথ ও রামচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। রাম দণ্ডকারণ্য-গমনকালে চিত্রকূট-পর্ব্বত-সন্নিধানে তাঁহার আশ্রমে এক নিশা যাপন করেন।* পরে তিনি লঙ্কা হইতে সীতা সমুদ্ধার করিয়া অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, বাল্মীকি তাঁহার চরিত অবলম্বনপূর্ব্বক রামায়ণমহাকাব্য রচনা করেন। রাম লোকাপবাদ ভয়ে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলে, লক্ষ্মণ জাহ্নবী-তটে বাল্মীকির আশ্রমসন্নিধানে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আইসেন।† রামের পুত্রদ্বয় কুশীলব ইঁহারই আশ্রমে লালিত পালিত হইয়া রামায়ণ মহাকাব্য তানলয়যোগে বীণাসহ গান করিতে শিক্ষা করেন এবং সভাসীন রামচন্দ্রকে তাহা শ্রবণ করাইয়া বিমুগ্ধ করেন। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে রামের অভিলাষ হইলে, ভগবান বাল্মীকি স্বয়ং তাঁহাকে সভামধ্যে লইয়া আসিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং সেই বিশুদ্ধস্বভাবা মহীয়সী মহিলার পুনর্গ্রহণের নিমিত্ত রামকে যথোচিত অনুনয় করেন।‡ এই সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে, রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি যে রামের ও দশরথের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না।

কোশলরাজ্য ও তাহার রাজধানী অযোধ্যাপুরী মহারাজ দশরথ ও রামচন্দ্রের রাজত্বকালে ভারতে অতিশয় প্রখ্যাত ছিল। অযোধ্যা মহানগরীতে কোনও বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলে, নানা দেশ হইতে রাজগণ ও ঋষিবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিতেন। মহর্ষি বাল্মীকিও এইরূপ সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যানগরীতে উপস্থিত হইতেন। সুতরাং তিনি যে অযোধ্যা স্বচক্ষে অনেকবার দেখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বালকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যাপুরীর যে মনোহারিণী বর্ণনা

* "ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগমাশ্রমং সর্ব্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্॥"
(অযোধ্যা, ৫৬ শঃ সর্গঃ)

† ঋষিরা কোনও একস্থলে বহুদিন বাস করিতেন না। প্রয়োজন ও ইচ্ছা হইলে তাঁহারা যে সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেন, তাহার প্রমাণ রামায়ণেই পাওয়া যায়।

‡ উত্তরকাণ্ড ১০৬ ও ১০৯ সর্গ দেখুন।

আছে, এবং অযোধ্যাকাণ্ডে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক সময়ে উৎসবময়ী নগরী ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির যে জাজল্যমান চিত্রাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায় তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতারই ফল বলিয়া বিবেচনা হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, কবিকল্পনায় কোন কোন চিত্র বা সকল চিত্রই অল্পাধিকপরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়া থাকিবে এবং হওয়া সম্ভবপরও বটে, কিন্তু, তাহা হইলেও, এই অতিরঞ্জনের পশ্চাদ্ভাগে যে সত্যের সুদৃঢ়ভিত্তি দণ্ডায়মান ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সুধাধবলিত কোনও মনোহর অট্টালিকা জ্যোৎস্নাজালবিমণ্ডিত হইলে এক অপার্থিব শোভা ধারণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু জ্যোৎস্নাবিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত শোভার অপার্থিবত্বই বিলীন হয়, অট্টালিকার যাহা স্বাভাবিক পার্থিব শোভা, জ্যোৎস্নাবিলয়ে তাহার কিছুই হ্রাস বা খর্ব্বতা হয় না।

অযোধ্যাপুরীর বর্ণনাকালে, বাল্মীকির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যে চিত্র জাজ্বল্যমান ছিল, ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। * বর্ত্তমান প্রবন্ধে, মহারাজ দশরথের সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ ও মনোহর রাজান্তঃপুরের একটি ক্ষীণচিত্র উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

হুইলার সাহেব রামায়ণ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী প্রাকার প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল না। তাঁহার মতে ইহা সম্ভবতঃ কাষ্ঠবংশাদি নির্ম্মিত একটি বেষ্টনীমাত্র ছিল। রাজপ্রাসাদও ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা গঠিত ছিল কি না, তদ্বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ মনোযোগসহকারে রামায়ণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, বাল্মীকির সময়ে হিন্দু আর্য্যগণ ইষ্টকাদির ব্যবহার জানিতেন এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা গৃহাদি প্রস্তুত করিতেন। † সুতরাং অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ও প্রাকার যে ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাজ দশরথের "রাজভবন শরৎকালীন নিবিড়-মেঘসদৃশ ও কৈলাসশৃঙ্গতুল্য নানাপ্রকার মনোহর প্রাসাদ-শিখর এবং গগনস্পর্শী, বিশনতুল্য, পাণ্ডুরবর্ণসম্পন্ন ও রত্নসমূহশোভিত ক্রীড়াগৃহে শোভিত ছিল এবং পৃথিবীতে তাহার উপমা ছিল না।" (বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ অযোধ্যাকাণ্ড, ১৭শ সর্গ)।

রাজভবনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা, আমরা তাহার বর্ণ, উচ্চতা এবং প্রাসাদের উপরিভাগস্থ গগনস্পর্শী শৃঙ্গাদির চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। শরৎকালে সুনীল আকাশবক্ষে পুঞ্জীভূত ধবল মেঘরাশি যেরূপ স্তরে স্তরে শোভা পাইয়া থাকে, দশরথের সুধাধবলিত রাজপ্রাসাদও তদ্রূপ শোভা পাইত এবং অসংখ্য শৃঙ্গে পরিবৃত হইয়া কৈলাস পর্ব্বত যেরূপ শোভিত হয়, শিখরসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদও তদ্রূপ শোভা ধারণ করিত। দশরথের রাজপ্রাসাদের যদি মৃণ্ময়ীভিত্তি থাকিত ও তাহা যদি তৃণাচ্ছাদিত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনার কোনই সার্থকতা থাকিত না।

আমাদের আবাসবাটী সচরাচর যেরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, একটি বহির্ভাগ ও অপরটি অন্তঃপুর, দশরথের প্রাসাদেরও তদ্রূপ দুইটি বিভাগ ছিল। বহির্ভাগে তাঁহার সভাগৃহ ও তৎসম্মুখে সুবৃহৎ চত্বর ছিল। সভাগৃহ সম্ভবতঃ দ্বিতল কিম্বা উচ্চস্থানে স্থাপিত ছিল। যেহেতু, তাহাতে "আরোহণ" করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

"স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ॥

(অযোধ্যা, ৩য়ঃ সর্গঃ)

পুনশ্চ

"সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ।
সনীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ॥"

(ঐ, ৫মঃ সর্গঃ)

বলা বাহুল্য, দশরথ সভাসদগণে পরিবৃত হইয়া সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকে, পিতৃদর্শনার্থ রামচন্দ্র প্রাসাদে আরোহণ করিয়া সভায় উপ মহশ্রদ্ধা-দ্বিতীয় শ্লোকে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সভাগৃহে আরো করিলেন। রামচন্দ্র যখন রাজপথে রথারোহণ করিয়া মে আকৃষ্ট

* "অযোধ্যাপুরী" প্রবন্ধ; "প্রদীপের" শ্রাবণ সংখ্যা।

† মহারাজ দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার কালে নিমন্ত্রিত রাজগণ ও অন্যান্য ব্যক্তির আবাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন—

"ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।"

বালকাণ্ডম্, ১৩ শঃ সর্গঃ

তখন দশরথ প্রাসাদে থাকিয়াই রামকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। যথা:—

"প্রাসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্।"

(ঐ ৩য়ঃ সর্গঃ)

এই সভাগৃহে রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া মহারাজ দশরথ রাজকার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিতেন। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সভাসদ্‌গণ সম্মুখে উপবিষ্ট হইতেন। কোনও গুরুতর রাজকার্য্যোপলক্ষে যখন প্রাসাদে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম হইত, তখন ঋষিবর্গ, রাজগণ, ধনবান্ ও শ্রেষ্ঠ বণিক্‌গণ আপনাপন পদমর্য্যাদা অনুসারে সভাগৃহে উপবেশন করিতেন, ও দর্শক নাগরিকেরা সভাগৃহের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ চত্বরে স্থান পরিগ্রহ করিত।

এই সভাগৃহ ও চত্বর রাজপ্রাসাদের প্রথম কক্ষ্যায় (প্রকোষ্ঠে) অবস্থিত ছিল। এই কক্ষ্যাপ্রবেশের দ্বারের নাম রাজদ্বার। রাজদ্বার যেরূপ উচ্চ, তদ্রূপ প্রশস্ত ছিল। এই রাজদ্বারের ভিতর দিয়া অশ্বযুক্ত রথ ও আরোহীসমেত বৃহৎ হস্তী গমনাগমন করিতে সমর্থ হইত। দ্বারপালেরা অস্ত্রশস্ত্র সহকারে দ্বার রক্ষা করিত এবং সম্ভবতঃ তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারিত না।

প্রথম কক্ষ্যার পরেই দ্বিতীয় কক্ষ্যা। এই শেষোক্ত কক্ষ্যা প্রবেশের দ্বারেও দ্বারপালেরা অবস্থান করিত। প্রজাসাধারণ মাত্রেরই প্রথম কক্ষ্যা প্রবেশের অধিকার ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ্যার দ্বার সকলের পক্ষে অবারিত ছিল, বলিয়া বোধ হয় না। এই কক্ষ্যাতেই রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত মহীপতিগণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অভিষেকের পূর্ব্বাহ্নে এই স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অন্তঃপুরচারিণী মহিষীগণ ও অন্যান্য মহিলাবর্গেরও এই স্থানে রামাভিষেক দর্শনের সুবিধা ছিল।

দ্বিতীয় কক্ষ্যার পর তৃতীয় কক্ষ্যা। তৃতীয় কক্ষ্যা পর্য্যন্ত প্রবেশ দ্বার উচ্চ ও প্রশস্ত ছিল। যেহেতু এই কক্ষ্যা পর্য্যন্তও রথচালনের প্রমাণ পাওয়া যায়। * ইহার পর আরও দুইটি কক্ষ্যা ছিল। তাহা পদব্রজে প্রবেশ করিতে হইত। বলা বাহুল্য যে এই পঞ্চ কক্ষ্যার প্রতি দ্বারেই শস্ত্রপাণি ধানুকিগণ প্রহরণায় নিযুক্ত থাকিত। পঞ্চম কক্ষ্যার পরেই "শুদ্ধান্তঃপুর" বিদ্যমান ছিল। এই স্থানেই রাজমহিষীগণ বাস করিতেন। যথা:—

"স সর্ব্বাঃসমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবর্ত্ত্য জনং সর্ব্বং শুদ্ধান্তঃপুরমভ্যগাৎ॥"

(অযোধ্যা, ১৭ শঃ সর্গঃ)

অর্থাৎ অনুচরবর্গের সহিত রামচন্দ্র পঞ্চম কক্ষ্যা পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক, সেই স্থানে তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিয়া, শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, শুদ্ধান্তঃপুরে মহিষীগণ থাকিতেন বলিয়াই, রাম তাঁহার অনুচরদিগকে পঞ্চম কক্ষ্যা হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে শুদ্ধান্তঃপুরের যৎসামান্য আভাস দেওয়া যাউক।

মহারাজ দশরথের তিনটি প্রধানা মহিষী ছিলেন। কৌশল্যা প্রথমা, কৈকেয়ী দ্বিতীয়া ও সুমিত্রা তৃতীয়া ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কৈকেয়ী যুবতী, পরমাসুন্দরী ও রাজার অতীব প্রিয়পাত্রী ছিলেন। এই তিনটি প্রধানা মহিষী ব্যতীত, মহারাজের আরও সার্দ্ধতিনশত মহিষী ছিলেন। * ইঁহারা সকলেই অন্তঃপুরবাসিনী। এই মহিষীগণ ও ইহাঁদের দাসীবর্গ, সকলের সংখ্যা যে সহস্রাধিক ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত অন্তঃপুরচারিণী প্রতিহারিণীদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এই সমস্তের জন্য অন্তঃপুরে এক একটি গৃহ নিরূপিত করিলেও, অন্তঃপুরের যে আকার হয়, তাহা মনোমধ্যে সহজে ধারণা হয় না। কিন্তু প্রধানা মহিষীদের এক একটি অন্তঃপুর বৃহদায়তন ছিল। অপরা সার্দ্ধতিনশত মহিষীদের এক একটি অন্তঃপুর তাদৃশ বৃহৎ না হইলেও, মহারাজের যে আবাসযোগ্য ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? সুতরাং পাঠকবর্গ মহারাজের অন্তঃপুরের আয়তন মনে মনে কল্পনা করিয়া লউন।

* "স কক্ষ্যা ধন্বিভি র্গুপ্তাস্তি স্রোহতিক্রম্য বাজিভিঃ।
পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ"॥

(অযোধ্যা, ১৭ শঃ সর্গঃ)

"বাজিভিঃ রথযুক্তৈ" রিতি টীকা।

* "অর্দ্ধসপ্তশতাস্তাস্ত প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।"

(অযোধ্যা, ৩৪শঃ সর্গঃ)

"অর্দ্ধসপ্তশতা একদেশীসমাসঃ। সপ্তশতস্যার্দ্ধং সংখ্যা যাসাং তা ইত্যর্থঃ।" ইতি টীকা

পঞ্চম কক্ষ্যার পর শুদ্ধান্তঃপুরের আরম্ভ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ কক্ষ্যাতেই যে কৈকেয়ী দেবীর অন্তঃপুর ছিল, তাহার প্রমাণ রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। * দশরথ রামাভিষেকের পূর্ব্ব দিবসে কৈকেয়ীকে রামের রাজ্যাভিষেকরূপ প্রিয় সংবাদ জানাইবার জন্য যখন তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন মহর্ষি বাল্মীকি তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যথা :—

"স কৈকেয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥
শুকবর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চহংসরুতাযুতম্ ॥
বাদিত্ররবসজ্যুষ্টং কুব্জাবামনিকা যুতম্।
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ ॥
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্ব্বৃক্ষৈর্ব্বাপীভিরুপশোভিতম্ ॥
দান্তরাজতসৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্।"

(অযোধ্যা ১০মঃ সর্গঃ)

অর্থাৎ "মহাযশা রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সেই উৎকৃষ্ট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই অন্তঃপুরে অনেক লতা-নির্ম্মিত গৃহ এবং অশোক ও চম্পক বৃক্ষে শোভিত চিত্রিত সৌধ ছিল; তাহাতে অনেক গজদন্তনির্ম্মিত ও (রজত) সুবর্ণ রচিত বেদি এবং গজদন্তনির্ম্মিত ও (রজত) সুবর্ণ রচিত উৎকৃষ্ট আসন ছিল; সেই অন্তঃপুর ক্রৌঞ্চ ও হংস রবে প্রতিধ্বনিত সরোবরসমূহে উপশোভিত ছিল; উহাতে অনেক নিত্যপুষ্প ও ফলসমন্বিত বৃক্ষ এবং শুক ও ময়ূর-পক্ষী ছিল; সেই অন্তঃপুর বিবিধ বাদ্যরবে প্রতিধ্বনিত ছিল। উহাতে অনেক কুব্জা ও খর্ব্বাকারা দাসী ছিল এবং সেই অন্তঃপুরে নানাবিধ অন্ন, পেয় ও মোদক প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য এবং অনেক মহামূল্য অলঙ্কার ছিল; অধিক কি, সেই অন্তঃপুর সকল বিষয়ে স্বর্গের তুল্য ছিল।" (বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ, অযোধ্যা ১০ম সর্গ)

উদ্ধৃত বর্ণনায়, পাঠকবর্গ কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের একটি জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিতে পাইতেছেন এবং তাহার আকার প্রকার এবং আয়তনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন। যে অন্তঃপুরে অনেক লতাগৃহ ও চিত্রিত সৌধ বিদ্যমান, ক্রৌঞ্চহংসনিনাদিত বাপীসমূহ বিরাজিত, নিত্যপুষ্প ও ফলপ্রসূ বৃক্ষরাজি শোভমান, তাহা যে আয়তনে বৃহৎ ও দেখিতে পরম রমণীয় ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কৈকেয়ীর সৌধসকলও উচ্চ ছিল; যে হেতু তাঁহার দাসী মন্থরা সৌধচূড়ে আরোহণ করিয়া, রামাভিষেক উপলক্ষে উৎসবময়ী সমগ্র অযোধ্যানগরী দেখিতে পাইয়াছিল। যথা :—

"জ্ঞাতি দাসী যতোজাতা কৈকেয্যাতু সহোষিতা।
প্রাসাদং চন্দ্রসঙ্কাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া ॥
অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদন্ববৈক্ষত ॥"

(অযোধ্যা, ৭মঃ সর্গঃ)

প্রাসাদের উচ্চতা অপর একটি শ্লোকদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। যথা :—

"নির্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া।
সাগরহ্রদসঙ্কাশাৎ সুমন্ত্রোহন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ ॥"

(অযোধ্যা, ১৪শঃ সর্গঃ)

বাল্মীকি কৈকেয়ীর অন্তঃপুরকে সাগরহ্রদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে উচ্চ সৌধমালার মধ্যে কৈকেয়ীর অন্তঃপুর সাগরহ্রদেরই ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

সপ্তম কক্ষ্যাতে অন্যান্য রাজমহিলারা বাস করিতেন। দশরথের রাজপ্রাসাদে দ্বিতল, ত্রিতল এবং এমন কি সপ্ততল গৃহও বিদ্যমান ছিল। যথা :—

"হর্ম্মৈর্ব্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ সমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্য্যো রামদর্শনকর্শিতাঃ ॥"

(অযোধ্যা, ৫৮ শঃ সর্গঃ)

হর্ম্ম্য অর্থে ধনিক গৃহ, বিমান অর্থে সপ্তভূমিক গৃহ এবং প্রাসাদ অর্থে রাজগৃহ বা ত্রিভূমিক গৃহও বুঝায়। * সুমন্ত্র রাম প্রভৃতিকে জাহ্নবীতটে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শূন্যরথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া যখন অন্তঃপুরে মহারাজকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, তখন শোকার্ত্তা রাজমহিলারা তাঁহাকে ত্রিতল ও সপ্ততল গৃহ হইতে অবলোকন করিতেছিলেন।

অষ্টম কক্ষ্যা হইতে কৌশল্যার অন্তঃপুরের আরম্ভ। রামলক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসের জন্য বহির্গমন করিলে দশরথ উন্মত্তের ন্যায় প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপথ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। পরে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, তিনি ভৃত্যবর্গকে

* অযোধ্যাকাণ্ডের ১৭ ও ১৮ সর্গ দেখুন।

* রামায়ণের টীকা দেখুন।

বলিয়াছিলেন "আমাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল; আর কোথাও আমার চিত্ত আশ্বস্ত হইবে না।" বলা বাহুল্য শোকোন্মত্তা কৌশল্যা রাজার সমক্ষে প্রথমে অনেক বিলাপ করিলেও, পরে নিজ শোক সংবরণপূর্ব্বক স্বামীকে আশ্বস্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রাম প্রভৃতিকে জাহ্নবীতটে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া মহারাজ দশরথকে কৌশল্যার অন্তঃপুরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। যথা :—

"স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে ॥"

অর্থাৎ সুমন্ত্র মহারাজকে অষ্টমী কক্ষ্যাতে দেখিতে পাইলেন। সুতরাং অষ্টমী কক্ষ্যাই যে কৌশল্যার অন্তঃপুর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কৌশল্যার অন্তঃপুরও আয়তনে বৃহৎ ছিল। রাম কৈকেয়ীর মুখে বনবাসাজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া জননীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন। "রাম তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধ পরমসৎকৃৎ দ্বারাধ্যক্ষকে ও অপরাপর অনেক দৌবারিককে অবস্থিত দেখিলেন। * * * তিনি প্রথম-কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় কক্ষ্যাতে প্রবেশিয়া তথায় রাজসৎকৃত বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অবস্থিত দেখিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। পরে, তিনি তৃতীয় কক্ষ্যাতে প্রবেশিয়া বালা ও বৃদ্ধা মহিলাদিগকে দ্বার রক্ষা করিতে দর্শন করিলেন।" (অযোধ্য, বিংশ সর্গ)। * কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের ন্যায় কৌশল্যার অন্তঃপুরও যে লতাগৃহ, চিত্রিত সৌধমালা, হংসসারসনিনাদিত বাপী প্রভৃতিতে সুশোভিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইঁহার অন্তঃপুরে দেবগৃহাদিরও বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দশরথের রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায়, তাহার উচ্চতা, প্রকাণ্ডত্ব, মনোহারিত্ব ও দর্শনযোগ্যতা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বাল্মীকির এই বর্ণনা পাঠ করিয়া হুইলার সাহেব কিরূপে যে তাহার অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

রাম[illegible]চন্দ্রের প্রাসাদ দশরথের রাজপ্রাসাদ হইতে স্বতন্ত্র থাকি[illegible] তিনি নিজ প্রাসাদ হইতে মহারাজের রাজপ্রাসাদে আসিবার কালে রাজপথ বাহিয়া আসিতেন; এ স্থলে রামের প্রাসাদের যৎসামান্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রামচন্দ্রের প্রাসাদের তিনটি কক্ষ্যা অতিক্রান্ত হইলে, তাঁহার অন্তঃপুরে উপস্থিত হওয়া যাইত। যথা :—

"স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্।
তিস্র কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ ॥"

(অযোধ্যা, ৫মঃ সর্গঃ)

রামের প্রাসাদও দেখিতে পরমরমণীয় ছিল। যথাঃ—

"ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্।
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্ত শক্রবেশ্মসমপ্রভম্ ॥
মহাকপাটপিহিতং বিতর্দ্দিশত শোভিতম্।
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রুমতোরণম্ ॥
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্।
মণিভির্ব্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ॥
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্।
গন্ধান্ মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দ্দুরং শিখরং যথা ॥
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দ্দদ্ভির্বিরাজিতম্।
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণং সুৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা ॥
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্মতেজসা।
চন্দ্রভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্ ॥
মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্।
মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শহ ॥"

(অযোধ্যা, ১৫শঃ সর্গঃ)

রামের রাজ্যাভিষেকের দিনে তাঁহার প্রাসাদ সুসজ্জিত হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে বাল্মীকি তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথের আদেশে রামকে আনয়ন করিতে গিয়া সুমন্ত্র দেখিলেন যে, "সেই ইন্দ্রালয়সদৃশ, বৃহৎকপাটযুক্ত, দ্যুতিসমন্বিত ভবনের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের উপরিভাগ শত শত বেদিকায় শোভিত এবং তাহাতে অনেক কাঞ্চন-নির্ম্মিত-প্রতিমা স্থাপিতা রহিয়াছে; তাহার বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমে খচিত; সেই শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিবিড় প্রভাশালী প্রদীপ্ত ভবন মণি ও মুক্তাসমূহে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পমাল্যদাম ও তদন্তর্ব্বর্ত্তীমহাদীপ্তিসমন্বিত মণিগণে অলঙ্কৃত হইয়া মেরুগুহার সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে, তাহা চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত হইয়া মলয়গিরির ন্যায় মনোহর গন্ধ বিসর্জ্জন করিতেছে; তাহা শব্দকারী সারস ও ময়ূরগণে বিরাজিত,

* [illegible]মান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ।

স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত বৃক (ব্যাঘ্র) সমূহে সমাকীর্ণ এবং স্বত্রধরখোদিত-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম-চিত্রযুক্ত কাষ্ঠফলকে শোভিত রহিয়াছে এবং সেই কুবের ভবনসদৃশ রামালয় দীপ্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সাদৃশ্য লাভ করিয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা সকল প্রাণীরই মন ও চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে।" ইত্যাদি (বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ)

এই উদ্ধৃত বর্ণনাদ্বারা পাঠকগণ রামভবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। দশরথের অন্তঃপুরের সহিত ইহারও অন্তঃপুরের সৌসাদৃশ্য ছিল। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পুলিসের বাহাদুরী।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর।

কলিকাতায় প্লেগের হুজুগ যখন অত্যন্ত অধিক, যখন সহস্র সহস্র প্লেগাতঙ্কিত কলিকাতাবাসী, পূর্ব্বে শিয়ালদহ এবং পশ্চিমে হাবড়া, কলিকাতার এই উভয় প্রান্তবর্ত্তী রেল পথে বঙ্গের দূরতর পল্লীতে পলায়নপূর্ব্বক আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেছিল, সে সময়ে আমি কলিকাতা-বক্ষঃস্থিত আমার দ্বিতল বাসাটিতে বসিয়া একাগ্রমনে আমার কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন, "যঃ পলায়তি স জীবতি।" কিন্তু এই কলিযুগে যে "অন্নগত প্রাণ," এ সত্যটি এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও আমি ভুলিতে পারি নাই, ভাবিলাম, দৈবের কথা বলা যায় না, কোন গতিকে প্লেগের হাত এড়াইলেও এড়াইতে পারি, কিন্তু এই মধ্যবয়সে গবর্ণমেণ্টের চাকরীটুকু হারাইলে এমন চাকরী পুনঃপ্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাই আমি আমার মা, পিসিমা, স্ত্রী এবং আমার ভগিনী দুটিকে কিছু কালের জন্য দেশে পাঠাইয়া একাকীই বীরপুরুষের মত প্লেগদানবের সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিলাম। কিন্তু ইহাতেও এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ উপস্থিত হইল; আমার স্ত্রী শৈল শেষটা বাঁকিয়া বসিল, বলিল, "মরিতে হয় দুজনে একত্র মরিব, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কখন সেই ম্যালেরিয়াপূর্ণ পাড়াগাঁয়ে যাব না। কলিকাতাতে যে কেহই থাকিতেছে না, তাত আর নয়, অদৃষ্ট ছাড়াইয়া কোথায় যাইব, বল?" এই সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের উত্তরে আমি বোম্বের প্লেগের কথা তুলিলাম, সেগ্রিগেসন ও প্লেগরেগুলেশনের ভয় দেখাইলাম, কিন্তু সে অটল! সুতরাং অগত্যা তাহাকে কাছে রাখিয়া বাকি আর সকলকে বাড়ী পাঠাইতে হইল।

বাঙ্গালীর মেয়ের এতখানি সাহস কিছু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রীর পক্ষে এই প্রকার আত্মত্যাগের কিঞ্চিৎ কারণ আছে। বাল্যকাল হইতেই সে কলিকাতাবাসিনী, বেথুনে শিক্ষিতা এবং কোন প্রকার হুজুগের আশঙ্কা হইতে ভয় পাইবার পাত্রী নহে। কলিকাতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা এবং অসুবিধা তাহার জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, পল্লী গ্রামকে সে যমালয়ের মত মনে করে, এবং এই নকল যমালয় অপেক্ষা আসল যমালয়ে যাইতেই সে অধিক রাজী!

কিন্তু শৈলকে লইয়া অবশেষে আমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইল। পরিবারবর্গের সহিত পুরাতন, বৃদ্ধ পৈত্রিক ভৃত্যটিও দেশে চলিয়া গিয়াছে, তিন চারি দিন যাইতে না যাইতেই দাসীটা আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবু, আমার মাহিয়ানা চুকাইয়া দিন, আমি আর একদিনও এখানে থাকিব না, বাঁচিয়া থাকিলে অনেক যায়গায় চাকরী মিলিবে।" বিপদ দেখিয়া আমি তাহাকে অনেক যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে প্লেগের ভয়টা কিছু নহে এবং অদৃষ্টের লেখা খণ্ডান যায় না। কিন্তু 'চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী,' তাহার ত আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী নয়, আমার সকল উপদেশ অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইল, তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হইলাম।

আট দশজন লোকের স্থানে এখন বাসায় রহিলাম শুধু আমি আর আমার স্ত্রী শৈল। দুইটি মাত্র লোক লইয়া প্রকাণ্ড বাড়ীটা শূন্যতাভরে যেন 'খা' 'খা' করিতে লাগিল; ইহার উপর আমার আবার সর্ব্বদা [illegible] পরে থাকিবার যো নাই; সকালে বেলা দশটা হইতে দু[illegible] বর্গকে পর্য্যন্ত এবং রাত্রে আটটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত [illegible]

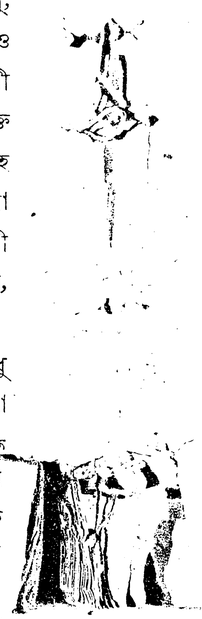

আফিসে আমার 'ডিউটী'। একটি বাঙ্গালী রমণীকে একাকিনী বাসায় রাখিয়া আফিসে গিয়া মনোযোগের সহিত যথানিয়মে 'ডিউটী' সম্পন্ন করা কিরূপ কঠিন, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিবে না; কিন্তু চাকরীজীবী বাঙ্গালীর গত্যন্তর নাই।

সুখে দুঃখে সুবিধা অসুবিধায় কয়েক দিন এক রকম কাটিয়া গেল। একদিন শুনিলাম সহরে বড় চোরের উপদ্রব হইয়াছে, পাড়াতেও দুই একটা বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। লোকজন প্রাণভয়ে মূল্যবান দ্রব্যাদি উপযুক্তরূপে সুরক্ষিত না করিয়াই অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে, চোরেরা তাহা বুঝিয়াছিল, এখন তাহাদের একটা মরসুম! আমি কিছু চিন্তিত হইলাম। নগদ টাকা যে আমার ঘরে বেশী ছিল তা নয়; আমার শ্বশুর মহাশয় বেশ অবস্থাপন্ন লোক, শৈল ছাড়া আর তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা ছিল না, শৈলকে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার এবং আমাকে কতকগুলি রূপার বাসন বিবাহের সময় যৌতুক দিয়াছিলেন। আমরা স্বামী স্ত্রী বিবাহের পর হইতেই কলিকাতায়, কাজেই এগুলিও আমরা এখানে রাখিয়াছিলাম। শৈলের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কয়েকখানি গহনা ভিন্ন অন্যান্য অলঙ্কার এবং রূপার বাসন আমি নীচের ঘরে চোর কুঠুরীটার মধ্যে একটা মজবুত সিন্দুকে রাখিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস ছিল উপরের কোন কক্ষ অপেক্ষা এই কুঠুরীটাই অধিক গুপ্ত এবং সুরক্ষিত। বিশেষতঃ আমার বিশ্বাসী পৈতৃকভৃত্য গোপীনাথ এই কুঠুরীটার পাশেই একখানা নেয়ারের খাট পাতিয়া তাহার উপর দিবারাত্রি অধিকাংশ কাল পড়িয়া থাকিত, যেন কোন সুপ্তিহীন যক্ষ অন্ধকারময় পাতালের কোন নিভৃত গর্ভে একটা গুপ্তকক্ষের পাশে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া একাগ্রচিত্তে তাহার কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে!

কিন্তু এখন আর গোপীনাথ নাই। সেই জন্য, চোরের উৎপাত বৃদ্ধি হইলে, একদিন সকালে আহার করিতে বসিয়া আমি শৈলকে বলিলাম, "নীচে এখন আর কেহ থাকে না, সোণারূপার গহনাপত্রগুলা উপরের কোন ঘরে রাখা ভাল; বাসায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমাকে একা থাকিতে হয়, সে সময় চোর আসিয়া জিনিষগুলা চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে।"

আমার কথা শুনিয়া শৈল হাসিয়া বলিল, "তোমার ভয় দেখে আর বাঁচিনে; রাজ্যের এত জিনিষ থাকিতে আমাদের সামান্য কখানা গহনার উপর চোরের নজর পড়িবে? আমাদের এ সকল জিনিষের কথা কেই বা জানে! আর আমিত একেবারে মরিয়া থাকি না, রাত্রে যতক্ষণ তুমি আফিসে থাক, আমি ততক্ষণ প্রায় জাগিয়াই থাকি। আমার খুব সজাগ ঘুম, সামান্য শব্দেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, ওগুলা চোর কুঠুরীর মধ্যেই থাক।"

আমি বলিলাম, "তোমার বড় পাতলা ঘুম এই অহঙ্কারেই তুমি বাঁচনা। কিন্তু তুমি যতই সাবধান হও, আমি বাজী রাখিয়া বলিতে পারি যে তোমার এত সজাগ ঘুমের মধ্যে হইতেও আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব সরাইতে পারি—তুমি কিছুই টের পাইবে না।"

"আচ্ছা বাজীরাখা থাক, যদি তুমি তা পার তা হ'লে আমি তোমাকে—তোমাকে আর কি দেব আমারত কিছুই নেই, কিন্তু যদি তোমার হার হয়?"

"অর্থাৎ যদি আমি তোমার কাছে ধরা পড়ি?—তাহ'লে আমি তোমাকে দুটো একটা সৌখীন জিনিষ কিনে দেব।"—আমি এই উত্তর দিলাম। শৈল অভিমান-উদ্বেলিত স্বরে বলিল,, "সৌখীন জিনিষের মুখে আগুন, কেনা জিনিষে আমার দরকার নেই।"

আমি বলিলাম, "না কিনিয়া পাওয়া যায় এমন অমূল্য দ্রব্য আমি কোথা পাইব?" শৈল বলিল, "কিছু নাই কি?"

আমি উত্তর দিলাম, "আছে, প্রেম এবং চুম্বন; অমূল্য বটে, কিন্তু দুটোই পুরানো; কোন্টা চাই?"

শৈল আমাকে পাখাকরিতেছিল, রাগ করিয়া পাখা ফেলিয়া উঠিয়া গেল; আহারান্তে আমি আফিসে চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুল।

রাত্রি আটটা হইতে আমার 'নাইট ডিউটী'। সন্ধ্যার সময় সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, একটা 'নাইট ক্যাপ' মাথায় পরিয়া দ্বিতীয়বার আফিসে চলিলাম; বাসায় শৈল একাকিনী থাকায়, তাহার অনুরোধক্রমে আমি বাহিরের

ঘরের সকল দরজার ভিতর হইতে খিল দিয়া, শুধু একটা দরজায় চাবি লাগাইয়া আফিসে যাই। নীচের কোন ঘরে আলো রাখিবার আবশ্যক হয় না, কেবল সিঁড়ির ঘরটাতে সমস্ত রাত্রি গ্যাস জ্বলে।

আফিসে যথারীতি কাজ করিয়া রাত্রি বারোটার সময়ে বাসায় ফিরিলাম। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে আমার বাসা প্রায় দুই মাইল, কি তারও কিছু বেশী হইবে। এত রাত্রে ট্রাম পাওয়া যায় না, গাড়ীর বন্দোবস্ত রাখাও বহু ব্যয়-সাধ্য। বৃষ্টি বাদল না হইলে, রাত্রে এতখানি পথ পদব্রজে অতিক্রম করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। রাত্রে আমি প্রায় প্রত্যহই হাঁটিয়া বাসায় আসিতাম

ধীরে ধীরে বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শীতল বাতাশ বহিতেছে, পথে জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, নির্জ্জীব গ্যাস পোষ্ট গুলা মাথায় মশাল জ্বালিয়া নিদ্রা-হীন বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় নিঃশব্দে দূরে দূরে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সজীব প্রহরী মহাশয়েরা কোথায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন তাহা দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। একে নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথ, তাহার উপর প্লেগের ভয়ে পুরবাসি-গণ নগর ছাড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; ভাবিলাম এমন রাত্রে যদি চোরে চুরি না করিবে তবে আর কখন তাহাদের চুরির সুবিধা হইবে। সহসা আমার স্ত্রীর সহিত আমার সকাল বেলার তর্ক মনে পড়িয়া গেল। মনে করিলাম, রূপার বাসনগুলা সরাইয়া ফেলিলে মন্দ হয় না, এত রাত্রে শৈল নিশ্চয়ই জাগিয়া নাই। সকালে উঠিয়া সকল কথা প্রকাশ করিব।

অদূরবর্ত্তী গির্জ্জা হইতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। আমার মনে আছে কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন রবিবার রাত্রে থিয়েটার দেখিতে গিয়া আমি অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিয়াছিলাম। বাহিরে যাইবার সময় এখনকার মত তখন চাবি লাগাইয়া যাইতাম না; ভিতর হইতে রুদ্ধ-দ্বার খোলা না পাইয়া অগত্যা সে দিন আমাকে বাহিরের ঘরের জানালার একটা কাঠের গরাদে খুলিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে হইয়াছিল। গরাদটা সেই সময় হইতে খোলাই আছে—বহির্দ্বারের চাবি আমার কাছে থাকিলেও এই জানালা দিয়া আজ আমি ভিতরে প্রবেশ করা স্থির করিলাম।

আমার কৌতূহল এত বেশী হইয়াছিল যে এই ঘটনায় সহসা সুপ্তোত্থিতা শৈল ভীত হইয়া একটা বিভ্রাট বাধাইতে পারে, এ রকম সম্ভাবনা আমার মনেই আসে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আমি গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি অল্প জোরে ধাক্কা দিবামাত্র জানালাটা খুলিয়া গেল, ভাবিলাম, গরাদে ভাঙ্গা জানালাটা ভাল করিয়া আটকানো উচিত ছিল, যাহা হউক অল্প চেষ্টায় আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়া খুসী হইলাম।

পথের গ্যাসের আলোক আসিয়া মুক্ত বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিল, সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি একটা লোক ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে! তাহার দাড়ী কামানো, সুদীর্ঘ গোঁফ, কোট প্যাণ্টলন পরা, অসুরের মত চেহারা, দেখিয়াই চুনোগলির ফিরিঙ্গী নন্দন বলিয়া বুঝিতে পারি-লাম। আমার বিস্ময় বিদূরিত না হইতেই সে সহসা তাহার পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া আমা কপালের কাছে ধরিল, আমি আতঙ্কে দুই পা পিছাইয়া গেলাম, হতবুদ্ধি হইয়া, তাহাকে কি বলিব একটা কথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

সে পিস্তলটা ধরিয়াই মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, "এখানে কিছু হইবে না, আমি আগে এখানে আসিয়াছি, তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ, গোল করিলে তোমার খুলি উড়া-ইয়া দিব।"

তাহার মুখে মদের ভয়ানক দুর্গন্ধ, তাহার উপর জড়িত ইংরেজী কথা, তথাপি মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিলাম, সে আমাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী চোর বলিয়া মনে করিয়াছে—আমার পরিচ্ছদও সেই ফিরিঙ্গীটার মতই বরং অপেক্ষাকৃত অনেক পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ছিল, এবং বলিতে গর্ব্ব হয় যে আমি তাহার অপেক্ষা অনেক খানি বেশী ফরসা! আমি প্রথমে ভাবিলাম, এত আমাকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে বলিতেছে, গোলমাল না করিয়া এখনি বাহির হইয়া যাই, আমার বাসা হইতে থানা বেশী দূরে নয় দৌড়িয়া গিয়া গোটা দুই কনেষ্টবল সঙ্গে আনিয়া ইহাকে ধরাইয়া দিই।

পর মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, এই কক্ষের পরইত সিঁড়ি ঘর, যদি নীচে চোর কুঠুরীর সন্ধান না পাইয়া এ দোতালায় উঠে! সেখানে শৈল একা নিদ্রিতা আছে,—আমি গৃহ-ত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু মস্তকের সম্মুখে

পিস্তল উদ্যত। আর কি করিলে সকল দিক বজায় থাকিতে পারে তাহা মাথার মধ্যে আসিল না।

যাহা হউক একটু ভাবিয়া উত্তর দিলাম, "আমি অনেক দিন হইতেই এ বাড়ীটাতে একবার জাল ফেলিব ভাবিয়া আসিতেছি; আজ তুমি আমার পাঁচ মিনিট আগে আসিয়া আমাকে তাড়াইতে চাও?"—যতদূর সম্ভব সাহেবী সুরে ইংরাজীতে এই কথা বলিলাম।

সাহেব কি ভাবিল, পিস্তল নামাইয়া বলিল, "আচ্ছা, তাহা হইলে এস আমরা দুজনে মাল অনুসন্ধান করি, গোল করিয়ো না, করিলে আমাদের দুজনের হাতেই বছর খানে-কের জন্য, শিকল পড়িবে। কখন তুমি জেল খাটিয়াছ?"

আমি বলপূর্ব্বক ওষ্ঠে ঈষৎ হাস্য সংগ্রহ করিয়া বলি-লাম, "না, অল্পদিন হইল আমি এ ব্যবসায়ে হাত দিয়াছি। তুমি?"

সাহেব বলিল, "আমি পাঁচ সাত বছরের মধ্যে তিনবার জেল খাটিয়াছি। ঘোড়ার পিঠ হইতে অনেক বার আছাড় না খাইলে ভাল ঘোড়সোয়ার হওয়া যায় না। জেল না খাটিলে পাকা চোর হওয়া যায় না। পাকা চোর হইতে তোমার অনেক দেরী।"

পাছে নাম জিজ্ঞাসা করিলে কিম্বা অধিক কৌতূহল প্রকাশ করিলে সন্দেহ করে, এই ভাবিয়া আমি তাহাকে আর অধিক প্রশ্ন করিলাম না।

আমি কিয়ৎকাল তাহার সঙ্গে নিম্নতলে এ কুঠুরী ও কুঠুরী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। সে কোথাও কিছু না পাইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ঘরের জিনিষপত্র টানিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া, এখানকার জিনিষ সেখানে ফেলিয়া একটা লণ্ড-ভণ্ড বাধাইয়া দিল। অবশেষে সিঁড়ির ঘর রুদ্ধ দেখিয়া একটা ধাক্কা দিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল, এবং গ্যাসালোকে আলোকিত কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল!

এখনো সে চোরকুঠুরীর সন্ধান পায় নাই। ভাবিলাম কোন রকমে এ পাপটাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। তাই বলিলাম, "আমরা অনর্থক এ বাড়ীতে প্রবেশ করি-য়াছি, কিছুই লাভের আশা দেখিতেছি না, চল, বাহির হইয়া যাই।"

আমার কথা শুনিয়া চোর ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, "এ নিশ্চয়ই তোমার চালাকি; আমাকে বিদায় করিয়া তুমি মূল্যবান্ জিনিষপত্রগুলি হাতাইতে চাও। যাহোক আমি উপরে একবার না দেখিয়া ফিরিব না। দেখিতেছি নীচে কিছুই নাই।"

মুহূর্ত্তের জন্য আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। শৈলের জন্য বড় চিন্তিত হইলাম, ধীরে ধীরে বলিলাম, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, উপরে একবার খোঁজ করিয়া দেখাই উচিত, কিন্তু তুমি মোটামানুষ, সিঁড়িতে দুপ্ দাপ করিয়া পায়ের শব্দ হইতে পারে, আমি পাতলা আছি, আমারই একা উপরে যাওয়া ভাল।"

তাহার উত্তরের জন্য আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এখন আমাকে তাহারই মতাবলম্বী হইয়া চলিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

সম্মুখের সমুদয় দন্তগুলি বাহির করিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া সে উত্তর দিল, "তা হইবে না, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

কি বিপদ! হতভাগাকে কি করিয়া নিবৃত্ত করি? অবশেষে অগত্যা একটা উপায় বাহির করিলাম। তাহাকে বলিলাম, "তুমি তিনবার সুধুই জেল খাটিয়াছ, চুরির কিছুই শিখিতে পার নাই। আমি জেল খাটি নাই, চুরি বিদ্যায় এপ্রেণ্টিস্ মাত্র, কিন্তু জিনিষপত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে আমি তোমার অপেক্ষা বেশী মজবুত; তুমি দাঁড়াও, আমি একবার দেখি নীচে কোন দামী জিনিষ পাওয়া যায় কি না!"

তাহাকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া, তাহার পাশ কাটাইয়া ত্বরিতগতিতে আমি চোরকুঠুরীর সম্মুখে আসিলাম, চাবি দিয়া চক্ষের নিমিষে কুঠুরীটা খুলিয়া ফেলি-লাম, সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে গহনাপত্র, রূপার বাসন যাহা কিছু মূল্যবান্ জিনিষ ছিল সমস্ত টানিয়া বাহির করিলাম। চোর নতমস্তকে উন্মুক্ত সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার মধ্যে আর কোন জিনিষ নাই।

কিছুই পাইবার আশা ছিল না, সহসা সম্মুখে এতগুলি টাকার জিনিষ দেখিয়া আনন্দে, লোভে ফিরিঙ্গীনন্দনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; আমার পিঠে উৎসাহপূর্ণ করাঘাত করিয়া বলিল, "এই জন্যই বুঝি তুমি আমাকে ভুলাইয়া বিদায় করিবার চেষ্টায় ছিলে; কিন্তু আমি পাকাচোর,

তোমার মতলব অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিলাম। যাহোক তুমি বড় 'ক্লেভর বয়', কালে বড় চোর হইতে পারিবে। এ ঘরের সন্ধান তুমি কিরূপে পাইলে, সিন্দুকই বা কেমন করিয়া খুলিলে?"

আমি বলিলাম, "অনেক রকম চাবি সংগ্রহ করিয়া এ কাজে হাত দিতে হয়; একাজে কৌশল না খাটাইলে জেল খাটা এড়ান যায় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফল।

আমার কৌশল ও ক্ষিপ্রতায় চোরের মনে আমার উপর কিছু বিশ্বাস হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। সে আমাকে বলিল, "তুমি খুব কাজের লোক দেখিতেছি—এখন এক কাজ করা যাক্। আমি এমালগুলি সামলাইয়া রাখি, তুমি উপরের ঘরগুলা ভাল করিয়া দেখিয়া এস। আরো কিছু পাওয়া যাইতে পারে।"

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দেখিলাম, সে কোটের নীচে হইতে কাপড়ের একটা বড় থলে বাহির করিয়া মনোযোগ সহকারে তাহার মধ্যে অলঙ্কার ও বাসনগুলা পুরিতেছে; দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, "তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইও না, আমি উপরটা একবার দেখিয়া আসি, আরো গহনাপত্র কিছু পাওয়া যাইতে পারে।"

অতি লঘুপদক্ষেপে আমি দ্বিতলে আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম শৈল ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, স্বপ্নেও হয়ত সে জানিতে পারিতেছে না যে আমাকে আজ কি বিপদে পড়িতে হইয়াছে! আমি তাড়াতাড়ি আমার পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম, দ্বারজানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলাম, ঘরে টেলিফোঁর কল বসান ছিল, ব্যগ্রভাবে কম্পিতহস্তে 'বেল' দিলাম; দুই মিনিট পরে উত্তর আসিলে লম্বমান 'টেবিলে' আমাদের কোয়াটারের পুলিশ ষ্টেসনের ঠিকানা দেখিয়া লইয়া সেখানে কথা চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলাম।—আমি ডাকিতেই একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? কি চান?"—আমি আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম, "এখনি দুইজন কনেষ্টবল চাই—স্কোয়ারে—নং বাড়ী, একটা চোর আসিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যায়।"

কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "কনেষ্টবল লইয়া সব ইন্সপেক্টর রওনা হইয়া গিয়াছে, ব্যস্ত হইবেন না।"

কনেষ্টবল রওনা হইয়াছে! আমি সংবাদ দিবার আগেই কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দারোগা রওনা হইল,—ইহার অর্থ কি? অন্য কোথা হইতে ত তাহারা এজন্য তাগাদা পায় নাই? হয়ত কেহ আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছে। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অসহিষ্ণুভাবে পুনর্ব্বার 'বেল' দিলাম—কোন উত্তর নাই। এদিকে আমার আর বিলম্ব করিবারও উপায় নাই, ভয় পাছে চোর জিনিষপত্রগুলা হাতাইয়া সরিয়া পড়ে! আমার উপর তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইলে তাহাকে আটকাইয়া রাখা কঠিন।

অগত্যা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলাম, আমার তখন এতই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল যে আমার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধ, ক্ষোভ, ভয়, উদ্বেগ সকলে মিলিয়া আমার মনের মধ্যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত করিল।

নীচে আসিয়া দেখিলাম জিনিষগুলি থলের মধ্যে পুরিয়া চোর সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, কিছু পাও নাই বুঝি?"

আমি ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া বলিলাম, "উপরে জিনিষের অভাব নাই। কিন্তু একটা লোক ঘরের মধ্যে ঘুমাইতেছে। তাহাকে বিছানার উপর দুই একবার নড়িতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল, হয়ত হঠাৎ সে জাগিয়া উঠিতে পারে। তাই পলাইয়া আসিয়াছি, খানিক পরে আবার যাইব।"

চোর বলিল, "তবে আজ থাক্, একদিনে বেশী লোভ করিতে গিয়া ধরা পড়িতে পারি; সুবিধা বুঝিয়া আর একদিন আসা যাইবে।"

বুঝিলাম, সে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট। শেষে দেখি, সে ঝোলাটা ঘাড়ে তুলিয়া দ্বিতীয় কোন কথা না বলিয়াই চম্পট দেয়! আমি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলাম, সহসা দুই হস্তে তাহার ঝোলা চাপিয়া ধরিলাম, বলিলাম, "তুমি আমাকে মালের ভাগ না দিয়াই চলিয়া যাইতে চাও, তা কিছুতেই হইবে না।"

সক্রোধে ঝোলাটা সজোরে মেঝের উপর ফেলিয়া সে আবার দ্বিতীয়বার তাহার পিস্তল তুলিয়া ধরিল; ঠিক

সেই মুহূর্ত্তে সহসা অদূরে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পরমুহূর্ত্তেই তিনচারি জন লোক যুগপৎ রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। সে দ্বারটিতে বাহির হইতে তালা দেওয়া ছিল; আমি দ্রুতপদে গিয়া একটি অর্গলবদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।

ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, চোর বেগতিক দেখিয়া আমার সর্ব্বস্ব সমেত তাহার ঝোলাটা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। আমি এক লম্ফে তাহার সম্মুখে আসিয়া প্রাণপণশক্তিতে তাহা চাপিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে কক্ষে পুলিশ প্রবেশ করিল। তখন সে আমার মুখের উপর চঞ্চল, ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঝোলা পরিত্যাগ করিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লাফাইয়া পড়িল। আলো অন্ধকারে পুলিশ বোধহয় চৌরের এই পলায়ন ব্যাপার দেখিতে পায় নাই।

আমার হাতে তখনো ঝোলাটা রহিয়াছে, মুহূর্ত্তমধ্যে দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া আমাকেই চাপিয়া ধরিল, একজন কোন কথা না বলিয়া আমার উভয় হস্তে হাতকড়া পরাইতে লাগিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তাহার পরেই বুঝিতে পারিলাম, প্রকৃত চোরের অদর্শনে তাহারা আমাকেই চোর বলিয়া মনে করিয়াছে! হায়, চোরেও সন্দেহ করিয়াছিল আমি চোর এবং সাধু পুলিশেও সন্দেহ করিতেছে আমিই চোর, ইহার উপর আজ সকালবেলার বাজীর কথা মনে করিয়া সুপ্তোত্থিতা শৈল যদি প্রকাশ করে যে এ চুরি আমারই চাতুরী মাত্র, তাহা হইলে চোর নহি একথা ঘরে এবং বাহিরে কাহারো নিকট প্রমাণ করিতে পারিব না;—এমনি চক্রের মধ্যে পড়িয়াই বুঝি ভগবানকে ভূত হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক সকল কথা তখন সবিস্তারে বুঝাইবার সময় ছিল না, সংক্ষেপে বলিলাম, "আমি চোর নহি গৃহস্বামী,—চোর ঐ কুঠুরীটার মধ্যে লুকাইয়াছে।"

সবইনেস্‌পেক্টর সন্দেহাকুল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এত রাত্রে চোরামাল ঘাড়ে করিয়া গৃহস্বামী?"—

আমি তাহার মধুরালাপের ভূমিকাতেই বাধা দিয়া বলিলাম, "এ সকল কথার জবাব আমি পরে দিতেছি, আগে চোর ধরিবার চেষ্টা করুন, চোর ঐ কুঠুরীতে।"

কিন্তু সবইনেস্‌পেক্টর আমার কথা আমলেই আনিল না, বরং আমাকে ধমকদিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "আমার কাছে ওসব চালাকি খাটিবে না, তোমাকে মাল সমেত গ্রেপ্তার করিয়াছি, তোমাকেই আমি চালান দিব। তোমার পকেট 'সার্চ' করিয়া দেখি, পকেটেও বোধ হয় কিছু আছে।"—কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সে অসঙ্কোচে আমার উভয় পকেটে হাত পুরিয়া দিল; ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত মুখমণ্ডলে আসিয়া জমা হইল, আমি সক্রোধে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, "মহাশয়, আপনারা খুব বাহাদুর, ভদ্রলোকের বাড়ী আসিয়া তাহাকেই অসঙ্কোচে চোর বলিয়া ধরিতে পারেন।"

"শুধু পোষাক এবং চেহারা দেখিয়া চোর ও সাধু নির্ণয় করা কঠিন,—"কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত দারোগা এই উত্তর করিল। আমাদের গোলযোগ শুনিয়া শৈল তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল; অতঃপর যখন সে সলজ্জভাবে স্বীকার করিল যে আমার কথাই ঠিক, আমিই প্রকৃত গৃহস্বামী, এবং সেই লজ্জাবনতমুখী অবগুণ্ঠিতা রমণীর স্বামীও বটে, তখন কনেষ্টবল দুজন সবইনেস্‌পেক্টরের ইঙ্গিত অনুসারে আমাকে ছাড়িয়া চোরের সন্ধানে পাশের কুঠুরীতে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

কিন্তু সে কক্ষে কেহ নাই, সেই ভাঙ্গা জানালাটা খোলা, বুঝিলাম, দারোগা এবং কনেষ্টবলদের বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই চোর পলাইয়াছে! সেই জানালাটার ভিতর দিয়াই সে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুলিশ মহাপ্রভুদের এ কথায় বিশ্বাস হইল না; দেখিলাম, আমি চোর একথা প্রমাণ হইলেই তাঁহারা খুসী হন, কিন্তু উপায় নাই; আমার সপক্ষে অব্যর্থ প্রমাণ বর্ত্তমান। অবশেষে অগত্যা তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বে আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং এত রাত্রে তাঁহারা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাকে বিপন্মুক্ত (না বিপদগ্রস্ত?) করিতে আসিয়াছিলেন, এজন্য আমার কাছে কিছু বক্‌শিস্ প্রার্থনা করিলেন, বিশেষ প্রলোভন সত্ত্বেও অর্দ্ধচন্দ্রের পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিয়াই তাঁহাদিগকে বিদায় করিলাম।

সে রাত্রে আর আমাদের ঘুম হইল না। শৈল আগাগোড়া সকল কথা শুনিয়া বলিল, "কি ভাগ্যে চোরটা তোমায় গুলি করে নাই, তোমার খুব বুদ্ধি যাহোক।"

আমি বলিলাম, "তুমিও বেশ নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছিলে, এই বুঝি তোমার খুব সজাগ ঘুম ?"

শৈল হাসিয়া বলিল, "এখন ত তা বলিবেই, তোমার নাম করিয়া আমি পুলিশষ্টেশনে টেলিফোঁতে খবর না দিলে তোমার সোণা রূপার জিনিষপত্রগুলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইত দেখিতাম।"

বুঝিলাম, শৈল চোরের শুভাগমন অনেক আগেই জানিতে পারিয়াছিল, সত্যই তাহার ঘুম খুব সজাগ! আমি সবিস্ময়ে বলিলাম 'সেকি? আমি উপরে আসিয়া দেখি তুমি ঘুমাইতেছ, একি তোমার কপট নিদ্রা?—তুমি সহসা পুলিশে খবর দিলে, যদি চোর না হইয়া আমিই হইতাম? আমি বাজী রাখিয়াছিলাম তা মনে আছে ত?"

শৈল বলিল, "আমি নীচে খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া প্রথমে তুমি আসিয়া কিছু নাড়িতেছ এই রকমই মনে হইয়াছিল, কিন্তু বাজী রাখার কথা ভুলি নাই, ভাবিলাম চোর ধরিতে হইবে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দরজার পাশে একটু দাঁড়াইতেই তোমাদের আলাপ শুনিতে পাইলাম, দুই এক কথাতেই ব্যাপার কি বোঝা কঠিন হইল না।—উপরে আসিয়া তৎক্ষণাৎ পুলিশষ্টেশনে টেলিফোঁ করিয়া শুইয়াছিলাম। কিছু অন্যায় করিয়াছি কি?"

আমি বলিলাম, "আজ তোমার সম্পূর্ণ জিত, তোমার বুদ্ধি কৌশলেই জিনিষগুলা বাঁচিয়াছে।"

শৈল ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "আর তোমাকে বাঁচাই নাই? পুলিশের হাত হইতে আমিই ত তোমাকে উদ্ধার করিলাম। কিন্তু ইহারা কি আশ্চর্য্য লোক—চোর না পাইয়া তোমাকেই চোর বলিয়া ধরিতে যায়।"

আমি বলিলাম, ইহাই "পুলিশের বাহাদুরী।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

১। আবাহন।

বিহরে বিমল অম্বরে, বিহঙ্গ ললিত সুস্বরে;
ভুবন-ঈশ্বরি এস মন্দিরে।
তবকর কমনীয় স্নেহ-সার সিঞ্চনে,
ললিত লতিকা কত জাগিয়াছে বিপিনে,
দিতে পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে।
(তব) বীণার নিক্কনে জাগিয়া উষাতে,
ছুটেছে নির্ঝর গাহিতে গাহিতে,
ওপদে মিলিতে।
অলিকুলসঙ্কুল কুসুম সকল,
ওপদ ছুঁইতে হয়েছে বিহ্বল;
মৃদুল সমীরে, বহিছে নিশ্বাস,
প্রীতি নমস্কার জানায় আকাশ;
দিগঙ্গনাগণ পরেছে সুহাস,
শ্রীমুখে উজ্জ্বল শোভিছে হাসি;
তোমারে পূজিতে হয়েছে উল্লাসী!
তরুণ অরুণ জ্বলিছে সুনীলে,
শ্রীমুখ তোমার, দেখাবে সকলে।
প্রকৃতি আপন খুলিয়া প্রাঙ্গণ,
সাজায়েছে দিয়ে শিশির রতন।
এস ফুলপথে প্রফুল্ল গায়িকা!
এ নাট্যশালার প্রধান নায়িকা!
ভ্রমর কহিবে 'মধু'র কথা,
প্রজাপতি গাবে ফুলের গাথা,
তব পুষ্পমঞ্চে কোকিলঅঙ্গনা,
রাগ রাগিণীর গাহিবে মূর্চ্ছনা।
(হেথা) কবির হৃদয়ে কত কথা আছে,
সুধাবিষ মাখা কবে তব কাছে।
প্রেমের কামনা, কুসুমেষু-শর,
স্নেহ আলিঙ্গন, অশ্রুর লহর,
জানাবে তোমারে রাজরাজেশ্বরি!
সঙ্গীতরূপিণী, এসগো সুন্দরি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

২। স্মৃতি।

নির্ঝর শুকায়ে গেলে, জেগে থাকে তটপ্রাণে,
শুধু তার গীতময় করুণ বেদন।
দিবস চলিয়া গেলে, পড়ে থাকে শুধু তার
একটুকু কনক স্বপন।
গোলাপ ঝরিয়া গেলে, শূন্য বৃন্ত বেড়ি কাঁদে
শুধু তার কাহিনী মধুর।
শবদ থামিয়া গেলে, প্রতিধ্বনি ফেলে শ্বাস,
বিলাপিয়ে অতি দূর দূর।
বসন্ত চলিয়া গেলে, জাগে শুধু লতা মুখে
অতি ক্ষীণ হরিত স্মিরিতি।
মলয় চলিয়া গেলে, কুসুমের কাছে ফিরে
শুধু তার প্রতিধ্বনি-গীতি।

KUNTALINE PRESS.

অভাব নাই। শ্রীবাড়ীতে স্বগৃহসংলগ্ন শিবমন্দিরের পার্শ্বে সুন্দর সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যা-কালে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন; তাহার অনেকগুলি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার চিঠীর ফাইল্ সেই সব প্রেম-উপঢৌকনে পরিপূর্ণ। পদ্মাবক্ষে তাঁহার অকাল-মৃত্যু মনে পড়িলে, সেই সঙ্গে কবিকাহিনীর "গঙ্গাজল শব" শীর্ষক কবিতাটি স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। তিনি যেন স্বীয় মৃত্যুর আভাস পাইয়াই উক্ত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। "দিবা অবসান প্রায় রজনীর মুখে, কোথা ভেসে যাও শব কহনা আমায়॥" আজ আমার কর্ণে বাজিতেছে। সেই কবিতাটিতে পরি-জনের দুঃখ অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়া-ছিলেন, বোধ হয় নবদৃষ্ট স্বর্গের শোভায় মুগ্ধ হইয়া শব আত্মীয়দিগের আর্ত্তধ্বনি, মন্দসান্ধ্যহিল্লোলনীত "দূর বাঁশরীর রব" এবং "কৃষকের বৈতালিক তান" কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। সেই স্বর্গ কিরূপ শবকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন।—

"যদি দেখিতেছ তবে কহ মোরে আজ।
কোথায় সে দেশ মরি দেখিতে কেমন।
সে গগনে সুধানিধি করে কি বিরাজ!
করে কি দিবসে ভানু কর বিতরণ!
এইমত বৃক্ষশাখে আনন্দে বসিয়া
এইমত পক্ষী কিহে বরষে সুস্বর!
এইরূপ শত শত কুসুম ফুটিয়া
সৌরভে পাগল করে বিলাসী ভ্রমর।
এইমত ঐকানিকা বাদ বিসম্বাদ,
এইমত আশা ভক্তি পবিত্র প্রণয়,
এইমত সুখ দুঃখ হরিষ বিষাদ,
বিচ্ছেদ, মিলন আশা, ভগন হৃদয়।
কিম্বা সে অপূর্ব্ব দেশ জিনিয়া কল্পনা
শোভে নীলাম্বরতলে কণকমণ্ডল।
পরাজি কোকিল কণ্ঠ বাজিছে বাজনা.
চতুর্দ্দিকে হেমজ্যোতি করে ঝলমল,
পীযূষসলিলা শত বহে তরঙ্গিণী,
হীরকের ফল শোভে মরকতশাখে,
প্রকৃত মুকুতা লয়ে ঊষা বিনোদিনী
প্রভাতে প্রকৃতি অঙ্গ সাজাইয়া রাখে
অনন্ত সুখের ধাম সতত উল্লাস
ভাবনার ছায়া তথা না পারে পশিতে
রোগ শোক দুঃখ তাপ দারিদ্র হুতাশ
সে দেশ নিবাসিগণে পারে না দংশিতে।"

কবি শবের নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখন আমরা তাঁহার নিকট সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি। সৃষ্টিকাল হইতে প্রকৃতির রুদ্ধ দ্বারে বারংবার আঘাত করিয়াও মানুষ সেই প্রশ্নের উত্তর পায় নাই!

তিনি তাঁহার শ্মশানমন্দিরে খোদিত করিবার জন্য নিজেই কয়েকটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন! মন্দির উঠি-য়াছে। কবিতাগুলি শীঘ্রই খোদিত হইবে। গ্রাম্যকবির স্মৃতিমন্দিরের দুয়ারে সেই কয়েকটি দুঃখময় ছত্র লিখিত থাকিবে এবং ইহাই তাঁহার শেষ। এত ভালবাসার পৃথি-বীতে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইবার জন্য গন্ত-মুখ নর-আত্মা কেন ব্যাকুল হয় কে বলিবে? পারস্য দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছিলেন "আমার সমাধির উপর মূল্যবান্ প্রস্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই, দরিদ্রদিগের কবরের জন্য স্বভাবের ঘাস গুল্মের আবরণই যথেষ্ট।" এরূপ দৈন্য কিছু বিরল।

উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম আমিই সুহৃদ্ কবির অগ্রে যাইতে পারিব, কিন্তু যমরাজ কেন কু ভক্ষণ করিবেন?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গ্রন্থিবন্ধন।

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে আমি বুঝি বিবাহসময়ের গ্রন্থিবন্ধন বা "গাঁট-ছড়া" বাঁধার বিষয়েই কোন একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সকলকে চমকিত করিয়া ফেলিব, অথবা কোন অদৃষ্ট অশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যের সমাবেশ দেখাইয়া ঐ প্রথার ওকালতি করিব। এজন্য প্রথমেই অভয় দিতেছি যে সে সব কল্পনা এ প্রবন্ধের প্রসূতি নহে। তবে সেটাও গ্রন্থিবন্ধন, এটাও সাধুভাষায় গ্রন্থিবন্ধন বা দেশীয় ভাষায় "গান্তি বাঁধ, বা গাঁট্ঠি বন্দ্।" উভয়টিরই উদ্দেশ্য এক, সঙ্কেত এক। বিবাহের গাঁঠছড়া বাঁধাও উভয়ের একত্র মিলনের চিহ্ন বা সঙ্কেত। প্রস্তাবিত "গাণ্টিবন্দ"ও একত্র মিলনের একটি সঙ্কেত, এই পর্য্যন্ত উভয়ের একতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহার পর আর কোন একত্ব নাই।

এই 'গাণ্টিবন্ধন' একত্র মিলনের একটি সঙ্কেত। এ সঙ্কেত জগতে আর কোন স্থানে প্রচলিত আছে কি না জানি না, ভারতের অন্যান্য অসভ্য জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হয় কি না তাহার সঠিক তথ্য প্রাপ্ত হই নাই। তবে ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত প্রধান করদ রাজ্য ময়ূরভঞ্জের অধিবাসী অসভ্য অনার্য্য সাঁওতাল, ভূমিজ, প্রভৃতি দিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত আছে। এবং এই সঙ্কেতের ফলে রাজ্য অনেক সময় এরূপ উদ্বেলিত হয় যে ময়ূরভঞ্জ-রাজকে এজন্য ইহা নিবারণ জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। এজন্য আমরা পাঠকবর্গকে ইহার স্থূল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উপহার দিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, অসভ্য, মূর্খ, বর্ব্বর, জাতির মধ্যে যে একতা, যে একপ্রাণতা এখনও কার্য্য করিতেছে, স্বীয় দেশের জন্য বা জন্মভূমির জন্য যে মমত্ব বোধ আছে, উচ্চশিক্ষিত, সভ্যতাভিমানী, সভাসমিতি-পরায়ণ, বাক্যবিশারদ অনেক জাতির মধ্যে তাহার অংশ-মাত্রও আছে কি না সন্দেহ। দেখিবেন, অসভ্য জাতি আবশ্যক হইলে কিরূপ একত্বসূত্রে গ্রথিত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে, কিরূপ নীরবে, করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে জয়ঢক্কা না বাজাইয়া, নিজ বাক্‌পটুতার মাত্র পরিচয় না দিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে!

অন্যের মনে কিরূপ ভাব হইবে বলিতে পারি না কিন্তু এই 'গাণ্টি বন্ধন" সঙ্কেতের বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মনে কেমন একটা অবক্তব্য আনন্দের ভাবের সঞ্চার হইয়াছে; অসভ্যদিগের মধ্যেও একপ্রাণতা আছে ইহা মনে করিতে আমার প্রাণে যেন একটা তরঙ্গ উঠে।

যাহা হউক এখন প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত আরম্ভ করা যাউক। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিবাংশই সুবিস্তীর্ণ শালবনময়, এবং পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ। এইরূপ বন ও পর্ব্বতসঙ্কুল হওয়ায় রাজ্যটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জন এবং কবিজনচিত্তাকর্ষক। এই সমস্ত নিবিড় বন মধ্যে এবং পর্ব্বতোপত্যকায় প্রকৃতির শিশু সাঁওতাল, কোল, ভূমিজ প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ইহারা সংখ্যায় বড় অল্প হইবে না, কিন্তু এক স্থানে অধিক সংখ্যক একত্রে গ্রাম সংস্থাপন করিয়া বাস করা ইহাদের যেন কতকটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ! চারিদিকে নিবিড় বনশ্রেণী ব্যাঘ্র ভল্লুকের চির বাসস্থল। তাহারই মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে দুই চারি ঘর কোথাও পাঁচ সাত ঘর, কোথাও বা এক এক ঘর বসতি। বড় গ্রাম করিয়া বাস করে না তাহা নহে, তবে সেটা বড়ই কম দেখা যায়। তাহারা বনমধ্যে বাস করে, কন্দমূলাদি দ্বারা উদর পূরণ করে, কৃষি কার্য্যও করিয়া থাকে, হাঁটুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্বীয় তন্তুকর্ম্ম-নির্ম্মিত স্থূল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে, শীতকালে অগ্নি জ্বালিয়া অঙ্গে সেক দ্বারা প্রবল শীতের কঠোর আক্রমণ হইতে দেহ প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সময়ে সময়ে ঘরের মেজেয় গর্ত্ত করিয়া সন্তানগণকে তন্মধ্যে রাখিয়া উপরে মাদুর বা খড় চাপা দিয়া তাহাদিগকে শীত হইতে রক্ষা করে, বন হইতে কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া সহরে বিক্রয় করে, আর স্বীয় স্বীয় নিত্যপ্রতিবাসী ব্যাঘ্র ভল্লুকের সহিত, অথবা বন্য-হস্তীর সহিত গোমহিষ এবং উৎপন্ন শস্যাদির স্বত্ব-সাব্যস্ত করিবার জন্য অনেক সময় বিবাদ করিয়া থাকে। এইরূপেই তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে! স্ফূর্ত্তির সময় গৃহজাত হাণ্ডিয়া-মদ্য পানপূর্ব্বক দেশকালপাত্রবিবেচনাশূন্য হইয়া 'মাদোল' বাজাইয়া উল্লাসে নৃত্যগীত করিয়া থাকে; এই তাহাদের নিত্য জীবনের ইতিহাস! সাধারণতঃ তাহারা স্বজাতীয় দূরস্থগণের ধার বড় ধারে না, ধারিবার প্রয়োজনও সর্ব্বদা হয় না। কিন্তু কোন গুরুতর কার্য্য বা বিবেচনার বিষয় উপস্থিত হইলে তখন তাহাদের সকলের একত্র হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উপস্থিত কার্য্য সম্বন্ধে বিবেচনা এবং কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ জন্য পরামর্শ একাকী হওয়া অসম্ভব বা দুই চারি জনেও তাহা হইতে পারে না, তখন স্বজাতীয় সমস্ত গুলিকেই একত্রিত করিবার প্রয়োজন। এইরূপ একত্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে সকলকে সে বিষয় জ্ঞাপন করা আবশ্যক। যাহার মনে এইরূপ বৈঠকের আবশ্যকতা বোধ হইবে তাহাকে জাতীয় সকলকে সংবাদ দিতে হইবে নতুবা তাহারা কেমন করিয়া জানিতে পারিবে, এবং কেমন করিয়া একস্থানে মিলিত হইবে? তাহারা সুশিক্ষিত নহে, ষ্টেটস্‌ম্যান, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, গ্রহণ করে না বা তাহাদের অস্তিত্ব অবগতও নহে যে তাহাতে বিজ্ঞাপন দিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; একজন ব্যক্তিকে সকলের নিকট সংবাদবাহকরূপে পাঠানও সুবিধাজনক ও নিরাপদ নহে, ঢোল পিটিয়া দিয়াও গোপনে নীরবে

মিলিত হওয়া অসম্ভব। অতএব সেরূপ স্থলে কি উপায়?

অভাবই আবিষ্কারের জনক। একটা অভাব উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তাকুল চিত্তে নিশ্চয়ই কোন না কোনরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অসভ্য-দিগের মনেও ঐরূপ সংবাদ বাহনের উপযুক্ত উপায়ের অভাব উপস্থিত হইয়া এক সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়াছে। তাহাই এই গাঁটঠি বন্ধ বা গ্রন্থি বন্ধন। এই গ্রন্থিবন্ধন আর কিছুই নহে, সাধারণ এক গাছি দড়ি; ইহাতে কতকগুলি গ্রন্থি বা গাঁটঠি দেওয়া থাকে; এই গাঁট থাকার জন্যই ঐ সঙ্কেতের নাম গাঁটঠি হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাহার স্বজাতীয়দিগকে বিশেষ কোন কারণে সংবাদ বা নোটিশ দিতে হয় সে ঐরূপ এক গাছি দড়ি লইয়া তাহাতে দিনের হিসাবে কতকগুলি গাঁট দিয়া দেয় অর্থাৎ যে কয় দিন পর মিলিত হইবার কথা সেই কয়টি গ্রন্থি ঐ দড়িতে দিয়া সে এক গ্রামে পাঠাইয়া দেয় বা নিজেই দিয়া আসে এবং যাহার নিকট দিয়া আসে তাহাকে বলিয়া আসে যে "অমুক স্থানে আর অমুক কার্য্য জন্য।" কার্য্যের কথা বিশেষ কিছু বলা থাকে না, সাধারণভাবে বলা থাকে যেমন 'রাজার জন্য, দেবতার জন্য, দেশের জন্য, ঘরের জন্য' এইরূপ। সে ব্যক্তি আবার অন্য ব্যক্তির হাতে দড়ি গাছি দিয়া মুখে 'অমুক স্থানে,' 'অমুক হেতু' বলিয়া দেয়। এই ব্যক্তি আবার অন্যের নিকট ঠিক ঐ কথা বলিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে গ্রামের সমস্ত প্রধান, মাতব্বর, সকলেরই হাতেই দড়ি গাছা ফিরিয়া আসে। দড়িতে যতগুলি গাঁট আছে, তত দিন পর একত্রিত হইতে হইবে বলিয়া জানিতে পারে। এই দড়ি এক জনের হাতে পড়িলে অন্যকে ইহা দিতেই হইবে ইহা তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ও ধারণা আছে। এইরূপে বিলি করিতে করিতে যে গ্রামে রাত্রি হইয়া গেল, সে গ্রামের কোন ব্যক্তির নিকট সেদিনকার মত দড়ি থাকিল, পর দিন প্রাতে সে তাহা হইতে একটি গাঁট খুলিয়া ফেলিয়া অন্য গ্রামে কাহারও নিকট তাহা অর্পণ করে, তখন সেই গ্রামে সংবাদ রটিত হইতে থাকে। এই রূপে নীরবে তাহাদের সমিতির সংবাদ প্রচারিত হয়। প্রত্যেক দিন প্রাতে একটি করিয়া গাঁট খুলিয়া অন্য গ্রামে তাহা চালিত করা হয়। তাহাদের টেলিগ্রাফ এইরূপে গ্রামে গ্রামে প্রধান, বয়স্ক, যুবকদিগের মধ্যে ঘোষিত হয়। এবং এই গাঁটটিকে তাহারা এত সম্মান করে যে তাহা কি বলিব। গাঁটটি হাতে পাইলেই আর কোন দ্বিধা নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন কথা প্রশ্ন করিবার নাই, কথিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া রহিল!

কোন প্রকার বাধা বিপত্তিই সাধ্যমত তাহাকে উপস্থিতি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। কে ডাকিতেছে, বিশেষ হেতু কি, তাহা জানিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তার পর যদি "দেশের হুকুম" এই কথা শুনিয়া থাকে তবেত আর কথাই নাই, জীবন থাকিতে সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। যখন নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইবে, তখন অকস্মাৎ সেই স্থানে দলে দলে অসংখ্য অসভ্যদলের সমাগম হইয়াছে, সকলের মুখেই যেন এক ভাব, এক প্রতিজ্ঞা, এক দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে; নিয়োক্তার অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য নীরবে শুনিয়া তদনুসারে কাজ করিবে এই যেন তাহাদের সংকল্প! হঠাৎ এরূপ সমাবেশের জন্য সকলকেই ভীত হইতে হয়! সকল সময়েই যে দেশের হুকুমে তাহারা সমবেত হয় তাহা নহে। তবে যখন তাহারা মনে করে যে রাজা তাহাদের সম্বন্ধে কোন অন্যায় আইন করিয়াছেন বা তাহাদের জমির স্বত্ব কোনরূপে অপহরণ বা নষ্ট করিতেছেন তখন তাহারা "দেশের হুকুমে" সমবেত হইয়া রীতিমত বিদ্রোহ উপস্থিত করে। সে বিদ্রোহ দমন করিতে রাজ্যের প্রভুকে অনেক সময় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়! কোথাও কিছু নাই, চারি দিকে নিস্তব্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছে, ইতোমধ্যে যদি হঠাৎ ৫।৭ শত অথবা ২।৩ শত অসভ্য জাতি রাজধানীতে সমবেত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মুখে অসন্তোষের ছবি প্রকটিত দেখা যায়, তবে ভীত হইবার, ব্যতিব্যস্ত হইবার কথা হয় না কি?

এই জন্য এ রাজ্যের রাজা এই 'গাণ্টি'র জন্য আইন প্রচার করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপ গাণ্টি প্রচার করিয়া লোক সমবেত করিবে তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে। এই আইন করা হইলেও এই গাণ্টি প্রচার ধৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নীরবে এই সঙ্কেত প্রচারিত হয়, এবং অনেক সময়ই সকলে সমবেত হইলে পর জানা যায় যে

'গাণ্টি' প্রচার হইয়াছিল। গাণ্টি বন্ধনের স্থূল বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইল। এখন পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন ইহার মধ্যে একটা সুন্দর একতা, একপ্রাণতার ভাব আছে কি না। এই সমস্ত অসভ্য বর্ব্বরগণ এই সামান্য গ্রন্থি-সঙ্কেতপ্রচারিত আজ্ঞা যেরূপ দৃঢ়তার সহিত, অবিচলিত-চিত্ততার সহিত পালন করে, আমরা, সভ্যতাভিমানী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, আমরা কি সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত সেই একপ্রাণতার সহিত, আমাদের মাতৃভূমির মঙ্গল আহ্বান, বা কোন শুভতর কার্য্যের আহ্বান পালন করিয়া থাকি? যদিই বা করি, সে কয় জন? অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নয়, বর্ত্তমান তাহার উত্তর দিবে!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমান্ শঙ্করাশ্রম স্বামী।

হিন্দুজাতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আন্তরিক সদ্ভাব নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মদ্বেষও শিথিল হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষিত বা পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের সংখ্যা সঙ্কীর্ণগণ্ডীবদ্ধ। এখনও ভারতের পনর আনা হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম মানে ও হিন্দুশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের দূষণ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনার শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। শাস্ত্র বিভিন্ন হইলেও সকলে বেদের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। বেদে যে কি আছে তাহা অল্প লোকেই জানে। তবে কোন কোন প্রগল্‌ভ ব্যক্তি, চৈতন্যাবতার, রাসলীলা, রাধার মহিমাও বেদ হইতে বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে।

বেদের প্রতি যখন সকলেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তখন বেদের প্রকৃত মর্ম্ম সাধারণের গোচর হওয়া উচিত। বস্তুতঃ বৈদিক ধর্ম্ম ও মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন না করিলে হিন্দুজাতি উপধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদপন্থী না হইলে হিন্দুজাতির ধর্ম্মজনিত একতা সংসাধিত হইবে না। যিনি এই একতা সম্পাদনে যতদূর যত্ন করিবেন, তিনি হিন্দুজাতির তত কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

সম্প্রতি শঙ্করাচার্য্যের "শারদাপীঠদ্বারকাসংস্থানাধীশ্বর শ্রীশঙ্করাশ্রম স্বামী" আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া মালদহে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি যেমন পরম বিদ্বান্, বাগ্মী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তেমনই সদালাপী। ইঁহার মুখনির্গত বাক্যসুধা পান করিয়া এ স্থানের সকল লোক তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। ইঁহার আগমনে লোকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা ও মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে। ইঁহাদের এতাদৃশ ভ্রমণে মহোপকার সাধিত হয়। কেবল যে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, এরূপ নহে, বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একতাও সাধিত হয়। লোকের প্রাচীন কালের কথা মনে পড়ে। শঙ্করাচার্য্যের মহিমা ও বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বর্ণনা না করিলে লোকে ইঁহাদের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া আমরা তাঁহার বিষয় কিছু বলিতেছি।

ভারতভূমি বৌদ্ধগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম তিরোহিতপ্রায় হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় না হইলে ভারতের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইত, তাহা বিবেচনার সামর্থ্য আমার নাই। বৌদ্ধপ্লাবিত ভারতবর্ষে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃস্থাপনার্থ যে সকল মহামনীষীর আবির্ভাব হয় তন্মধ্যে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য প্রধান। কুমারিল ভট্ট, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এবং শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের জ্ঞানাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য, উভয়েই দক্ষিণাপথের লোক। শঙ্কর স্বামী বলেন, উভয়ে সমসাময়িক। শঙ্করাচার্য্যের সময়, অদ্যাপি নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমান শঙ্কর স্বামীর কৃত বিমর্শ নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বকালীন বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি বচন আছে, যথা ঃ—

নিধিনাগেভ বহ্ন্যব্দে বিভবে মাসি মাধবে।
শুক্লে তিথৌ দশম্যান্তু শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ॥

প্রচলিত সংবৎ ও শকাব্দার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির সংবৎ চলিতেছিল। যুধিষ্ঠির সংবতের ৩৮৮৯ অব্দে বৈশাখ শুক্ল দশমীতে শঙ্করাচার্য্যের উদয় হয়। কলির কোন্ অব্দে

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব হয়, তদ্‌বিষয়ে নানা মত আছে। রাজতরঙ্গিণী বলেন ৬৫৩ কল্যব্দে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হয়। পুরাণে একটি বচন আছে, যথা ঃ—

আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
তাবদ্ বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরং॥

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের অভিষেচন পর্য্যন্ত ১০৫০ বৎসর অতীত হয়। ৩৭০ পূঃ খৃষ্টাব্দে নন্দের অভিষেক হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির অল্পদিন পরেই পরীক্ষিতের জন্ম হয়। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক বর্ত্তমান সময় হইতে ১০৫০+৩৭০+১৮৯৯=২৩১৯ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মহাভারতের মতে প্রায় কলিপ্রবৃত্তি সময়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। পুরাণের বচনের সঙ্গে, ৩০৮৯ কল্যব্দে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়, এই কথার সমন্বয় সাধিত হয় না। এখন কলির ৫০০০ বৎসর চলিতেছে, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এতদনুসারে শঙ্করাচার্য্য ৫০০০—৩৮৮৯=১১১১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯৯—১১১১=৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। ইতিহাসের সহ ইহার মিল হইতেছে। তুলুবদেশের চিদম্বর গ্রামে শঙ্করের জন্ম হয়। শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম বিমলা। পঞ্চম বৎসরে শঙ্করের উপনয়ন হয়। শঙ্কর অষ্টম বৎসর বয়সে কার্ত্তিক শুক্ল একাদশীতে চতুর্থাশ্রম স্বীকার করেন। নবম বৎসর বয়সে শ্রীমদ্‌গোবিন্দাচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভ করেন। এখন হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিয়া ষোড়শ ভাষ্য প্রণয়ন, নারায়ণ প্রতিষ্ঠা ও জ্যোতির্ম্মঠ নির্ম্মাণ করেন। জ্যোতির্ম্মঠ সচরাচর যোশীমঠ নামে কথিত হয়। এত অল্প বয়সে ষোড়শ ভাষ্য প্রণয়নের কথায় বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ জন্মে। ষোড়শ বর্ষ বয়সে, বারাণসী ধামে আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবেরও প্রথম প্রচারক্ষেত্র বারাণসী। পৃথিবীর প্রাচীন নগরগুলির মধ্যে কেবল বারাণসী আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে।

বারাণসী সরস্বতীর লীলানিকেতন। শঙ্কর বারাণসী হইতে মাহিষ্মতীপুরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্রের সহ বিচার করেন। মণ্ডনমিশ্র, কর্ম্মব্রহ্মবাদী ছিলেন। মণ্ডনের পত্নী, সরস্বতী দেবী উভয়ের মধ্যস্থ হন। এ এক অপরূপ দৃশ্য। শঙ্কর ও মণ্ডনের ন্যায় পরম জ্ঞানিদ্বয় বিচার করিতেছেন। বিচার করিতেছেন, কোন্ বিষয় লইয়া? না ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া। মধ্যস্থলে বীণাপাণির অপরা মূর্ত্তি সরস্বতী দেবী। প্রাচীন ভারত যে জ্ঞানগরিমায় কতদূর গৌরবশালী ছিল, তাহা ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। বিচারে মণ্ডনমিশ্রের পরাজয় হয়। মণ্ডন, শঙ্করের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য ও ব্রহ্মস্বরূপাচার্য্য নাম ধারণ করেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরে সরস্বতী দেবীর মৃত্যু হয়। শঙ্করাচার্য্যের অন্তরে সরস্বতী দেবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা নগরে সরস্বতীর মন্দির ও মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। জৈনগণ, দ্বারকা নগরের তাবৎ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া আপনাদের দেবা-লয় স্থাপন করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য জৈনগণকে পরাজিত করিয়া, দ্বারকানগরকে পুনরায় হিন্দুতীর্থ করেন। রুদ্র মালাকার নামক স্থপতি, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করে। শঙ্করাচার্য্য, সেই মন্দিরে যাদবেন্দ্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সিদ্ধেশ্বর নামক শিবমূর্ত্তিরও এই সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়।

শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং নিরাকার ব্রহ্মবাদী হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধারণ লোক তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিবেনা, তজ্জন্য তিনি পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতেন। শিবের প্রাধান্য তাঁহার কর্ত্তৃক প্রখ্যাপিত হইত। যে যে স্থানে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক হিন্দু মন্দির ও হিন্দুদেবমূর্ত্তি উৎখাত হইয়াছিল, তিনি সেই সেই স্থানে পুনরায় মন্দির ও দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে শৃঙ্গগিরি মঠ স্থাপন করেন। উহা মহীশূরের অন্তর্গত শিঙ্গারি মঠ নামে প্রসিদ্ধ। ৮০৭ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীরাজ সুধন্বা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। সুধন্বা, দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধদিগের বিনাশের জন্য ভৃত্যদিগের প্রতি দৃঢ় আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে, যথা ঃ—

আসেতোরাতুষারাদ্রের্বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
যোনহন্তি স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥

ইহা অবশ্যই অত্যুক্তিপূর্ণ। তৎকালে সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত স্থান, কোন রাজার অধিকারে ছিল না। কোন রাজা প্রকাণ্ড ভূভাগের বৌদ্ধগণের প্রতি এতাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণে সাহস পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তবে স্থানবিশেষে যে বৌদ্ধনিপীড়ন না হইয়াছিল, এমন

নহে। ৮০৭ খৃষ্টাব্দে সুরেশ্বরাচার্য্যকে দ্বারকা পীঠে স্থাপন করেন। ৮০৮ খৃষ্টাব্দে দিগ্‌বিজয়ে বিনির্গত হন। এই অব্দে তোটকাচার্য্য ও হস্তামলকাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ৮১৩ খৃষ্টাব্দে হস্তামলকাচার্য্যকে শৃঙ্গগিরিমঠের এবং তোটকাচার্য্যকে জ্যোতির্ম্মঠের অধ্যক্ষতা প্রদান করেন। ৮১৫ অব্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি স্থাপন ও গোবর্দ্ধনমঠের প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মপাদ নামক উগ্রস্বভাব শিষ্যের প্রতি গোবর্দ্ধন মঠের ভার অর্পিত হয়। এই দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি জগন্নাথের মূর্ত্তি কি না বলিতে পারি না। শঙ্করের দিগ্‌বিজয় বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্থানবিশেষে তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে কোন কালে বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদিগের সহ প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া শঙ্কর উগ্রস্বভাব পদ্মপাদাচার্য্যকে গোবর্দ্ধনমঠের অধ্যক্ষতা প্রদান করেন। কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্যকে ১০৩২টি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহ বিচার করিতে হয়। দক্ষিণাপথের চালুক্য রাজগণ শঙ্করাচার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দিগ্‌বিজয় সমাপন করিয়া শঙ্করাচার্য্য, কাশ্মীরমণ্ডলে স্বস্থাপিত শারদাপীঠে বাস করেন। ৯২০ খৃষ্টাব্দে দ্বাত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়সে শঙ্করাচার্য্য পরলোক গমন করেন।

যদি হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতির প্রিয় হয়, তাহা হইলে হিন্দুজাতি শঙ্করাচার্য্যের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। তাঁহার লেখা এতাদৃশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের পর দ্বিসপ্ততিজন আচার্য্য শারদাপীঠে আধিপত্য করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ আচার্য্য প্রগাঢ় ক্ষমতাপন্ন পুরুষ ছিলেন। এই পীঠের অধিপতিগণ সচরাচর শঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের নামে যে সকল স্তব ও শ্লোকমালা দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ের কতকগুলি এই সকল শঙ্করাচার্য্যের রচিত।

বর্ত্তমান শঙ্করস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম জগন্নাথস্বামী। ইনি অন্ধ্রদেশের (তৈলঙ্গের) অন্তর্গত গোদাবরী ডিষ্ট্রিক্টে বেলনাটি নামক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে বংশ বিদ্যাব্রহ্মণ্যের জন্য অতি বিখ্যাত। ইঁহার পিতা পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইনি পিতার নিকট হইতে অধিগতবেদবেদাঙ্গাদিবিদ্য হইয়া একবিংশবর্ষ বয়সে তীর্থ পর্য্যটনে নির্গত হন। ইঁহার তীর্থ ভ্রমণকাল জ্ঞানলাভে পর্য্যবসিত হয়। কাঞ্চী, রামেশ্বর, অবন্তী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক দ্বারকানগরে উপস্থিত হইয়া দণ্ড্যাশ্রম গ্রহণ করেন। তাৎকালিক দ্বারকাপীঠাধিপতির মৃত্যুর পর ইনি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে শারদাপীঠের অধিপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। উপাধিসহ ইঁহার সম্পূর্ণ নাম এই,—

শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীশারদাপীঠদ্বারকাসংস্থানাধীশ্বর শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বর শঙ্করাশ্রম স্বামী।

জগদ্‌গুরু ও রাজরাজেশ্বর উপাধি কে দিয়াছে, তাহা জানি না। যে ব্যক্তিই উপাধি দিক্ না কেন, এই উপাধি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইঁহারা ভারতবর্ষের প্রধান লোকদের মধ্যে গণনীয়। বটপত্তন (বরদা) ও কাঠিওয়াড়ের রাজগণের নিকট ইঁহারা অত্যন্ত সম্মানিত। ইনি জামনগর, ভবনগর, রাজনগর (অহমদাবাদ) বরদা, উদয়পুর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভূপাল, গোয়ালিয়র, আগরা, মথুরা, দিল্লী, লাহোর, জম্বু, হরিদ্বার, বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, পাটনা, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর ভ্রমণ করিয়া পরমহংস বিশ্বম্ভর গিরির প্রার্থনায় ইংলিশবাজার নগরের মনস্কামনা দেবীর মন্দির সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহার সঙ্গে প্রাচীন রাজগণের প্রদত্ত বহুসংখ্যক তাম্রশাসন, প্রস্তর ফলক ও অন্যবিধ লেখপত্র আছে, যাহার সহায়তায় শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস সঙ্কলনের সবিশেষ সহায়তা হইতে পারে। ইতিহাসক্ষেত্রে যে সুধন্বার অস্তিত্ব ও সময় লইয়া অদ্যাপি বাদবিতণ্ডা চলিতেছে, তাঁহার প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনের অবিকল নকল দিলাম।

নৃপতিসুধন্বার তাম্র-শাসন।

শ্রীমহাকালনাথায় নমঃ।
শ্রীমহাকাল্যৈ নমঃ।
শ্রীমৎসদাশিব পরাপর মূর্ত্তি
চতুষষ্ঠি কলা বিলাস বিহার মূর্ত্তি
বৌদ্ধাদিসর্ব্ববাদি দানব নৃসিংহমূর্ত্তি
বর্ণাশ্রম বৈদিক সিদ্ধান্তোদ্ধারক মূর্ত্তি
মামকীন সাম্রাজ্য ব্যবস্থাপন মূর্ত্তি

বিশ্বেশ্বর বিশ্বগুরুপদ জগজ্জেগীয়মান মূর্ত্তি
নিখিল যোগিচক্রবর্ত্তি শ্রীমচ্ছঙ্কর
ভগবৎ পূজ্যপাদপদ্ময়োঃ।

ভ্রমরায়মানসুধন্বনো মম সোমবংশচূড়ামণি যুধিষ্ঠির পারম্পর্য্য পরিপ্রাপ্ত ভারতবর্ষস্যাঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বিকেয়ং রাজন্যস্য বিজ্ঞাপ্তিঃ। ভগবদ্ভির্দিগ্‌বিজয়োকারি। সর্ব্বেবাদিনঃ পরাকৃতাঃ। সর্ব্বেবর্ণাশ্রমাশ্চ কৃতযুগবৎপূর্ণে বেদাধ্বনি নিয়োজিতাঃ সন্তো যথাশাস্ত্রমাচরন্তিহি ধর্ম্মং। ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বর মহেশ্বরী স্থানান্যশেষদেশবর্ত্তীন্যুদ্ধৃতানি। সর্ব্বং ব্রহ্মকুলমুদ্ধারিতং। বিশিষ্যাস্মদ্‌রাজ্যকুল মান্বীক্ষিক্যাদ্যশেষ রাজতন্ত্রপরিশীলনোন্নীতং ভবতি। ব্রহ্মক্ষত্রাদ্যস্মৎ প্রমুখ নিখিল বিনেয় লোক সংপ্রার্থনয়া চতস্রোধর্ম্মরাজধান্যো জগন্নাথবদরী দ্বারকা শৃঙ্গর্ষিক্ষেত্রেষু ভোগবর্দ্ধনজ্যোতিশ্‌শারদা শৃঙ্গেরীমঠাপর সংজ্ঞকাঃ সংস্থাপিতাঃ। তত্রোত্তরদিশো যোগিজন প্রাধান্যেন ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষণং সুকরমেবেতি জ্যোতির্ম্মঠে শ্রীতোটকাপর নাম্নঃ প্রতর্দ্দনাচার্য্যানথ শৃঙ্গর্য্যাশ্রমে শৃঙ্গর্ষিসমস্বভাবান্ পৃথ্বীধরাভিধেয় হস্তামলকাচার্য্যান্ ভোগবর্দ্ধনে স্বত এবাভিমতত্বেনাত্যন্তোগ্রস্বভাবানপি সর্ব্বজ্ঞকল্পপদ্মপাদাপর নাম সনন্দনাচার্য্যানথ বৌদ্ধকাপালিকাদি সকল বাদিভূয়িষ্ঠে পশ্চিমস্যাং দিশি বাদিদৈত্যাঙ্কুরঃ পুনর্মাভবদিতি শারদাপীঠে-কিল দ্বারকায়াং জৈনেরুৎসাদিত বজ্রনাভনির্ম্মিত ভগবদা লয়াদি দুর্দ্দশাং দূরীকৃত্য ভগবদ্ভিস্ত্রিলোকসুন্দর নাম্না পুনঃ সন্নিবদ্ধ ভগবদালয় শ্রীকৃষ্ণাদি সকল মর্য্যাদা সুসংস্কৃতায়া মধিগতাশেষলৌকিকবৈদিক তন্ত্রবিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিসর্ব্বজ্ঞানময়ান্ বিশ্বরূপাপর নামসুরেশ্বরাচার্য্যবশ্চাস্মৎ সর্ব্বলৌকিকাভিমতি পূর্ব্বকমভিষিচ্যৈবং চতুর্ভ্য আচার্য্যেভ্যশ্চতস্রোদিশ আদিষ্টা ভারতবর্ষস্য। ত এতে তত্তৎপীঠপ্রনাত্যা নিজনিজমেবমণ্ডলং গোপায়ন্তো বৈদিকমার্গমুদ্‌ভাসয়ন্ত। সর্ব্বে বয়ং তত্তন্মণ্ডলস্থা ব্রহ্মক্ষত্রাদয়স্তত্তন্মণ্ডলস্থেবাচার্য্যস্যাধিকারাধিকৃতা বর্ত্তিষ্যামহে চ। মহদ্ বিনির্ণয় প্রসক্তৌতু সুরেশ্বরাচার্য্যা এবোক্তলক্ষণতঃ সর্ব্বত্রৈব ব্যবস্থাপকা ভবন্তু ভগবতামনুশাসনাচ্চ। অস্মদরাজসত্তৈব নিরঙ্কুশগুরুসত্তাপ্যুক্তমর্য্যাদিয়া জগত্যবিচলং চলতু। পরিব্রাজকোহি মহাকুলীনত্ববৈদুষ্যাদিবিশিষ্টাচার্য্যলক্ষণৈরন্বিত এব শ্রীভগবৎপাদপীঠানামধিকার হেতুমর্হতি নতু বিনিময়েনেত্যবমাদিনিয়মবন্ধো ভগবদাজ্ঞা সমববুদ্ধঃ সমস্তৈরথাস্মদাদি ব্রহ্মক্ষত্রোদিবংশোদ্ভবৈঃ পরমপ্রেম্নোত্তমাঙ্গেনাদ্রিযত ইত্যেযাং বিজ্ঞপ্তিমঙ্গীকুর্ব্বন্তু ভগবন্ত ইতি স্বস্ত্যস্তু লোকেভ্যঃ। যুধিষ্ঠির শকে ২৬৬৩ আশ্বিন শুক্ল ১৯।

সুধন্বা সার্ব্বভৌমঃ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে আমরা গোলে পড়িয়াছি। মূল তাম্রশাসনখানি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। শঙ্করস্বামী বলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উহা চাহিয়া লইয়াছেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্টি বিভ্রম।

"ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ" এই বাক্যের সহিত আমরা আবাল্য পরিচিত। চক্ষুকর্ণনাসিকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইবার অবসর পাই না; এবং ইন্দ্রিয়সকল,' যে অনেক সময়ে অজ্ঞানের পথও উন্মুক্ত করিয়া, আমাদিগকে প্রতারিত করে, তাহাও বড় বুঝিতে পারি না। আমাদের প্রাচীন দর্শনকারগণ মানুষের নানা ভ্রম ও দুর্ব্বলতার কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের এই আলোচনায় দৃষ্টিবিভ্রমের কথা ফাঁক যায় নাই। রজ্জুকে সর্প বোধের ব্যাপারটি লইয়া, পণ্ডিতগণ মনশ্চক্ষু, মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি অনেক গুরু বিষয়ের অবতারণা করিয়া, নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টিভ্রম সম্বন্ধীয় মীমাংসার আলোচনা করিব না, এবং নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া মানুষ অনেক সময় যে সকল বিভীষিকা প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তাহার আলোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নির্ব্যাধি চক্ষুদ্বারা আমরা সুস্থাবস্থায় সর্ব্বদাই যে সকল ভুল দেখিয়া থাকি, উপস্থিত প্রবন্ধে কেবল তাহাই আলোচিত হইবে।

অনেক সময় ফোটোগ্রাফের ছবি তুলিবার ক্যামেরার সহিত মানবচক্ষু তুলিত হইয়া থাকে। এই তুলনা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়, পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, ক্যামেরার পুরোভাগে একটি স্থূলমধ্য কাচখণ্ড (Convex Lens) সংলগ্ন থাকে; ইহার দ্বারা বহিঃস্থ পদার্থের নিখুঁৎ ছবি,

যথেচ্ছা ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট করিয়া, ক্যামেরার মধ্যস্থ একটি কাচের পর্দ্দার উপর পাতিত করিতে পারা যায়। আমাদের চক্ষুর গঠন ব্যাপারও কতকটা সেইরূপ। অক্ষিগোলকের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে, এক প্রকার স্বচ্ছ ও ঘন পদার্থময় স্থূলমধ্য কোষ (Crystaline Lens) থাকে,—ঠিক্ ক্যামেরার স্থূলমধ্য কাচের ন্যায় ইহাদ্বারা দৃশ্যমান বাহ্যবস্তুর ছবি চক্ষুমধ্যে উৎপন্ন হইয়া অক্ষিগোলকের সর্ব্বপশ্চাতে স্থিত একটি পর্দ্দার (Retina) উপর আসিয়া পড়ে। তারপর মস্তিষ্ক ও উক্ত পর্দ্দাস্থ স্নায়ুজালের সাহায্যে, কোন অপরিজ্ঞাত জটিল প্রক্রিয়ায় দর্শনজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্যামেরায় পর্দ্দা যন্ত্রের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ থাকে না,—সেটি যথেচ্ছা অগ্রপশ্চাৎ সরাইয়া, যেস্থানে বাহ্য পদার্থের ছবি পর্দ্দায় সুস্পষ্টরূপে পতিত হয়, শিল্পী তথাকার ছবিখানি তুলিয়া থাকেন;—কিন্তু চক্ষুর পশ্চাদ্‌ভাগস্থ পর্দ্দাটা দর্শক ইচ্ছানুসারে স্থানান্তরিত করিতে পারেন না,—সে'টি সর্ব্বদাই চক্ষুছিদ্র (Pupil of the eye) হইতে এক নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে স্থির থাকে; দর্শনীয় পদার্থের দূরত্বানুসারে, দর্শক পূর্ব্বোক্ত কোষের স্থূলতার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া বাহ্য পদার্থের যথাসম্ভব নিখুঁৎ ছবি, চক্ষুর পর্দ্দার উপর পাতিত করেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্দ্দা ও স্থূলমধ্য কোষের সাদৃশ্য ব্যতীত [illegible]

[illegible] বয়সে শঙ্করাচার্য্য পরলোক গমন করেন।

[illegible] চক্ষু ও ক্যামেরার গঠন ব্যাপারে আর কোনও ঐক্য দেখা যায় না,—ইহার পর উভয়ের কার্য্য তুলনা করিতে গেলে, বরং নানা অনৈক্যই দেখা গিয়া থাকে। পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—ফোটো তুলিবার কাচ ক্যামেরার মধ্যস্থ ছবিতে অধিকক্ষণ সংযুক্ত থাকিলে ছবি বেশ সুস্পষ্ট অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া কাচে অঙ্কিত হইয়া যায়,—কিন্তু মানব দৃষ্টি কোন একটি পদার্থে অধিককাল আবদ্ধ থাকিলে, অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ পর্দ্দা ক্রমেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং দর্শকও পদার্থটি দেখিতে এক প্রকার ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। কোন উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে, অতি অল্প সময় মধ্যেই এই ক্লান্তি বেশ বুঝিতে পারা যায়; এবং পরে চক্ষু দৃশ্যান্তরে ন্যস্ত করিলেও, অক্ষিপর্দ্দার অবসাদ শীঘ্র মোচিত হয় না। এইজন্য কোন এক উজ্জ্বল বর্ণের বস্তু অধিককাল দেখিয়া, পদার্থান্তরে দৃষ্টিপাত করিলে—পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের ছায়ার অনুরূপ একটা ছবি, কিয়ৎ-কাল চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে দেখা যায়। এই ছবি প্রায়ই মূল পদার্থটার বর্ণের অনুপূরক(Complementary) কোনও এক বর্ণে রঞ্জিত থাকে। অর্থাৎ পদার্থটা উজ্জ্বল লোহিত বা পীত বর্ণের হইলে,—ছবির বর্ণ যথাক্রমে নীলাভ হরিৎ বা নীল, হইতে দেখা যায়। উজ্জ্বল দীপ-শিখা বা দিক্‌প্রান্তসংলগ্ন সূর্য্যগোলকে কিয়ৎকাল দৃষ্টি-পাত করিয়া,—সহজেই এই দৃষ্টিবিভ্রমের পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত উজ্জ্বল পদার্থ দর্শনে আরও অনেক দৃষ্টি-বিভ্রম সংঘটিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উজ্জ্বল পদার্থের যথার্থ আয়তন-জ্ঞান সম্বন্ধীয় ভ্রমটী (Irradiation) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা পরীক্ষাদ্বারা দেখাগিয়াছে, পদার্থ উজ্জ্বল হইলেই, সে'টী যেন আমাদের নিকট তাহার প্রকৃত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া বোধ হয়। পাঠকপাঠিকা-গণ শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া বা চতুর্থীর চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিলে, এই ভ্রমের একটী সুন্দর উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। উক্ত সময়ে সূর্য্যকিরণে আলোকিত চন্দ্রের ক্ষীণোজ্জ্বল অংশের পার্শ্বেই, চন্দ্রমণ্ডলের অবশিষ্টাংশটীও, পৃথিবী হইতে

দেবীর মন্দির সমীপে [illegible]

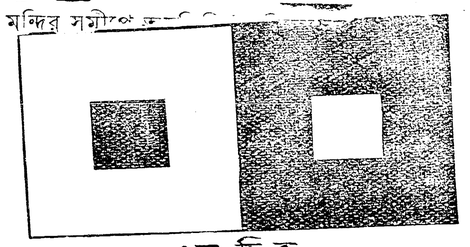

১ম চিত্র

প্রতিফলিত ক্ষীণ সৌর-কিরণে অনুজ্জ্বল অবস্থায় দেখা যায়,—কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে চন্দ্রের এই উজ্জ্বল ক্ষীণ কলাটী কোনক্রমেই ইহার অনুজ্জ্বল মণ্ডলের অংশীভূত বলিয়া বোধ হইবে না,—উজ্জ্বল অংশটী স্পষ্টই ম্লানজ্যোতি অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্ফীত দেখাইবে। ১ম চিত্রে, শ্বেত ও কৃষ্ণ চতুর্ভুজদ্বয়, ঠিক সমান করিয়া অঙ্কিত হই-য়াছে,—কিন্তু শ্বেত ক্ষেত্রটী পার্শ্বস্থ কৃষ্ণ ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক উজ্জ্বল হওয়ায়, লগ্নচক্ষে দেখিলে শ্বেতটী স্পষ্টই বৃহত্তর বলিয়া বোধ হইবে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া

থাকিবেন, কৃষ্ণ বা নীল বর্ণের কাগজে মুদ্রিত শ্বেত অক্ষর পাঠ করা বিশেষ কষ্টকর।—ইহাও পূর্ব্বোক্ত কারণে ঘটিয়া থাকে,—অক্ষরগুলি কাগজের বর্ণের তুলনায় উজ্জ্বল বলিয়া, তাহাদের অংশীভূত রেখাগুলির বিস্তার অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়; কাযেই প্রত্যেক অক্ষর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অক্ষরের সহিত মিলিত হইয়া, সকলগুলিই ক্রমে অপাঠ্য হইয়া পড়ে।

কষ্টলব্ধ পদার্থ সাধারণতঃ আমাদের নিকট অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়। মনোহর বিপনিশ্রেণীশোভিত রাজপথ দিয়া বহুক্ষণ ভ্রমণ করিলেও পথিক অতি অল্পই ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকেন, এবং পথের দৈর্ঘ্যটাও যেন অল্প বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যবিহীন নির্জ্জন প্রান্তর-পথ অবলম্বন করিয়া অদূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, পথটা অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকলই মানসিক ভ্রমের কার্য্য,—সুন্দর রাজপথ দিয়া গমনকালে, নানা সুখকর দৃশ্যে আমাদের মন বিন্যস্ত থাকে এবং মনের অজ্ঞাতসারে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণক্রিয়াটাও সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়,—কিন্তু বৈচিত্র্যবিহীন মরুময় প্রান্তরপথে ভ্রমণকালে চিত্তা-কর্ষক পদার্থের অভাবে, আমরা মনকে কেবল পথভ্রমণের আনুসঙ্গিক ব্যাপারে নিয়োজিত করি। তার পর শেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, পথগমনের চেষ্টা ইত্যাদির কথা আলোচনা করিয়া, আমরা পথটাকে মনে মনে অযথা দীর্ঘ বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকি। দর্শন কার্য্যে এই প্রকার ভ্রমের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। ২য় চিত্রে

২য় চিত্র

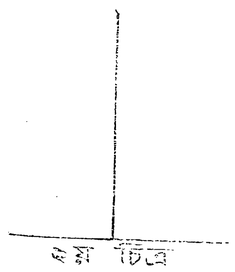

ভূমিস্থ রেখা ও দণ্ডায়মান রেখা, উভয়েরই দৈর্ঘ্য সমান,—কিন্তু লম্বরেখাটী যেন ইহার পাদরেখা অপেক্ষা স্পষ্টই বৃহত্তর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই দৃষ্টিভ্রমের কারণ, অনেক্‌টা পূর্ব্ববর্ণিত দূরত্বভ্রমের অনুরূপ। ধরাপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল (Horizontal) কোন রেখা দেখিতে, আমাদের চক্ষু অনুমাত্র ক্লান্তি অনুভব করে না; কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হইতে ঠিক্ ঊর্দ্ধগত (Vertical) কোন রেখার আমূল দেখিতে হইলে চক্ষুর পেশীগুলি যথাযথভাবে আকু-ঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হয় এবং এই সকল অনুষ্ঠানে একটু অধিক সময়েরও আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। এইজন্য ২য় চিত্রস্থ রেখাযুগল সর্ব্বাংশে সমান হইলেও দণ্ডায়মান রেখাটী দেখিবার জন্য, দর্শকমাত্রেরই একটু আয়োজন করিতে হয়,—আমরা উক্ত আয়োজন ও চেষ্টার কথা মনে করিয়া লম্বরেখাটীর দৈর্ঘ্য অযথা কল্পনা করিয়া ফেলি।

কয়েক বৎসর হইল জল্‌নার (Zöllner) নামক জনৈক আলোকতত্ত্ববিদ্, একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-বিভ্রমের ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—কয়েকটী সমান্তরাল সরলরেখা (Parallel Straight line) অঙ্কন করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকটী যদি অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান্তর সরলরেখা দ্বারা তির্য্যক্ ভাবে ছেদ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বাঙ্কিত সরলরেখাগুলির মধ্যস্থ ব্যবধান সমান থাকা সত্ত্বেও ইহাদের প্রান্তদেশ যেন পর-স্পর নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে। ৩য় চিত্রে

৩য় চিত্র

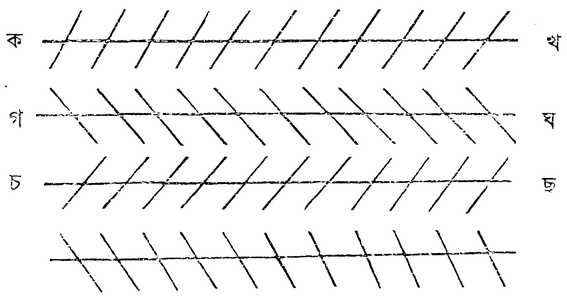

উল্লিখিত বাক্যের সার্থকতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহাতে কখ, গঘ, ও চছ রেখাত্রয় পরস্পর ঠিক সমান্তর করিয়া অঙ্কিত আছে; কিন্তু তির্য্যক্ রেখাগুলির দ্বারা ছেদিত হওয়ায়, ইহাদের প্রান্তদেশ যেন ক্রমেই একই দিকে নত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। চিত্রটীর নিম্নভাগ ঈষৎ উন্নত করিয়া দেখিলে এই দৃষ্টি-বিভ্রমটী আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

TORN PAGES.

দুইটী সমআয়তনবিশিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মধ্যে একটী লম্বভাবে এবং অপরটী আড়ভাবে কতকগুলি সমান্তর সরল রেখা দ্বারা খণ্ডিত হইলে,—আর একপ্রকার দৃষ্টিভ্রমের উৎপত্তি হয়। ৪র্থ চিত্রে ক-ক্ষেত্র লম্বভাবে,

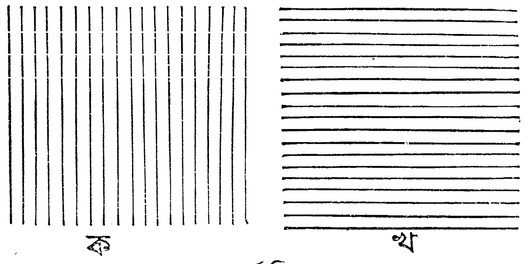

ক খ

৪র্থ চিত্র

এবং খ ক্ষেত্রটী অতির্য্যক্ ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। ক্ষেত্র-দ্বয়ের উন্নতি ও বিস্তার সকলই সমান—কিন্তু তথাপি খ-ক্ষেত্রটী যেন ক-ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক উন্নত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই দৃষ্টি-বিভ্রমের সাহায্যে জনৈক বৈজ্ঞানিক এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—খর্ব্বকায় ব্যক্তিগণ জনসমাজে দীর্ঘতর পুরুষ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে,—অতির্য্যক্-রেখাঙ্কিত (Horizontally Striped) বস্ত্রাদি পরিধান দ্বারা দর্শকের চক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভ্রমোৎপাদন করিলে,—বোধ হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

সরল রেখা ও অনেক জ্যামিতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবয়ব দর্শনে আমরা অনেক সময় ভুল করিয়া থাকি। এই ভ্রমের নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে পরীক্ষণীয় রেখাটীর সহিত পার্শ্বস্থ অপরাপর রেখার তুলনায়, আমাদের যে মানসিক বিকার হয়,—তাহাই এই শ্রেণীর দৃষ্টিবিভ্রমের উল্লেখ-যোগ্য কারণ বলিয়া বোধ হয়। পাঠক পাঠিকাগণ ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্রে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। ৫ম চিত্রে কখ ও গঘ রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য সমান; কিন্তু প্রথম রেখাটী, তদপেক্ষা দুইটি বৃহত্তর রেখা দ্বারা আবদ্ধ থাকায়, এবং দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্রতর রেখাযুগলের মধ্যে আছে বলিয়া,—কখ রেখা গঘ অপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই প্রকার ৬ষ্ঠ চিত্রেও, চছ ও তথ রেখাদ্বয়, মানদণ্ডদ্বারা মাপিলে ইহাদের দৈর্ঘ্য ঠিক্ একই দেখা যাইবে কিন্তু ইহাদের প্রত্যেক প্রান্তে বিভিন্নমুখী রেখা সংলগ্ন আছে বলিয়া, নগ্নচক্ষে দেখিতে গেলে, রেখাযুগলের

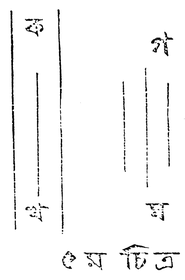

ক খ গ ঘ

৫ম চিত্র

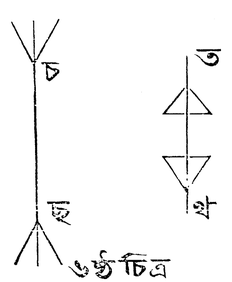

চ ছ ত থ

৬ষ্ঠ চিত্র

দৈর্ঘ্য কোনক্রমে সমান বলিয়া বোধ হইবে না,—চছ রেখা স্পষ্টই তথ অপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইবে।

পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন,—রাত্রি-কালে কোন উজ্জ্বল নক্ষত্র বা বৈদ্যুতিক দীপশিখার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রায়ই ইহাদের দীপ্তি-মান্ অংশ হইতে কতকগুলি রশ্মি মণ্ডলাকারে বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিতে পাই। সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা করিলেও পূর্ব্বোক্ত রশ্মি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়;—বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীনেরা সূর্য্যকে "সহস্র রশ্মি" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে সূর্য্যের দৃশ্যতঃ সহস্ররশ্মির মধ্যে একটীরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই,—সকলই আমাদের দৃষ্টির ভ্রম! ইঁহারা বলেন,—মানবচক্ষুস্থ স্থূলমধ্য স্বচ্ছকোষটী একই উপাদানে গঠিত নয়; পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, এইটী কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কতকগুলি রেখাদ্বারা ব্যাপ্ত দেখা যায়; এবং উক্ত সরলরেখা অধিকৃত স্থান, প্রায়ই কোষের অবশিষ্টাংশের উপাদান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন এক পদার্থে পূর্ণ থাকে। কোন উজ্জ্বল পদার্থের আলোক কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, উক্ত শিরাকার ঘনপদার্থে বাধা প্রাপ্ত হইয়া,—পূর্ব্বর্ণিত আলোকচ্ছটা বা রশ্মির উৎপাদন করে।

চক্ষুগঠনের নানা অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত আরো অনেক দৃষ্টি-ভ্রম সংঘটিত হইয়া থাকে। ৭ম চিত্রস্থ বৃত্তটীর প্রত্যেক অংশই একই পরিমাণ স্থূল রেখায় এবং একই প্রকার মসী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে;—কিন্তু তথাপি চক্ষুর ঠিক্ সম্মুখস্থ লম্বরেখাময় বৃত্তাংশদ্বয়ের বর্ণ যেন পার্শ্বস্থ অংশ দুইটীর বর্ণ অপেক্ষা অধিক গাঢ় বলিয়া বোধ হইতেছে। তা'র পর যদি পুস্তকখানি ঘুরাইয়া ধরিয়া পূর্ব্বেকার পার্শ্বস্থ বৃত্তাংশ-দ্বয় এখন ঠিক্ চক্ষুর সম্মুখীন করা যায়, তাহা হইলে প্রথম-

দৃষ্ট গাঢ়কৃষ্ণ অংশযুগল, স্পষ্টই ধূসর বর্ণের বলিয়া বোধ হইবে। মানব-চক্ষুর উপরিভাগটা ঠিক্ পূর্ণ-গোলকের

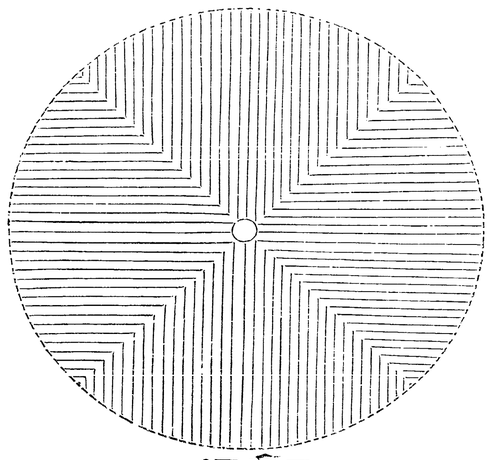

৭ম চিত্র

(Sphere) অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ প্রত্যেক চক্ষুর একপ্রান্তের গোলত্ব, অপর প্রান্তের বক্রতা অপেক্ষা প্রায়ই কিঞ্চিৎ অধিক দেখা যায়। আলোকতত্ত্ব-বিদ্‌গণ বলেন,—চক্ষুর গঠনের এই বিশেষত্বের জন্য পূর্ব্ব-বর্ণিত দৃষ্টিভ্রমের উৎপত্তি হয়।

পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—রাত্রিকালে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা সেগুলিকে বিশেষ বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট বলিয়া মনে করি;—কিন্তু পৃথিবী হইতে নক্ষত্রাদির দূরত্বের পরিমাণ হিসাব করিলে, আমাদের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোন আয়তনই থাকিতে পারে না। অতি বৃহৎ দূর-বীক্ষণ দ্বারা নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সেগুলি আলোক-বিন্দু ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না,—সুতরাং উজ্জ্বল বিন্দুকে এইপ্রকারে স্পষ্টায়তনবিশিষ্ট দেখা, আমাদের দৃষ্টির একটী সাধারণ ভ্রম। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে,—চক্ষুগঠনের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্ব এই দৃষ্টিভ্রমেরও প্রধান কারণ।

লম্বভাবে (Vertically) অঙ্কিত সরল রেখা সম্বন্ধীয় কয়েকটী ভ্রান্তির কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে,—তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ভ্রমের কথা উল্লেখযোগ্য। একখণ্ড কাগজে কতকগুলি সরল রেখা লম্বভাবে টানিয়া, কাগজ-খানি উত্তোলিত করিয়া চক্ষের সহিত ঠিক এক সমতলে রাখিলে, রেখাগুলির দৈর্ঘ্য যেন হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। ৮ম চিত্রটী লইয়া পাঠকপাঠিকাগণ পরীক্ষা করিলে, উল্লিখিত কথার সার্থকতা বেশ বুঝিতে পারিবেন, এবং এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রীভূত রেখাগুলি পত্রবিদ্ধ সূচির বা পিনের ন্যায় দণ্ডায়মান বোধ হইবে। ৯ম চিত্রটী, এই

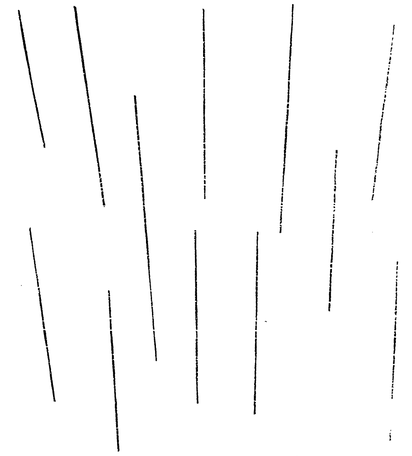

৮ম চিত্র

শ্রেণীর দৃষ্টি-বিভ্রমের অপর একটী উদাহরণ—ইহাতে লম্ব-রেখাদ্বারা কয়েকটী বাক্য মুদ্রিত আছে, সাধারণভাবে পাঠ করিতে গেলে, বাক্যগুলি সহসা পাঠ করা বিশেষ কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু পুস্তকের পত্রখানি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, চক্ষুর সহিত একসমতলে ধরিলে,—ইহার প্রত্যেক কথা সুস্পষ্ট দেখা যাইবে।

ইংরাজি ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদি পঠনব্যাপারে আমাদের মনে সর্ব্বদাই কতকগুলি ভুল সংস্কার থাকিয়া যায়। আমরা মনে করি, পাঠকমাত্রেই প্রত্যেক মুদ্রিত অক্ষর আমূল নিরীক্ষণ করিয়া বাক্যটী বুঝিয়া লইয়া থাকেন,—কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। পাঠকালে, আমরা অক্ষরের কেবল ঊর্দ্ধতন অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই পাঠে সমর্থ হই। মুদ্রিত পুস্তকের কোন একছত্রের ঠিক্ নিম্নার্দ্ধ একখণ্ড কাগজ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, পাঠকপাঠিকাগণ পুস্তক পাঠের চেষ্টা করিলে,—অর্দ্ধাচ্ছাদিত ছত্রটী তাঁহারা অনায়াসেই পাঠ করিতে পারিবেন; কিন্তু ঊর্দ্ধাংশ আচ্ছাদন করিয়া কেবল নিম্নার্দ্ধ দেখিয়া পাঠ করিতে চেষ্টা করিলে,

৯ম চিত্র

ছত্রস্থ কথাগুলি সম্পূর্ণভাবে পাঠকরা নিশ্চয়ই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। K, B, S, 8, প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজি বর্ণের, আকার জ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের একপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমরা মনে করি উক্ত অক্ষরগুলির ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অংশদ্বয়ের আকার ঠিকই এক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নয়,—ইহাদের নিম্নার্দ্ধ ঊর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া মুদ্রিত থাকে, কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ꓘ, ꓭ, 'S '8—ইত্যাদি প্রকারে বর্ণগুলি বিপরীতভাবে মুদ্রিত করিয়া, ইহাদের ঊর্দ্ধাংশটী নিম্নার্দ্ধের সহিত তুলনা করিলে, এই ভ্রমের ব্যাপার স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন,—উদয়াস্ত কালে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল অতি বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পরে আকাশের ঊর্দ্ধদেশে উথিত হইলে, ইহাদের আকার ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। দিক্প্রান্তস্থ চন্দ্রসূর্য্যের এই বৃহদায়তন দর্শন, আমাদের একটী বৃহৎ ভ্রম। কোন যন্ত্রাদিদ্বারা উদয়াস্তকালে সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস নির্দ্ধারণ করিয়া পরে মধ্যাহ্নসূর্য্যের ব্যাসপরিমাণের সহিত ইহার তুলনা করিলে,—উভয় ব্যাসের পরিমাণ একই দেখা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ এই দৃষ্টিভ্রমের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;—তাঁহারা বলেন, সূর্য্যমণ্ডল আকাশপ্রান্তে অবস্থান করিলে, আমরা দিক্প্রান্তসংলগ্ন বৃক্ষ ঘর বাড়ী ইত্যাদি নানা পার্থিব পদার্থের সহিত, ইহার তুলনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, তদ্দ্বারা সূর্য্যগোলকের একটা নির্দ্দিষ্ট আকার মনোমধ্যে অঙ্কিত রাখি,—তা'র পর সূর্য্য ক্রমে ঊর্দ্ধারোহণ করিলে, ইহার সহিত তুলনা করিবার উপযোগী কোন পদার্থই, আর সুনির্ম্মল আকাশে দেখিতে পাই না। কাযেই,—সৌরগোলক পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বলিয়া বোধ হয়। পাঠক পাঠিকাগণ স্থূল কাগজ দ্বারা নল প্রস্তুত করিয়া, তাহার ছিদ্র দ্বারা উদীয়মান সূর্য্যের মণ্ডল পরীক্ষা করিলে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সার্থকতা কতক্ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—নগ্নচক্ষুদৃষ্ট সৌরবিম্ব অপেক্ষা ছিদ্রপথে অবলোকিত সূর্য্যগোলক স্পষ্টই ক্ষুদ্রতর দেখাইবে। *

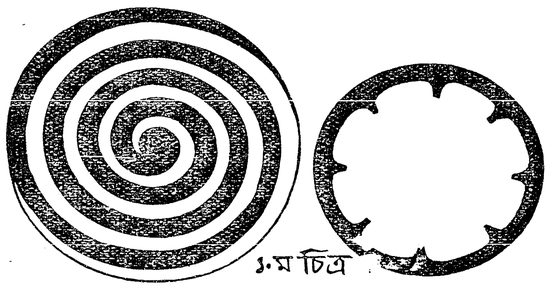

অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্ত্তী পর্দ্দার (Retina) দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যে সকল দৃষ্টিভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রবন্ধের প্রথমাংশে তন্মধ্যে কয়েকটী আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর আর একটী ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করিয়া, আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন,—কোন উজ্জ্বল আলোকবিন্দু চক্ষুর সম্মুখে, দ্রুত চালিত হইতে থাকিলে, আমরা আর আলোকবিন্দু দেখিতে পাই না,—তৎপরিবর্ত্তে উজ্জ্বল আলোক রেখা দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। বিজ্ঞানবিদ্গণ, এই দৃষ্টিভ্রমের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—আমাদের চক্ষুস্থ পর্দ্দায় কোন উজ্জ্বল পদার্থের ছবি পতিত হইবা মাত্রই, পদার্থটী দৃষ্টিবহির্ভূত করিলে, উক্ত ছবি পদার্থটীর সহিত অন্তর্হিত না হইয়া, কিয়ৎকালের জন্য চক্ষুর পর্দ্দায় অঙ্কিত থাকিয়া যায়। কাযেই উজ্জ্বল আলোক বিন্দুটী নির্ব্বাপিত বা স্থানান্তরিত হইলেও, ইহার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে, দর্শক আলোকচ্ছবি দেখিতে থাকেন,—চলিষ্ণু আলোক বিন্দুর ছবি এই প্রকারে চক্ষুতে অধিককাল থাকায় (Persistence of vision) উল্লিখিত দৃষ্টিভ্রমের উৎপত্তি হয়। চক্ষুর পর্দ্দার পূর্ব্ববর্ণিত দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিয়া, সিনোম্যাটোগ্রাফ্ (Cinomatograph) বায়োস্কোপ

* এই দৃষ্টিবিভ্রমটীর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া,—বৈজ্ঞানিকগণ নানা কথা বলিয়াছেন। কতকগুলি পণ্ডিতের মতে, দিক্প্রান্তস্থ চন্দ্র সূর্য্যের দূরত্ব গণনায় আমরা একটা বড় ভুল করিয়া থাকি বলিয়া, চন্দ্র সূর্য্যের আকার বৃহত্তর মনে হইয়া পড়ে। ইহারা বলেন,—দর্শক ও দিক্প্রান্তের মধ্যে, আমাদের পরিজ্ঞাত নানা বৃক্ষাদি গৃহ অট্টালিকা প্রভৃতির ব্যবধান থাকায়, আকাশপ্রান্তের দূরত্ব সম্বন্ধীয় একটা স্থূলভাব দর্শক মাত্রেরই মনে স্বতঃই অঙ্কিত হইয়া যায়;—কিন্তু খ—মধ্যের (Zenith) দূরত্ব ধারণা করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত সুযোগ থাকে না। কাযেই দিক্-প্রান্তের দূরত্বের তুলনায়, খ-মধ্যের ব্যবধানটী, দর্শকের নিকট ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে। তা'র পর চিরপরিচিত নির্দ্দিষ্ট আকারের চন্দ্রসূর্য্য দিক্প্রান্তে উপস্থিত হইলে, আমরা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমবশতঃ উদয়াস্তের স্থান, খ—মধ্যস্থ চন্দ্রসূর্য্যের স্থান অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী, মনে করিয়া, ইহাদের আকার অযথা বৃহৎ বলিয়া কল্পনা করিয়া ফেলি। এই দৃষ্টিবিভ্রমের, দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ কারণ থাকায়, পাঠক পাঠিকাগণের মনে ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়, গত পৌষের "প্রদীপে" ইহার একটু আভাষও দিয়াছেন। কিন্তু সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ নাই,—উভয় ব্যাখ্যাই উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসায় অল্পাধিকপরিমাণে প্রযুজ্য,—এবং দৃষ্টিবিভ্রমের ন্যায় ব্যাপারে উক্ত কারণদ্বয় যুগপৎ কার্য্য করিয়া, যে একই ফল উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাও বোধ হয় কেহ সাহস করিয়াবলিতে পারেন না। গত আশ্বিন কার্ত্তিকের "প্রদীপে," উদয়াস্তের চন্দ্র সূর্য্যের আকারবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় কারণোল্লেখ প্রসঙ্গে, আমি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম,—সে'টী আমার নিকট অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিবিভ্রমের পূর্ব্ববর্ণিত উভয় ব্যাখ্যাই, বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া আসিতেছে;—জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রোক্টারপ্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত, উক্ত ভ্রান্তিটীর আলোচনায়, দ্বিতীয় কারণটীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার কথা আচার্য্য টীণ্ডাল ও লার্ডনার প্রভৃতি সুধীগণ লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। ডাক্তার লিন্ডসে জনসন (G. Lindsay Johnson) দৃষ্টিবিভ্রম সম্বন্ধীয় তাঁহার এক বিশেষ রচনায় লিখিয়াছেনঃ—When the moon is high in the heavens, you have no object near to compare its size with; whereas, when near the horizon, we naturally compare it with objects on the earth which appear in its vicinity. If, for example, the moon appears near a tree on the horizon, we notice it looks bigger than the tree; and the mind knowing how large a tree looks when close to, and what a large angle of view it takes up, gives the moon credit for looking much bigger than when it stands alone in the vast expanse of sky.

১০ম চিত্র

(Bioscope) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে, আজকাল অনেক সুন্দর জীবন্তদৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে। চক্ষুর এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা না থাকিলে, আমরা বোধ হয় আতসবাজীর সৌন্দর্য্য উপভোগে সমর্থ হইতাম না। ১০ম চিত্রটী দ্বারা এই সাধারণ দৃষ্টিভ্রমের পরীক্ষা করা যাইতে পারে। চিত্রখানি ঠিক্ চক্ষুর নিম্নে ধরিয়া একসমতলে ঘুরাইলে, চিত্রাঙ্কিত কুঞ্চিত রেখাটী আপনিই ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হইবে এবং ইহার পার্শ্বস্থ চক্রটীকে বিপরীত মুখে আবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইবে*।

এতদ্ব্যতীত আমরা প্রতিদিন আরো অনেক ভ্রম দর্শন করিয়া থাকি। তন্মধ্যে সুনিপুণ চিত্রকরগণ তাঁহাদের শিল্পচাতুর্য্যে, আমাদের চক্ষে যেসকল ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন, তাহাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত নানা ভ্রান্ত ধারণা ও দুর্ব্বলতা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন, এবং পটাঙ্কিত চিত্রটী যাহাতে দর্শকের দুর্ব্বল চক্ষু ও সংস্কারপূর্ণ বিকৃত মনটীকে সত্যপথভ্রষ্ট ও প্রতারিত করিতে পারে, চতুর চিত্রকর তাঁহার তুলিকার প্রত্যেক মৃদু স্পর্শে তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

১। জীবন।

বসিয়া নদীতীরে চাহিয়া অপলকে
বালুকা গণি আমি শুধুরে।
তটিনী কুলু কুলে বহিছে কূলে কূলে
কানেতে বাজে আসি মধুরে।
উপরে নীল মেঘে তপন আছে জেগে
দহিছে শির খর কিরণে।
খসিয়া পাতাগুলি মাখিছে বন-ধূলি
লুটায়ে পড়ে তরু-চরণে।
কুসুম অবসিত কোকিল শ্রান্তচিত
ভ্রমর আর নাহি গুঞ্জরে।
রয়েছে বন ছায়ে বিহগ লুকাইয়ে
বকুল আর নাহি মুঞ্জরে।
প্রকৃতি শ্রান্ত শুধু হৃদয় করে ধু ধু
চৌদিকে কেহ কোথা নাহি রে।

বসিয়া নদী তীরে জীবন দ্বিপ্রহরে
বালুকা গণি আর চাহিরে।
ফুরায়ে যায় বেলা ভাঙ্গিছে খেলা মেলা
লুকায় পাখী নিজ আবাসে।
আকাশে রাঙ্গা রাঙ্গা নীরদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
শতেক রঙ্গে কত শোভা সে।

* এই দশম চিত্রটী অল্পদিন হইল, অধ্যাপক সিলভেনস্ টমসন্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে।

* চিত্রবিদ্যায়, অঙ্কণচাতুর্য্যে স্বভাবতই যে সকল দৃষ্টিবিভ্রাট সংঘটিত হয়, তাহার সম্যক্ আলোচনা, মাদৃশ কলাবিদ্যাহীন লেখকের ক্ষমতার বহির্ভূত। কোন চিত্রকলাবিদ্ লেখক "প্রদীপে" তাহার আলোচনা করিলে, তাহা নিশ্চয়ই পাঠক সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে।

Dr. G. Lindsay Johnson রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, অধ্যাপক হপ্কিন্স্ প্রণীত Experimental Scien e, এবং সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পত্র La Nature প্রভৃতি পুস্তক হইতে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য কয়েকটী চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রী জঃ—

বনের ছায়া মাঝে আঁধার ভীম সাজে
প্রকাশে ক্রমে নিজ মূরতি।
সে আলো কোথা গেল আঁধার দেখা দিল
না জানি ধরণীর কি রীতি।
আকাশে দেখি চাহি চাঁদের রেখা নাহি
তারকা উপহাসে হাসিয়া।
নদীর কালো জলে তাহার ছায়া জলে
বালুকা মাঝে আমি বসিয়া।
নীরব হল পাখী ক্ষণেক ডাকি ডাকি
নীরব হল ক্রমে ধরণী।
জগত এ'লোকেশে ঢাকিয়া ভীমা বেশে
রহিল নিশ তমবরণী।
কেহ না আসে কাছে কোথায় কেবা আছে
সবারে ডাকি আয় আয়না।
আঁধার ঘোর এসে পড়েছে তট দেশে.
বালুকা দেখা আর যায় না।
শুধুই মেঘ শিরে তারকা উঁকি মারে,
আলেয়া করে দূরে ছলনা।
গভীর অন্ধকারে রহিনু নদী-তীরে
বালুকা গণা মোর হলনা।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

২। অতৃপ্তি।

কেন এ অতৃপ্তি-ঊর্ম্মি হৃদি-পারাবারে
উথলিয়া কূলে কূলে করিছে রোদন ?
কি অভাব আকুলতা, কোন্ তৃষাতরে ?
চাহিছে সাধিতে সদা কোন সে সাধন ?
চারিদিকে উঠে মহা কর্ম্ম কোলাহল।—
কুসুম বিকশি উঠি বিতরিছে বাস,
গাহিছে কর্ম্মের গীত তারকা সকল,
সকলেরে প্রাণ দিতে বায়ু ফেলে শ্বাস।
শুনিয়ে পরাণ এই কর্ম্মের কল্লোল,
চাহিছে মিশাতে ইথে ক্ষুদ্র কণ্ঠতান,
আপনার পানে চেয়ে জাগিতে কেবল,
চাহেনা থাকিতে তার অধীর পরাণ।
তাই এ অতৃপ্তি-ঊর্ম্মি হৃদি পারাবারে,
উথলি উঠিছে কাঁদি সদা তৃষাভরে।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

৩। জীবন ও জীবিকা।

পৌষ-প্রভাতে বিষাদ-শোভাতে
কুয়াসা-মগন দিশা,
কিবা পথ ঘাট স্থল জল মাঠ
ভূতলে গগনে মিশা।
রাজপথ দিয়া চলেছি বাহিয়া,
সমুখে ধাইছে মন,
বরষা কি শীতে ভয় নাহি চিতে,
দারুণ ভ্রমণ-পণ!
হিমে ভরা বায় হুহু ব'য়ে যায়,
বুকেতে কাঁপিছে আসি;
মাথার উপরে লঘু পাখা ভরে
ঝরিছে শিশির রাশি।
নাহি মানি কিছু নাহি চাহি পিছু
আপনার মনে ধাই,
প্রকৃতি-সদনে দাস্য-বেদনে
ক্ষণেক জুড়াতে চাই।
হায়! সে যে ভার নহে ঘুচাবার,
মর্ম্মে জড়িত মূল,
বজ্র সমান শত অপমান
বক্ষে বিঁধিছে শূল।
এ বড় ভীষণ জীবিকার রণ
চাকরী বিষম দায়,
নিশিদিনমান চাপা যে পাষাণ,
পেষণে পরাণ যায়।
যাইতে আসিতে শুইতে বসিতে
শুধু সে চরণ সেবা,
আপন জীবন নহে সে আপন,
এ ব্যথা বুঝিবে কেবা?
কে জানে এমন হ'বে অঘটন—
বিধাতা হইবে আঁধা?
উদরের দায় দিতে হ'বে, হায়,
কবির মাথাটা বাঁধা?
সুখের কারণ সঁপি কায়মন
সুখ সে মিলিল কই?
ভূতের বেগার করি শেষে সার
দুখের পশরা বই!
শুনি কার রব পাশরিনু সব,—
ধন জন যশ-আশ?
পরম হেলায় পরিনু গলায়
দীনতা হীনতা-ফাঁস?
হাহা! ধিক্ হেন! কূল তাজি কেন
অকূলে ভাসানু নায়?
ধিক্! ক'ব কা'য় জীবিকার দায়
জীবন বুঝিবা যায়!
ভাবিয়া ভাবিয়া চক্ষে ভরিয়া
বক্ষে নামিল জল,
গুরু অবসাদ গভীর বিষাদ
ছাইল মরম-তল।

হেন কালে ফিরি পাশে মোর হেরি
সুধিয়া রমণী যায়,
ধনুকের মত মাথা অবনত,
মাঝাতে বাঁকানো কায়।
বিচারিলে থুল হ'য়ে যায় ভুল
আছে বা না আছে প্রাণ,
হাঁটিছে যখন হইবে চেতন
হেন মনে অনুমান।
কাঁখে এক ঝুড়ি জলপান মুড়ি,
যেন সে অচল ভার,

বাজারের পথে দু'টি পা না যেতে
নামাইছে বারবার।
সকল বেদন ঢাকিয়া তখন
করুণা উপজে মোর,
কহিনু সুধাই, "বলি, হাঁগো আই!
বেটা বেটী নাহি তোর?"
শুনিতে না পায়, পুছি পুনরায়
ঊর্দ্ধে তুলিয়া রব;
বলে,—"আরে বাপ! কিবলিব পাপ
যমেরে দিয়েছি সব!
মরণ নিদয় মোরে নাহিলয়—
কপাল এমনি ভিন্!
হাটে বাটে যাই মুনাফা যা পাই
তাই দিয়ে কাটে দিন।"
কহি পুন,—"তোর বড় ত কঠোর
এ বুড়া বয়সে জ্বালা;
ছাড়ি' এ সকল সহরেতে চল,
ভিক্ষা মিলিবে মেলা।"
বুড়ী পেয়ে তাপ বলে,—"আরে বাপ!
ছিছি! একি কথা মেনে?
জীবন থাকিতে পরের বাড়ীতে
কাঙ্গাল হইব কেনে?
নহি ক'রও ঋণী, আমি একাকিনী
করি সে আপন কাজ;
নিজ মানে থাকি ভগবানে ডাকি,—
ইথে বা কি আছে লাজ?"

বুড়ি এত বলি' গেল যবে চলি
সহসা দেখিনু চেয়ে,
অরুণ কিরণ সোণার বরণ
ফেলেছে গগন ছেয়ে।
কুয়াসা-বসন করিয়া মোচন
নগন তনুয়াখানি
তপন পরশে নবীন হরষে
হাসিছে প্রকৃতি রাণী।
কাননের ফাঁকে সহকার-শাখে
উথলে শ্যামার তান,
শুনি' সেই সুর প্রমোদ-মধুর
পুলকে পূরিল প্রাণ।
মধুর বাঁশীতে লাগিল কহিতে
যেন বা মরম মাঝ,—
নিজ মানে থাকি ভগবানে ডাকি
ইথে বা কি আছে লাজ?
কেমনে না জানি তুহারে বাখানি
সুধিয়া রমণী ওরে!
কবির উদাস করিতে বিনাশ
বিধি কি পাঠালে তোরে?
ধূলির সমান যত অভিমান
ধূলিতে ফেলিনু ছুড়ি,—
ভাবিনু তখন,— "ভয় কিরে, মন!
বাজারে বেচিব মুড়ি!"

২২শে পৌষ, ১৩০৫।

ক্ষিতিজস্থ চন্দ্রসূর্য্যবিম্ব বড় দেখায় কেন?*

আমার মনে হইত বাঙ্গালা মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের কোন পাঠক নাই। যেহেতু যাঁহারা বিজ্ঞান শিখিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজিতে শিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না; এবং যাঁহারা না শিখিয়াছেন, তাঁহারা মাসিক পত্রে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গলাধঃ করিতে ভীত হন। কিন্তু পৌষমাসের 'প্রদীপ' দেখিয়া উক্ত মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পাঠক আছে, পরন্তু সমালোচকও আছে।

ক্ষিতিজস্থ চন্দ্রসূর্য্যবিম্ব বড় দেখায় কেন?—সংক্ষেপে 'প্রদীপে' ইহার আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কিশোর রায় আমার প্রায় সমুদয় কথার ভুল বাহির করিয়াছেন। লেখকের বুঝিবার ভুল, বুঝাইবার ভুল হইতে পারে। কিন্তু দুই পৃষ্ঠা লেখার মধ্যে এত ভুল করিয়াছিলাম, ইহাতে নিজেই বিস্মিত হইয়াছি। 'প্রদীপ'-সম্পাদক 'প্রদীপটীর' আকার ক্ষুদ্র দেখাইয়া লেখকের কলমকেও ক্ষুদ্র করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া থাকেন। সম্পাদকের মন্তব্য চিরদিন শিরোধার্য্য। কিন্তু এটুকু বলিতে বাধ্য যে, পত্র ছোট হইলে পল্লব-গ্রাহিতার প্রশ্রয় হয়। মাসিকপত্রাদির পাঠক চুম্বক হইলেও নানা শ্রেণীর আছেন। কোন পাঠক আমূল বিবরণ আকাঙ্ক্ষা করেন, কেহ বা কোন বিষয়ের শেষ কথা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হন।

ক্ষিতিজস্থ গ্রহবিম্ব বড় দেখায় কেন?—ইহার উত্তর বড় জটিল। আলোচনের (Sensation) বিষয় হইলে এত জটিল হইত না, প্রত্যক্ষের (Perception) বিষয় হওয়াতেই এত বিষম হইয়াছে। আলোচনেই বিসম্বাদ হয়, প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। প্রত্যক্ষে বিবেক (Discrimination) এবং বিশিষ্ট বা সবিকল্পজ্ঞান (Judgment) আবশ্যক। সকলের বিশিষ্ট জ্ঞান সমান হয় না। শিক্ষা, সংস্কার প্রভৃতি নানা কারণে উহা ভিন্ন হয়, ফলেও ভিন্ন

* এই প্রবন্ধটি আমরা যথাসময়ে পাইয়াও স্থানাভাববশতঃ মাঘ মাসে প্রকাশ করিতে পারি নাই।

প্রদীপ-সম্পাদক।

হয়। অধিকন্তু যে ঘটনাপরম্পরা ধরিয়া বিশিষ্টজ্ঞান হয়, সকল স্থলে তাহাও সুবোধ্য ও ব্যবচ্ছেদ্য হয় না।

যখন ক্ষিতিজস্থ ও নভঃস্থ বিম্ব-পরিমাণ একই থাকে, অথচ ভিন্ন প্রতীয়মান হয়, তখন প্রশ্নের উত্তর মনোজন্য ভ্রান্তি বা বিশিষ্ট জ্ঞানের দোষ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ ভ্রান্তি হয় কেন? এদেশের প্রাচীনেরা মনে করিতেন, ক্ষিতিজস্থ বিম্ব সুখদৃশ্য হয় বলিয়া বড় দেখায়। সাধারণ লোকে ইহাকেই কারণ ভাবিয়া থাকে। কি কারণে সুখদৃশ্য হয়, এখানে তাহা বিচার করা আবশ্যক। দুর্দৃশ্য বস্তু অপেক্ষা সুদৃশ্য বস্তু বড় দেখায়। দুই একটা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমি লিখিয়াছিলাম উহা কারণ নহে। অর্থাৎ উহা আংশিক কারণ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র কারণ হইতে পারে না।

তবে কারণ কি? ক্ষিতিজে জ্ঞাত বস্তুর পরিমাণের সহিত বিম্বব্যাসের তুলনা করিতে পারি, মধ্য আকাশে পারি না। তাই মধ্য আকাশে বিম্বব্যাস যা তা একটা মনে হয়। অধিকাংশের মতে ইহাই এক মাত্র কারণ। আমি লিখিয়াছিলাম, "এই মানসিক ভ্রান্তিই উক্ত বিষয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া আমার মনে হয় না।" কেন? তাহার দুই একটা প্রমাণ দিয়াছি। আর কি হইতে পারে? ক্ষিতিজস্থ বিম্বের সুখদৃশ্যতা।

প্রবন্ধের স্থূল কথা এই। প্রশ্নটার উত্তরের সূচনা মাত্র করিয়াছিলাম। দুই একটা সম্ভাব্য উত্তরের দোষগুণ বিচার করিয়া আমার মনে যাহা যাহা কতকটা ঠিক বোধ হইয়াছে, প্রবন্ধের শেষে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটা আদ্যোপান্ত স্থিরচিত্তে পড়িলে বোধ করি তাহাই মনে হইবে।*

সমালোচক মহাশয় কিরণ প্রসারণ ও তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ irradiation লইয়া একটু অধিক টানাটানি করিয়াছেন। সুখদৃশ্য বস্তু বড় দেখায়; এই প্রকারে বড় দেখানকে আমি কিরণ-প্রসারণ বলিয়াছি। শব্দটা আমার রচিত। ইংরাজিজ্ঞ পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া শব্দটার পরে irradiation শব্দ যোগ করিয়াছিলাম। কি প্রকার ব্যাপার বুঝাইতে কিরণ-প্রসারণ শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তাহাও মোটামুটি বলিয়াছিলাম। এস্থলে কেবল এই টুকু দ্রষ্টব্য ছিল, সেই ব্যাপারকে কিরণ-প্রসারণ এবং কিরণপ্রসারণকে ইংরাজিতে irradiation বলা যাইতে পারে কি না। সমালোচক এই ক্রম বিপর্য্যস্ত করিয়া আমার অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন!

তাঁহারই ক্রম অবলম্বন করা যাউক। Irradiation শব্দটা Physiologyর। সুতরাং সামান্য অভিধান না দেখিয়া যাঁহারা শব্দটা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ দেখা যাউক। দেখিতেছি, Kirke (Handbook of Physiology, 12th edition) লিখিয়াছেন, "From the insufficient adjustment of the image of a small white object, it appears surrounded by a sort of halo or fringe. This phenomenon is termed irradiation." কেহ কেহ উহাকে diffusion circles বলিয়াছেন। বোধ করি কিরণপ্রসারণ শব্দটি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।*

Irradiation এর কোন প্রকার physiological 'ব্যাখ্যা' আমি কুত্রাপি দেই নাই। উহার কারণ আমার জানা নাই। ব্যাখ্যার প্রয়োজনও দেখি নাই। সমালোচক নিজে 'বোধ' করিয়া শেষে সেই বোধের 'সুমধুর ব্যাখ্যার' ভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ দেন নাই। বলা বাহুল্য, কল্পনাকে 'বৈজ্ঞানিকেরা' প্রমাণ বলিয়া মনে করেন না।

সমালোচক আমার আর একটা গুরুতর দোষ আবিষ্কার করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম, "কোন বস্তুর প্রভা বৃদ্ধি হইলে তাহা নিকটস্থ সুতরাং বৃহৎ বোধ হয়।" তিনি বলেন, "নিকটস্থ সুতরাং বৃহৎ কথাটা নিতান্তই অসত্য। বাস্তবিক ইহার ঠিক বিপরীত কথাই সত্য।" নিকটস্থ সুতরাং বৃহৎ,—ইহার বিপরীত নিকটস্থ সুতরাং

* আর একজন লেখক প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। আমার উক্তির দোষ দেখাইতে গিয়া তাঁহাকে আনয়নের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

* Irradiation শব্দের আরও বিস্তৃত অর্থ আছে। এখানে একটা প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি; "If we approach it [the tympanic membrane] by introducing into the outer ear some small object like the tip of a rolled-up tissue-paper lamp-lighter, we are surprised at the large radiating sensation which its presence gives us, * * *. It is immaterial to enquire whether the far reaching sensation here be due to actual irradiation upon distant nerves or not."—Prof. James. (*Principles of Psychology. Vol. II. 1891.*)

ক্ষুদ্র (কিংবা দূরস্থ সুতরাং বৃহৎ)। তবে সমালোচকের মতে কোন বস্তুর প্রভা বৃদ্ধি হইলে তাহা নিকটস্থ সুতরাং ক্ষুদ্র বোধ হয়।

দুঃখের বিষয়, আমার এরূপ বোধ হয় না। রাত্রে কেরোসিন দীপের আলো কমাইয়া দিলে জিনিষগুলা দূরে ও ছোট বোধ করি, আলো বাড়াইয়া দিলে কাছে ও বড় বোধ করি। এক চোখ বন্ধ করিয়া দেখি, দৃষ্ট বস্তু দূরে ও ছোট বোধ করি, দুই চোখে দেখিবা মাত্র তাহা কাছে চলিয়া আসে ও বড় বোধ হয়। কাচে ভূষা মাখাইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, সূর্য্যবিম্ব ছোট বোধ হয়। গত ১৩ই পৌষ চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ সময়ে অনেকেই চন্দ্রবিম্ব ছোট হইতে দেখিয়াছিলেন।

এস্থলে বলা উচিত, আমার চক্ষের দোষ আছে। আচার্য্য হক্সলির চক্ষের দোষ ছিল কি না, তাঁহার জীবনচরিতে কেহ লেখেন নাই। দৃষ্ট বস্তুর পরিমাণ, অন্তর ও আকার সম্বন্ধে আমাদের যে প্রকার বোধ হইয়া থাকে, তিনি একটী সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সূত্রের অনুবাদ এই। "অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে, (১) বড় বস্তুর প্রতিরূপ চক্ষুতে বড় হয়, ছোট বস্তুর ছোট হয়; (২) কোন বস্তু দূরে থাকিলে প্রতিরূপ ছোট হয়, নিকটে থাকিলে বড় হয়; (৩) দূরে থাকিলে দীপ্তি কম হয়, নিকটে থাকিলে বেশী হয়।" এই সকল প্রমাজ্ঞান হইতে কিপ্রকার অপ্রমাজ্ঞান হয়, তাহাও আচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে (১) চক্ষুতে ছোট প্রতিরূপ হইলে বস্তুটী ছোট এবং বড় হইলে বস্তুটী বড় মনে হয়; (২) কোন বস্তুর প্রতিরূপ বড় হইলে তাহা নিকটে এবং ছোট হইলে দূরে মনে হয়; (৩) কোন বস্তু সপ্রভ হইলে তাহা নিকটে এবং নিষ্প্রভ হইলে দূরে মনে হয়।"*

আমি লিখিয়াছিলাম, "সুখদৃশ্য বস্তু দেখিবার সময় চক্ষুর তারা বড় হয়, সেই বস্তুই দীপ্তমান্ হইলে তারা ছোট হয়। কাজেই উভয় স্থলে চক্ষুতে একই পরিমাণের প্রতিরূপ পড়ে না।" সমালোচক বলিতেছেন, "চক্ষুর তারা ছোট বড় হইলে চক্ষুর ভিতরে খালি আলোকের তারতম্য হয় মাত্র। চক্ষুর ভিতরে Retinaয় জিনিসের প্রতিরূপ উৎপাদন বিষয়ে crystalline Lensটিই একমাত্র কারণ; চক্ষুর তারার ইহাতে কোনরূপ হাত আছে, এ কথা এই নূতন শুনিলাম।"

নূতন কথা শুনা, সমালোচকের পক্ষে নূতন হইতে পারে। আমার পক্ষে নূতন নয়, আমাকে প্রত্যহ অনেক নূতন কথা শুনিতে হয়। Retinaতে কোন বস্তুর প্রতিরূপ উৎপাদন বিষয়ে Crystalline lensটিই একমাত্র কারণ; ইহাও উহার একটী দৃষ্টান্ত বলিতে পারি। কেন না cornea, aqueous and vitreous humours নিরর্থক সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানি না। একখানি crystalline lens থাকিলে retinaতে সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিরূপ পড়িতে পারে, কিন্তু প্রতিরূপ স্পষ্ট হইবে না। এই জন্য অন্ততঃ iris রূপ একখানি diaphragm আবশ্যক। চক্ষুর তারা (pupil) অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, আলেখ্যযন্ত্রাদির diaphragm এর তুল্য কাজ করে। তাহার অভাবে প্রতিরূপ ক্লিষ্ট বা অবিস্পষ্ট (blurred) হয়। যথাযথ স্থানে কিরণ পড়ে না বলিয়া প্রতিরূপ এবম্বিধ হয়। বোধ হয়, কিরণ-প্রসারণের (irradiation) কারণও এই।

চক্ষুর তারা (pupil) দ্বারা দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহা (১) চক্ষুতে পতনশীল আলোকের পরিমাণ ব্যবস্থা করে, (২) spherical aberration হ্রাস করে। সমালোচক আমার উক্তির প্রমাণ চাহিয়াছেন। প্রমাণ, Kuhne's artificial eye লইয়া প্রত্যক্ষ পরীক্ষা, photographer's camera লইয়া পরীক্ষা। পরীক্ষা করিতে অবসর না থাকিলে কোন একখান physiology দেখিলে retinaতে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ উৎপাদন বিষয়ে iris এর কার্য্য জানিতে পারা যাইবে। তথায় দেখা যাইবে, অন্যান্য কারণ ব্যতীত (১) উজ্জ্বল বস্তু, এবং (২) নিকটস্থ বস্তু দেখিবার সময় চক্ষুর তারা ছোট হয়। অন্য পক্ষে নিষ্প্রভ বা মলিন বস্তু এবং দূরস্থ বস্তু দেখিবার সময় তারা বড় হয়। চক্ষুর তারা ছোট বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে retinaতে যেমন আলোকের তারতম্য হয়, তেমনই প্রতিরূপের পরিমাণেরও কিঞ্চিৎ হয়।

* See Huxley's *Lessons in Elementary Physiology.*

এস্থলে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমালোচক প্রভা বা দীপ্তি ছাড়িয়া দিয়া দৃষ্ট বস্তুর পরিমাণ ও অন্তর সম্বন্ধে আমাদের অপ্রমাজ্ঞানের বিচার করিয়া আমার উক্তির দোষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সমালোচক আমার অজ্ঞতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে "সাধনা" পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার সদভিপ্রায়ের জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। দুঃখের বিষয় 'সাধনা" আমার নাই, এক্ষণে সংগ্রহ করিবার অবকাশও নাই। তিনি "সাধনা" হইতে যে টুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। "আকাশের প্রান্তের চাইতে তাহার মধ্যভাগটাকে আমরা আমাদের অধিক সন্নিহিত মনে করি। এই জন্য প্রাতঃকালের সূর্য্য অপেক্ষা মধ্যাহ্নের সূর্য্যকে নিকটস্থ মনে করি," কাজেই ছোট বোধ হয়। মূল প্রশ্নের এইরূপ উত্তরে সমালোচক কি বাস্তবিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন! এখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিতেছে। আকাশের প্রান্তটা কেন দূরবর্ত্তী বোধ হয় প্রকারান্তরে ইহাই ত প্রশ্ন!

প্রশ্নটার উত্তর সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থে কি বলে, দেখা যাক। এস্থলে Empiristic এবং nativistic theoryর উল্লেখ আবশ্যক নাই।

Huxley বলেন, "The moon, or the sun, when near the horizon, appears very much larger than when it is high in the sky. When in the latter position, in fact, we have nothing to compare it with, and the small extent of the retina which its image occupies suggests small absolute size. But as it sets, we see it passing behind great trees and buildings which we know to be very large and very distant, and yet it occupies a larger space on the retina than they do. Hence the vague suggestion of its larger size."

Foster বলেন, (Text-book of Physiology, 2nd edition),—"The moon on the horizon appears larger than when at the zenith, partly because it can then be more easily compared with terrestrial objects, and partly perhaps because, from a conception we have of the heavens being flattened, we judge the moon to be farther off at the horizon than at the zenith; and being farther off, and yet subtending the same angle, must needs be judged larger."

James বলেন (Principls of Psychology), "The well-known increased *apparent size of the moon on the horizon* is a result of association and probability. It is seen through vaporous air, and looks dimmer and duskier than when it rides on high; and it is seen over fields, trees, hedges, streams, and the like, which break up the intervening space

and make us the h... better realise the latter's extent. Both th... these causes make the moon seem more d... distant from us when it is low; and as its ... visual angle grows no less, we deem ... that it must be a larger body, and we so ... perceive it."

...য়। ক্ষিতিজের নিকটে চন্দ্রের গতি সহজেই লক্ষ্য হয়,

তাঁহ... এজন্যও তাহা বড় দেখায়। শেষোক্ত ব্যাখ্যার সহিত

এবং ... টুকুও যোগ করা যাইতে পারে। ইতি

এ... থিয়া

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

...অ

---

o... "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য।"

n th...

প্রথমভ... of a ... ংরেজ-প্রভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত)। শ্রীদীনেশচন্দ্র ...ded by a... এ, প্রণীত। মূল্য তিন টাকা।

এই উ... non is te... খানি কয়েক মাস হইল আমাদের হস্তগত হইয়া... usion ci... পূর্ব্বে ইহার কোন উল্লেখ করিতে না পারায় অ... শব্দটি একে... ত আছি। আজ ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে যাইতে... এর কে নানা কারণে আমরা ইহার সমালোচনা করিতে অক্ষম। ... যেসকল প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের প্রধান... প্রধান সমুদয়গুলিও আমরা পাঠ করি নাই। ইহা একজন বাঙ্গলা মাসিক-পত্র-সম্পাদকের পক্ষে লজ্জার কথা; কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে হইলে একথা স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তদ্ভিন্ন দীনেশ বাবু যে সকল হস্তলিখিত অমুদ্রিত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাদের বিষয় ত কিছুই জানি না। সুতরাং দীনেশ বাবুর গ্রন্থ খানির পরিচয় দেওয়াই আমাদের পক্ষে শোভা পায়, সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে দীনেশ বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনি কলিকাতা "পীস্ এসোসিয়েষ্যনে"র অঙ্গীকৃত "বিদ্যাসাগরপদক" পাইবার জন্য বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং পদকটি প্রাপ্ত হন। "এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেবকৃত 'মৃগলব্ধে'র এক খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয়, এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্চয়-

শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ।

TORN PAGES.

কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, রাজরাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প মনে স্থির হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে সব প্রাচীন পুঁথি কীটগণের করাল-দংষ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কথঞ্চিৎ প্রাণরক্ষা করিতেছে সে গুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কীটকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া ব্যতীত প্রতি বৎসর কাল তাহাদিগকে বহ্নিযজ্ঞে আহুতি দিতেছেন —যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একদিন এসিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা মেম্বর হোরন্‌লি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন; এই সূত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্বারা পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার করিতে ইতিপূর্ব্বেই উদ্যোগী ছিলেন,—আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহপ্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান্ বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বরা রচিত) মহাভারত, ছুটিখাঁর (শ্রীকর নন্দীর রচিত) অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতক দিন কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, মধ্যে মধ্যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেন ডিপুটিমাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ক্যাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়াছি। এই সময় কবি আলোয়ালকৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নলদময়ন্তী প্রভৃতি গ্রন্থ আমাকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। * * * পল্লীগ্রামে হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজকরা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত, আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ়ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছি। একদিন রাত্রি ১০টার সময় ত্রিপুরা জেলার গৈলারা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথ হারাইয়া ফেলি; ভয়ানক বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকারে বিরলবসতি জঙ্গলের পথে প্রায় ৩ঘণ্টাকাল যে ভাবে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা সেই দিনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বর্ম্মণ ও আমার মনে চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে। * * * *

"এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষাও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথমভাগ অদ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহাকিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তিচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ভাষা, সামাজিক আচার, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; ছাপা পুস্তক হইতে হস্তলিখিত পুস্তকেরই অধিক আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে; ম্যাগ্নিফাইংগ্লাস্ দ্বারা দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত তাম্রকূটপত্রসমষ্টির ন্যায় পুঁথির পাঠোদ্ধার করা সুকঠিন ব্যাপার, রোগীর দেহে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় অতি সাবধানে পত্রগুলি উল্টাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। এই ছয় বৎসর নানারূপ পারিবারিক অশান্তিতে মন উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রতিদিন ধৈর্য্যসহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে, গ্রন্থকার কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি ভূমিকায় গ্রন্থখানির নানাবিধ অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদয় সত্ত্বেও ইহা অনায়াসে বলা যায় যে তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে, তিনি এরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়। এই পুস্তকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচন-শক্তি, তেমনই তাঁহার গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে প্রকারে অনেকগুলি গ্রন্থের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার ভাষার মনোহারিত্ব, রচনানৈপুণ্য ও শিল্পীর মত নানাবিষয়ের যথাস্থানে সমাবেশ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমরা পঠদ্দশায় যেরূপ আনন্দ ও আগ্রহের সহিত টেন-প্রণীত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম, দীনেশবাবুর গ্রন্থও প্রায় আদ্যোপান্ত তদ্রূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। তাঁহার পুস্তকে নানা প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানবস্তু সরস ভাবে বিবৃত হইয়াছে; প্রাচীন কবিদের কবিতার নমুনাও অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহাদের কাব্যের অনেক নায়ক নায়িকার চরিত্রও দক্ষতার সহিত উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীনবঙ্গে স্ত্রীলোকেরা কিরূপ উচ্চশিক্ষা পাইয়া গ্রন্থরচনা করিতেন, নাপিত, কামার প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেও যে পূর্ব্বে সুশিক্ষিত হইয়া গ্রন্থ লিখিতেন, তাহারও পরিচয় দীনেশবাবুর পুস্তকে পাওয়া যায়। মুসলমান রাজারা অনেকে কিরূপ বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন, তাহাও দীনেশবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুসলমান বৈষ্ণবকবিদের সম্বন্ধেও অনেক কথা আমরা তাঁহার পুস্তক হইতে জানিতে পারি।

বাঙ্গলাভাষা ত প্রাচীন বটেই, বাঙ্গলা সাহিত্যও যে প্রাচীন, তাহা দীনেশ বাবুর পুস্তক পড়িলে ভাল করিয়া জানিতে পারা যায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিলে কেবল যে আমরা সাহিত্যরসাস্বাদনসুখ ও ভাষাজ্ঞান লাভ করি, কেবল যে আমরা বঙ্গের প্রাচীন সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক অবস্থা প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হই, তাহা নয়; আমাদের স্বদেশ-প্রেম গাঢ়তা লাভ করে। টেনিসন্ লিখিয়াছেন :—

Love thou thy land, with love far-brought
From out the storied Past, and used
Within the Present, but transfused
Thro' future time by power of thought.

এই যে অতীতবর্ত্তমানভবিষ্যদ্ব্যাপী স্বদেশ-প্রেম, তাহা স্বদেশের অতীত ইতিহাস না জানিলে কেমন করিয়া সম্ভবে? বর্ত্তমানকে বুঝিতে হইলে অতীতকে জানিতে হয়; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করিতে হইলেও জাতীয় চরিত্রের, স্বদেশীয় সমাজের স্থায়ী অর্থাৎ প্রাচীন উপাদানগুলির বিষয় আলোচনা করিতে হয়। যে সকল দীর্ঘজীবী বৃক্ষ উন্নতমস্তকে আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহে, বিস্তৃত শাখাপল্লবের দ্বারা পৃথিবীর শোভাবর্দ্ধন করে এবং ফলফুলে সকল প্রাণীর তৃপ্তিসাধন করে, তাহাদের মূল মৃত্তিকার বহু নিম্নে অদৃশ্য দেশে রসাকর্ষণে নিযুক্ত থাকে। জাতীয় চরিত্রও পুষ্টিলাভার্থ অতীত গৌরবের অন্বেষণ করে, এবং ভবিষ্যতে আশাবাহু বিস্তার করে। বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। যাঁহারা "ঐতিহাসিক চিত্রের" অনুষ্ঠাতা, আশাকরি তাঁহারা অন্ততঃ মালমসলা সংগ্রহও করিতে পারিবেন। কিন্তু বাঙ্গলা প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে করিতে পারি, এবং তাহা করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনে দীনেশ বাবুর পুস্তক অজ্ঞাতদেশে পথপ্রদর্শকের ন্যায় আমাদিগকে সাহায্যদান করে।

এক্ষণে আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করিব। দীনেশবাবু ভূমিকায় অদ্ভুত রামায়ণ, দুর্গাপঞ্চরাত্রি প্রভৃতি কাব্য-প্রণেতা জগদ্রামরায়ের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যকুমার রায় স্বাক্ষরযুক্ত যে প্রবন্ধটি "দাসী"তে বাহির হইয়াছিল, উহার লেখকের প্রকৃত নাম সত্যকুমার নহে; উহা কল্পিত নাম মাত্র। প্রকৃত নাম প্রকাশ করিতে আমরা অনুমতি পাই নাই। আমরা জগদ্রামের রামায়ণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এপর্য্যন্ত কেবল লঙ্কাকাণ্ডটি পাইয়াছি। উহা জগদ্রামের নিজের রচনা নয়, তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদের। জগদ্রামপ্রণীত দুর্গাপঞ্চরাত্রি আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের নিকট আছে। তিনি উহার টীকা লিখিতেছেন।

দীনেশ বাবু মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গলা

কথার অর্থ দিয়াছেন। এগুলি সচরাচর কোন বাঙ্গলা অভিধানে পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেকগুলি হফ্‌টন্* সাহেব প্রণীত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অভিধানে পাইয়াছি। এই অভিধান খানিতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কথার ইংরাজী অর্থ দেওয়া আছে। অভিধানখানি বৃহৎ ও অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে অনেক প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা কথারও অর্থ আছে। একজন ইংরাজ ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা করিতে পারি নাই; ইহাতেই বাঙ্গালী ও ইংরাজের প্রভেদ বেশ বুঝা যায়।—দীনেশবাবু যে সকল অপ্রচলিত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোন কোনটি এখনও বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আমরা একবার "দাসী"তে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সচরাচর কথিত শব্দের অর্থসম্বলিত এক একটি তালিকা প্রস্তুত হইলে বড় ভাল হয়। তাহা হইলে অনেক তথাকথিত অপ্রচলিত শব্দ আর অপ্রচলিত বলিয়া বোধ হয় না, এবং বঙ্গসাহিত্যের শব্দদারিদ্র্যও দূর হয়। ইহাতে আরও এক লাভ এই হয় যে অনেক সময় নূতন কথার সৃষ্টি করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন চাষাভুষার কথা সাহিত্যে অধিক প্রচলিত হইলে উহা জনসাধারণের প্রেমের দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, এবং উহা বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, মর্ম্মের কথা ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা লাভ করে। যাহা হউক, এখন আমাদের জেলায় প্রচলিত বা হফ্‌টনের অভিধানে প্রাপ্ত দুই একটি শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"আউল-সিদ্ধব্যক্তি।" হফ্‌টনে "আউবল" শব্দ পাওয়া যায়, অর্থ the first, chief, best। "আওলিয়া"ও পাওয়া যায়, অর্থ chief, respectable, venerable। "আওড়ে বক্রভাবে।" বাঁকুড়া অঞ্চলে কটাক্ষকে "আড়-চোখে" বা আড়নয়নে চাওয়া বলে। আবর্ত্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত আওড় শব্দ হফ্‌টনে আছে; অর্থ a return, a whirlpool. এই অর্থের সহিত বক্রতার সম্বন্ধ আছে। "আপ্ত—আপন" ইহা হফ্‌টনে পাওয়া যায়; তাঁহার মতে উহা হিন্দী আপ্ হইতে উদ্ভূত। আপ্ত কথাটিও কতকটা আত্মীয় অর্থে বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত। আপন অর্থেও উহা ব্যবহৃত হয়—যথা আপ্তসুখ, আপ্তগর্জি, ইত্যাদি। "আসা নড়ি—হাতের লাঠি।" এই দুইটি কথা হফ্‌টনে আছে; অর্থ যথাক্রমে, a staff, a stick. "উকা—অগ্নি।" হফ্‌টনে ইহার মানে আছে, a torch, a firebrand। "কৈতর—পায়রা।" ইহা কাটোয়া অঞ্চলে প্রচলিত আছে। "ছামুর—সম্মুখের"; বাঁকুড়ায় প্রচলিত। "জীউ—জীবন"; বাঁকুড়ায় প্রচলিত। "ডাঙ্গ—কাটি"; হফ্‌টন বলেন ইহা দণ্ড হইতে উদ্ভূত; ইহাও বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত আছে; তথায় গুলিডাণ্ডা খেলাকে টিক্‌ডা'ঙ্গ বলে। "ডাঙ্গাইবার—প্রহার করিতে" বাঁকুড়ায় ডাঙ্গরাইবার এই আকারে প্রচলিত আছে। "ডাম্বাডোল—বহুজনতার শব্দ"; হফ্‌টনে "ডামাডোল, an uproar" আছে। বাঁকুড়ায় ডামাডোল কথা লণ্ডভণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়। ডাম্বাডোল হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়, অর্থ ফর্ব্‌সের হিন্দুস্থানী অভিধান মতে wandering without house or home, ruined, destitute. "বাবন—ব্রাহ্মণ;" গ্রাম্য হিন্দীতে বাভন বলে,। "বুন্দা—বৃষ্টিবিন্দু;" ইহা একটী হিন্দী কথা, বাঁকুড়ায় চলিত। "মিঠ—মিষ্ট"—হফ্‌টনে আছে। "যোগ্যবান—যোগ্য;" বাঁকুড়ায় এই অর্থে যোগ্যিমন্ত ব্যবহৃত হয়। "সানে—ইঙ্গিত;" ইহাও কিছু ভিন্ন আকারে বাঁকুড়ায় চলিত আছে। "সরুয়া—সরু;" ইহা বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত একটি প্রবাদ-বাক্যে পাওয়া যায়; যথা—"হাত লুলুলুলু, পা সরুআ, পেট গজন্দর, গাল পেরুআ।" "মাই—মাতা;" বাঁকুড়ায় প্রচলিত। "অথান্তর—চেষ্টা, শ্রম, বিপদ;" শেষোক্ত অর্থে বাঁকুড়ায় "আথান্তর" প্রচলিত। ১৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "বোধ হয় এই সহিলা ও সইলা হইতে 'সল্লা' পরামর্শ শব্দ আসিয়াছে।" সলা কথাটি হিন্দীতে বহু প্রচলিত; উহা আরবী "সলা" শব্দ মাত্র; হফ্‌টনে পাওয়া যায়। "রাকাড়ে—শব্দে;" রাকাড়া বাক্যালাপ করা বা শব্দ করা অর্থে বাঁকুড়ায় ব্যবহৃত হয়। দীনেশবাবু যেরূপ অর্থ দিয়াছেন, তাহাতে উহা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের জেলায় উহা ক্রিয়াপদরূপেই ব্যবহৃত। রা—শব্দ ধ্বনি, স্বর; কাড়া—

* Bengali and Sanskrit Dictionary, by Sir Graves Haughton : Sold by Parbury, Allen & Co, Leadenhall Street, London.

ব্যবহারার্থ বাহির করা বা নূতন কোন জিনিষ ব্যবহার করা; যেমন 'হাঁড়ি কাড়া।' রা ও কাড়ন এই দুটি শব্দ পৃথকভাবে হফ্‌টনে পাওয়া যায়। ১৪২ পৃষ্ঠায় দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে বাউটীর সহিত তিনি নামেমাত্র পরিচিত। কিন্তু উহা এখনও বঙ্গ-দেশের অনেক স্থানে পরিহিত হয়। বুলে—ভ্রমণ-করে, বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত। আউটিয়া—আলোড়ন করিয়া; বাঁকুড়ায় চলিত, যেমন দুধ আউটান; হফ্‌টনে পাওয়া যায়। ধড়ে—দেহে, সামাইল—প্রবেশ করিল, সিনান—স্নান; বাঁকুড়ায় ব্যবহৃত। এইরূপ আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত দি.তেছিঃ—জট (জঁট)—চুল, টাবা-নেবু, কাণি—ছেঁড়াবস্ত্র—(হফ্‌টনে আছে,) গড়—প্রণাম, বাট—পথ, মেড়—প্রতিমাপঞ্জর। দীনেশবাবুর উল্লিখিত অনেকগুলি প্রাকৃত শব্দ অপরিবর্ত্তিত ভাবে বাঁকুড়ায় ব্যবহৃত হয়; যথা, —দুআর, শিআল, সঞ্ঝা (সন্ধ্যা), কম্ম। কতকগুলি প্রাচীন বিভক্তি-চিহ্নও আমাদের জেলায় চলিত আছে, যেমন ঘরকে যাব; নিজের গাঁকে যা। মানিক চাঁদের গানে আছে "আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও;" এরূপ প্রয়োগ এবং "রাজায় মেরেছে" প্রভৃতি প্রয়োগও শুনা যায়।

২৪৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে সেক্সপিয়র হলিনষেড্ হইতে মিল্টন ডান্টে হইতে চুরি করিয়াছেন। "চুরি" কথাটা যে এস্থলে প্রযোজ্য নয় তাহা গ্রন্থকার পর পৃষ্ঠায় নিজেই লিখিয়াছেন; সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু মিল্টন ডান্টের গ্রন্থাবলী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা কোথাও পাঠ করি নাই। তবে, আমরা মিল্টন সম্বন্ধে সমুদয় পুস্তক পড়ি নাই। কোন্ গ্রন্থে আছে, জানিতে পারিলে খুঁজিয়া দেখিব। এইরূপ আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে গ্রন্থকার অসাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ইংরাজী নাম বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিতে হইলে যথাসম্ভব উচ্চারণটি ঠিক্ থাকা উচিত। এই পুস্তকে কোন কোন স্থলে তাহা হয় নাই। বস্তুতঃ এতদর্থে, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যেরূপ কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

"মুসলমান বিজয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ও পরে", ইত্যাদি—৬৪ পৃষ্ঠা। আমাদের বোধহয় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে কালনির্দ্দেশ ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত হওয়া প্রার্থনীয়। "আকাশের তারার ন্যায় অগণ্য মহাভারতের অংশরচক দিগের নাম এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।" ৭৭ পৃষ্ঠা। এইরূপ স্থলে অতিশয়োক্তি পরিহার করিতে পারিলেই ভাল হয়।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "যেসব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর, তাহা কীর্ত্তি-স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস পর্য্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় হইবে। এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বিদ্যোৎসাহী জয়দেবপুরাধিপতির পক্ষে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রতী হইয়াছেন, ইহা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।" উদ্ধৃত অংশটুকু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরমাসে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং আশাকরা যাইতে পারে যে এই আড়াই বৎসরে অনেকগুলি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এক খানিও হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি নিপুণ—কিন্তু প্রতিশ্রুতি-পালন-বিমুখ বাঙ্গালীর চিরন্তন গৌরব রক্ষিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

বিলাতে সন্তানশিক্ষা।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় পুত্রকন্যাদের শিক্ষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমরা এদেশে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পরিবারের মধ্যে অনেক চাকর চাকরাণী দেখিয়া মনে করি বিলাতেও বুঝি ঐরূপ। এদেশবাসী ইংরেজদের মধ্যে প্রতি বড় সংসারেই এক এক জন ইউরোপীয় গবর্ণেস (Governess) ও তার নীচে দুই তিন জন দেশীয় বেহারা ও আয়া ছেলেমেয়েদের জন্য নিযুক্ত থাকে—সুতরাং সন্তানদের পালন ও শিক্ষার প্রতি মায়েদের বড় একটা মনোযোগ দেখা যায় না।

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা দেখা যায়। সেখানে বেশি লোকজন রাখিতে অনেক টাকার দরকার, অত্যন্ত ধনীরাই সেরূপ বাবুয়ানা

করিতে সক্ষম। সেজন্য, গৃহস্থ লোকদের সংসার ও সন্তানের ভার জননীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বিলাতের গৃহিণীরাও এবিষয়ে অজ্ঞ নহেন। সুস্থ ও সবল দেহের দুগ্ধে তাঁহারা সন্তানের শরীরকে যেমন জোরাল করিয়া তুলেন, শিক্ষিত মনের উন্নতভাবে শিশুর হৃদয়কেও তদনুরূপ তেজাল করেন। আমরা এই শিশুচারা দেখিয়াই বুঝিতে পারি, ভবিষ্যৎ জীবনে ইহা কিরূপ সতেজ বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে।

শিশু একমাসের হইলেই মা তাকে কোলে বা টানা-গাড়িতে লইয়া বেড়াতে যান। প্রত্যহ সকালে এক ঘণ্টা ও বিকালে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরিষ্কার বায়ু সেবনে জননী ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ভদ্রমহিলাদের এরূপে প্রকাশ্য স্থানে বেড়াইবার উপায় নাই, কিন্তু অধিকতর দুঃখের বিষয়, তাঁহারা সন্তানদেরকেও বড় একটা বাড়ীর বাহিরে পাঠাতে ভালবাসেন না। নির্ম্মল বায়ুসেবন সুস্থ দেহ-গঠনের পক্ষে যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে না পারাই বোধ হয় তাঁহাদের এরূপ আচরণের কারণ।

এইরূপে প্রথম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চার পাঁচ বৎসর মার সঙ্গে বেড়ান ও মার কাছে শিক্ষার মধ্যেই শিশুর বাল্যজীবন ফুটিতে থাকে। আজকাল অতি অল্প-বয়স্ক শিশুদের জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই কিণ্ডরগার্টেন স্কুল খোলা হইয়াছে; এজন্য ঐরূপ ছোট ছেলেদের শিক্ষার নিমিত্ত বাড়ীতে কিণ্ডরগার্টেন করিবার সুবিধা না হ'লে পিতা মাতারা এই সময় হ'তেই সন্তানদেরকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বহুদিন পূর্ব্বে 'ভারতী' ও 'সখা'তে দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সুতরাং সে বিষয়ে এখানে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। উপযুক্ত বয়সে কার্য্যতঃ শিক্ষার (Practical education) ন্যায় শিশুজীবনকে জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মপটু করিয়া তুলিবার পক্ষে উহা একটি প্রধান সাধন। যে শিক্ষায় মনের সঙ্গে হাতেরও চালনার দরকার তাহাই মানুষের জীবনে অধিক ফলদায়ক। ইউরোপীয়েরা উহার উপকারিতা এখন উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন ও সেই অনুসারে কাজ করিতেছেন—তাই তাদের জীবনে এত দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে। আমাদের কিন্তু ওরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

পুত্রকন্যাদের সাত আট বৎসর পূর্ণ হ'লেই ইংরেজ পিতামাতারা তাহাদেরকে কিণ্ডরগার্টেন থেকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠান। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল ইংলণ্ডে অনেক আছে। সবগুলিই অতি সুশিক্ষিত হেডমাষ্টার বা হেডমিষ্ট্রেসের দ্বারা চালিত। শিক্ষকেরা অধিকাংশই অভিজ্ঞ ও উপাধিধারী। ঐ সব বোর্ডিং স্কুলে বালকবালিকারা অতি উত্তম নিয়ম ও শাসনের মধ্যে থাকে। আমাদের দেশীয় পিতামাতারা হয় ত ভাবিবেন, বিলাতের বাপমায়েরা বড় স্নেহহীন, অত অল্প-বয়স্ক সন্তানদিগকে পরের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু উহা আপাততঃ কিছু নির্ম্মম বোধ হ'লেও উহার ফল অতি উৎকৃষ্ট হয়। একটি সুচালিত বিদ্যালয়ে বালক বালিকারা যেমন সকল বিষয়ে চৌকস জ্ঞান লভিতে পারে, গৃহে পিতামাতার কাছে বা শিক্ষক রাখিলেও ওরূপ শিক্ষা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বাড়ীর শিক্ষা প্রায় পক্ষপাতী হইয়া থাকে; অতিরিক্ত স্নেহের বলে পিতামাতা অনেক সময় সন্তানদের দোষগুণ ঠিক বিচার করিতে সক্ষম হন না; সেজন্য ঘরে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা প্রায় একগুঁয়ে ও আত্মম্ভরী হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে অনেক একবয়সী ছাত্র একত্র থাকায় কর্ত্তৃপক্ষরা তাহাদের দোষগুণ ভাল করিয়া দেখিতে পান ও সেই অনুসারে শাসন করেন। আর পরের কাছে থাকায় লজ্জা বা ভয়বশতঃ বালকেরা নিজ নিজ মন্দ বৃত্তিগুলি জানিতে শিখে, ও আড়াআড়ি বশতঃ তাহাদের সৎবৃত্তি সকল আরো উৎকর্ষ লাভ করে।

১৫।১৬ বয়স পর্য্যন্ত ইংরেজ সন্তানেরা বোর্ডিং স্কুলে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে পুত্রেরা কিরূপে অধিক শিক্ষিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থার অধিকতর উন্নতি করিবে, সে বিষয়ে ইংরেজ পিতারা অত্যন্ত যত্ন লন। আজকাল পুত্রদের ন্যায় কন্যাদেরকেও উচ্চশিক্ষা দিয়া বড় কাজের যোগ্য করিবার জন্য পিতামাতার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। সন্তানদের শিক্ষার জন্য ইংরেজ অভিভাবকেরা অকাতরে ব্যয় করেন। পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হ'বেন—প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁর আয়ের চতুর্থাংশ, কখন কখন তার চেয়েও বেশি, অর্থ, সন্তানদের শিক্ষার জন্য জমাইয়া রাখেন। যাঁর মাসে ৩০০৲ টাকা আয়, তিনি প্রতিমাসে ১০০৲ টাকা সানন্দে পুত্রের স্কুলখরচ দেন। তাঁহারা মনে করেন সন্তানদের

বিদ্যার জন্য অর্থব্যয় করা জীবন-বিমাতে (Life insurance) প্রিমিয়ম (premium) দেওয়ার মত। যত অধিক অর্থব্যয় করিয়া পুত্রকে যত অধিক শিক্ষিত করা যায়, সে যোগ্য হয়ে তত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে। আমি দেখিয়াছি, অনেক গৃহস্থ পিতা বা বিধবা মাতা সংসারের অনাটন করিয়াও মাসে মাসে ৩০৲ টাকা ব্যয়ে ছেলেকে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের জন্য পড়াইয়া থাকেন। কারণ, কিছুদিন পরে ঐ ছেলে মাসে ২০০০৲। ৩০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

সন্তানদেরকে ইংরেজ পিতামাতার এইরূপ উচ্চশিক্ষিত করিবার আগ্রহবশতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক স্কুল ও কলেজ খোলা হইয়াছে। কোন গ্রাম বা নগরেই বিদ্যাচর্চ্চা ও শিক্ষার উপায়ের অভাব নাই। ঐ সকল স্কুল ও কলেজগুলির সুবন্দোবস্ত দেখিলে কোন বিদ্যাভিলাষী লোক সুখী না হয়ে থাকিতে পারেন না। সেদেশে কেহই কোন স্কুল বা কলেজ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের অপেক্ষা করে না, অধিকাংশ বিদ্যালয় কোন ধনী বা সাধারণ লোকের দ্বারা স্থাপিত। অথচ কোন বালক বা বালিকাকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার নিয়ম নাই—কেন না, তাহারা জানে ভাল দ্রব্য বিনা পয়সায় পাইলে লোকে তাহার মূল্য বুঝিতে পারে না বা আদর করে না। আমাদের দেশের প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলি হইতেই আমরা তার প্রমাণ পাইতেছি। এদেশে শিক্ষিত লোক মাত্রেই বুঝিতে পারেন ও ছাত্রেরা নিজেও স্বীকার করেন যে কলিকাতার দুই চারটি প্রাইভেট কলেজের লেক্‌চার আজকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। তথাপি, কেবল ছাত্রবেতনের তারতম্য বশতঃ লোকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের আদর ও প্রাইভেট স্কুল কলেজগুলিকে তাচ্ছল্য করিয়া থাকে। আবার বিলাতের কলেজে ওরূপ ফ্রিশিপ না থাকিলেও সেখানে সকল বিদ্যালয়েই অনেকগুলি করিয়া ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়; তাহাতে দরিদ্র-সন্তানেরা বুদ্ধিমান ও বিদ্যায় মনোযোগী হলেই অক্লেশে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারে। তাছাড়া ইংলণ্ডে সকল শিক্ষালয়েই অনেক ফণ্ড থাকাতে তাহারা ছাত্রদের বেতনের উপর নির্ভর করে না, সেজন্য ছেলেদেরকে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম ও দৃঢ় শাসনের মধ্যে রাখিতে পারে।

বিলাতের বালকেরা ৩।৪ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ২৩।২৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্কুল ও কলেজে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নহে। ছাত্রজীবন শেষ হইবার পর তাহারা নিজে নিজে যে জ্ঞান লভিতে আরম্ভ করে, সেই জ্ঞানলাভই তাহাদের যথার্থ শিক্ষা। সে দেশের লোকে কলেজের শিক্ষা ও পরীক্ষা দেওয়াকে জ্ঞানভাণ্ডারের পথদর্শকস্বরূপ ভাবে। বিদ্যালয়ের পাঠের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান উপার্জ্জিতে হয় যেন তাহাই শিক্ষা করে; পরে নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে নানা প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জিয়া মনকে ভূষিত করে। স্কুল ও কলেজের পাঠের সময় কেবল 'সহধ্যায়ীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব' এই ভাবিয়া ছাত্রেরা উৎসাহের সঙ্গে পড়ে ও বিদ্যালয়ের ধারানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু কলেজের পাঠ ও পরীক্ষা শেষ হলে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশিবার জন্য যে কৌতূহল জন্মায় তাহাই যথার্থ শিক্ষার মূল, এবং ঐ মূল অবলম্বন করিয়া ইংরেজ যুবকেরা যথাসাধ্য জ্ঞানসঞ্চয়পূর্ব্বক নিজেদের ও স্বদেশের উন্নতি করে।

আর একটি কারণে বিলাতের ছাত্রেরা ইচ্ছামত জ্ঞান উপার্জ্জিবার সুবিধা ও সাহায্য পায়। সেটি ইংলণ্ডীয় পিতার পুত্রদের প্রতি মিত্রভাব ও সৌজন্য প্রকাশ। ইংরেজ সন্তানেরা বয়স প্রাপ্ত হলে পিতামাতা তাহাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন; তাঁহারা বুঝেন যে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে মানুষের সদসৎ বিবেচনার শক্তি জন্মায়, তখন তাহারা শৈশবকালের ন্যায় সমস্ত বিষয়ে পিতামাতার মতের বা ইচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চাহে না; সেজন্য পুত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই পিতামাতা তাহাদেরকে ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিতে বলেন। যে সন্তানের যেরূপ কাজে মনোযোগ ও ইচ্ছা, পিতা তাহাকে সেইরূপ শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন; যাহার যেরূপ জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা তাহাকে সেই জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির উপায় খুঁজিয়া দেন। যাহার এঞ্জিনিয়ার হইবার ইচ্ছা, পিতা তাহাকে জোর করিয়া কখন ব্যারিষ্টার করেন না; যে ডাক্তারি করিতে চায় শীঘ্র লাভের আশায় তাকে কেরাণী বানান না; চিত্রবিদ্যায় যার অনুরাগ তাকে সওদাগর হবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না; বিজ্ঞান শিখিতে যে ছেলের আগ্রহ তাকে আফিসে দেন না।

এইরূপ যৌবনাবস্থা হতেই বালকেরা যে যার মনোমত পাঠাভ্যাস ও জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারে বলিয়া বিলাতের লোকের যেরকম দ্রুত ও স্থায়ী উন্নতি হইতেছে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও তদনুরূপ প্রশস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কেবল বিদ্যা লইয়াই সমস্ত জীবন কাটান। গ্রন্থরচনা কোন কোন ব্যক্তির জীবনের ক্রীড়াস্বরূপ; কেহ বা নূতন নূতন জ্যোতিষের আবিষ্কার করাকে একমাত্র সুখ বলিয়া গণনা করেন। নানাপ্রকার বিজ্ঞানের অনুশীলন কোন কোন লোকের চির সহচর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছেলেরা ৭।৮ বৎসর হলেই ইংরেজ পিতামাতারা তাহাদিগকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠান; ইংলণ্ডে ভদ্র সন্তানদের জন্য এরূপ পবলিক ও প্রাইভেট স্কুল অনেক আছে, তার মধ্যে 'হ্যারো' 'ইটন' ও 'রাগবি' এই তিনটি অতি পুরাতন ও অধিক প্রসিদ্ধ; এখানে ছাত্রেরা বিদ্যার সঙ্গে নানাপ্রকার বলকর খেলা ও ব্যায়াম শিক্ষা করে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, দাঁড়বহা প্রভৃতি সকল রকম ক্রীড়াতেই দক্ষ হয়। হ্যারো ও ইটন বিদ্যালয়ের মধ্যে অতিশয় আড়াআড়ি চলে; এক স্কুলের ছাত্রেরা ভাল হলে অন্যটির অপমান হবে বলিয়া দুই দলেই প্রাণপণ শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকটির ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে সমাজ করিয়া নানা বিষয় লইয়া পরস্পর তর্ক করে, এবং কি বিদ্যাশিক্ষা কি ব্যায়ামশিক্ষা সকল বিষয়েই আড়াআড়ি করিয়া সাধ্যমত উত্তমরূপে শিখে। আবার দুইটির মধ্যে অনেক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ প্রত্যেকটির আরো বেশি উন্নতি হয়। দুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট ও নৌকাদৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া হইয়া থাকে; উহাতে যে স্কুলের জয় হয়, সেইটি কোন প্রকার পুরস্কার পায়, এইজন্য উভয় পক্ষেই ছাত্রদেরকে ঐ সকল বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে অত্যন্ত যত্ন লয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালী বালকদেরকেই ইংরেজ বালকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু বঙ্গীয় বালকেরা চতুর ও বুদ্ধিমান হলেও অপরিণতত্ব বশতঃ অনেক শারীরিক ও মানসিক আমোদ হারায়। বাঙ্গালী ছাত্রেরা ১৭।১৮ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হলেই অমনি যৌবনের মধ্যভাগে আসিয়াছেন ভাবিয়া গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন এবং সকল প্রকার বলদায়ক ক্রীড়া ও শারীরিক ব্যায়ামকে বালকের যোগ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অনেকে, ঐ সকল ক্রীড়ায় মন দিলে বালকেরা লেখাপড়া শিখিতে পারে না বা দুষ্ট হইয়া যায়—এই বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের স্কুল ও কলেজগুলিতে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার বন্দোবস্ত দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হবে। আমাদের দেশে, বিশেষ বাঙ্গালায়, আমরা যে ছাত্রদেরকে ক্রীড়ায় মন দিলে বিদ্যায় অবহেলা করিতে দেখি, সে ক্রীড়ার দোষে নয়, বালকদের দুর্ব্বল প্রকৃতির দোষ। বহুকালের অনভ্যাস ও অনুৎসাহ বশতঃ বালকদের মন এতদূর নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা যদি প্রাণ ভরিয়া খেলায় মন দেয়, তাহলে পড়ার জন্য আর তাহাদের কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণেই আমাদের দেশে ক্রীড়াপ্রিয় ছাত্রদের মধ্যে এত মূর্খ বালক দেখিতে পাই।

জ্ঞানীমাত্রেই এখন বুঝিয়াছেন, মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক সুখ, অসুখ, বল ও দুর্ব্বলতার কত ঘনিষ্ট সম্পর্ক। শরীর অসুস্থ হলে মনও অসুস্থ থাকে, মানসিক কষ্ট হলে শারীরিক পীড়া জন্মায়, আর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান থাকিলে মন সতেজ ও সক্ষম থাকে। সুতরাং বলিষ্ঠ বালকেরা যে লেখাপড়ায় অধিক পারদর্শী হইবে, ও তাহাদের জ্ঞান অধিক দিন স্থায়ী হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ দেখিতে হইবে যে, মানুষের শরীর ও মন দুই আছে, একটিকে অবহেলা করিয়া অন্যটি কর্ষিলে শেষে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয়, এবং শরীরের দুর্ব্বলতার সঙ্গে ভীরুতা, তেজোহীনতা প্রভৃতি মন্দ গুণেরও আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, কয়েকজন দেশীয় যুবক অতি অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া অনেক খ্যাতি লভিয়াছিলেন; কিন্তু শরীর অবহেলাপূর্ব্বক দিনরাত কেবল মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা অল্প দিন পরেই পীড়িত হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন! ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! ইংরেজেরা এসকল বিষয় অতি উত্তম বুঝে; ইহারা বরং মানসিক শিক্ষাকে অবহেলা করিবে, তথাপি শরীরকে কদাচ অগ্রাহ্য করিবে না। বিলাতের কোন কোন স্কুলে বালকেরা অনেক সময় পাঠ পরিত্যাগ করিয়া খেলা ও ব্যায়ামে রত থাকে, এবং বিদ্যা অপেক্ষা খেলাতেই অধিক নিপুণ হয়। যদিও

অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়; কিন্তু অল্প বয়সেই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক সুখ হারান অপেক্ষা সবল শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকা অনেকাংশে শ্রেয়।

স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া ইংরেজ বালকেরা কলেজে ভর্ত্তি হয়। সে দেশেরও উচ্চ শিক্ষা সচরাচর বিশ্ববিদ্যালয়েই দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন ও ডব্লিন্—এই চারটি সকলের মধ্যে প্রধান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সকল ঐ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা ও দৃষ্টান্ত অনুসারেই স্থাপিত হইয়াছে ও উহারই অবিকল অনুকৃতি; কেবল প্রভেদ এই যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি ভারতবর্ষের অপেক্ষা অনেক কঠিন।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক প্রকার। এই দুটি অতিশয় ধনী ও পুরান; আর পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহারা কোন কোন বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা করা, উপাধি, ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ করা এবং ছাত্রদেরকে নিয়মে রাখা ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। উহাতে বহুবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে লাটিন, গ্রীক, অঙ্ক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধান। অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীর অনেক স্থানের যুবকেরা কেম্ব্রিজে অঙ্কশাস্ত্রের উপাধি লইতে যায়। সুখের বিষয় আমাদের অনেক স্বদেশীয় ভ্রাতাও ঐ উপাধি লভিয়া আসিয়াছেন। ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা পরীক্ষা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে কোন একটিতে ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইলে উপাধি লওয়া যায়। কেম্ব্রিজে সর্ব্বশুদ্ধ সতরটা কলেজ আছে, অক্সফোর্ডেও ঐরূপ; সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন বদান্য ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক কলেজের এক একটি অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাকে সচরাচর 'মাষ্টার' বলে। ইনি ও 'ফেলো' নামক কতকগুলি উপাধিধারী লোক কলেজের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। যে 'ফেলো' (Fellow) ছাত্রদের শিক্ষা ইত্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহাকে 'টিউটর' বলে। যে ফেলো ছাত্রদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করেন তাঁহাকে 'ডীন' বলে। প্রতি কলেজেই একটি ছোট গির্জ্জা আছে; সেখানে প্রতিদিন উপাসনার সময় সকল ছাত্রেরা উপস্থিত থাকে কি না খবর রাখা ডীনের কর্ম্ম। প্রত্যেক কলেজে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই ছাত্রদেরকে নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়। ঐ ছাত্রবৃত্তিগুলি মাসে ৩০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ছাত্রেরা কলেজের ভিতরে বা নগরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বাসায় থাকিতে বাধ্য হয়; তাহারা প্রতিদিন সকালে কি সন্ধ্যায় অন্ততঃ একবার গির্জ্জায় যায়। প্রত্যেক কলেজে ৯টা হতে ১২টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় কলেজের 'হলে' একদিকে কর্ত্তৃপক্ষরা ও অপরদিকে ছাত্রেরা বসিয়া ভোজন করে। রাত্রিতে কোন ছাত্রের বাহিরে যাইবার হুকুম নাই। কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের স্বভাবচরিত্র ও নীতিধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কোন ছাত্র নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিলে তাহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

বি, এ, উপাধি লইতে হইলে প্রায় তিন বৎসর কোন কলেজের ছাত্র থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কলেজের ভিতর থাকিয়া এই উপাধি লইতে মাসে প্রায় ৩০০৲ টাকা করিয়া খরচ হয়, কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বেশিও ব্যয় করে, আবার কেহ বা ইহার কমেও চালায়। বড়মানুষ ও সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তানেরাই এখানে অধিক যায়, সেজন্য তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে হলে আবশ্যকের অপেক্ষা কিছু অধিক খরচ পড়ে। যাহা হোক, এই সব কলেজস্থিত ছাত্রেরা এই তিন বৎসরে যে শিক্ষা ও উপকার পায়, ও তাহাদের যেরূপ চরিত্র গঠিত হয়, তাহা ধরিলে এ ব্যয় সার্থক বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজ পিতারা সন্তানদের শিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করেন। ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের কাছে থাকাতে ছেলেরা ভদ্রোচিত গুণ শিখিবে, বিদ্বান লোকের সংস্রবে বিদ্যোৎসাহী হবে, নির্ম্মল চরিত্রের দৃষ্টান্তে উন্নতস্বভাব হবে—এই ভাবিয়া গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত পিতামাতাও পুত্রদেরকে কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডে পাঠান। তাঁহাদের সে আশাও প্রায় বিফল হয় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী লোকেরা আদৃত হইয়া থাকেন। অক্সফোর্ডের এম্, এ, বা কেম্ব্রিজের বি, এ,—হইলেই লোকে বুঝিতে পারে যে সে লোকটি যথার্থই ভদ্র, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র।

তাছাড়া, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিলে ছাত্রেরা অনেকগুলি বিশেষ উপকার পায়। প্রত্যেক কলেজের ছাত্র এক বাড়ীতে বাস করে, একত্র আহার করে, এক লেক্চার শুনে—এইরূপে পরস্পরের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। প্রতি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ সমাজ থাকায় ছাত্রেরা একত্র মিশিবার অনেক সুবিধা ও অবসর পায়; ইহা ব্যতীত, সকলে একসঙ্গে ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া থাকে। সকলেই প্রায় এক বয়সের ও এক অবস্থার লোক, সে জন্য সহজেই তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে; এবং অনেক সময় সেই বন্ধুত্ব চিরজীবন স্থায়ী হইয়া থাকে। ছাত্রেরা ঐখানে সাংসারিক জীবনের প্রথম পরিচয় পায় এবং মানুষ ও মানুষের স্বভাব, আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে।—এইরূপে বহুযত্নে, বহুব্যয়ে ও বহুদিন নিয়ম ও শাসনের মধ্যে থাকিয়া এক একটি ইংরেজ বালক, পূর্ণবয়সে চরিত্রবান্ মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

চিত্ত-বিকাশ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কাশীধাম, দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়ে শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।* মূল্য ছয় আনা।

অনেক দিনের পর কবিবর হেমচন্দ্রের এক খানি নূতন কাব্যগ্রন্থ হাতে পাইলাম। এখানির আকার ক্ষুদ্র—২১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে।

অনেকদিন হইতে হেমবাবুর বীণা একপ্রকার নীরব ছিল। মধ্যে মধ্যে একটা আধটা তান যাহা বাহির হইত, তাহাও সে পুরাতন হেমবাবুর বলিয়া মনে হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত কবিতা দুইটি ইহার প্রমাণস্থল। সেকালে মাইকেলের মৃত্যুতেও হেমবাবু কবিতা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে কবিতার সঙ্গে উক্ত কবিতা দুইটির কত প্রভেদ! "হেমবাবুর হাত খারাপ হইয়া গিয়াছে" এই একটা সাধারণ অভিযোগে তিনি অনেক দিন হইতে অভিযুক্ত রহিয়াছেন। আমরা ত হেমবাবুকে খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু 'চিত্তবিকাশ' পাঠ করিয়া হেমবাবুর সম্বন্ধে আবার আমাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। বুঝি তাঁহার বীণা আবার সেকালের সুরে ঝঙ্কার দিবার আয়োজন করিতেছে।

হেমবাবু পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—

"শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্ম-কল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ করিলাম।"

সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই শুনিয়াছেন যে হেমবাবুর দুইটি চক্ষুই নষ্ট হইয়াছে। কথাটা খুব ঠিক নহে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে, হেমবাবুর দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িতে আরম্ভ হয়। বাম চক্ষুটিতেই কিছু বেশী পড়িতে থাকে। ক্রমে দৃষ্টি এত ক্ষীণ হইয়া পড়িল যে উচ্চতম শক্তির চশমার সাহায্যেও আর লেখাপড়ার কাজ চলিল না। চিকিৎসকেরা চক্ষুতে অস্ত্রচিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে গতবৎসর পৌষ মাসে কলিকাতার এক সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় চক্ষুচিকিৎসক হেমবাবুর বামচক্ষুতে অস্ত্র করিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। কোথায় চক্ষুটি ভাল হইবে, না একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। ইহার পর চৈত্রমাসে হেমবাবু কাশী চলিয়া যান। সেই অবধি তিনি সেই খানেই অবস্থিতি করিতেছেন; মধ্যে একবার মাস খানেকের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন মাত্র। এখন তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটিতে খুব ছানি পড়িয়া আছে; পুস্তকাদি অত্যন্ত নিকটে ধরিলে দেখিতে পান। এই চক্ষুটিতে অস্ত্র করাইলে হয়ত ভালও হইতে পারে, কিন্তু পাছে এটিও বামচক্ষুর মত নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে হেমবাবু সাহস করিয়া, দ্বিতীয়বার অস্ত্রচিকিৎসায় সম্মত হইতে পারিতেছেন না। তিনি নৈরাশ্য ও আশঙ্কা বশতঃই নিজেকে অন্ধ বলিতেছেন; কিন্তু তাই বলিয়া "[illegible]

* এই পুস্তক কলিকাতায় ৫৫নং কলেজষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

সংবাদ প্রচার করা সম্বাদপত্র-সম্পাদকগণের উচিত হয় নাই।

চিত্তবিকাশের প্রথম কবিতার নাম—"হের ঐ তরুটির কি দশা এখন।" এই জীর্ণ তরুটিকে দেখিয়া কবি নিজের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন ঃ—

দেখিয়া তরুরে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার (ও) আগে সবই তোর সম,
শাখা শাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।
হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্ত উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়েছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়।
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়।

"স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়!" এসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু বড় সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। মা বঙ্গভাষা! যে আজীবন তোমার এত সেবা করিল, তোমায় এত করিয়া সাজাইল, আজ তাহার স্বজন আশ্রিতগণ কাঁদিয়া বেড়ায়!—আমরা আর কি বলিব? যদি বলি—"ভাই বাঙ্গালী, তোমরা প্রত্যেকে হেমবাবুর কাব্যগুলি ক্রয় করিয়া গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা কর"—তাহা হইলে কথাটা নিতান্তই দোকানদারী গোছের শুনায়। এরূপ অনুরোধের মূল্য অতি সামান্য। রামা, শ্যামা, নিধের পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া সম্পাদকগণ ত প্রায়ই বাঙ্গালী জাতিকে এরূপ অনুরোধ করিয়া থাকেন। বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, আমাদের এত সাধের বঙ্গভাষা তাঁহার সেবকগণের চক্ষে শুধু সরস্বতীবেশে নহে, লক্ষ্মী-মূর্ত্তিতেও বিরাজ করেন। এ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের চেতনা সম্পাদন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটি কি হেমবাবুর চিত্তবিকাশ ও বিদ্যালয় সংস্করণের কবিতাবলীকে বাঙ্গালা স্কুল সমূহের পাঠ্য করিয়া দিয়া বাঙ্গালীজাতির ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের মুখরক্ষা করিতে পারেন না? আমরা সভ্যসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাইব? যাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ের একজন অসাধারণ, সর্ব্বজনপ্রিয় কবি বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, তাঁহার ওকা-ইত্যাদির পর্য্যবেক্ষণ বন্ধ হইল, আর অমনি তাঁহার স্বজন আশ্রিতগণ কাঁদিয়া বেড়ায়! সুদূর ভবিষ্যতে যদি কখনও বাঙ্গালীর উন্নতি হয়, তবে আমাদের বংশধরেরা এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিয়া, আমাদিগকে কি ঘৃণার চক্ষেই না দেখিবে। আমাদের বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া লজ্জায় তাহারা মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে।

চিত্ত-বিকাশের দ্বিতীয় কবিতা "বিভু কি দশা হবে আমার?"—পড়িলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই,—নিম্নে একটু একটু নমুনা দিলাম ঃ—

বিভু, কি দশা হবে আমার?

একটী কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ করে' রাখিলে অবনী, পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন!
আমার সম্বল মাত্র ছিল হস্তপদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে!

* * * *

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষু নিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর প্রতিপাল্য দীন
করে' ভবে বাঁধিয়া রাখিলে!
জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভাভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি!

* * * *

প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে উষেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে।
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে।

* * * *

নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না।

অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কবিতাটির উপসংহারে হেম বাবু বিভুপদে প্রার্থনা করিতেছেন ঃ—

জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার।

ইহা পাঠ করিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। আর যে হয় বলুক, হেম বাবুর মুখে ত এ কথা শোভা পায় না। তিনি যে আশার কবি, উৎসাহের কবি; "বিশ্ব পুরে যার শুনে আশা গান" তাঁহার মুখে এ কথা কেন?

ইহার পরবর্ত্তী কবিতাটিতেই কবি এই মানসিক ব্যাধির ঔষধ পাইয়াছেন। কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন ঃ—

এস ভগবান কর ধৈর্য্য দান
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।

* * * *

দুর্দ্দিনের দিনে যেই বলীয়ান
সহিতে বিধির কঠোর বিধান,
নমেনা টলেনা নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তাহারি জীবন ধন্য।

এইবার আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিল। কবি কল্পনার চক্ষে পৃথিবীকে সুন্দরী দেখিতেছেন।

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিভুগানে মাতোয়ারা জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

এই কবিতাটির একস্থানে হেমবাবু গীতোক্ত ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনার সুন্দর অনুকরণ করিয়াছেন। ইহার পরই তিনি ভগবানের "ভুবনমোহন রূপ" বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

ভুবনমোহনরূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার।
যখন বসন্তকালে নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
বীর সমীরণে খেলে তটিনীর পুলিনে,
নিদাঘে জোছনা নিশি হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারাহার গগনে
পুনঃ যবে বরষায় বেগে স্রোতধারা ধায়,
কুতূহলী বনস্থলী শিখি নাচে বিপিনে,
যখন সুধার আশে শরৎ চন্দ্রমা পাশে,
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে,
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে।
জয় জগদীশ জয় বলরে বদনে।

"কৌমুদী," "স্মৃতিসুখ," "খদ্যোত"—এ তিনটিও বেশ লাগিল;—তবে এমন কিছু বিশেষত্ব নাই। "আলোক" এইটি দেখিবার জিনিষ। কবির চক্ষে এখন "চির অস্তমিত দিনমণি"—এ অবস্থায় তিনি আলোক সম্বন্ধে কি লেখেন জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। বিরহেই ত ভালবাসার বিকাশ বল, পরিপাক বল, যাহা কিছু সবই। প্রথম যখন বিশ্বলোকে আলোকের আবির্ভাব হইল, তখন কিরূপ হইল, হেমবাবু তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। এস্থলে তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন, ইংরাজি কিম্বা সংস্কৃত কোনও সৃষ্টি-কল্পনার সঙ্গে তাহা মিলে না। বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করিবার পর জীবসৃষ্টি করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টিকল্পনা অত্যন্ত জটিল। বঙ্গকবি কল্পনা করিতেছেন, সৃষ্টির আর যাহা কিছু সমস্ত শেষ হইলে, পরে আলোকের সৃজন। কল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে। জীবগণ জন্মাবধি কেহ পরস্পরকে দেখে নাই, প্রকৃতিকেও দেখে নাই, শব্দে শুনিয়াছে, স্পর্শে অনুভব করিয়াছে মাত্র। তাহাদের যে দৃষ্টিশক্তি বলিয়া একটা শক্তি আছে, তাহাও তাহারা জানিত না। এমন অবস্থায় শুভক্ষণে বিশ্বপতি অন্ধকারের যবনিকা সহসা উত্তোলিত করিলেন। কি বিস্ময়, কি সুখ, কি আনন্দের তরঙ্গ জীব জগৎকে আকুল করিয়া দিল!

জগৎ হইল আলোকময়,
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়।
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন নন্দন কানন।
তরু লতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল।
পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর।
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বনফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন
সুন্দর স্বর্গীয় মানব বদন,
হেরি সে বদন পশু পক্ষী যত
নিজ নিজ শির করিল নত।

কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়, আলোক-সৃজনের পূর্ব্বে যেমন জীবগণ দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে কিছুই জানিত না, সেইরূপ হয়ত এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদের ভিতরে

আর একটি ইন্দ্রিয় আছে, তাহার বিষয় আমরা কিছুই জানি না। শুনিতে পাই ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম যবনিকা আছে। আলোক আসিয়া যেমন দর্শনেন্দ্রিয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল, সেইরূপ আর একটা কিছু আসিয়া যদি আমাদের এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেয়, আর তাহার বলে যদি আমরা ইহ-পরলোকের অন্তরাল-যবনিকা ভেদ করিতে পারি!

"জন্মভূমি" ও "কি সুখের দিন" কবির আত্মকথায় পরিপূর্ণ। অনেক দিনের পর কবি স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়াছেন। সে স্থানের সঙ্গে কত না বাল্যস্মৃতি বিজড়িত। সেই পবিত্র চণ্ডীমণ্ডপ—সেখানে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হইত। মণ্ডপের সম্মুখে আটচালা—যাত্রা হইত, গান হইত। তাহার নীচেই উঠান। চারিধারে প্রাচীরের বেষ্টন—কোথাও বা ইঁটের গাঁথুনি, আবার কোথাও বা মাটীর। তাহার পাশে বোধনের বৃদ্ধ বেলগাছটি আজিও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই শৈশব ও কৈশোরের সব কথা মনে পড়িল। সেই ছুটাছুটি, মারামারি, ঝগড়া ও ভাব, কথোপকথন, হাস্যপরিহাস, গীতবাদ্য, যাত্রা, পাঁচালী, রামায়ণ শোনা। আর কি মনে পড়িল? মনে পড়িল মার সেই মুখ খানি। মা ত এখন নাই, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।

কত দিন(ই) হায় সে মায়ের মুখ
হেরি নাই চখে—দিয়া চিরদুঃখ
কাল দেছে মুছে সে আনন্দ ছবি।
কত সুখ কথা হইল স্মরণ
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন
অন্ধকারে যেন উদিল রবি।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, হেমবাবুর জননীর নাম দেবী আনন্দময়ী। নামটি কবিজননীর উপযুক্ত বটে।

শেষ কবিতাটির নাম "কবিতা সুন্দরী"। মূর্ত্তিমতী কবিতাদেবীর বর্ণনা ঃ—

অশোকের তলে, যেন শশী জ্বলে,
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী করে গণ্ড রাখি
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।

হেমবাবু কবিতাসুন্দরীকে অশোকতরুতলে কল্পনা করিয়াছেন। কাব্যসাহিত্যে অশোকতরুর একটু প্রাচীন সম্মান আছে। কবিতার মহীয়সী কন্যা সীতাদেবীকে অনেক দিন হইতে আমরা মানস চক্ষে অশোকের তলে দেখিয়া আসিতেছি। উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করিয়াই আমার মনে ত অবনতমুখী, অশ্রুনয়না জনকনন্দিনীর ছবি উদিত হইয়াছিল। হেমবাবু কবিতা সুন্দরীকেও সেইখানে আনিয়া বসাইয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে।—ইহার পর কবিতা সুন্দরীর একটু বর্ণনা আছে। "সুনিবিড় কেশ" তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া "ছড়ায়ে পড়েছে এলা"। নবতৃণদলের কোমল আসনে তিনি পা দুখানি মেলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে কত না শোভা কত না সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। এই বর্ণনা সংস্কৃত-সাহিত্যের শান্তরসসিক্ত তপোবনবর্ণনাগুলি স্মরণপথে আনয়ন করে। "আবৃত রঞ্জিত লোমে" মনোহরতনু কত বনচর নির্ভয়ে সুখে দূরে ও সন্নিধানে অবিরত ভ্রমণ করিতেছে। হরিণীসুন্দরী আপনার শিশুটি লইয়া নৃত্য করিতেছে। করিণী পদ্মের মৃণাল তুলিয়া শাবক মুখে দিতেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে স্থানে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভাও অতি মনোহর ঃ—

সেথা পরকাশে প্রমত্ত উল্লাসে
কবিপ্রিয় ঋতুচয়,—
বসন্ত, বরষা, সরস সুরসা
শরৎ সৌন্দর্য্যময়।
নিকটে উদ্যান অতি রম্যস্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে;
সুগন্ধে মোদিত সদা সুশোভিত
নানা জাতি তরু ফুলে।
ফুল রেণু গায় সদা ভ্রমে তায়
মন্দ মন্দ সমীরণ।
আকাশে সৌরভ, মাটীতে সৌরভ.
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।
সুষমা সুঘ্রাণ ভরিয়া উদ্যান,
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে দেব উদ্যানে মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোলকলা শশাঙ্ক উজ্জ্বলা,
চির জ্যোৎস্না ফুটে রয়।

সেখানে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, শেক্সপীয়র প্রভৃতি কবিগণ "সুধা কণ্ঠস্বরে" সেই দেবীর অর্চ্চনায় নিরত। আমাদের কবি আক্ষেপ করিতেছেন, এই কবিতা দেবীর সাধনা ও আরাধনাকে জীবনের ব্রত করিতে তাঁহারও অভিলাষ ছিল, কিন্তু হায় তাহা হইতে পায় নাই।

ভুল নিজ ভ্রমে বৃথা পরিশ্রমে
জীবন ফুরায়ে এল।
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দুকূল ভাসিয়া গেল।

তাই কবিতাকে সম্বোধন করিয়া হেম বাবু বলিতেছেন, হে দেবি, এখন সাধ করিয়া নহে, বিপদে পড়িয়া আবার তোমার শরণাগত হইলাম, দাসে দয়া করিও, ভক্ত বলিয়া মনে রাখিও। তুমি যেন মায়ের মায়া ভুলিও না। তোমাকে যে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, পদছায়া দিয়া সাধ পূর্ণ কর।—এই প্রার্থনায় কাব্যখানির উপসংহার।

চিত্রবিকাশের অনেক কবিতার বর্ণনা সংক্ষেপে দিলাম। কাব্যরসগ্রাহী জননাধারণ পুস্তক হইতে স্বেচ্ছামত ইহার রসাস্বাদ করিবেন। ঈশ্বর, কবিবরের শরীর ও মনকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিক্লেশ হইতে মুক্ত করুন, হেমবাবু এখনও বহু—বহুদিন আমাদের বঙ্গসাহিত্যসভা উজ্জ্বল করিয়া থাকুন; এই প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি। ইতি মাঘ সংক্রান্তি, ১৩০৫।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পুস্তকপ্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

মনোহর পাঠ, এবং প্রসঙ্গমালা।—শ্রীহরনাথ বসু। প্রণীত। এই দুইখানিই বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক। উভয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ—বিষয় নির্ব্বাচন উৎকৃষ্ট এবং চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। লিখিত বিষয়গুলি বালক বালিকাগণের চিত্তাকর্ষণ করিবে এবং তাহাদের পক্ষে উপদেশপ্রদ হইবে।

ভূমিকম্প—প্রকাশক শ্রীসারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী। ইহা গতবৎসরের ভূমিকম্পের ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। পুস্তকখানির প্রারম্ভে ইহার দীর্ঘ সমালোচনা দেওয়া আছে।

বাঙ্গালী বৈশ্য।—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সঙ্কলিত। লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক অহিন্দু জাতি ব্রাহ্মণেতর বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন ঃ—বাঙ্গলার বৈশ্যগণকে এক্ষণে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, ইহা তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার ফল। অপরাপর জাতি শাস্ত্রালোচনা করিলে উচ্চ হইতে পারেন।" যাঁহারা এক্ষণে "শূদ্র নামে ঘৃণিত" তাঁহাদের পক্ষে "উচ্চ" বর্ণে প্রবেশ লাভের চেষ্টা মন্দ নহে। এই চেষ্টার আর একটী দৃষ্টান্ত—

যোগীকুলদীপিকা।—শ্রীরামচন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। বর্ত্তমানে যাঁহারা যুগী নামে পরিচিত, তাঁহারা যে অন্ত্যজ শূদ্র নহেন, পরন্তু সৎকুলোদ্ভব, এই গ্রন্থের ইহাই প্রতিপাদ্য। যোগী বা নাথবংশের "ইতিহাস" ও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

শুশ্রূষা প্রথমভাগ।—শ্যামাচরণ দে প্রণীত। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহে থাকা উচিত। ইহাতে গৃহশয্যা, রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য, শুশ্রূষা করিবার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্য, পরিচর্য্যা, ঔষধবিধান, আহার, সেক, পুল্টিস, অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত, অস্ত্রপ্রয়োগের পর কর্ত্তব্য, ক্ষত শুশ্রূষা, দুর্ঘটনা, পথ্যাপথ্য নির্ণয়, পথ্য প্রস্তুত প্রণালী, খাদ্য নির্ব্বাচন, রোগ বিশেষে ব্যবস্থা, মুষ্টিযোগ এবং অন্যান্য বহুবিধ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ একখানি পুস্তকের বড় অভাব ছিল। শ্যামাচরণ বাবু এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কারণ, অনেক সময় ভাল ডাক্তারের চিকিৎসাও উপযুক্ত শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার অভাবে ফলপ্রদ হয় না।

কানন।—(প্রথম ভাগ) শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামে "গরীব ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা এখনও চলিতেছে। উহা দ্বারা অনেক বিপন্ন লোক উপকৃত হইতেছে ও হইয়াছে। "কানন" উহারই সাহায্যার্থ প্রকাশিত। সহৃদয় গ্রন্থকার মহাশয় উহার অন্যতর সম্পাদক। গ্রন্থখানিতে লেখক মহাশয়ের লিপিনৈপুণ্য ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির মূল্য সসর্থ পক্ষে ।৹ আনা; অসমর্থ পক্ষে ।/০ আনা মাত্র। এই পুস্তক ক্রয় করিলে যে পুণ্য হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক চিত্র। ত্রৈমাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "ঐতিহাসিক চিত্রের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ ডাকমাশুল ।০ আনা, প্রতি সংখ্যা ১।০ মাত্র।" ইহা রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সূচনা" লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের কারণ "সূচনা" লেখকের ভাষায়ই বলি,—"পরের রচিত ইতিহাস নির্ব্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধজলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।" "এই পত্রে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্ত্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে ঐতিহাসিক চিত্র দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না,—সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি ঐতিহাসিক চিত্রের মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।" "আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুকার্য্যে পরিণত হইয়া এদেশে বহু মূল্যে বিক্রীত হয়;—তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত। যখন দেশের কোন মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন, তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি। ভারত ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে

কত নূতন নূতন বাহিং হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু কি বাণিজ্যে কি সাহিত্যে—ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোন কাজেই লাগিবে না? ঐতিহাসিক চিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী স্বদেশী কারখানা স্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশী যোগাড় হয় নাই, ইহার কলবলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য, যে মহা অভাব মোচনের আশা করা যায়, তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্ম্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভব নহে।"

প্রত্যেক স্বদেশপ্রিয় বাঙ্গালীর এই পত্রের গ্রাহক ও পাঠক হওয়া উচিত। আমরা আশা করি এই পত্রের দ্বারা আমাদের অনেক জাতীয় কলঙ্ক অপনীত হইবে, এবং অনেক কলঙ্ক স্পষ্টতর হইবে। কারণ ইহার লেখকগণ নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেম অপেক্ষা সত্যপ্রিয়তার অধিক আদর করিবেন। ইহা হইতে আমরা আমাদের অধঃপতনের কারণ বুঝিতে পারিব, এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির উপায় নির্দ্দেশেও সমর্থ হইব।

ইহার বর্ত্তমান সংখ্যায় "সূচনা" ও "সম্পাদকের নিবেদন" ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে:—ইণ্ডিকা—শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী লিখিত; রিয়াজ্-উস্-সালাতিন (উপক্রমণিকা); মল্লভূমি—শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস লিখিত; নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন—শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী লিখিত; ঐতিহাসিক কবিতা সংগ্রহ: জগৎশেঠ—শ্রীনিখিলনাথ রায় লিখিত; চাঁদকবির বীরগাথা; আক্‌বর সাহ—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত; পৌরাণিকী—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিত। আগামী সংখ্যায় আমরা এই পত্রের একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিব।

সৎকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর বর প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। ইহা একখানি নীতি গ্রন্থ; বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে বালকদিগের নিমিত্ত লিখিত। বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—"আমরা স্বয়ং ধর্ম্মবিশেষের অতি অধম অনুবর্ত্তী হইলেও সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণই আমাদের প্রণম্য; এবং মনে মনে তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিয়াই সৎকথা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।" এই কথাগুলিতে গ্রন্থকারের যে ভক্তিপ্রবণতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার গুণে তাঁহার গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের বালকগণের পাঠ্য হইয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল এবং সুপাঠ্য; বিবৃত বিষয় ও আখ্যায়িকা গুলিও উপদেশপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহার ছাপাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

১। হিতকথা—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত। মূল্য ৵৹ আনা। ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমন্বয়ভাষ্য। [সংস্কৃতের অনুবাদ] প্রথম খণ্ড। নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত। প্রতিখণ্ড মূল্য ৵৹ আনা। ৩। সুর-সঙ্গীত। মূল্য ১৲ টাকা। ৪। সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-বিচার—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ প্রণীত; মূল্য ১৲ টাকা। ৫। স্মৃতি-বিদ্যা বা স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায়। মূল্য ১৷৹ আনা। ৬। ছায়াপথ—শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত প্রণীত; মূল্য কাপড়ের বাঁধাই ৷৵৹, কাগজের মলাট ৷৹। ৭। চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত ৷৹ আনা। হাসি ও অশ্রু—শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত; মূল্য ১৲ টাকা। ১০। বিনোদমালা গীতিকাব্য—শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত; মূল্য ১৲ টাকা। ১১। জীবন গীতা—শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত মূল্য ৷৹ আনা। ১২। বন ফুল-হার-গীতিকাব্য—শ্রীমতী তরঙ্গিনীদাসী প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা। ১৩। বসন্ত (গার্হস্থ্য উপন্যাস)। তত্ত্বকুসুম, "দেবী না মানবী," "প্রভা," "দিবাকর," প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীশ্যামলাল মজুমদার প্রণীত। ১৪। নলিনী-গাথা—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, এম্. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৫। হরিদাসী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।/৹। ১৬। সিদ্ধান্ত দর্পণঃ। মহামহোপাধ্যায় সামন্ত শ্রীমচ্চন্দ্রশেখর সিংহের বিরচিতঃ। মূল্যম্ মুদ্রাত্রয়ম্। ১৭। সুনীতিশিক্ষা। ডাক্তার শ্রীরসরাজ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা।

—০—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আপাততঃ গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সমালোচনার্থ পুস্তক পাঠাইবেন না। প্রদীপের সম্পাদকের পুস্তক সমালোচনা করিবার অবকাশ নাই।

"পুলিশের বাহাদুরী।"

"প্রদীপে"র গতসংখ্যায় প্রকাশিত "পুলিশের বাহাদুরী" শীর্ষক গল্পটি সম্বন্ধে লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন;—"প্রদীপে আমার যে গল্পটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্লটের মূল অংশটা একটা ইংরাজী গল্প হইতে গৃহীত; কিন্তু সেই অস্থিটুকুর উপর সম্পূর্ণ দেশী মাংস লাগাইয়া তাহাকে এমন আলাদাভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, যে সেই অস্থিটুকুর উৎপত্তি কোথায়, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়দেয় কৌতূহল নিবারণ আবশ্যক জ্ঞান করি নাই। যাহা হউক যখন প্রদীপের অনুরক্ত পাঠক এবং আপনার বন্ধুগণ এজন্য প্রদীপকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তখন প্রদীপের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অপরাধী মনে করিলে এজন্য প্রদীপের পাঠকমণ্ডলীর নিকট আমার হইয়া ত্রুটী স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু আশা করি সেই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে, এই অকিঞ্চিৎকর গল্পে মৌলিকত্ব এবং প্রতিভা প্রদর্শনের গৌরব লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় যে আমি কোথা হইতে ইহার প্লট গ্রহণ করিয়াছি, ফুটনোটে তাহা ব্যক্ত করি নাই, তাহা আবশ্যক বোধ করি নাই বলিয়াই এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম; অবশ্য এ নহে, কথায় যদি তাঁহারা সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা আমার পক্ষে দুরূহ। দেখিতেছি, একজন যাহা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করে, অন্যের নিকট শুধু তাহা আবশ্যক নহে, সেজন্য কৈফিয়ৎ দেওয়াও দরকার। যাহা হউক ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থায় গল্পের সঙ্গেই কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইব, আপনি সেজন্য আশঙ্কা করিবেন না। ইতি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯। একান্ত বিনীত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

৮

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।

দ্বিতীয় ভাগ। চৈত্র, ১৩০৫। চতুর্থ সংখ্যা।

ফলিত জ্যোতিষ।

পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল সময়ে প্রীতিকর হয় না; অথচ পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিব কি না, এই একটা পুরাতন কথা। উভয় পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা বহুকাল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, আর নূতন কিছু বলিবার আছে তাহা বোধ হয় না। অথচ এক পক্ষ অকস্মাৎ এরূপ বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন, যে তখন তাড়াতাড়ি পুরাতন মরীচাধরা অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া কোনরূপে শাণ দিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইল না, অথচ আমার বোধ হয়, এক কথায় ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। একটা উত্তর দিলেই যেন গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে।

উত্তরটা এই। মহাশয় ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন? অবশ্য মহাশয় যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে আপনার তৃপ্তি হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রমাণগুলি আমার নিকট উপস্থিত করুন; আমার তৃপ্তি হয় তাহা বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনার সংগৃহীত প্রমাণে যদি আমার তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্য আমাকে নির্ব্বোধ বা ভাগ্যহীন মনে করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া গালি দিবেন না। কেন না এই শেষোক্ত অধিকারে আপনিও যেমন বঞ্চিত নহেন, আমিও তেমনি বঞ্চিত নহি। পীনাল কোডের এ বিষয়ে কোনরূপ পক্ষপাত নাই।

এ কালে যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা ভয়ানক দুর্নাম আছে, যে তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না; এবং মাঝে মাঝে তাঁহারা এ জন্য যথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক্ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে মুখে না হউক মনে মনে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের কারণ ঘটিত না, কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা গালি দিবার সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ আনয়ন করিবার সময় তাঁহাদিগকে একবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়।

এবং যখনি তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায়, তখনি তাঁহারা কতিপয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের বদলে ন্যায়শাস্ত্রের একটা লাইব্রেরী অধ্যয়ন করিয়া শোনাইতে প্রবৃত্ত হন।

তাঁহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্দ্র খাঁয়ের [illegible] জন্মকালে বুধগ্রহ যখন কর্কট রাশিতে প্রবেশ কা[illegible] তখন ঐ পুত্র ভাবী কালে ফিলিপাইন পুঞ্জের রাজা হইবেন

তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ইহা অসম্ভব কিরূপে? বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইবামাত্র পাখীসব রব করিতে থাকে, কাননে কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমরা বৎসর বৎসর দেখিয়া আসিতেছি সূর্য্যদেব বিষুব সংক্রমণ করিবামাত্র দিন রাত্রি অমনি সমান হইয়া যায়, তখন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে সাইবীরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে ইহাতে বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠে ইহা যখন কালিদাস হইতে কেলবিন পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তখন সেই চন্দ্র বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন না ঘটিবে? একটা যদি সম্ভব হয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল; বিশেষতঃ মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন জিনিষ কত আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত!

বাস্তবিকই স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কত বিষয় আছে, যাহা মানবের পক্ষে স্বপ্নাতীত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভক্তগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়। স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে কেন, এই মর্ত্ত্যেই দেখ, প্রীষ্টলি ক্যাবেণ্ডিস লাবোয়াশিয়ারের সময় হইতে একশত বৎসর কাল আমরা রসায়ন গ্রন্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদের বায়ুমণ্ডলে গোটা পাঁচেকের বেশী বায়ু নাই; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই চিরপরিচিত বায়ুমণ্ডলে অচিন্তিতপূর্ব্ব, অননুভবনীয় ছত্রিশ গণ্ডা নূতন বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইতে চলিল, এবং পৃথিবীর যাবতীয় রসায়ন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ আপ-টু-ডেট্ রাখা কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিল; পাঁচ বৎসর আগে ইহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত মনুষ্যের বীভৎস অস্থি কঙ্কালকে মোলায়েম সুদৃশ্য ত্বকের আবরণের ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়া পেলী ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট দূরদর্শিতা ও সাধুতার জন্য কত বাহবা পাইয়া আসিতেছিলেন; সহসা রন্তগেন সাহেব কোথা হইতে নূতন আলোকের আবিষ্কার করিয়া সেই ভীষণ বৈরাগ্যোৎপাদক কঙ্কালকে চক্ষুর্গোচর করিয়া দিবেন, তাহাই বা কে জানিত?

সুতরাং এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই সকল সংবাদ যখন অদ্যাপি জ্ঞানগোচর হইল না, নিত্য নূতন ঘটনা ঘটিয়া মনুষ্যের বিজ্ঞানশাস্ত্রকে এক একটা প্রবল ধাক্কা দিয়া বৈজ্ঞানিককে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত বড় সংসারটায় কি হয় কি না হয় তাহার সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বলে ঐ সূর্য্যটার আয়তন বারলক্ষ পৃথিবীর সমান, ঐ নক্ষত্রটা হইতে আলোক আসিতে বার বৎসর পোনের দিন অতিবাহিত হয়, সেই আলোক আবার এক সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশবেগে চলে ইত্যাদি। এখন এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব, ওটা অসম্ভব, এরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে।

অহো সকলি যথার্থ; তথাপি দুরাত্মা বৈজ্ঞানিক আপনার জেদ ছাড়িবে না। সে বলিবে সবই যথার্থ—সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই। উল্কাবর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্লব, যোগবলে মৃত্যুজয় ও মন্ত্রবলে পিশাচবশীকরণ কিছুই অসম্ভব নহে। অমুক ঘটনাটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিকূল, অমুক ঘটনা গতির নিয়মের প্রতিকূল ইত্যাদি বলিয়া অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে বসা ঠিক নহে। এমন কি ব্যক্তিবিশেষের আজ্ঞায় সূর্য্যদেব কিয়ৎক্ষণের জন্য আকাশমণ্ডলে স্থির ছিলেন, এবং ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ভক্তগণকে দেখা দিয়াছিলেন, ইহাও কোন ক্রমে অসম্ভব নহে। আমার বোধ হয় না, এ কালের কোন বৈজ্ঞানিকের এরূপ দুঃসাহস আছে যে তিনি যুক্তিবলে ঐ সকল ঘটনার অসম্ভাব্যত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন।

বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক বিশ্বাস সচরাচর আরোপিত হয় যাহা তাঁহার আদৌ নাই। লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যভিচারিতায় নিতান্ত বিশ্বাসী; প্রাকৃতিক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। এ পর্য্যন্ত আমি একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখিলাম না, যাহাতে লেখা আ[illegible] [কাঁ]ঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথ[illegible] পৃথিবীকে চতুঃপার্শ্বে ঘুরাইতে বাধ্য। বস্তুতঃ প্রকৃ[illegible] কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ পর্য্যন্ত কাঁঠাল [illegible]

হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই, সেই জন্য পদার্থবিদ্যাবিদেরা বলেন, কাঁঠাল ফলের ঐরূপ স্বভাব, সে ভূমিতেই পড়ে, আকাশে উঠেনা, এতকাল তাহাই করিতেছে, সম্ভবতঃ কাল পরশু তাহাই করিবে। কিন্তু কাল হইতে যদি কাঁঠাল ফল আর ভূমিতে পতন অন্যায় ভাবিয়া আকাশে আরোহণই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন, সমগ্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিতান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে আপন আপন গ্রন্থের মধ্যে ও বক্তৃতার মধ্যে লিখিতে ও বলিতে থাকিবেন, কাঁঠাল ফলের স্বভাবটা অমুক দিন হইতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এতকাল সে ভূমিতে পড়িত, এখন আকাশে উঠে। এবং কাঁঠালের দেখাদেখি অন্য সকলেই যদি সেই পন্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ সংস্করণে দেখা যাইবে পৃথিবী আর সকল জিনিষকে আকর্ষণ করে না, কোন কোন জিনিষকে বিকর্ষণ করে। প্রকৃতির নিয়মটা বদলাইয়া গেল, কেন বদলাইল তাহা প্রকৃতি দেবীই বলিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্য মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন নাই, এবং প্রকৃতিকে কৈফিয়ত চাহাও নিষ্ফল।

ফলতঃ আম কাঁঠালের ভূতলপাতে সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট স্বার্থ আছে, বিশেষতঃ ঐ ঐ পদার্থ যখন সুপক্ক অবস্থায় আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই। দলীলের ভিতর যাহাই থাকুক, রেজিষ্টার বাবু তাহা রেজিষ্টার করিয়া যান, তাঁহার পারিশ্রমিক লাভ ব্যতীত অন্য উদ্বেগের কোন কারণ নাই, বৈজ্ঞানিক সেইরূপে প্রাকৃতিক ঘটনা কেবল রেজিষ্টার করিয়া যান; ঘটনাটা এমন না হইয়া এমন কেন হইল তাহা ভাবিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক নহে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই যিনি কোন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন বা তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখিয়াছেন।

তবে কোন একটা ঘটনার সংবাদ পাইলে [illegible] সংবাদটা প্রকৃত কি না এবং ঘটনাটা প্রকৃত [illegible]না, তাহা রেজিষ্টারির পূর্ব্বে জানিবার অধিকার বিজ্ঞা[নবি]দের যথেষ্ট আছে, এবং এই অনুসন্ধান কার্য্যই বোধ [illegible] তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক বিবিধ সংশয়ের উদ্ভাবন ও সংশয় অপনোদনের উপায় আবিষ্কার করে। আমাদের মত সাধারণ লোকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে তফাত। আমরা যত সহজে একটা ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া লই, তিনি তত সহজে তাহা করিতে চাহেন না। নানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। আ[মরা] অনেক সময়ে পরের কথায় বা ভদ্রলোকের কথায় অ[বিশ্ব]াস নিতান্ত অসামাজিক ও অন্যায় বলিয়া স্থির করি, কিন্তু [ত]াঁহার এই সামাজিকতার জ্ঞানটা অত্যন্ত অল্প। তিনি অ[illegible]জে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ও নিরীহ ব্যক্তিকেও বলিয়া ব[illegible] তোমার কথাটা আমি বিশ্বাস করিলাম না। এ একটা বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ, তবে তাঁহার এই সংশয়পরতা কেবল অন্যের প্রতিই নহে; তাঁহার নিজের প্রতিও তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। তিনি সকল সময়ে আপনার ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না ও আপনার বুদ্ধিকেও বিশ্বাস করেন না। কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে, কখন বা পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা সত্ত্বেও একটা স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিবেন এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা আকুল। তাঁহার যখন আপনার প্রতি এইরূপ ভাব তখন তাঁহার পরের প্রতি অবিশ্বাসটা কতকটা মার্জ্জনাযোগ্য।

অবশ্য প্রমাণ সংগ্রহ যে সকল সময়েই অত্যন্ত কঠিন এমন নহে। এমন অনেক নূতন ঘটনা সচরাচর আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। মনে কর সে দিন রন্তগেন সাহেব একটা নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কার করিলেন, যে এমন এক রকম আলোক আছে যাহার সাহায্যে বাক্সর ভিতর টাকা রাখিলেও ধরা পড়ে, মনুষ্য শরীরের হাড় কয়খানা গণিয়া দেখান চলে। এই ব্যাপার সত্য কিনা প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা হালকা কাচের পাত্রের ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাষণ করিয়া তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক ও একখানা কাগজে একটা দ্রব্যবিশেষের প্রলেপ মাখাইয়া অন্ধকার ঘরে সেই কাগজখানা ঐ কাচ পাত্রের সম্মুখে ধর; এখন উভয়ের মাঝে হাতখানা ধরিলেই বাক্সর ভিতর টাকার ছায়া ও হাতের হাড়গুলার ছায়া দেখিতে পাইবে। পাঁচ মিনিটের

পরিশ্রমেই ব্যাপারটা যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঘটনা সত্য কি না প্রমাণ করিতে কোনই কষ্ট নাই; কিন্তু যদি আমার কোন বন্ধু আসিয়া বলেন কাল রাত্রিতে চন্দ্রলোক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ ও পাকা দাড়ি, তাহা হইলে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা মিথ্যা বলিলেও আমাকে বন্ধুর প্রেম বঞ্চিত হইতে হইবে, আর সত্য স্থির করিয়া অন্যের নিকট গল্প করিতে গেলেও অন্যরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। অথচ ঘটনাটা যে একবারে অসম্ভব তাহা কোন ন্যায়শাস্ত্রের সাধ্য নহে যে সাহস করিয়া বলে। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান্ লোকে কি করিয়া থাকেন? বন্ধুর সত্যপরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও তিনি কথাটা আপনার মনের মধ্যেই রাখেন; অন্ততঃ নিজমুখে রাষ্ট্র করেন না। কিন্তু ঘটনাটা মিথ্যা কি সত্য তাহা অপর সাধারণের জানিবার কোনই অবকাশ ঘটিল না।

অমুক তারিখে বৃহস্পতি মকরে প্রবেশ করায় আমার ফলাহারে নিমন্ত্রণ জুটিবে এরূপ আশাতেও অনেকটা আনন্দ আছে, এবং কোন বৈজ্ঞানিক যখন ইহার অসম্ভাব্যতা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে পারেন না, তখন অকারণে সেই আশাভঙ্গ করিয়া আমার মনোভঙ্গের প্রত্যবায়গ্রহণে তাঁহার লাভ নাই। তবে আমার আশা সফল হইল কিনা, এই ব্যাপারে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে শুধু আমার বাক্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে বলিলে কাপুরুষতা হয়। তিনি যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অসামাজিক অভদ্র প্রভৃতি বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে নির্ব্বোধ কিংবা পাপাত্মা বলিতে পারি না। তিনি যতটুকু প্রমাণ না পাইলে তৃপ্ত হইবেন না, অন্ততঃ সে প্রমাণটুকু তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

বস্তুতঃ ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগের অবিশ্বাসের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে বিস্তর যুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় হাঁসপাতালে রোগী বাড়ে, ইত্যাদি তর্কে বিশেষ লাভ নাই। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠালগাছ ভাঙ্গিয়াছে, সুতরাং তোমার বাগানে আমগাছ কেন না ভাঙ্গিবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলা অকারণে কি এ রাশি ও রাশি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতির সহিত আমার ফলাহার প্রাপ্তির কোন সম্বন্ধই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিতেও কিছু আসে যায় না। আর নেপোলিয়নের কোষ্ঠী ছাপানর পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর না মিলিলে চাপিয়া যাইব অথবা গণকঠাকুরকে গালি দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

আসল কথা সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই। সূর্য্যও অকস্মাৎ ফাটিয়া দ্বিধা হইতে পারে। অগ্নির দাহিকা শক্তিও নষ্ট হইতে পারে। মরা মানুষও সমাধি হইতে উঠিতে পারে। আমারও অদ্য নিমন্ত্রণ জুটিতে পারে, কিন্তু জুটিবে কিনা তাহার প্রমাণ অন্যরূপ। এবং অবিশ্বাসীরা যেরূপ প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীরা সেরূপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা যে প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। এই আত্যন্তিক সংশয়পরতার জন্য বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদিগকে গালি দেন। এবং বলেন আমি যে প্রমাণে তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ না কেন; আমি কি এতই নির্ব্বোধ, আমি কি এতই অন্ধ, আমি কি এতই বধির, ইত্যাদি। এ সকল যুক্তির উত্তর নাই। এবং এ সকল যুক্তি বিফল দেখিয়া যখন তাঁহারা লাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হয়। কেন না প্রাণের আশঙ্কা সকলেরই বেশী; এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অঙ্গহীনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কন্যাদায়।

চোরবাগানের শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকে বলে "বোম ভোলানাথ।" নিজে তিনি নিতান্ত ভালমানুষ; পৃথিবীশুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমানুষ মনে করেন। সকলকে অত্যন্ত অধিক বিশ্বাস করা যেন তাঁহার একটা মানসিক রোগ। জিনিষ কিনিয়া কখনও টাকার ফেরৎ পয়সা গণিয়া লন নাই। কেহ বিপদে পড়িলেই শ্যামাচরণ বাবু তাহার উপকার করেন; তিনি নিজে বিপদে পড়িলে সে যে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া তাঁহার উপকার করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

শ্যামাচরণ বাবু বেঁটে খাটো রকমের মানুষটি। চোখ দুটি ভাসা ভাসা হাসি হাসি। গৌরবর্ণ প্রৌঢ় পুরুষ; মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কহেন। সওদাগরি আফিসের চাকরি;—বেতন সামান্য, ষাট টাকা মাত্র। একটি প্রাইভেট্ ট্যুষণও আছে। এই সামান্য আয়ের উপর ভরসা করিয়া কলিকাতা সহরে সপরিবারে বাস করা কম দুঃসাহসের কাজ নহে। একটি ঠিকার ঝি আছে সে কতক কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায়। বাকী কর্ম্ম নিজেদের করিয়া লইতে হয়। কষ্ট হয় বটে কিন্তু উপায় ত নাই।

শ্যামাচরণ বাবুর একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স ১৭।১৮ বৎসর, বি, এ, ক্লাসে পড়ে। বড় মেয়ের নাম সুলোচনা হরিপুরে বিবাহ হইয়াছে। তাহার ছোট শৈলবালা, তাহার ছোট ক্ষান্তমণি। শৈলবালার আজিও বিবাহ হয় নাই, দিলেই হয়। ক্ষান্তমণি ছোট।

শ্যামাচরণ বাবুর হাতে পৈত্রিক আমলের কিছু টাকা ছিল, তাহা বড় মেয়েটির বিবাহে সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এইত অবস্থা;—রাখিয়া ঢাকিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করিতে হয়! কিন্তু বোম্ ভোলানাথকে তখন সে কথা বুঝায় কাহার সাধ্য? তখন শৈল ছোট ছিল;—এখন সে বারো তের বছরের হইয়াছে—এখন শ্যামাচরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন। কন্যাদায় এমনি জিনিষ, বোম্ ভোলানাথ শ্যামাচরণকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্ভাবনায় এই দরিদ্র-দম্পতির মুখ ক্লিষ্ট, মন বিষাদভারাক্রান্ত। গৃহিণী বলিলেন—"আমার গায়ের যা কিছু গহনা আছে, সব বিক্রয় কর। হাজার টাকার উপর পাওয়া যাইবে। তাহাতেই এ যাত্রা জাতি রক্ষা হউক।"

শ্যামাচরণ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন; বলিলেন—"তাহার পর? ক্ষেন্তির বেলায় কি উপায় হইবে।"

গৃহিণী বলিলেন—"আশু ততদিন যদি নারায়ণের ইচ্ছায় মানুষ হয়; তাহা হইলে আর ভাবনা কি?"

ক্ষান্তমণি শৈলবালার চেয়ে দুই তিন বৎসরের মাত্র ছোট। আজিকালিকার বাজারে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র আশুতোষ যে দুই তিন বৎসরে মানুষ হইতে পারিবে সে আশা অপর কেহ হইলে সাহস করিয়া মনে স্থানদিতে পারিত না, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবু দিলেন। গহনা বিক্রয়ের পরামর্শই স্থির হইল।

কিন্তু আবার মনের মত পাত্রও ত চাই। গৃহিণী বলিলেন—"যখন আমি গা খালি করিয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, মেয়ের বিবাহ দিতেছি, তখন যে-সে-একটাকে ধরিয়া দিলে চলিবে না। জামাই দেখিতে সুশ্রী হইবে, দুইটা কি একটা পাস করা হইবে, খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে,—এইরূপ চাই।"

শ্রীমান আশুতোষের একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাহার নাম মোহিনীমোহন। সে জমিদারের ছেলে; কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া পড়া শুনা করিত। মাঝে মাঝে আশুর সঙ্গে বাড়ীতে আসিত। অনেক বার নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়ানও হইয়াছে। জামাতার যে লক্ষণগুলি গৃহিণী চাহিয়াছেন, এই মোহিনীমোহনে তাহার সকলগুলিই বিদ্যমান। সুতরাং স্বভাবতঃ তাহারই কথা সকলের মনে হইল।

যেমন কর্ত্তা, তেমনি গৃহিণী, তেমনি ছেলেটি। জমিদারের ছেলে, বি, এ, পড়িতেছে; গহনা বেচিয়া হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাহাকে ক্রয় করিবেন। সত্যযুগ আর কি! শ্যামাচরণ বাবু বামন, প্রাংশুলভ্যফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন। ইহার প্রতিফল স্বরূপ "উপহাস" নহে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

আশু বলিল,—মোহিনীর বিবাহ হয় নাই বটে। কিন্তু তাহারা কাহার সন্তান, কয় পুরুষে, নৈকুষ্য অথবা ভঙ্গকুলীন, এ সব আশু কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন কলেজে কথায় কথায় কৌশল করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে আশু সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইল। সমস্তই মিলিয়াছে। বড় সুখের কথা। আশু একেত শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র, তাহাতে অল্পবয়স্ক, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই নাই,—সে মনে করিল যেন বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। প্রথম হইতেই মোহিনীর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখন মনে মনে তাহাকে ভাবী ভগ্নীপতি

স্থির করিয়া সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিল। ইহার ফলস্বরূপ আশুদের বাড়ীতে মোহিনীর যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। শনিবার কলেজের ছুটির পর সে প্রায়ই আসিয়া আশুদের বাড়ীতে সন্ধ্যাযাপন করিত। রবিবারে এবং অন্য ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আশুর মা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ইঁহাদের গোপন অভিপ্রায় জানিতে মোহিনীমোহনের অধিক দিন বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বে শৈলবালা মোহিনীর সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিত না বটে, কিন্তু তাহার সম্মুখে বাহির হইত এবং প্রতিদিনই দুই একবার পরস্পরে চোখোচোখি হইয়া যাইত। আশু ও মোহিনী আহারে বসিলে আশুর মা পরিবেশন করিতেন, প্রয়োজন হইলেই শৈল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। কিন্তু যে দিন শৈলবালা এই বিবাহের কথা শুনিল, সে দিন হইতে মোহিনীর সাক্ষাতে আর প্রাণান্তেও বাহির হইত না। মোহিনী আসিলেই ক্ষান্তমণি সুর করিয়া বলিতে থাকিত, "দিদির বর এসেছে গো।" মোহিনী বাহির হইতে এই গান শুনিয়া হাসিত—ভাবিত কোথায় কি তার ঠিক নাই, বিবাহ! কিন্তু শ্যামাচরণের কন্যা শৈলবালার ত সে বুদ্ধি ছিল না। সে যখন মোহিনীমোহনকে দেখিত, তখন তাহাকে স্বীয় ভাবী পতি স্বরূপ দেখিত। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যে কোনও অংশের কল্পনা করিত, সেই অংশেই দেখিতে পাইত, মোহিনী সুন্দর শান্ত সমুজ্জ্বল চক্ষু দুটিতে স্নেহ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ক্রমে মোহিনীমোহনেরও বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিল। তাহার সমস্ত তর্কযুক্তি শীঘ্রই তাহাকে কল্পনার কমনীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মোহিনী ভাবিত, যদি শৈলবালার সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়, তবে কেমন হয়? মনে হইত, বেশ হয়। বেশ নামটিও কিন্তু। শৈলবালার লজ্জাটা বড় বেশী,—কখনও ভাবিত তা বেশ ত, লজ্জাই ত স্ত্রীলোকের ভূষণ। আবার কখনও বা ভাবিত, এই ভূষণবাহুল্যে আমার নব প্রণয়ের কোমল হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইবে না ত? লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। এখন ত দেখিলেই পলাইয়া যায়; ফুলশয্যার রাত্রে কথা কহাইতে অনেক সাধ্য সাধনার প্রয়োজন হইবে। কল্পনায় সেই ফুলশয্যার রাত্রিটির অভিনয় করিত। শৈলবালা যেন খস্‌খসে কাপড় পরিয়া, সাটিনের বডিস্ পরিয়া, কপালে একটি খয়েরের টিপ কাটিয়া, চুলে এসেন্স মাখিয়া, জড়সড় হইয়া, মুখখানি ঢাকিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। শয্যায় প্রবেশ করিয়া সে শৈলকে কি বলিয়া ডাকিবে? নাম করিয়াই ডাকিবে। শৈল কি আর উত্তর দিবে? সে ফিরিবেও না, চাহিবেও না, কথাও কহিবে না। অনেক চেষ্টাতে যেন কথা কহিল। কিন্তু সে যেন শৈলর নিজ কণ্ঠস্বর নহে। সেই পিতৃগৃহের সুপরিচিত শাণিত দ্রুত কোমল কণ্ঠস্বর কি এই? এ যে ভাঙ্গা, জড়ান, সঙ্কুচিত, বাধাপ্রাপ্ত স্বর, কিন্তু নিরতিশয় মধুর।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রজনীশেষে নিদ্রাকর্ষণ হইত। স্বপ্ন দেখিত—সে স্বপ্নও যেন শৈলবালার স্মৃতি-পরিমলে আমোদিত। যে রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র পৃথিবীর উপর বেশী করিয়া উন্মাদনা বর্ষণ করিত, সে রাত্রিতে হয়ত কল্পনা করিত, যেন এক সমুদ্রবেষ্টিত জনহীন দ্বীপের প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা শৈলবালার সাক্ষাৎ পাইল। তখন নূতন নূতন বিবাহ হইয়াছে। শৈল, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?—কেমন করিয়া আসিয়াছে, তাহাত শৈল জানে না। বাড়ীতে বিছানায় মার কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া দেখিল এই বনে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় আরব্যোপন্যাসের জিনি দৈত্য অথবা পরীদের রাজা উড়াইয়া আনিয়া থাকিবে। সমুদ্রগর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া শৈলবালা কাঁদিতেছিল। এখন আর ভয় করিতেছে না। মোহিনী যেন বলিল, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার জন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনি? শৈল বলিল, না আমি একলা থাকিতে পারিব না, আমার ভয় করিবে যে। তবে চল দুই জনেই যাই। কিন্তু শৈল কি সেই কঙ্করাকীর্ণ পথে চলিতে পারে? চল তোমায় কোলে করিয়া লইয়া যাইব।—ফল যদি না পাওয়া যায়? ফল যদি থাকে, আর জল যদি না থাকে? কি হইবে?—বিধাতা যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বলিয়া গেলেন—তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের মুখে চুম্বনের অমৃত সঞ্চিত রাখিয়াছি, ফল ও জলের প্রয়োজন হইবে না।—আরও কত সমস্ত অসম্ভব কল্পনা। সে আর বলিয়া কাজ নাই। শুনিলে বিজ্ঞলোকে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন।

নাটক নভেল মোহিনীর বিস্তর পড়া ছিল। সে যে ভালবাসার পথে পদার্পণ করিল, তাহা বেশ জানিয়া শুনিয়াই করিল। সে পথ বড় পিছিল। প্রণয়ের সে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল একগলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি স্নিগ্ধতা সর্ব্বশরীরকে আলিঙ্গন করিল! চারিদিকে পদ্মবিকাশ। ডুবিয়া মরিতেও সুখ আছে।

এখন অবধি আর আশু ডাকিলে মোহিনী সহজে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহিত না। মনে মনে ষোল আনা ইচ্ছা যাইবার;—কিন্তু বোধ হইত, যেন সকলে তাহার এ ভাবপরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলিয়াছে। যেন কত অপ্রতিভ হইয়া থাকিত।

একদিন শ্যামাচরণ বাবু মোহিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, আমার অনেক দিনের সাধ, শৈলের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ? তোমার যদি সম্মতি থাকে ত বল, তোমার পিতাঠাকুরের নিকট আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।"

মোহিনী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। মাটির পানে চাহিয়া, কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। শ্যাম বাবু ভাব বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?" মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বেশ ত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ।

গৃহিণী মাঝে মাঝে তাগাদা করেন, "মোহিনীর বাপকে যে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিলে তাহার কি হইল?" শ্যামাচরণ বাবুর আঠারো মাসে বৎসর;—তিনি বলেন, এই লিখ্‌ব এবার। গৃহিণী বলেন—মেয়ে যে এ দিকে বল্‌তে নেই বড় সড় হয়ে উঠ্‌ল। আর আইবুড় রাখা কি ভাল হয়? এর পরে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে যে! শ্যামাচরণ বাবু বলেন,—এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে,—পরীক্ষাটা হয়ে যাক্ তার পরে প্রস্তাব করিব।

"এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে"—কথা শুনিলে হাসি পায়। যেন বিবাহের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন শুধু শ্যামাচরণ বাবুর প্রস্তাব করাটা। সাধে লোকে তাঁহাকে বলিত 'বোম্ ভোলানাথ!'

পরীক্ষা হইয়া গেল; মোহিনী বাড়ী গেল। আরও দুই তিন মাস কাটিল। আজ লিখি কাল লিখি করিয়া এখনও শ্যামাচরণ বাবু পত্র লেখেন নাই। বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, বৈশাখের পূর্ব্বেত বিবাহের দিন নাই;—এখন অবধি অনর্থক পত্র লিখিয়া কি হইবে।

বৈশাখ মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আশু মোহিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশু এই শুভ সংবাদ মোহিনীকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইল। বাড়ীতে আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল।

এইবার শ্যামাচরণ বাবু চিঠি লিখিলেন। মোহিনী ও আশুতোষের পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্ণনা করিয়া, মোহিনীর পরীক্ষা-ফলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অতিশয় বিনয়সহকারে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সপ্তাহ খানেক পরে পত্রের উত্তর আসিল। মোহিনীর পিতা বল্লভপুরের জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মোহিনীর সহিত আশুতোষের বন্ধুত্বের কথা পূর্ব্ব হইতেই তিনি অবগত আছেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর গুণের কথাও তিনি মোহিনীর নিকট সর্ব্বদাই শুনিতে পান। তাঁহার সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয় ইহা অতি সুখের কথা। তবে দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা কথা কহা সে এখন রীতি হইয়াছে, সেটা চুকিয়া গেলেই সমস্তই ঠিকঠাক করা যাইতে পারে। সেটা পত্রের দ্বারায় না হইয়া বাচনিক হইলেই উভয়পক্ষের সুবিধা ও সময় সংক্ষেপ হইবে। অতএব এই অভিপ্রায়ে একবার যদি শ্যামাচরণ বাবু অনুগ্রহ করিয়া দীনের কুটীরে পদধূলি দেন, তবে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইবেন।

এ পত্র পড়িয়া শ্যামাচরণ বাবু যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন। গৃহিণীকে বলিলেন,—"আহা দেখেছ! যেমন ছেলেটি, তেমনি বাপটি। আজকালকার দিনে এমন কুটুম্ব পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা।"—স্থির হইল আগামী শনিবারে আফিসের পর যাত্রা করিবেন।

পরদিবস এক সময় নিরিবিলি পাইয়া শৈলবালা লুকাইয়া উপরোক্ত পত্রখানি পাঠ করিতেছিল,—তাহার দিদি সুলোচনা আসিয়া এই চৌরকার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া শৈলের মুখ চোখ কাণ রাঙা হইয়া উঠিল। দিদি পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"শৈলি,

তোর আর দেরী সইচে না! বাবাকে বলিব এখন, যেন এই মাসেই বিবাহের সব ঠিকঠাক করিয়া আসেন।"

বাস্তবিকই পিতার যাত্রাকালে সুলোচনা তাঁহাকে বলিয়া দিল—"বাবা, যদি সব ঠিক হয়, তবে এই মাসেই নয়ত জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িতেই বিবাহের দিন স্থির করে এস। সামনের জামাইষষ্ঠীতে যেন আমরা আমোদ আহ্লাদ করিতে পাই।"

শ্যামাচরণ বাবু যথাসময়ে বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ রায় তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মোহিনীদের ঘরবাড়ী, লোকজন, সোর সরাবৎ দেখিয়া, সেই প্রথম শ্যামাচরণ বাবু ভাবিলেন,—"এমন লোকের ছেলেকে মেয়ে দেওয়া আমার মত অবস্থার লোকের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ।"—তবে নাকি মোহিনীর পিতার পত্রে যথেষ্ট [illegible] পাইয়াছিলেন, তাই অনেকটা ভরসা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় তিনি মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিলেন। স্নানাহার করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রায় মহাশয় বলিলেন,—পথশ্রমে আপনার ক্লেশ হইয়াছে। এ বেলা বিশ্রাম করুন। ওবেলা তখন সে সমস্ত কথাবার্ত্তা কহা যাইবে।

অপরাহ্ণে রায় মহাশয়দের বহির্ব্বাটীতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইল। অনতিবৃহৎ কক্ষটির মধ্যস্থলে দুইখানি চৌকী যোড়া করিয়া পাতা। তাহার উপর আগ্রার একখানি সতরঞ্চ। তাহার উপর রজকালয় হইতে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি চাদর বিছান। কয়েকটি তাকিয়াও স্থানে স্থানে সজ্জিত। রায় মহাশয় জমিদার-গর্ব্বে মধ্যস্থলে সুখাসীন। শ্যামাচরণ বাবুকে তিনি সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন,—"শ্যামাচরণ বাবুর মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার চেয়ে আর কি সুখ আছে?"

রায় মহাশয় এ কালের লোক ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া সভাকার্য্যের সূচনা করিলেন। বিবাহের টাকা লওয়া যে একটা রীতি হইয়াছে, তাহার প্রতি নিন্দার বেশী ঝোঁকটা পড়িল। বলিলেন—"আমাদের সে সব দিন কাল এক আলাহিদা রকমের গিয়াছে। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন মনে আছে, একশত এক টাকা পণ, একটি সোণার আংটি, আর একটি চেলির যোড় মাত্র পাইয়াছিলাম। আর বুঝি ভরি দশ পনেরো সোণা আর ভরি পঞ্চাশ যাট রূপা। ইহাতেই একবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব কতই লজ্জিত। বলেন—"বৈবাহিক মহাশয়, আমি ছেলের বিবাহ দিতে

আসিয়াছি বই ত ছেলে বিক্রয় করিতে আসি নাই।" —আর এখন?—এখন মহাশয়, সে দিন আমার বড় সম্বন্ধীর মেয়ের বিবাহ হইল; পঞ্চাশ ভরি সোণা, দুই শত ভরি রূপা, হাজার-এক টাকা নগদ, তাহার উপর দান-সামগ্রী আছে, খাট বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা তা মহাশয়? এই ধরুন ঘড়ি—সোণার ঘড়ি, সোণার গার্ডচেন, হীরার আঙ্গটি, চেলীর যোড়, তা ছাড়া আবার রূপার টী-সেট্। জামাই বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়াইবেন, তাই রূপার টী-সেট চাই। এই নূতন বরাভরণ সাহেব বাড়ী হইতে আনাইতে প্রায় দুই শত টাকা লাগিয়া গেল। জামাইয়ের গুণের মধ্যে কি?—না, এল্, এ, পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতেছেন। বাপ জজকোর্টের সেরেস্তাদার। বিষয় আশয় কিছুই নাই, চাকরি ভরসা। চাকরি ত তালপত্রের ছায়া। আজ যদি চাকরি যায় তবে কাল কি খাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। আরে ছি-ছি—একালে কেবল অর্থ, কেবল অর্থ, কেবল অর্থ। অর্থ ছাড়া আর কথাটি নাই।

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে রায় মহাশয়ের এ মত সমর্থন করিলেন। শ্যামাচরণ বাবু মনে মনে বলিলেন—"যে যথার্থ ভদ্রলোক হয়, সে সর্ব্বদোষাবহ একালেও আপনার ভদ্রতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে।"

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"তাহা হইলে এইবার উপস্থিত বিবাহের একটা কথাবার্ত্তা হইয়া যাক।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তাহলে আমি একবার বাড়ীর ভিতর ওঁয়াদের জিজ্ঞাসা করে' আসি।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব হইল না। তিনি বালির কাগজে লেখা এক সুদীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ছেলেপিলেকে দিয়া নিজের মনের মত এই ফর্দ্দ লেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন—"বাড়ীর ওঁয়ারা অলঙ্কার এই চাহেন। তাহার পর আর আর যাহা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা বলিবেন না বলিয়াছেন—আমারই উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। আমার এক্তারের মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই যথাসম্ভব সুলভে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিষ্কৃতি দিব, কিন্তু মেয়েদের এই ফর্দ্দ হইতে অধিক কমান আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না।"

ফর্দ্দ পড়া হইল। তাহার বিস্তারিত বিবরণে পাঠককে ক্লিষ্ট করিব না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শ্যামাচরণ বাবুর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

গহনার যাহা ফর্দ্দ বাহির হইয়াছে, তাহা খুব টানাটানি কসাকসি করিয়া দিলে দুই হাজার টাকার একটি পয়সা কমে হইবে না।

তাহার পর গণ আছে, পণ আছে, ফুলশয্যা আছে, নমস্কারী আছে, নিজেদের খরচ আছে। ফল কথা, মোহিনীমোহনকে জামাতা করিতে হইলে অন্যূন তিন হাজার টাকার প্রয়োজন।

সম্বলমাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি। বিক্রয় করিয়া বড়জোর দেড় হাজার টাকা হইতে পারে।

এত দিন ধরিয়া এত সাধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আকাশে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অনুনয় বিনয় করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলে হয়ত কিছু কমিতে পারে। কিন্তু সে আর কত কমিবে? নিজের সাধ্যের মধ্যে আসিবে না। ভূমিকায় ত রায় মহাশয় বলিয়াই দিয়াছেন যে গহনার তালিকা হইতে বিশেষ কিছু কমান তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। "কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে তৃণে, যদি আর কিছু না পায় সম্মুখে—" সুতরাং শ্যামাচরণ মনে করিলেন, কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কি আর অলঙ্কারের তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারেন না? স্ত্রীলোকের কথাই কথা থাকিয়া যাইবে এও কখন হয়? নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণ করিলেন। তিনি যদি স্ত্রীকে বলেন—ইহা করিতে হইবে, তাহাতে স্ত্রী দ্বিরুক্তি করিবেন? কখনই না। তাই শ্যামাচরণ বাবু সহসা হাত দুইটি যোড় করিয়া, রায় মহাশয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমি কন্যাদায় হইতে যাহাতে উদ্ধার হই, তাহা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।"

রায় মহাশয় অমনি—"হাঁ হাঁ করেন কি?—আমার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া আমাকে অপরাধী করেন কেন?

আপনি মহাশয় ব্যক্তি"—ইত্যাদি প্রকার উক্তি করিয়া সবলে শ্যামাচরণ বাবুর দুই হাত ছাড়াইয়া দিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমি মহাশয় ব্যক্তি নহি। মহাশয় ব্যক্তি আপনি। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রলোক। আমাকে কৃপা করিয়া এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।"

সভার একজন বলিলেন—"অত টাকা ব্যয় করা যদি আপনার সাধ্যাতীত হয়, তবে কত ব্যয় আপনি করিতে পারেন, তাহাই বলুন না।"

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"মহাশয়গণ, আমার সমস্ত অবস্থা আমি অকপটে নিবেদন করিতেছি, সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যাহা বিচার হয় করিবেন।—আমি ষাটটি টাকা মাহিনা পাই। একটি ছেলে তিনটি মেয়ে, এই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি লইয়া ঘর করি। হাতে কিঞ্চিৎ পিতৃদত্ত অর্থ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। সে টাকার একটি কাণা কড়িও আর অবশিষ্ট নাই। আছে এখন কেবল ব্রাহ্মণীর গায়ের অলঙ্কার কয়খানি। সেইগুলি বিক্রয় করিলে হাজার বারোশত টাকা হইতে পারে। ঐ টাকার ভিতর যাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, সবদিক রক্ষা হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে,—তাহাই আপনারা পাঁচজনে করিয়া দিন।"

এ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে শ্যামাচরণের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে কিন্তু একটু অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল। শ্যামাচরণের মত বোম্ ভোলানাথ লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহা তাহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। জমিদারের ঘরে বি, এ, পাস করা ছেলের সন্ধানে আসিয়াছেন, হাতে কিছু নাই সে কি হইতে পারে? সওদাগরি আফিসে চাকরি করেন, বেতন ষাট টাকাতে কি আসে যায়?—অমন কত ষাট টাকা রোজগার করেন তাহার কি কোনও হিসাব আছে?

তথাপি রায় মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে একবার বাড়ীর ভিতর যাই। বলিয়া কহিয়া দেখিগে মেয়েরা যদি কিছু কমাইতে রাজি হন।" বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কমাইবার কথা শুনিয়া মেয়েরা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। বলিয়াছেন, তোমার যাহা খুসী তাহাই কর। আমাদের কথা যদি থাকিবেই না তবে জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ইহার পর আর খোসামোদ করা চলে না। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে ত? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরও আত্মসম্মান একটা সীমার পর আর মাথানোয়াইতে ঘৃণা বোধ করে। শ্যামাচরণ বাবু এইবার একটুকু "শুষ্ক শ্বেত হাসি"হাসিলেন—তাহা "জমাট অশ্রুর মত দুষারকঠিন।" বলিলেন—"তাহা হইলে ত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্মান আমার অদৃষ্টে নাই।"

ইহাতে রায় মহাশয় এমন ভাবটা প্রকাশ করিলেন, যেন তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আর শ্যামাচরণ যেন উভয়েই এক অত্যাচারী রাজার শাসনাধীনে পীড়িত—তাই সমবেদনা অনুভব করিতেছেন। অপর সকলে মনে মনে ভাবিল, ছি এমন স্ত্রীবশ!

যাহা হউক, নিরাশার পাথর বুকে বাঁধিয়া সেই রাত্রেই শ্যামাচরণ গৃহে ফিরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বাড়ীতে একটা আশা আনন্দের যে কোলাহল উঠিয়াছিল, শ্যামাচরণ ফিরিবা মাত্র তাহা থামিয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীর কান্না পাইতে লাগিল। আর শৈলবালা অত্যন্ত গোপনে বাস্তবিকই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।—সুধু কি মা বাপের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল, না আরও কিছু কারণ ছিল?—আমার ত বিশ্বাস, ছিল। কিন্তু সে পণ করিয়া বসিল না—যাহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সে ছাড়া আর কাহাকেও আত্মদান করিব না;—আমি চিরকুমারী থাকিব। সে অত শত জানিত না। তাহার বুকে যে কিসের বেদনা আসিয়া বাজিল, তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

গৃহিণী বলিলেন—"এখন উপায়?" শ্যামাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি আর কি উপায় করিব? ঈশ্বর কি উপায় করেন দেখি। আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। হাজার বারোশত টাকায় হয় এমনি একটি পাত্র। পাস টাস হোক্ আর নাই হোক্,—দুইটা খাইতে পরিতে দিতে পারে। আর নিতান্ত মূর্খ, গোঁয়ার, মাতাল, দুশ্চরিত্র না হয়। অনেক সন্ধান করিতে হইল। অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এ ভোগ কাহাকে না ভুগিতে হইয়াছে? কয়েকটা স্থানে ত, এই হইল—এই হইল—সব ঠিকঠাক্—আর হইল না। সেই বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। পূজার সময় একস্থানে স্থির হইল। হাজার টাকা দিতে হইবে। পাত্রটি উকীল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের। তাই বলিয়া বয়স অধিক না,—এই ত্রিশের মধ্যে। মেয়েটি বয়স্থা ও সুন্দরী দেখিয়া "বি, এ, বি, এল্" এর পিতা হাজার টাকাতেই স্বীকার হইয়াছেন; স্বীকার হইবার আরও একটু বিশেষ গোপনীয় কারণ ছিল। পাঁচবৎসর ছেলের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই পাঁচ বৎসর বিস্তর সাধ্য সাধনাতেও ছেলেকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই। এবার কোন শুভগ্রহবশে ছেলে রাজি হইয়াছে। সুতরাং টাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্য্যটা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কারণ কি জানি, যদি বিলম্বে মতি ফিরিয়া যায়!

১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। শ্যামাচরণ গহনাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের মাস খানেক পূর্ব্বে একটা ভারি দুর্ঘটনা ঘটিল। রান্নাঘরের সম্মুখের বারাণ্ডায় শৈল বসিয়াছিল। একটি জল খাবার ছোট ঘটির ভিতর বামহস্তের মাঝের আঙ্গুলটি দিয়া, ঘটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রান্নাঘরের ভিতর সুলোচনার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে চুণ সুরকীর একটা চাঙর খসিয়া সেই হাতের উপর পড়িল। ঘটির কানাটা ভাঙ্গিয়া গেল, আঙ্গুলও আধখানা সেই সঙ্গে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই খুব জ্বর। পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটি দ্বিতীয়বার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচদিনে জ্বর ছাড়িল; কিন্তু আঙ্গুল ভাল হইতে পনেরো কুড়ি দিন লাগিয়া গেল।

একে মেয়ের বিবাহ হয় না, তাহার উপর আবার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! খুব সাবধান, যেন প্রকাশ হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া না যায়।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল।

বরপক্ষীয়েরা পল্লীগ্রাম হইতে প্রভাতেই আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের জন্য কাছেই একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া ছিল, তাঁহারা সেইখানেই উঠিলেন।

বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল শৈলবালার মুখখানি মলিন। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দুইটি জলে পুরিয়া উঠিতেছে। তাহার আর সে পূর্ব্বেকার আকার নাই। যেন সে সম্প্রতি ছয়মাসের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে।

বেলা দশটার সময় গায়ে হলুদ হইল। বরপক্ষীয়দের একটা দাসী গায়ে হলুদের সময় বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে দেখিয়া গেল, মেয়ের একটি আঙ্গুল কাটা। যথাসময়ে সে বরের পিতার নিকট গোপনে এ সংবাদ দিতে ভুলিল না। বরকর্ত্তা শুনিয়া ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি নিজে পূজার সময় মেয়েকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু হয়ত বাম হাতটা কাপড়ের ভিতর লুকান ছিল, তাই অত লক্ষ্য করেন নাই। যাহা হউক প্রিয়বন্ধু ক্ষুদিরাম খুড়ার সহিত অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে কৌশলে এইটা জানাজানি করিয়া দিয়া, আরও দুই একশত আদায় করিয়া লইতে হইবে।

সন্ধ্যা হইল। বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বর আসিয়া সভাস্থ হইল। ইয়া গোঁফ্—ইয়া চেহারা—পাড়ার ছেলেরা বরকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল, বরের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব কিছুই করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্ত্তা যথারীতি গলবস্ত্র হইয়া সভায় নিবেদন করিলেন—"লগ্ন উপস্থিত, গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি হউক।"

বর গিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপবেশন করিল। শ্যামাচরণ জামাতাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বরকর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের একটা চিরকালের কৌলিক প্রথা আছে, তাহা পালন করিতে হইবে। কনেকে সভায় আনা হউক। বর কনের হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিবে। তাহার পর বরণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা নিজেদের পুরোহিতের মুখ পানে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি নাই।

যাহা উঁহাদের করিবার প্রথা আছে তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি কি ?"

কনেকে আনা হইল। বরকর্ত্তা বরের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"এইটি তুমি কনের হাতে দাও।" কনেকে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী, হাত পাত।" শৈল বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে হইতে কম্পিত হস্ত খানি বাহির করিয়া দিল। বরকর্ত্তা বলিলেন—"না না, এক হাতে কি নিতে আছে মা ? দুইটি হাতই পাতিতে হয়।" শৈলত কিছুতেই বামহস্ত বাহির করে না। শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়া পলকে প্রলয়জ্ঞান করিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শৈল বাম হস্ত খানি বাহির করিল। সকলেই দেখিল, মাঝের আঙ্গুলটির আধখানা নাই।

বরকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"একি! অঙ্গহীন!" পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীগুরু! অঙ্গহীনা কন্যা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে ? মুখুয্যে মহাশয়, বিবাহ স্থগিত করুন।"

বিবাহ স্থগিত করুন! কন্যাপক্ষীয়েরা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। একজন বলিল—"কোথাকার অশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্য! একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে অঙ্গহীন হয় একথা কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন ?"

ভট্টাচার্য্য অশাস্ত্রজ্ঞ! ভট্টাচার্য্য কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন! তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"কে হে বেল্লিক অকালকুষ্মাণ্ড, আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক না কি ?"

শ্যামাচরণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি এখন বিবাহ স্থগিত করেন, তাহা হইলে আমার জাতি থাকে কেমন করিয়া ?"

এইবার ক্ষুদিরাম খুড়া সর্ব্বসমক্ষে বরকর্ত্তাকে বলিল—"কন্যাকর্ত্তা পণস্বরূপ আর দুই শত টাকা ধরিয়া দিউন, মিট মাট করিয়া ফেলা যাইতেছে। কি বল হে ভট্টাচার্য্য ?" সেই মাত্র একজন ভট্টাচার্য্যকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করিবেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি বলিলেন—"টাকা ধরিয়া দিলে শাস্ত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না কি ?"

সেই স্থানে কন্যাযাত্র কলেজের একজন জ্যাঠা ছোকরা চশমা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—"ঢের দেখেছি, আর ভট্টাচার্য্যগিরি ফলাতে হবে না। নরশব্দ রূপ কর দেখি ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিদ্রূপে আসন ছাড়িয়া একলম্ফে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। দুই হাত অতি বেগে ঝাড়িয়া বলিলেন—"এ বিবাহে যদি আমি মন্ত্র বলাই তবে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

বরপক্ষীয়ের পাঁচজন হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, করেন কি! করেন কি!" ভট্টাচার্য্য বরকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে তবে উঠাও বর।"

বর বলিল—"আমি ও আঙ্গুলকাটা মেয়েকে বিবাহ করিব না"—বলিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বরের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"কি! বিবাহ করিবে না! মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিব না!"

শৈলবালার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এতক্ষণ কেহ তাহার খবর রাখে নাই। একটা দাসী শ্যামাচরণকে ঠেলিয়া বলিল—"ওগো বাবু, মেয়ে যে এলিয়ে পড়্‌ল।" তৎক্ষণাৎ শৈলকে ধরাধরি করিয়া অন্যত্র পাঠান হইল।

এই গোলমালটা থামিলে বরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলিয়াছি, প্রথমাবধিই সে বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। পিতামাতার একান্ত উৎপীড়নে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সে এই সুযোগে চম্পট দিল।

মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়া, অনেক কষ্টে শৈলবালার চেতনা সম্পাদিত হইল। শৈলর মা কাঁদিয়া বলিলেন—উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হবে গো। উহার যে কপাল পুড়িল।

আমরা এতক্ষণ মোহিনীর কোনও উল্লেখ করি নাই। সে কলিকাতাতেই ছিল। আশু বলিল—"বাবা, আমি মোহিনীকে আনিয়া বিবাহ দিব।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের ডেস্ক হইতে একখানা বৃহৎ ছুরী বাহির করিয়া লইয়া পাগলের মত মোহিনীর বাসার উদ্দেশে ছুটিল। বাসার দরজা তখনও বন্ধ হয় নাই। দুইটা তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া দুতালার ছাদে গিয়া পৌঁছিল। দুতালার ছাদে একটি মাত্র কক্ষ, তাহাতে মোহিনী একাকী থাকিত। দুয়ার বন্ধ, ঘরে আলো

জ্বলিতেছে। কম্পিত স্বরে আশু ডাকিল,—মোহিনী, মোহিনী! মোহিনী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সংক্ষেপে আশু মোহিনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিল,—"ভাই, তুমি যদি এ রাত্রিতে আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আমাদের জাতি-কুল-মান রক্ষা কর। নহেত বল, এই ছুরী আনিয়াছি, তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।"

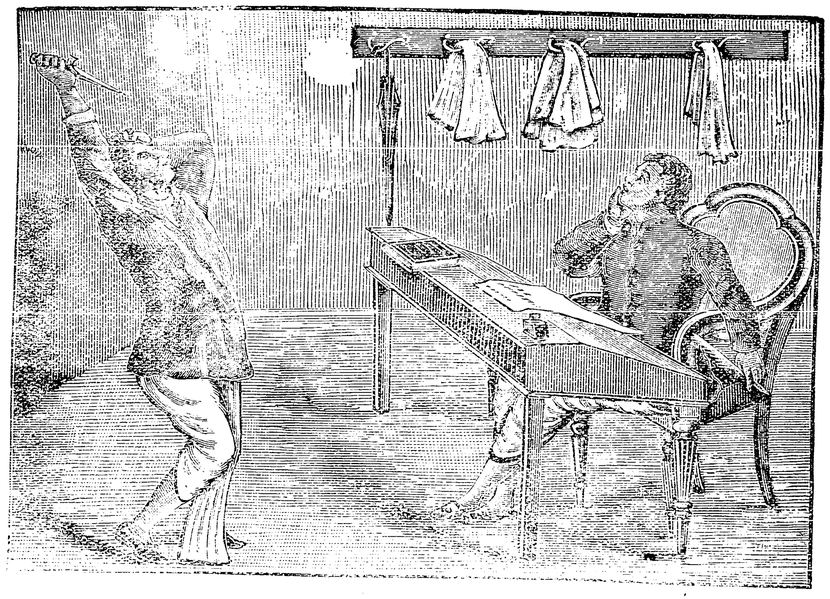

মোহিনী আপাদমস্তক শিহরিয়া আশুর হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইল। বলিল, "ভাই, চল, আমি তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব। আত্মহত্যা করিতে হইবে না।"

মোহিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল। টেবিলের উপর একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে দুই মিনিট পূর্ব্বে "বিসর্জ্জন" নাম দিয়া একটি কবিতা লিখিতেছিল;—শেষ পংক্তিটির কালি এখনও শুকায় নাই।

চটীজুতা পায়ে, আলুথালু বেশে, মোহিনী আশুর সঙ্গে চলিল। তখন রাত্রি দশটা হইবে। একটার মধ্যে শৈলবালার সঙ্গে মোহিনীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঠক রাগ করিবেন না। ঘটনাটা কিছু নভেলিয়ানা রকমের হইল বটে;—কিন্তু বাস্তবজীবনেও যে প্রতিদিন শত শত নভেলের ঘটনা ঘটিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিরাগমন।

মোহিনী পিতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া ফেলিল, কিন্তু পিতা ইহা শুনিয়া কি বলিবেন ? তিনি যদি এই অপরাধ ক্ষমা না করেন ? বিবাহের পর এই ভাবনা মোহিনীর ও তাহার শ্বশুরের প্রধান ভাবনা হইল।

শ্যামাচরণ বাবু কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছেন; মোহিনীকে জামাতা পাইয়া তাঁহার বহুদিনের সযত্নপালিত আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এই একটা সমস্যার জন্য আনন্দটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না; গৃহিণী বলেন,—"কে জানে বাবু, কি কপালে আছে। ছেলের মা বাপ বউকে নিলে হয়।"

শ্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই মোহিনীর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শনিবার ত কাঁক যায় না। মোহিনী একদিন শৈলকে বলিল,—"ভাগ্যে তোমার আঙ্গুলটি কাটিয়াছিল—তাইত—নহিলে এতদিন তুমি—।" আর বলিতে পারিল না। সে অবস্থা কি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় ? শৈল স্বামীর এই অসমাপ্ত কথাটুকু বুঝিল। পাঠ্যপুস্তকের অনেক কথা তখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই। মনে মনে বলিল—ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

মোহিনী যখনই আসিত, তখনই শৈলের জন্য কিছু না কিছু সখের জিনিষ লইয়া আসিত, কিন্তু শৈল মহা আপত্তি করিত—কিছুতেই লইবে না। বলিত—"কোথায় রাখ্‌ব ? সবাই যে দেখে ফেলবে।" মোহিনীও ছাড়িত না; বলিত, "দেখে দেখ্‌বে, তুমি ত আর চুরি করিতেছ না।"

শেষকালে শৈলকে লইতে হইত,—নহিলে স্বামী রাগ করেন। বিশেষ চেষ্টা করিত, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। ধরা পড়িয়া প্রথম প্রথম যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইত; কিন্তু বার কতক এইরূপ হইতে হইতেই লজ্জা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল।

মোহিনী শৈলকে একবার বলিল—"আমাকে পত্র লিখিও, নহিলে এ শনিবার আমি আসিব না।" শৈল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"কি লিখতে হয় আমি কি তা জানি?"

"তোমার দিদি তাঁহার স্বামীকে যে সব চিঠি লেখেন, তা কি তুমি দেখ নাই?"

'হাঁ, কতবার দিদি আমাকে দেখিয়েছে।"

"সেই রকম তুমিও লিখ্‌বে।"

শৈল মাথা নাড়িয়া বলিল—"সে আমার ভারি লজ্জা করিবে;—সে আমি পারিব না।"

"দিদির কেন লজ্জা করে না?"

"আগে দিদির মত বড় হই"—একথা বলিয়াই শৈল হাসিয়া ফেলিল। সে বেশ বুঝিল, এ ওজরটি নিতান্তই "পঙ্গু" হইতেছে। তাহার সমবয়স্কাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সকলেই চিঠি লেখে। চিঠি লিখিতে ইচ্ছা তাহারও হইত, কিন্তু সে কথা কি স্বামীর কাছে স্বীকার করিতে আছে? বেহায়া মনে করিবেন যে।

চিঠি লিখিবার জন্য শৈলকে বেশী বড় হইতে হইল না; দুই তিন সপ্তাহ বয়স বাড়িতে না বাড়িতেই সে স্বামীকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম চিঠি গুলি নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতি হইত। ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া হইতে লাগিল। কোন বিশেষ কথা থাকিলে চারি পৃষ্ঠাও পূরিয়া যাইত।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দারুণ দুর্ভাবনা বহন করিয়াও এই নবদম্পতির জীবন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। ক্রমে গ্রীষ্মাবকাশ নিকটে আসিল। বাড়ী যাইতে হইবে। দুই তিন মাস দেখা শুনা হইবে না, এই আশঙ্কায় দুইজনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। শৈল বলিল, "কোনও উপলক্ষ্য করিয়া মাঝখানে একবার কলিকাতায় আসিতে পারিবে না?"

মোহিনী বাড়ী গেলে বাড়ীর লোক তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখের চক্ষুর ভাব যেন সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মোহিনী কি ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে একদিক পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কিছু উত্তর পায় না।

একদিন পাড়ার একজন প্রবীণা দিদিমা মোহিনীর সাক্ষাতে তাহার মাকে বলিলেন--"ছেলে যেটের বড় হয়েছে—বিয়ে দাওনি—তাই মনে গুমিয়ে থাকে।" ইহা শুনিয়া মোহিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই তাহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। মোহিনীর মা ইহা লক্ষ্য করিলেন। সে অন্যত্র চলিয়া গেলে দিদিমাকে বলিলেন—"ঠিক বলেছ বাছা; আমি কর্ত্তাকে বলে শীঘ্রই ওর বিবাহ দিতেছি।"

গ্রামের পোষ্টমাষ্টার মোহিনীর একজন প্রিয় বন্ধু। তাহাকে বলা ছিল, মোহিনীর পত্রাদি বাড়ীতে না পাঠাইয়া যেন ডাক ঘরেই রাখা হয়, মোহিনী স্বয়ং গিয়া লইবে। একদিন পোষ্টমাষ্টার কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। যথাসময়ে ডাক আসিল। অধীনস্থ পিয়ন নিজেই ব্যাগ খুলিয়া পত্রগুলি বিলি করিল। পল্লীগ্রামের ডাকঘরে এরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সেই সঙ্গে শৈলবালার লিখিত মোহিনীর একখানি পত্র ছিল; তাহা মোহিনীদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এত লোক থাকিতে, পত্রখানি মোহিনীর ছোট বোন্ মালতীর হাতে পড়িল। মোহিনী তখন বাড়ী নাই। পত্রখানির আবরণ রঙ্গীণ, সমচতুষ্কোণ, এসেন্সের গন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। মালতীর কেমন সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ সে জল দিয়া পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল।

পত্র পড়িয়া মালতী অবাক্। ছুটিয়া মার কাছে গিয়া বলিল—"মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। দাদার স্বভাব চরিত্র বিগড়িয়া গিয়াছে।"

মা পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন। মেয়ের কথায় তাঁহার কোনও সংশয় রহিল না।

ওবাড়ীর বড় বউ আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি পত্র পড়িয়া বলিলেন—"আমি জানি, আমার খুড়তুতো ভাই কলিকাতায় পড়িত। তারও ঐ রকম হয়। সেও চিঠি ধরা পড়াতে জানাজানি হয়েছিল। তারপর আমরা ধরে

বেঁধে বিয়ে দিলাম। এখন রোগ শুধ্‌রেছে। একেবারে বউএর কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে। তা তোমরাও মোহিনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন—"আমরা যে জান্‌তে পেরেছি, তা যেন মোহিনী না শোনে। হয়ত বাছা আত্মহত্যা করে ফেল্‌বে। নয়ত বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে। চিঠি জুড়ে ঠিকঠাক করে তোমরা রেখে দাওগে।"

তাহাই হইল। মোহিনী যথাসময়ে আসিয়া পত্র পাইল। খুলিতে গিয়া দেখে, দিব্য একটি জলের দাগ। একবার বন্ধ করিয়া যে দ্বিতীয়বার খোলা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভাবিল, বাড়ীতে কেহ নিশ্চয় ইহা খুলিয়াছে। কিন্তু পত্রের ভিতর একটা পুনশ্চ ছিল। হয়ত শৈলবালাই পত্র বন্ধ করিয়া ঐ পুনশ্চটির জন্য আবার খুলিয়া থাকিবে। যাহা হউক বিস্ময়ে সন্দেহে মোহিনী পত্রখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিল।

গৃহিণী যথাসময়ে একথা কর্ত্তার কাণে তুলিলেন। কর্ত্তা বলিলেন—"ক্ষেপেছ, তাও কি সম্ভব? ও হয়ত কোনও বন্ধু এয়ার্কি করে ওরকম লিখেছে। ছেলের ছেলের অমন করে।" গৃহিণী মনে মনে বলিলেন—"হে মা কালীঘাটের কালী! তাই যেন হয়। আমার বাছার এ দুর্ণাম যেন বেঁচে থাক্‌তে আমায় শুন্‌তে না হয়।"

পরদিন একথা শুনিয়া ওবাড়ীর বড় বউ বলিলেন—"আচ্ছা, এ বিষয়ের তদন্ত আমরা করিতেছি।"

মোহিনীর অনুপস্থিতিতে, বড় বউ মালতীকে লইয়া ভিন্ন চাবি দিয়া মোহিনীর কলিকাতার তোরঙ্গ খুলিয়া ফেলিলেন। বিস্তর খুঁজিতে হইল না। একখানি লাল রেশমী রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠি। সবই এক হস্তাক্ষরে লিখিত। সব গুলিই প্রণয়ের চিঠি। প্রিয়তম, প্রাণসখা, অভিন্নহৃদয় ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ। তোমার শৈলবালা, তোমার আমি, তোমার শৈ, তোমার সাধের সই—ইত্যাদি বলিয়া শেষ। অনেক গুলাতেই লেখা, তুমি শনিবারে নিশ্চয় আসিবে। আশা দিয়া নিরাশ করিও না। অধিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

বেশী পড়িবার সময় নাই। কি জানি যদি হঠাৎ মোহিনী আসিয়া পড়ে! সমস্ত চিঠি পড়িলে কিন্তু প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি একখানিতে লেখা ছিল—"আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে, মা বাপ জানিলেন না, কি উপায় হইবে," ইত্যাদি।

বড় বউ ও মালতী আসিয়া মাকে বলিল—"মা, আর কোনও সন্দেহ নাই। গাদা গাদা চিঠি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারি খানার মর্ম্মও শুনাইয়া দিল। মা শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করিলেন—বাছাকে আমার ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর,—আমি পূজা দিব।

সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন—"আর উহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া কাজ নাই। একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বিবাহ দাও, আমি একটি পয়সাও চাই না।"

কর্ত্তা বিরক্তির সহিত বলিলেন—"এতদিন ত কোনকালে বিবাহ হইয়া যাইত। তুমি যে এক বারো হাত লম্বা ফর্দ্দ বাহির করিয়া বসিলে! ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অভিশাপ দিতে দিতে চলিয়া গেল। তার শাপেই ত এ সব হইল।"

গৃহিণী বলিলেন—"তার মেয়েকে যদি মোহিনীর পছন্দ হয়ে থাকে তবে তারই সঙ্গে বিয়ে দাও। তাহারা যাহা পারে তাহাই দিবে।"

কিন্তু কর্ত্তা এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। বলিলেন—"তাও কি হয়? একবার ফিরাইয়া দিয়াছি। আবার কোন্ মুখে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইব? দেশে কি আর সুন্দরী বড় মেয়ে নাই?"

গৃহিণী বলিলেন—"তা যেখানে হয় দাও। আর কিন্তু দেরী কর্‌লে চল্‌বে না।"

সেই গ্রামেই এক বিবাহযোগ্যা কন্যা বাহির হইল। যখন টাকা কড়ি সম্বন্ধে আর হাঙ্গামা নাই, তখন মনের মত পাত্রীর অভাব কি?

এক সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন স্থির হইল। মোহিনী বলিল আমি বিবাহ করিব না। অনেক পীড়াপীড়ি কান্নাকাটি চলিল। শেষে মোহিনী মাকে বলিল—"আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাহাতে যদি তোমরা আপত্তি না কর, তবেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।"

"কি প্রস্তাব?"

"শ্যামাচরণ বাবুদের সপরিবারে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।"

"সে আর বিচিত্র কি? তবে কেমন কেমন দেখাইতেছে। যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ, সে গত অগ্রহায়ণ মাসেই হইয়া গিয়াছে।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা, কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।" বহু কষ্টে তিনি রাজি হইলেন। মোহিনী স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ইঁহাদিগকে আনিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই সন্দেহ করিলেন, এ কেবল পলাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার একটা ছলমাত্র।

অগত্যা মোহিনী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা শ্বশুরকে জানাইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছে অকপটে তৎসমুদয়ই বর্ণনা করিল। বলিল, ঘটনা আর গোপনে রাখা চলে না। আমি যেমন আপনার বিপদে সহায়তা করিয়াছি, আপনি সেইরূপ আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করুন। আমি পারিব না,—আপনি আসিয়া সমস্ত খুলিয়া বাবাকে বলুন। আর যে ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া বাবা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আশুর বিবাহ দিন। তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

শ্যামাচরণ পত্র পাইয়া অনেক কষ্টে আফিসে ছুটি লইলেন। যে দিন বিবাহ, সেইদিন বেলা দশটার সময় সপরিবারে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

সেই বৈঠকখানায় আবার আজ একঘর লোক। স্বর্ণকার বিবাহের অলঙ্কার লইয়া উপস্থিত। রায় মহাশয় মধ্যস্থলে বসিয়া সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। শ্যামাচরণ বাবুও সেইখানে বসিলেন। রায় মহাশয় ভারি অপ্রতিভ;—আদর অভ্যর্থনাটা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিলেন। বেলা হইয়াছে, স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমাকে যদি একটি ভিক্ষা দেন, তবেই আমি আহার করিব।" অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি।"

তখন সেই গৃহপূর্ণ লোকের সম্মুখে শ্যামাচরণ বাবু কন্যা বিবাহের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর মোহিনীর পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। শেষে সহসা রায় মহাশয়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনার বিনা অনুমতিতে যে এ কার্য্য হইয়া গিয়াছে, আর এতদিন যে আপনার নিকট ইহা গোপন রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আমাকে আর আপনার পুত্রকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সকলেই বলিল—যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। এমন বিপদে মোহিনী যে ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিয়াছে, সে কুলোচিত কার্য্যই করিয়াছে। রায় মহাশয়েরা গ্রামের জমিদার; বংশাবলীক্রমে চিরদিনই বিপদের বন্ধু।

হরেকৃষ্ণ বাবু বৈবাহিককে সাদরে উঠাইয়া বলিলেন—"ভাই, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন হয় ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল। নারায়ণ সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এখন তোমরা ব'স, আমি বধূমাতার মুখ দেখিয়া আসি।"

স্বর্ণকারের নিকট হইতে কয়েকখানা অলঙ্কার লইয়া রায় মহাশয় বধূ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকে শুনিয়া অবাক্। বিস্ময়ের ঢেউ কতকটা প্রশমিত হইলে বধূকে বরণ করিবার ধূম পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যা বেলায় শ্রীমান্ আশুতোষের সহিত সেই কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। মেয়েরা ছাড়ে নাই; মোহিনীকেও বাসরে গিয়া গান গাহিতে হইয়াছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ময়ূরভঞ্জে হাতীধরা।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিকাংশই বনভূমি। রাজ্যের মধ্যদেশে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এক পর্ব্বতমালা শির উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতমালা রাজ্যটিকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশেও নিবিড় বন-শ্রেণী। এই সমস্ত পর্ব্বতে ও বনে বন্যহস্তী যথেষ্ট আছে। তাহারা অনেক সময় বন হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া দরিদ্র প্রজার কষ্টার্জ্জিত শস্য-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে রাজ্য হইতে খেদা করিয়া এইসব হাতী ধরা হয়। ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে একবার এইরূপ খেদা হইয়াছিল; আর এবারেও খেদা হইয়াছে। আমরা

শুনিলাম রাজ্যের রাজধানী বারিপদা হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরস্থ পর্ব্বতের পাদদেশে হাতীধরার আয়োজন হইয়াছে। কখন হাতীধরা প্রত্যক্ষ করি নাই সুতরাং এ সুবিধা কোন মতে ছাড়া উচিত বোধ করিলাম না। স্থানীয় উচ্চ উচ্চ কর্ম্মচারিগণেরও কয়েকজন যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং আমিও "কর্ত্তব্যঃ মহদাশ্রয়ঃ" নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। স্থানের দূরত্ব বিষয় প্রথমে অনুসন্ধান করা হইল, কারণ পদব্রজে যাওয়া যাইবে কি না সেটা নির্ণয় আবশ্যক কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ঠিক কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কেহ বলে ৪ ক্রোশ, কেহ বলে ৩ ক্রোশ, কেহ বলে ৫ ক্রোশ। এরূপ সন্দেহের মধ্যে শ্রীচরণযুগলকে পরীক্ষা করা সমীচীন বোধ হইল না। মহারাজের নিকট যানের দরবার করা হইল; মহারাজ হস্তী প্রেরণ করিবেন বলিয়া গেলেন। আমরা প্রীষ্টমাস্ বন্ধোপলক্ষে যাওয়া স্থির করিলাম। যথাসময় একটী হস্তী আসিল; আমরা শুভ ১৩ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে ৭ টার সময় যাত্রা করিলাম। যাত্রী হইলাম আমরা ৪ জন। হস্তী একটি, ৪জনে আর হস্তীতে স্বীয় স্বীয় দেহটা চালাইতে সাহস করিলাম না; সুতরাং "কেহ অশ্বে গজে কেহ" হইল। সঙ্গের লোকলস্কর হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে আমাদের অভিযান হইল। ক্রমে সহর ছাড়িয়া আমরা সুবিস্তীর্ণ মাঠে পড়িলাম। মাঠের হৈমন্তিক ধান্য কর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে, বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে ধান্যের মূলগুলি গড়াগড়ি যাইতেছে আর মাঠের মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শাল ও অন্যান্য তরুরাজি দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। দূরে চারিদিকে বনভূমি এবং পর্ব্বতমালার সুন্দর দৃশ্য! মাঠের দৃশ্যটী দেখিয়া প্রাণটা বড় আনন্দিত হইল। মাঠে মধ্যে মধ্যে তসরের গুটির চাষের জন্য শিরচ্ছেদিত 'আসন' বৃক্ষের সপত্র মূলদেশ সমন্বিত 'তসর আড়া' দেখা গেল। এই সব গাছে তসরের গুটি পোষা হয়। এখানে তুঁত বৃক্ষের পরিবর্ত্তে 'আসন' নামক বনজ বৃক্ষে তসরের গুটির পোষণ হয়।

মাঠ ছাড়িয়া আমরা এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সাঁওতাল কৃষক রমণীগণ ও শিশুগণ বিচিত্র বেশধারী আমাদিগকে সোৎকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; আমরাও সভ্যতাবরণে মণ্ডিত হইয়া যথারীতি গাম্ভীর্য্য রক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলাম। এইরূপে ৪।৫ মাইল পথ যাওয়া গেল।

হস্তী যান একরূপ দিল্লীকা "লাড্ডু।" যাঁহারা চড়েন নাই তাঁহারা মনে করেন যে কতই যেন সুখ, আর যাঁহারা চড়িয়াছেন, বিশেষতঃ বিনা হাওদায় কেবল গদীতে যাঁহারা চড়িয়াছেন তাঁহারাও বেশ জানেন যে কতই সুখ—আর যাঁহারা এই অধমের ন্যায় সর্ব্ব পশ্চাতে চড়িয়াছেন তাঁহারা বিশেষ জানেন কতই সুখ! বাস্তবিক যাঁহারা হাতী চড়েন নাই তাঁহাদিগকে আমি বিনা হাওদায় "হস্তী হস্ত সহস্রেণ" দূরে রাখিতে পরামর্শ দেই, আর তথাপি যদি চড়িতে হয়, তবে পশ্চাদ্ভাগে যেন কখন না চড়েন। সেই সুবিশাল নিতম্বের অনবরত উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই রক্ত মাংসের শরীরটার যে উত্থান পতন সহ্য করিতে হয় তাহার তুলনায় দেহ স্বীয় পদ-যান ব্যবহার করিতে সহস্রবার স্বীকার করিবে। আর প্রতি পদবিক্ষেপে মাটির শরীর মাটিতে মিশিয়া যাইবার আশঙ্কা দুই হস্তে প্রাণপণে দড়ি ধরিয়া থাকিতে থাকিতে দুইহাত অবশ হইয়া যায়, তবু বোধ হয় কর্ম্মবন্ধন বুঝি কাটিল। রৌদ্রের তেজ প্রখর হইতে আরম্ভ করিলেও ছত্র ব্যবহারের উপায় নাই "এক হাত মে যে ঢাল, ওর হাত মে যে তরয়াল," সুতরাং 'লড়ার' সুবিধা নাই। ইত্যাদি শত স্বচ্ছন্দতা সহ্য করিয়া যাঁহারা হাতী চড়িতে চান তাঁহারা চড়ুন আপত্তি নাই। আমার তো ৪।৫ মাইলেই যথেষ্ট বা তদপেক্ষাও বেশী হইল। সুতরাং আমরা 'সুখের চেয়ে স্বস্তি' ভাল মনে করিয়া রাজরাজড়াকে অব্যাহতি দিলাম। গল্প গুজবে পথ চলায় কোন কষ্ট হইল না। ক্রমে আমরা ৮'৯ মাইল অতিক্রম করিয়া আসিলাম কিন্তু খেদার কোন চিহ্নই নাই! একটি গ্রামের 'প্রধানের' (রাজস্ব সংগ্রাহক তহশিলদার) বাটীতে আমরা বসিলাম। অতি সুন্দর দুধ, চিনি, মুড়ি আসিল, আমরা তদ্দ্বারা বেশ প্রাতরাশ করিয়া দেহে জোর বাঁধিয়া লইলাম। পথে আবার গমন। চলিতেছি তো চলিতেছি, পথ আর ফুরায় না। পথে যে সব লোক চলিতেছে তাহাদের অনেকেই অসভ্য জাতি। তাহাদিগের দূরত্ব ও সময়ের ধারণা অতিকম অথবা একেবারেই নাই। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিবে একক্রোশ, কেহ বলিবে তিন ক্রোশ।

মোট কথা ক্রোশ নামক দূরত্বের ধারণা তাঁহাদের ক্ষীণ মস্তিষ্কে আসে না। পর্ব্বতমালা যেন আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিতে লাগিল, আমরাও যত চলিতেছি, তাহারাও ততই সরিয়া যাইতেছে। ক্রমে পর্ব্বতের বৃক্ষাদি বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল, একটা টানা হরিদ্বর্ণের লেগ হইতে তাহারা যেন তখন বিভিন্ন ভাবে দেখা দিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম তবে অবশ্য অনেক নিকট হইয়াছি। আবার এক বিস্তৃর্ণ বন মধ্যে প্রবেশ করিলাম। শুকাদি পাখীর সুমধুর রব বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কর্ণে সুধা-বর্ষণ করিতে লাগিল। কত শাল, আমলকী, কুসুম, গাম্ভার, বহেড়া, হরিতকী আরও শত শত অজ্ঞাতনামা বৃক্ষগণ বনে গলাগলি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর মধ্যে মধ্যে পাথরের চাঁই। সে কি বড় সাধারণ পাথর; আট দশ হাত উচ্চ ৪।৫ হাত প্রশস্ত ২।৩ হাত বেধ বিশিষ্ট প্রস্তরের স্তম্ভ সব বিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, কোনটি বা অন্য গুলির গায় ঠেশ দিয়া আছে। কোথাও স্তূপাকার কৃষ্ণ প্রস্তরের এক সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রায় ১৫।২০ হাত স্থান ব্যাপিয়া উচ্চ নীচ ভাবে পড়িয়া আছে, বোধ হয় যেন কেহ প্রস্তর দ্রব করিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি ঢালিয়া দিয়াছে, সেই স্রোত গড়াইয়া এই সব স্থান ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথাও ডেলার মত পাথর কতকগুলি একস্থানে স্তূপ হইয়া রহিয়াছে। ঘুটিং যে কত পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। চারিদিকে বন, অনেকস্থানেই কঙ্কর-ময় মৃত্তিকা, তার মধ্যে এ সব প্রস্তর স্তর কোথা হইতে কে আনিয়া ফেলিয়া গিয়াছে? এ সব প্রস্তরস্তম্ভ কেমন করিয়া এস্থানে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাদের একটি স্থান-চ্যুত করিতে শত শত লোকের শক্তি আবশ্যক! বাস্তবিক আমার মনে এই কথাই উঠিতে লাগিল। ভাবিয়া কূল পাইলাম না! এইরূপ স্থানে আসিলেই বাস্তবিক বিশ্বকর্ত্তার অসীম শক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক আমরা ক্রমে সে বন অতিক্রম করিলাম, পর্ব্বতের দিকে তাকাইয়া বুঝিতেছি যে ক্রমশঃ নিকট হই-তেছি বটে কিন্তু পৌঁছিতে আর পারিতেছি না। পথে পার্ব্বত্য ঝরনা ২।১টা পার হইয়া গেলাম। শেষে মাহুতের মুখে জানিলাম আর খুব অল্প পথ আছে। এক মাইল দেড় মাইল হইবে। তখন আবার সসম্মানে যাইবার জন্য গজাশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার উদ্‌ঘাতানুদ্‌ঘাত সহিতে সহিতে আমরা চলিলাম। শেষে শ্রম সফলতায় পৌঁছিল; হাতীধরার ঘের দেখা গেল। আর লোক জন, অগ্নিকুণ্ড সব দেখা গেল। আমরা তাহা অতিক্রম করিয়া যেখানে মহারাজার নিবাস স্থাপিত হইয়াছে, তথায় উপনীত হই-লাম, কারণ আমাদের ও তথায়ই বিশ্রামের স্থান ও মাধ্যা-হ্নিক ক্রিয়ার স্থান! আমরা আজ মহারাজের অতিথি। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা সাড়ে বারটা হইয়াছে। মহারাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া খেদার স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

যেখানটা নিবাস স্থাপিত হইয়াছে সেটা বহির্বেষ্টনের অতি সমীপবর্ত্তী। সেই জনশূন্য বিজনে যেন একটি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। বনজ পত্রপল্লবের দ্বারা কতকগুলি পর্ণ-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। রামচন্দ্র বনবাসে পর্ণকুটীরে বাস করিতেন শুনিয়াছিলাম, পর্ণকুটীর (প্রকৃত পক্ষে) দেখি নাই; আজ দেখিলাম ময়ূরভঞ্জ রাজ শ্রীরামচন্দ্রও পর্ণকুটীরে বন-বাসকাল কর্ত্তন করিতেছেন। পাতার ছাউনি ছোট ছোট কুটীরগুলি দেখিতে বেশ। উপরে খড়ের এক পরদা পাতলা ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। সেই সব কুটীরেই মহারাজ তাঁহার ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য লোকজন সকলে বাস করি-তেছেন। চাউল, ময়দা, ঘৃত, জলখাবার, পান প্রভৃতির দোকান বসিয়াছে, গাঁজা, আফিংয়ের দোকান পর্য্যন্ত আসিয়াছে। খেদার কার্য্যে নিযুক্ত লোক ব্যতীত দর্শক ও কর্ম্মচারী বর্গে প্রায় এক হাজার বা ততোধিক লোক এখানে রহিয়াছে সুতরাং এ বিজন যে এক বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইবে তার আর বিচিত্র কি? একটী পার্ব্বত্য ঝরণা নিবাসের নিকট দিয়া প্রবাহিত। সেই স্বল্পতোয়া নির্ঝরিণীতেই এতলোকের পান, স্নানাদি সম্পন্ন হইতেছে সুতরাং সে জল যত পরিষ্কার আছে বুঝিতেই পারা যায়, তথাপি পার্ব্বত্য ঝরণার জল বলিয়া তাহাতেও লোকের কোন অসুখ হয় নাই। মহারাজ ইচ্ছা করিলেই রাজ-ধানী হইতে স্বীয় ব্যবহারের উপযুক্ত যথেষ্ট জল, তাম্বু, ও অন্যান্য আসবাব লইতে পারেন, তাঁর অভাব কি? কিন্তু তিনি নিজ সুখস্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। পর্ণকুটীরে সকলের সঙ্গে সমান সুখে বাস করিতেছেন! এবিষয়ে তিনি অতুলনীয়! আমরা পৌঁছিয়া একটু

বিশ্রাম করিয়াই আহারাদি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিলাম, এবং তার পর একটু বিশ্রাম করিয়া হাতীর খেদার অন্তর্ব্বে-ষ্টন স্থলে যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

যে স্থানটি খেদার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেটি একটি পর্ব্বতের সানুদেশ। পর্ব্বত হইতে হস্তীগণ এইসব পাদ-দেশও বনে আহারান্বেষণে নামিয়া আইসে। সকলেই জানেন হস্তীগণ দল বাঁধিয়া ভ্রমণ করে। এক এক দলে ১টি ২টি কি ৩টি এইরূপ দাঁতাল (পুরুষ) হস্তী থাকে আর তাহাদের অধীনে ২০।২৫।৩০ কি ততোধিক হস্তিনী থাকে। হাতীগুলো বড় বহুবিবাহ পরায়ণ। এই দন্তিগণ অগ্রগামী হইয়া চলে, কেহ পশ্চাতেও থাকিয়া দলকে রক্ষা করে। ইহাদের নারী পূজা বা Gallantry খুব। দন্তীদিগের নিকট হস্তিনীগণের কোন ভয় নাই। দন্তিগণ হস্তিনীকে কিছু বলে না। এইরূপ দল বাঁধিয়া হাতী জঙ্গলে নামিলে আড়-কাটিগণ তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। হাতীরা বেলা ২।৩ টার সময় আহারান্বেষণে বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি চরিয়া বেড়ায়, ভোরবেলা একটা নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে শুইয়া অগাধ নিদ্রা যায়। শোওয়ার সময়েও সকলে মাথা একদিকে রাখিয়া শোয়। প্রাতঃকাল হইতে ১টা ২টা পর্য্যন্ত ইহাদের ঘুম ভাঙ্গে না। ইহাদের এই শয়ন-স্থান আড়কাটিগণ নির্ণয় করিলে পর একদিন প্রাতে তাহারা যাইয়া ঘুমন্ত দলটাকে গণনা করিয়া আসে যে কতগুলি দন্তী, কতগুলি হস্তিনী কতগুলি করভ অর্থাৎ শাবক আছে। এদিকে যে বনটাতে হাতী সব আসিয়াছে, সেই বনটার চতুর্দ্দিকে বহুবিস্তৃত করিয়া একটা বেষ্টন দেয়। কোন বার ১ মাইল ২ মাইল কোন বার ৪.৫ মাইল পরিধি স্থল বেষ্টিত হয়। বর্ত্তমান খেদার বেষ্টন ৫ মাইল পরিধি পরিমিত স্থল। এইটা হইল বহির্বেষ্টন। ইহাকে এখানে "জগৎবেড়" বলে। এ বেষ্টন কিছুই নয়, ৩.৪ হাত দূরে দূরে একটা একটা ৩।৪ হাত উচ্চ কাঠ বা ডাল, তাহাতে আবার এক সারি কি দুই সারি করিয়া সরু সরু ডাল বাঁধিয়া কোন প্রকারে একটা বেড় দেওয়া মাত্র। হস্তীতো দূরে থাকুক একটা কুকুর ছাগলেওইহা বোধহয় ঠেলিয়া ভাঙ্গিতে পারে। এইরূপ বেড়া এই ৫ মাইল পথ বৃত্তাকারে বনটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তো অবাক্ হইলাম যে এই বাধা হাতী মানে কেন? তার পর দেখিলাম যে বেড়া উপলক্ষ মাত্র। এইসব বেড়ার নিকটে নিকটে ৫।৭।১০ হাত দূরে দূরে এক এক খানি ছোট পর্ণকুটীর, তাহার মধ্যে একজন কি দুজন করিয়া অসভ্য কুলী, আর সম্মুখে এক এক অগ্নিকুণ্ড, আর মধ্যে ফাঁকা একটা একটা কাঠের খোল আর ২খানা করিয়া কাঠি। "জগৎ বেড়ের" গায় ৫।৬ হাত পরিমাণ করিয়া অনেক শালের ডাল কোপাইয়া মাথা সব থেঁত্‌লান রহিয়াছে। জানিলাম যে এই সবই হাতীর নিবারণের বাধা। এই সব রক্ষীবৃন্দের সংখ্যা কম নহে—এক হাজারের উপর. ইহারা প্রত্যেকে রোজ ।১০ হিসাবে পায়। যখন হাতী সব বৈকালে খাইতে বাহির হয় তখন যদি চরিতে চরিতে এই জগৎ বেড়ের নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া বৃক্ষাদি সঞ্চালনের ইঙ্গিতে রক্ষীগণ বুঝিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ ঐ ছোট দুই খণ্ড কাঠি দ্বারা তাহার কাঠের সেই খোলটাতে অবিরাম ঘা দিতে থাকে, "খট্ খট্, খটা খট্," শব্দ অবিরাম কাঠের খোল হইতে ধ্বনিত হইতে থাকে, আর সেই দিককার রক্ষীরা 'হৈচৈ' আরম্ভ করে। এই গোলমালের শব্দে হাতীগুলো ভয় পাইয়া সেদিক ত্যাগ করিয়া যায়।

হাতীর প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে উহারা কর্কশ উচ্চশব্দ একেবারে শুনিতে পারে না। উহাদের কর্ণপটহ বোধ হয় বড় পাতলা, তাই উচ্চ শব্দে উহারা বড় উদ্বেজিত হয় ও বড় ভয় পায়, আর আগুন দেখিলেও বড়ই ভীত হয়। তাই জগৎ বেড়ের রক্ষীগণ দিনে কেবল ঐরূপ শব্দই করে; রাত্রে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কুটীরের সম্মুখে বড় বড় কাষ্ঠ দ্বারা আগুনের কুণ্ড প্রজ্বলিত করা হয়। একটু গাছপালার শব্দ হইলেই অমনি যেদিকে গাছপালা নড়ি-য়াছে সেই দিক হইতে 'খট্ খট্ খটাখট্' শব্দ একতালে বাজিয়া কর্ণ বধির করিয়া দেয়, আর আগুন জ্বলিতে থাকে, হাতী শব্দ ও অগ্নি উভয়ের সম্মিলন দেখিয়া আর সেদিকে অগ্রসর হয় না। ক্লোরেট্ পটাসের পটকা ও মধ্যে মধ্যে বন্দুকও থাকে, নিতান্ত আবশ্যক হইলে পটকা ছোড়া ও বন্দুক আওয়াজ করা হয়। বন্দুকের আওয়াজ অবশ্য ফাঁকা। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে ঐরূপ সামান্য বেড়াতেই অমন বলশালী জন্তুকে কেমন করিয়া আটক করা হয়। আহা! উহার বিবেচনা শক্তি থাকিলে যদি এই শব্দ ও অগ্নিশিখা উপেক্ষা করিয়া সে অগ্রসর হইত

তবে কাহার সাধ্য উহাকে বাঁধে? সকলে প্রাণ লইয়া পলায়নের পথ পাইত না! কিন্তু তাহার অত্যন্তাভাব! তাই সহস্রগুণে হীনবল মানব কৌশলে উহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। আমরা বাহিরের বেড় দেখিয়া ক্রমে তাহার ধারে ধারে অগ্রসর হইতে হইতে ভিতরের বেড়ের পথের নিকট পৌঁছিলাম। তথায়ও জগৎবেড়ের বাহিরে দুইখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ ঔৎসুক্য বশতঃ অনেক সময় সেখানেই থাকেন; কারণ সেটা আদত বাসা হইতে অনেক নিকট। আমরা জগৎবেড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম এবং কিছুদূর গমন করিলে পর (প্রায় ১০০ হাত কি তারও বেশী) ভিতরের বেড়ের নিকট পৌঁছিলাম। সেটিও একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র। তাহার ব্যাস প্রায় ২০ হাত কি ২৪ হাত হইবে। চতুর্দ্দিকে মোটা মোটা কাষ্ঠের দ্বারা বেষ্টন নির্ম্মিত হইয়াছে। কাঠগুলির এক হাত দেড়হাত মাটিতে পোঁতা; আর বেশ গায় গায় আঁটা সাঁটা ভাবে সাজান। কাঠগুলি মাঝারি রকম মোটা। প্রায়ই মোটা মোটা সুপারি গাছের মত মোটা। তাহাদের গায় গায় আড়াআড়ি ভাবে দুইদিকে কাঠ দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া আরও মজবুত করা হইয়াছে। বেষ্টনগুলি মাটি হইতে ৫।৭ হাত উচ্চ। ইহার বহির্দ্দিকে বেষ্টনের গায় গোল করিয়া ২হাত পরিমাণ পরিসর মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে। দর্শকবৃন্দ এই মঞ্চে বসিয়া ভিতরের ব্যাপার দেখিবেন। এই মঞ্চ ব্যতীত ৪টি নবহৎ থানার মত উচ্চ মঞ্চও প্রস্তুত হইয়াছে, তথায় রাজবাড়ীর আত্মীয় যুবকগণের কেহ কেহ উপবেশন পূর্ব্বক হাতীধরা দেখিবেন। মহারাজের জন্যও একটি ঐরূপ মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে। বেষ্টনের বাহিরে এখানেও অনেক স্থলে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইবার স্থান ও উপকরণ প্রস্তুত আছে। আমরা বেড়টা ঘুরিয়া ইহার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। মহারাজ সেখানে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং গেটের বন্দোবস্ত পাকা করিতেছেন। আমরা শুনিলাম দুই দিন পূর্ব্বে একটি দন্তী বেড়ে পড়িয়াছিল কিন্তু গেট ভাঙ্গিয়া সে পলায়ন করিয়াছে, তাই আজ গেটের এত বেশী পারিপাট্য! গেটের পথটির পরিসর প্রায় ৫ হাত কি ৬ হাত হইবে। এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটি শালবৃক্ষ, অন্য প্রান্তে প্রকাণ্ড এক শালের গুঁড়ি প্রোথিত। তাহাদের পার্শ্বেই আধ হাত অন্তরে একরেখায় আর একটি একটি করিয়া দুটি বৃহৎ শাল স্তম্ভ। ইহারা উচ্চে দশ বার হাত হইবে। ইহাদের শিরোদেশে আড়াআড়ি ভাবে একটা কাষ্ঠ দুই দিকে ছিদ্র করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেন প্রকাণ্ড একটা 'হরাইজণ্টাল' বার, এই উপরের কাঠটার সহিত খুব মোটা এক গাছা জাহাজি কাছির মত কাছি (দড়া) জড়ান আছে।

এই দড়ার একপ্রান্তে প্রকাণ্ড গেটের দরজা ঝুলিতেছে, অপর প্রান্ত গেট হইতে অল্প দূরে স্থিত এক শালবৃক্ষের গায় বাঁধা আছে। এই শালবৃক্ষের সহিত একটী মঞ্চ বদ্ধ আছে। সেই মঞ্চ হইতে মানুষ হাত দিয়া ঐ দড়ির প্রান্ত পাইতে পারে। এই মঞ্চে যে মানুষ বসিয়া থাকে, সে হাতী ভিতরে প্রবেশ করিলে, দড়িটার যে প্রান্ত শাল বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধা সেই প্রান্ত কাটিয়া দেয়, অমনি সে প্রকাণ্ড দরজা সশব্দে পতিত হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া ফেলে। দরজা খানি ত সাধারণ নহে। সেও মোটা মোটা শালের প্রকাণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত, খুব মজবুত, খুব পুরু, তাহাকে নাড়িতে চাড়িতে প্রায় একশত বা ততোধিক লোকের আবশ্যক। এই দরজার ভিতর পিঠে অঙ্গুলির মত মোটা সূক্ষ্মাগ্র লোহার কাঁটা ৪।৫ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর শক্ত করিয়া মারা আছে। ভিতরে গেটের নিকট যে শালস্তম্ভ আছে তাহারও গায় ঐরূপ কাঁটা মারা। এদিকে বাহিরে যেটা কৃত্রিম স্তম্ভ অর্থাৎ প্রোথিত তাহাকে আরও মজবুত করিবার জন্য আর একটি শাল স্তম্ভ দ্বারা তাহাকে ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছে; তার পর আগুন, বন্দুক, পটকা, লোকের চীৎকার এ তো আছেই। তবু অনেক সময় গেট ভাঙ্গিয়া গজরাজ পলায়ন করেন। ধন্য শক্তি!

মহারাজ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়ের মধ্যে গিয়া তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী দেখাইলেন। বেড়ের মধ্যে বড়, মাঝারি, রকম শালের গাছ ৪।৫টা রহিয়াছে। বাহিরের গোল বেষ্টন পরিধি হইতে চতুর্দ্দিকে ৫।৬ হাত বিস্তৃত একটি পরিখা খনিত হইয়াছে, তাহার দুই মুখ গোল হইয়া গেটের পাশে আসিয়া মিশিয়াছে। গেটের পথটি কেবল খনিত হয় নাই। এই পরিখা সোজা সুজি নহে। উপর হইতে দুই দিকেই খুব ঢালু হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে সুতরাং

যত নীচে ততই পরিসর কম, একেবারে নীচে বোধ হয় অর্দ্ধ হস্ত পরিসর হইবে; আর যত উর্দ্ধ ততই পরিসর বেশী হইয়া শেষ ৫।৬ হাত বেষ্টনে শেষ হইয়াছে। এই পরিখার গভীরতা ৫।৬ হাত হইবে। পরিখার ভিতর ধারে মৃত্তিকার ২ কি ২½ হাত উচ্চ স্তূপ ঢালু হইয়া রহিয়াছে। সে স্তূপের নীচের পরিসর বেশী উপরে সূক্ষ্ম; অর্থাৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠ বা হস্তীপৃষ্ঠ বৎ। সেই স্তূপের বাঁধও পরিখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া গেটের নিকটে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সেই বাঁধের মধ্যকার স্থলটি সুতরাং বাঁধ হইতে ২ হাত পরিমাণ নিম্ন হইয়াছে, এবং সে স্থানটা গেটের পথের সহিত সমতল। সেইখানে হস্তীর প্রলোভনীয় খাদ্য সমূহ ছড়াইয়া রাখা হয়। ধান্য, ইক্ষু, কদলী বৃক্ষ ইত্যাদি সে খানে রাখা হয়। আর শাল, এবং অন্যান্য বন্য বৃক্ষের ডাল পুঁতিয়া সে জঙ্গলটি এমন করিয়া সুসজ্জিত করা হয় যে দেখিলে কুঞ্জবন বলিয়া ভ্রম হয়, একটা ফাঁদ বলিয়া কখন অনুভূত হয় না। গেটের ভিতরের পথেরও দুধারে ঐরূপ কৃত্রিম বৃক্ষক সমূহ প্রোথিত করিয়া সুসজ্জিত করা হয় এবং বাহিরের স্থানগুলিতেও ঐরূপে ডাল সব প্রোথিত করিয়া বনভূমির সহিত স্থানটির একত্ব সম্পাদিত হয়। আর মধ্যে মধ্যে ধান্যের গুচ্ছ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই বেড়ের গেটের পথ হইতে হস্তীদিগের বিশ্রামের স্থান পর্য্যন্ত পথেও এইরূপ ধান্য গুচ্ছ, ইক্ষু দণ্ড, কদলী দণ্ড, প্রভৃতি ছড়াইয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য যে এইরূপ খাদ্যের প্রলোভনে পড়িয়া খাদ্যের অনুসরণ করিতে করিতে বেড়ের মধ্যে উপস্থিত হইবে। বস্তুতঃও তাই ঘটিয়া থাকে। মহারাজ অকুতোভয়ে আমাদিগকে লইয়া সেই পথেও অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া ছড়ান খাদ্যাদি সব দেখাইলেন পরে আমাদিগকে বাসায় গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। এবং ৭।৮টা রাত্রির সময় প্রস্তুত হইয়া যাইতে বলিলেন। তখন বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুনিলাম হাতী সব চরিতে বাহির হইয়াছে। জগৎ বেড়ের রক্ষীবর্গ সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিল। কিছুকাল পরেই আমরা খটাখট্ শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনিতে লাগিলাম; হাতী সব ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং জগৎ বেড়ের নিকটস্থ হইতেছে, তাই রক্ষীগণ ঐরূপে তাহাদিগকে দূর করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, খুব শীত, আমরা আমাদের কুটীরের সমীপস্থ অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া গল্প করিতেছি ইতিমধ্যে হস্তিগণের বৃংহিত ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম উহারা চরিয়া বেড়াইবার সময় ঐরূপ ধ্বনি করিয়া থাকে, ভীত হইলে চীৎকার করে। চীৎকারের শব্দে বুঝিলাম যে চারিদিকেই তাহারা বেড়াইতেছে। এক এক বার চীৎকার আমাদের নিকটস্থ বোধ হয় আর ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে পটকার শব্দ, বন্দুকের শব্দ আর 'খটাখট্' শব্দ কর্ণ বধির করিয়া তুলে, অমনি চীৎকার আবার দূরে চলিয়া যায়। এইরূপে কিছুকাল থাকিতে থাকিতেই খেদা বেড়ের দিক হইতে যুগপৎ বন্দুকের আওয়াজ, লোকের গোলমাল ও হস্তীর উচ্চ চীৎকার শুনিলাম। প্রাণ দুর্দুর্ করিয়া উঠিল। 'খটাখট্' শব্দের বিরাম নাই। সংবাদ পাইলাম হাতী কোর্টে পড়িয়াছে। অমনি সকলে ছুটিয়া চলিলাম। খেদা কোর্ট বাসা হইতে এক মাইল পথ হইবে। ছুটিতে ছুটিতে জগৎ বেড়ের প্রবেশপথে উপস্থিত হইলাম। নিকটস্থ লোকেরা বলিল যে একটা দন্তী কেবল পড়িয়াছে, অতএব এখন বেড়ের মধ্যে আলো না লইয়া যাওয়া আশঙ্কাজনক। আলোর অভাব ছিলনা, অসংখ্য শালের ডালের মশাল (পিকা) জ্বালান হইয়াছে। শালের ডালগুলিতে ধূপরস থাকায় সুন্দর মশাল হয়। আমাদের আগে পাছে ৫।৭টা মশাল চলিল, আমরা নির্ব্বিঘ্নে খেদা কোর্টের নিকট পৌঁছিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলাম। মঞ্চের চতুর্দ্দিকেই লোকে লোকারণ্য! অনেক লোকের হাতেই শালের মশাল, আর 'একমোণা' নামক অস্ত্র,—একমোণাগুলি খুব লম্বা বাঁশের কঞ্চির মাথায় একটি একটি সুতীক্ষ্ণ লৌহকীলক যুক্ত অস্ত্র! বন্দুকধারীগণ চারিদিকে বন্দুকে ফাঁকা বারুদ চড়াইয়া প্রস্তুত আছে; পটকাও যথেষ্ট লোকের সঙ্গে আছে। লোকের উল্লাস উৎসাহ কত! মহারাজ এক মঞ্চে প্রশান্তোৎফুল্লবদনে বসিয়াছেন। আমরা উৎসুকনেত্রে বেড়ের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম। সুবৃহৎ দন্তযুগলসমন্বিত অতি সুগঠিত গজরাজ ক্রোধে দাঁড়াইয়া ফুলিতেছেন। আহা! বেচারা সুসজ্জিত কুঞ্জবন দেখিয়া বড় উল্লাসে উপভোগ করিতে আসিয়াছিল, এখন তাহার

ফল ভোগ করিতেছে! আহার বিহার কোথায় গিয়াছে, অনবরত শুণ্ড দ্বারা ভূমিস্থিত ধান্য, শাল পল্লবাদি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে, সব লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, আর শুণ্ডে করিয়া খড় মাটি তুলিয়া স্বীয় পৃষ্ঠ দেশে নিক্ষেপ করিতেছে। বন্য হস্তীর গঠন কি সুন্দর, মধুর সুডৌল সুগঠিত দেহ! পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখিবার যো নাই, একেবারে টান্‌টান ভাবে চর্ম্মগুলি রহিয়াছে। মস্তকটি প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড দন্ত দ্বয়ের একটি ভগ্নাগ্র, কর্ণ দ্বয়ের একটি স্থানে স্থানে ছিন্ন, বোধ হয় বনে অন্য বন্যগজের সহিত যুদ্ধে এই ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক শুনিলাম পথে যাইতে যাইতে বেড়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া এইটিই প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, অন্য গুলি কিছু পশ্চাতে ছিল। এমন সুন্দর বৃহৎকায় দন্তী দেখিয়া আর অন্যগুলির আগমনের বিলম্ব সহিতে ভরসা হয় নাই, অমনি দড়ি কর্ত্তিত হইয়াছে, সশব্দে গেট পড়িয়া গজরাজকে বন্য জীবন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। গেটের দরজার নিকট বাহিরে ৪।৫ জন বন্দুকধারী বসিয়া আছে, আর দরজার ফাঁকের মধ্য দিয়া ৫।৭টা শালের মশাল চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গজরাজ ভয়ে সে দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এক একবার একদিকে এমন করিয়া রোখ্ করিয়া ছুটে যে প্রাণে ভয় হয় যে এইবারই বুঝি বাহির হইল, লোকজন সব খুন হইল, কিন্তু মাটির স্তূপের উপর উঠিয়াই সম্মুখে দেখে বিশাল চালু গহ্বর, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ, একমোণার খোঁচা, 'হৈ হৈ' চীৎকার আর মশালের আগুন, সুতরাং বিফলমনোরথে পশ্চাৎপদ হইয়া যায়। সময় সময় রাগে মাটির বাঁধের মাটি সমস্ত দর্শকদিগের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করে, কোটের মধ্যে ডাল পালা থাকিলে শুঁড়ে করিয়া তাহাও ছুড়িয়া মারে, কিন্তু যে দিকে মারিতে যায় সেই দিকেই ঐরূপ সব উৎপাত, সুতরাং সব সময় পারে না। আর সেই জন্য মধ্যে মোটা ডাল পালা রাখা হয় না। মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্যে ঘোররবে চীৎকার করিয়া উঠে, কখন রোখ্ করিয়া ছুটিয়া গিয়া বাধা পাইয়া 'কঁা' 'কঁা' করিয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসে। আহা, মনে যেন বড় কষ্ট লাগিল! বেচারার স্বাধীনতা সুখ হরণ করিয়া লইয়া আমরা এই উল্লাস করিতেছি—আর সে স্বাধীনতা পাইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া আমরা কত বাধা দিতেছি, আর তাহাকে দুষ্ট, রাগী বলিয়া গালাগালি দিতেছি! জগতের রীতিই এই! রোমের প্রাচীন গ্লাডিয়েটোরিয়েল যুদ্ধের (Gladiatorial Fight) বিবরণের সঙ্গে এই বন্য গজের চেষ্টার অনেক সমতা মনে হইল।

যাহাহউক বিস্মিত ও ভীত হৃদয়ে কিছুকাল এই অদৃষ্টপূর্ব্ব করুণ দৃশ্য দেখিলাম। লোকে উৎসাহে মাতিয়া গিয়াছে। আমরা বুঝিলাম সমস্ত রাত্রি সে এইরূপ চেষ্টাই করিবে এবং লোকজন সকলে সমস্ত রাত্রি এই সব বন্দুক, মশাল, একমোণা আর চীৎকার লইয়া উহাকে বাধা দিবে। গেটের দিকে খুব বেশী রোখ্, সুতরাং সাবধানতাও সেই দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমরা তখনকার মত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মহারাজের আহার নিদ্রা নাই, তিনি রহিলেন, অধিকাংশ লোকজন সবই রহিল। আমরা বাসায় আসিয়া রাজভোগে জলযোগ করিয়া পর্ণকুটীর খাটিয়ায় শয়ন করিলাম। বিছানা পত্র সঙ্গে লইয়া ছিলাম। যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম হস্তিযূথের চীৎকার—কাতর চীৎকার আর বন্দুকের আওয়াজ, 'খটা-ট্' শব্দ অবিরাম শুনিতে লাগিলাম। শেষে ঘুমাইয়া গেলাম। শব্দাদি অবশ্য সমানভাবে সমস্ত রাত্রিই চলিয়াছিল।

শেষ রাত্রে গ্রহণ জন্য সাধারণ সকলে হরিবোল দিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙ্গিলে শুনিলাম শেষ রাত্রি হইতে গজরাজ বড় অত্যাচার করিতেছেন এবং নিষ্কৃতির পক্ষে উদ্দাম যত্ন চেষ্টা করিতেছেন। আমরা প্রাতঃকালে আবার মঞ্চাশ্রয় করিলাম। এবার মহবৎ মঞ্চ আশ্রয় করিলাম। শুনিলাম আজই হাতি বাঁধা হইবে। কিন্তু তখনও যেরূপ অশান্ত তাহাতে কিরূপে বাঁধা হইবে বুঝিলাম না। তখনও সে তাহার দুর্দ্দমনীয় তেজ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতেছে। আমরা শুনিলাম এখন উহাকে আফিং খাওয়ান হইবে। এইরূপে আফিং খাওয়ান হইলে নেশার ঘোরে তেজ হ্রাস হয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমায়। ইহাও তাই। অবিলম্বেই আফিং আসিল, এবং মুড়ির মোয়া আর ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে আফিং পুরিয়া তাহার নিকটে ফেলিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। সারারাত্রি অনাহার, তার পর এত আরাম, সুতরাং গজরাজ সেই বিষপূর্ণ খাদ্য আহার করিতে লাগিল। মোয়া বড় খাইল না, ইক্ষু উহাদের

বড় প্রিয়, তাহা খুব খাইতে লাগিল আর মধ্যে মধ্যে রোখ্ করিতে লাগিল। আফিং প্রায় আধ পোয়া পরিমাণ নাকি খাওয়াইবার কথা, নতুবা অত বড় দেহে নেশা জন্মিবে কেন? ক্রমে নেশা জন্মিতে লাগিল, হাতী মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বোধ হয় তার মনে হইতে লাগিল যে কি এক অভূতপূর্ব্বভাবে তাহাকে জড়ীভূত করিতেছে, তখনই একবার গাঝাড়া দিয়া বহির্গমনের রোখ্ করিতে লাগিল; কিন্তু তেজ কমিয়া আসিয়াছে। বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এখন ভিতরে প্রবেশের পথ করিবার ধুম পড়িয়া গেল। বেড়ের বেষ্টনের একটা স্থান পূর্ব্ব হইতেই পথ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যে মহবৎ মঞ্চে বসিয়াছিলাম, তাহার ঠিক পার্শ্বস্থস্থানই পথের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সে স্থানের গায়ে যে মঞ্চ ছিল তাহার কতকাংশ খুলিয়া বেড়ের কাষ্ঠগুলি উঠান বা কাটা হইতে লাগিল, আর ডালপালা দ্বারা আটি বাঁধা কতকগুলি বোঝা প্রস্তুত করিয়া সেগুলি বেড়ের পথের সম্মুখস্থ পরিখায় ফেলা হইতে লাগিল। এইরূপে ডালের বোঝা ফেলিয়া পরিখার সেই অংশের দুই কি তিন হাত পরিমিত স্থান পুরিয়া ফেলা হইল। তাহার উপর ছোট ছোট কাঠ ফেলিয়া শক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তার উপর কিছু মাটিও ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পথের ঠিক দুই পার্শ্বে বন্দুক একমোণাধারীগণ দাঁড়াইয়া আছে। বন্দী দন্তী সময় সময় এই নব পথে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু বন্দুকাদির বোরাত্মে সফলকাম হইতে পারিল না, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

এ দিকে রাজার পোষা হস্তীগুলি সব বাহিরে জমা করা হইয়াছে। দন্তী ছয়টি আর হস্তিনী ৬টি। দন্তীগুলি ভিতরে যায় না, গেলে মহাযুদ্ধের সূচনা হইবে; তবে বিপদাপদ আশঙ্কায় তাহাদিগকে প্রস্তুত রাখা হয়। হস্তিনীগুলিকে ভিতরে লওয়া হয় এবং তাহাদের সাহায্যেই ধৃত হস্তীর বন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হয়। পথ প্রস্তুত হইলে হস্তিনীগণকে ভিতরে লইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। মাহুতের সর্দ্দার মিঠাইবারা বনদেবতার পূজা করিয়া লইল; এই পূজা না হইলে তাহারা ভিতরে প্রবেশ করে না। পূজা করিয়া প্রবেশ করিলে কোন বিপদ হইবে না এই তাহাদের বিশ্বাস! হস্তিনীগণের প্রবেশপথ এরূপ হইয়াছিল যে একবারে একটি হস্তী ব্যতীত বেশী প্রবেশ করিতে পারিবে না। মাহুতেরা এই হস্তিনীদের দেহে দড়ি জড়াইয়া লয় যে তাড়াতাড়ি নামা উঠার সুবিধা হয়। তাহারা ঠিক হাতীর ঘাড়ের উপরে উবু হইয়া মুখখানি কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া হাতীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া রহিল। অনেক সময় তাহারা হস্তীর গায়ের রংএর অনুরূপ বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে যে ধৃত হস্তী লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না। এবার তাহারা সেরূপ কিছু করিল না। প্রত্যেকের হস্তে অঙ্কুশ এবং একমোণা। একমোণাগুলি হাতীর গায়ের সঙ্গে সমান্তরভাবে লাগাইয়া রাখে। এইরূপে সজ্জীভূত হইয়া একটি হস্তীনীকে মাহুত পথের নিকট চালাইয়া দিল, হস্তিনী পথের ধারে গিয়া ডালপাতার পথটা ভাল করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া গেল, প্রবেশ করিল না। একের পর এক আসিল, কেহই পথে পা দিল না। মাহুতের অঙ্কুশ, আঘাত সব উপেক্ষা করিল।

হাতী সব আমাদের উচ্চমঞ্চের নিকট জমায়েৎ হইল, আর মধ্যে মধ্যে তাহার শুণ্ড পরিক্রমণ তো বড় সহজ নয়, আমাদের মঞ্চ বিশেষ কম্পিত হইতে লাগিল; হস্তী ধরা দেখিতে আসিয়া জীবনটা এ বিজনে বিসর্জ্জনের অভিপ্রায় কাহারও ছিল না, সুতরাং আমরা আস্তে ব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া বেড়ের পার্শ্বস্থিত মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলাম। হস্তনীগণ পথটাকে মজবুত বোধ করে নাই তাই প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। পরে সর্ব্বকনিষ্ঠা হস্তিনীকে অনেক কষ্টে সেই পথে লইয়া যাওয়া হইল, সে সাবধানে পা ফেলিয়া পরিখা পার হইয়া অপর পারে মৃৎস্তূপের উপর উঠিল; একজন নির্ব্বিঘ্নে পার হইল দেখিয়া অপর গুলিও ক্রমে ক্রমে সাবধানে অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। গমনকালে ইহাদের সাবধানতা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যাহা হউক মাহুতগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়াই হস্তিনীগুলিকে এরূপ কৌশলে চালিত করিতে লাগিল যে প্রত্যেক হস্তিনীর পশ্চাদ্দেশ বন্দী হস্তীর দিকে ফিরান থাকে। গজরাজ এই সব নব সমাগতা হস্তিনী দেখিয়া আস্তে আস্তে শুণ্ড উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হইল এবং শুণ্ডদ্বারা উহাদের গাত্র আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মাহুতদিগের দৃষ্টি আছে যে কখন হস্তী ইহাদিগের সম্মুখে না

আসে। গজরাজ কিন্তু কিছুকাল ইহাদের দেহাঘ্রাণপূর্ব্বক ইহাদের শরীরে দন্তাঘাত আরম্ভ করিলেন। সকলে ভীত হইয়া পড়িল। হস্তিনীগুলি চীৎকার করিয়া পথের ধারে জড় হইল, পলাইয়া আসাও সহজ নয়, থাকাও কঠিন, অমনি বন্দুকের শব্দ আর হৈচৈ আরম্ভ হইল, দন্তী ফিরিয়া স্বস্থান অধিকার করিল! এরূপ ঘটনা সাধারণতঃ হয় না। হস্তিনীদিগকে উহারা কিছু বলে না! কিন্তু এ দন্তীটী বড়ই সামাজিক। সকলে বলিলেন "ও একা থাকায় ওরূপ হইতেছে, আর বিশেষতঃ উহার মদস্রাব হইতেছে তাই কিছু রাগী হইয়াছে। বাস্তবিক চক্ষুর একটু দূর পার্শ্বদেশ হইতে গণ্ডদেশের অনেকটা স্থানসিক্ত হইয়াছে দেখিলাম। ওই মণ্ডি বা মদক্ষরণ। ভাল, কবিবর্ণিত মদক্ষরণটা চক্ষে দেখিলাম। এদিকে মাহুতগণ অনেক কষ্টে হস্তিনী গুলিকে কিছু হটাইয়া হস্তীর সমীপবর্ত্তী করিল, আবার গজরাজ আসিল, আঘ্রাণ করিল, আবার দন্তাঘাত আরম্ভ করিল এবং দন্তাঘাতে একটি হস্তিনীর পশ্চাতের উরুদেশে গভীর ক্ষত করিয়া দিল; হস্তিনীগণ এবার বড়ই ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তাহাদের মাহুতগণ অতি কষ্টে তাহাদিগকে সংযত করিতে লাগিল। মাহুতগণও বড় ভীত হইয়া পড়িল, একটি মাহুত তো এমনি কাঁপিতে লাগিল যে তাহার উপরে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সে দীনভাবে আর একজনকে শীঘ্র আসিতে বলিতে লাগিল এবং আসার দেরী দেখিয়া হাতী ছাড়িয়াই সে সেখানে নামিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, সকলে তাহাকে তাহা করিতে বিশেষ নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু বেচারার প্রাণের ভয়—সে মানিবে কেন? যাহা হউক আর একদল পাকা মাহুত বেড়ের মধ্যে গিয়া পূর্ব্বের মাহুতগণকে বিদায় দিল, এবং তাহারা বিশেষ সাহস ও কৌশল সহকারে স্বীয় স্বীয় হস্তিনীকে পেছু হটাইয়া হস্তীর নিকট লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এখন বেলা প্রায় একটা! এই সময় এক পশলা বৃষ্টি আসিল, সঙ্গে ছাতা ছিল না সুতরাং ভিজিতে ভিজিতে বাসায় গেলাম; মহারাজ রহিলেন মঞ্চের নীচে; শীঘ্রই তাঁহার ছাতা আসিল। আমরা বাসায় গিয়া স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া আবার আসিলাম। তখন দেখিলাম হস্তীর পদে সরু দড়ি বাঁধা হইতেছে। মাহুতদিগের ক্রমাগত চেষ্টায় হস্তিনীগণ পশ্চাৎ হটিয়া হটিয়া ঠিক হস্তীর পশ্চাৎদেশে নিজ পশ্চাৎ দেশ সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুই হস্তিনী এইরূপে হস্তির পশ্চাৎদেশ স্বীয় স্বীয় নিতম্ব দ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছে। হস্তিনীগণ পশ্চাৎ ফিরিয়াও কখনই হস্তীর সম্মুখে যায় না, তাহা হইলে হয়ত দন্তাঘাত করিতে পারে। তাহারা স্বীয় নিতম্ব হস্তীর নিতম্বে লাগাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গজরাজ উহাদের এই স্পর্শসুখে নিমিলিতেক্ষণ হইয়া নিজ বিপদের বিন্দুবসর্গও জানিতে পারেন না। সম্মুখে যথেষ্ট ধান্যগুচ্ছ, ইক্ষুদণ্ড দেওয়া হইতেছে, তাহা মহাসুখে খাইতে থাকেন, এবং রমণীয় হস্তিনী-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছেন মনে করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। এদিকে ক্ষিপ্রকারী মাহুতগণ তখন নিঃশব্দে আসিয়া দুই হস্তিনীর মধ্যস্থলে বসিয়া গরুর দড়ির মত সরু দড়িরদ্বারা হস্তির দুই পশ্চাৎ পদে আড়াআড়ি শিকলি করিয়া জড়ানর মত জড়াইতে থাকে। এইরূপে কতকগুলি দড়িরদ্বারা পায়ের অর্দ্ধেক আন্দাজ পেঁচাইয়া ফেলে। এত দড়ি ফেরাফেরা করিতেছে তথাপি হতভাগ্যের বিন্দুমাত্র চেতনা নাই। যদি একটু নড়া চড়া করে, মাহুতগুলি সরিয়া যায়, হস্তিনীগণ আরো একটু জোরে নিতম্বচাপে উহাকে মুগ্ধ করে, আবার সে স্থির সে স্থির। এইরূপে উভয় পদ ছাঁদন হইয়া গেলে শেষে জাহাজী দড়ারমত মোটা ফাঁসযুক্ত দড়া আনিয়া ফাঁসযুক্ত দিকটা দুই পায়ের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া এক পার্শ্ব দিয়া ফিরাইয়া আনে। এই কার্য্যগুলি বড় তৎপরতার সহিত, কৌশলের সহিত নিঃশব্দে নির্ব্বাহিত হয়। হস্তিনীগণও দড়াফিরান কি মাহুতের হাতে দিবার সময় যথেষ্ট সাহায্য করে। দড়া ফিরাইয়া আনিয়া অপর প্রান্ত ফাঁসের মধ্য দিয়া ফিরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে থাকে; সুতরাং ফাঁস ক্রমে পায়ে বেশ আঁটিয়া ধরে; অপর পদেও এইরূপ করিয়া আর এক গাছা ফাঁস দড়া পরান হয়। পরে এই শক্ত দড়া দুই গাছি শালের বড় গাছের সঙ্গে জড়াইয়া শক্ত করিয়া বাঁধা হয়। মাহুতগুলির সাহস ও তৎপরতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়! আমাদের হাতীর একবার এইরূপ বাঁধা শেষ হইলে সে গা ঝাড়া দিল, অমনি হস্তিনীগুলি পলায়ন করিল। হস্তী দেখিল কঠিন বন্ধনে পড়িয়াছে। উচ্চ চীৎকারে বনভূমি

কম্পিত করিয়া সজোরে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আহা, বেচারার সে চেষ্টা দেখিলে চক্ষে জল আসে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দড়িতে পশ্চাৎপদ বাঁধা, সম্মুখে টানিতে টানিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাটিতে সরল রেখার ন্যায় শুইয়া পড়িল আর কতই কাঁদিতে লাগিল। মানবের নিষ্ঠুরতাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের হস্তী এইরূপ করিয়া এক পায়ের দড়া খুলিয়া ফেলিয়াছিল, সকলে ভীত, ত্রাস্ত হইয়া পড়িল। আবার মাহুতগণ হস্তিনী (কুনকী) দিগকে লইয়া ক্রমে সেই ভাবে দাঁড় করাইল। হতভাগা আবার এই স্পর্শসুখে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব ভুলিয়া গেল! যে স্থির সেই স্থির।

মাহুতগণ পুনরায় খুব ভাল করিয়া দুই গাছা মোটা দড়ায় শক্ত করিয়া প্রত্যেক পদ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিল, এবং এক কলসী জল ঢালিয়া দড়াগুলি ভিজাইয়া দিল।

হস্তীর বন্ধন শেষ হইল। কুনকীগণ তখন স্ব-কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া পূর্ব্বপথে বাহির হইয়া আসিল। হস্তী স্বীয় বিপদ তখন বেশ বুঝিতে পারিয়া আবার শত শত বার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, হস্তিনীগণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছিল সে পথ রুদ্ধ করিয়া সব ডাল পালা তুলিয়া পূর্ব্ববৎ করা হইল।

আমরা তখন মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া গজযূথে ফিরিয়া আসিলাম। আমি অর্দ্ধপথে পদযান অবলম্বন করিয়া বাসায় আসিলাম। বলা আবশ্যক যে স্থানটি সহর হইতে ১৪।১৫ মাইলের কম হইবে না।

অতঃপর কি করিয়া হাতী বাহির করা হইল সে কথাটা বলা আবশ্যক। হস্তী এইরূপে বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত রাত্রি বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করে, ২.৪ গাছা সরু দড়ি অনেক সময় ছিঁড়িয়াও ফেলে কিন্তু ওদিকে দড়ি জলে ভিজিয়া পায় কসিয়া ধরে, আর টানাটানিতে বদ্ধ স্থান কাটিয়া ঘা হইয়া যায়, সুতরাং আর টানাটানি করিতে পারে না। তখন গেটের দরজা খুলিয়া হস্তী ও হস্তিনী প্রবেশ করাইয়া বন্দীর দুই ধারে সারি দিয়া সাজান হয়, পশ্চাৎপদদ্বয়ের মোটা বন্ধন খুলিয়া সম্মুখপদদ্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ দুইগাছি মোটা দড়া বাঁধিয়া হস্তিনীদ্বয়ের গলদেশে বাঁধিয়া চালিত করা হয়, আশে পাশে আরও হাতী থাকে। বন্দী হস্তী সকলের মধ্যখানে থাকিয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে বাধ্য হয়। পায়ের বেদনায় বেশী ঝুটাপুটি করিতে পারে না। এইরূপে ধীরে ধীরে বেড় হইতে তাহাকে বাহির করিয়া জগৎ বেড়ের বাহিরে খোলা জায়গায় লইয়া বড় শাল গাছের সঙ্গে পশ্চাৎপদদ্বয় বেশ করিয়া বাঁধিয়া দেয়। সাধারণতঃ যে দিন ধরা হয়, তার পর দিনই বাঁধা এবং তার পর দিনই বেড় হইতে বাহির করা হইয়া থাকে। তিন দিনেই সব শেষ। তার পর বাহিরে ঐরূপ বদ্ধাবস্থায় থাকিতে থাকিতে পোষা হস্তিনীগুলি কাছে যাতায়াত করিতে থাকে এবং মানুষও ক্রমে যাতায়াত করে; এইরূপ ৫।৭।১০ দিন থাকিতে থাকিতে অনেক শান্ত হয়। আর তাহাকে ক্রমে চলা, ফেরা, দাঁড়ান, বসা, পিঠে চড়িতে দেওয়া ইত্যাদি শিখান হয়। হস্তীবৈদ্য বলিল যে চেষ্টা করিলে এক পক্ষের মধ্যেই হাতীকে সব ঠিক করিতে পারা যায়। বড় বেশী সময় লাগিলে এক মাস।

এইরূপে বন্যবারণ এক মাসের মধ্যেই মানবের অধীন হইয়া তাহার আজ্ঞানুসারে সহস্রকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে খেদা অর্থে তাড়াইয়া বেড়ের মধ্যে হাতী প্রবেশ করান। পূর্ব্বে তাহাই করা হইত। তাহা করিতে গেটের দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি ক্রমে অধিক বিস্তৃত দুইটি বেড়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বনের মধ্যে দেওয়া হয়। পরে লোক জনেরা দিনের বেলায় বন্দুক, ঢাক, ঠুক্‌ঠুকি কাঠি প্রভৃতির শব্দের দ্বারা হস্তীকে ভীত করিয়া তাড়াইয়া ঐ বেড়ার হাতার মধ্যে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে। একবার বেড়ায় প্রবেশ করিলে বেড়ার পথে ও দুই পার্শ্বে লোক প্রস্তুত থাকে এবং অনবরত শব্দ করিতে থাকে; হস্তীদলের বাহির হইবার পথ থাকে না, সুতরাং তাহারা ক্রমে গেটের মুখে আসিয়া বেড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, অমনি দড় কাটিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এইরূপ খেদা করা বড় শ্রমসাধ্য ও বিপদজনক বলিয়া এই কৌশল এখানে করা হইয়াছে। অন্য খেদাতেও এ পদ্ধতি আছে।

খেদার কার্য্যে ৪।৫ হাজার টাকার কম ব্যয় হয় না। এখানে এ পর্য্যন্ত দুটি হাতী ধরা হইয়াছে। এখনও কাজ চলিতেছে। এবারকার দলে ২০,২৫টা মোট আছে,

একেবারে সব না পড়ে তো ক্রমে ক্রমে ধরা হইবে, শেষে তাহাতেও না হইলে খেদার আশ্রয় লওয়া হইবে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

হাজি মহম্মদ মহসীন।

কেহ কাহারও মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিমাণ করিতে পারে না। দয়াধর্ম্ম মনুষ্যত্বের এক প্রধান চিহ্ন, দান দয়ার অন্যতর পরিচয়; সুতরাং দান দেখিয়া মনুষ্যত্বের একরূপ পরিমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু দান-দেবতা যখন স্বাভাবিকতার শুভ্র পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া রক্তিমবেশধারী বেণ্ডবাদ্যকর দলে প্রবেশ করেন, তখন উহাতে পুণ্য অপেক্ষা পরিহাসের চিত্রই অধিক ফুটিয়া উঠে। বাহুকের পৃষ্ঠে ঢাক,—বাদ্যকর উহা সজোরে বাজাইতেছে, দাতার মস্তকে গূঢ় উদ্দেশ্যের গুরুভার—স্তাবকগণ উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিয়া দিয়াছে। ইহাতে দানের মহিমা খর্ব্ব হইয়া পড়ে; দয়াধর্ম্মের আর অলৌকিকত্ব থাকে না।

দানের গৌরব কামনাভাবে। নিষ্কাম দানের প্রভা, কৌশলপ্রদীপ্ত দীপালোকের ন্যায় নির্ম্মল, নির্ব্বাত ও নিষ্কম্প। উহাতে দীপদশার প্রয়োজনাতিরিক্ত উন্নতি বা অবনতি নাই, কাচাবরণে কোন কৃষ্ণ চিহ্ন পড়ে না। সকাম দান উহার বিপরীত; কেবল ধূম, কেবল দুর্গন্ধ। যে স্থানে কামনা, সেই স্থানেই কালিমা। সাত্বিক দান স্বার্থ-নিরপেক্ষ, সময়-নিরপেক্ষ, কামনা-নিরপেক্ষ। দয়া কেবল দানে নহে,—মনে; বহুকাল পূর্ব্বে মহাভারতে এ কথার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কুবের তুল্য কুরুপাণ্ডব থাকিতে, দাতা—কর্ণ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দান দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিরাট স্ফূর্ত্তি বশতঃ দানশীলতায়ও বণিগ্‌বৃত্তির পদচিহ্ন পড়িয়াছে। এখন দানের উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে, মনে স্বভাবতঃ বাণিজ্য বিপণির এক কোলাহল চিত্র আসিয়া উপস্থিত হয়। কেবল ইঙ্গিত-ইশারা, কেবল তেজী-মন্দা, কেবল দানবাণিজ্যে ভাগ্যপরীক্ষা। এদিকে উপাধির উপদ্রবে দানের দেবত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। অর্থসাহায্যে জনসাধারণের যে উপকার হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উহাতে দয়া ধর্ম্মের শীতলতা অপেক্ষা অর্থসামর্থ্যের উত্তাপই অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। এই উত্তাপে করুণা বিগলিত প্রাচীন ভারতের যশের জলাশয়গুলি যে শুকাইয়া যাইতেছে, জাতীয় হৃদয়ে যে তীক্ষ্ণ বালুকার স্তর পড়িতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

বণিগ্‌বৃত্তির এই পূর্ণ প্রসারের মধ্যে এলাহাবাদের মুন্সী কালী প্রসাদ। বাঙ্গলার বেতনজীবী ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পাঞ্জাবের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা সাত্বিক দানের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইর শ্রীযুক্ত তাতার বিপুল দানের গভীর ঘোষণা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের দানযজ্ঞের ঘৃত-মধু গন্ধে আজি ভারতবর্ষ সৌরভময়। হুগলী নগরের হাজি মহম্মদ মহসীন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যে দানযজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এই শ্রেণীর। তন্মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই—উহা সর্ব্বস্ব স্বাহা। মহসীনের দানদৃষ্টান্ত সত্যযুগের সাত্বিক দান স্মরণ করাইয়া দেয়। নিম্নে এই মহাত্মার জীবন চরিতের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

হুগলী নগর এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দর ছিল। ব্যবসায় সমৃদ্ধির সংবাদে ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণের অনেকে এই নগরে আসিয়া বিপণি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে থাকেন। প্রায় দুই শত বর্ষ হইল আগা ফজলুল্লা নামে পারস্য দেশীয় একজন বণিক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র হাজি ফয়জুল্লাও বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। মুর্শিদাবাদও তখন বাণিজ্যব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। হাজি ফয়জুল্লা উভয় স্থানেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন এবং অতি সত্বরেই ধনী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার এই অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অচিরেই তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি হারাইয়া ফেলিলেন। পৈতৃক প্রতিপত্তি লইয়া আর তাঁহার স্বদেশে ফিরিবার সঙ্গতি রহিল না। তিনি হুগলী নগরেই স্থায়ী হইলেন। ইহারা প্রায় সম সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেবের একজন প্রিয় কর্ম্মচারী আগা মতাহর নামে পারস্য দেশীয় একজন বণিক সম্রাটের নিকট হইতে যশো-

হর প্রভৃতি স্থান জায়গীর পাইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে বাঙ্গলার বাণিজ্য রাজধানীতে দুইজন সমৃদ্ধ পারস্য দেশীয় বণিকের সম্মিলন ঘটিল।

আগা মতাহরের মন্নুজাননাম্নী এক কন্যা ছিলেন। মন্নু অতুলবিভবশালী পিতার একমাত্র কন্যা। পিতা মন্নুজানকে একটী সুবর্ণ তাবিজ দান করেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাতে ঐ তাবিজ ভগ্ন করা না হয় মন্নুজানের প্রতি পিতার এইরূপ আদেশ ছিল। পিতার মৃত্যুর পর মন্নুজান সুবর্ণ তাবিজ খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে পিতার স্বাক্ষর যুক্ত এক দানপত্র রহিয়াছে। কন্যাবৎসল পিতা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রাণসমা দুহিতা মন্নুজানকে দান করিলেন—দান পত্রে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। মতাহরপত্নী স্বামীর বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইয়া হাজি ফয়জুল্লাকে বিবাহ করিলেন। মহম্মদ মহসীন ইঁহাদের কুলপাবন পুত্র। ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

মহম্মদ মহসীনের ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত পাইবার কোন উপায় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে হুগলীর উকীল বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহসীনের জীবনসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মিঃ টরনবী হুগলী জেলার ইতিহাসে মহসীনের দানসম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "হুগলীর ইমামবাড়ী"তেও মহসীনজীবনের একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী নগরে মহসীনসম্বন্ধে অনেক প্রবাদকথা প্রচলিত আছে। লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত এবং জনবাদ আলোচনা করিলে মহম্মদ মহসীনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহাও পার্ব্বত্য-নদী-স্রোতের ন্যায় এই কিয়দ্দূর দেখা যাইতেছে, ঐ আবার বনভূমির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেকালে জীবনচরিত কেহ লিখিয়া রাখিতেন না, কেহ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহে যত্ন করিতেন না। অযত্ন উপেক্ষায় মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশে কোন ফল নাই। সেকালের লোকের জীবনচরিত লিখিবার সময় দীর্ঘনিশ্বাস সঙ্গের সঙ্গী।

মহসীন ও মন্নুজানের পিতা স্বতন্ত্র হইলেও মাতা এক। মন্নুজান অতুলবিভবশালিনী, মহসীনের অবস্থা সেরূপ ছিল না। তাই বলিয়া ভাইভগ্নীতে স্নেহ মমতার কোন ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মন্নুজান মহসীনের আট বৎসরের জ্যেষ্ঠা। উভয়ে বাল্যকালে স্থিরাজী নামে একজন বিচক্ষণ শিক্ষকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন. বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে মহসীনের জ্ঞানার্জ্জনপিপাসা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি কিছুদিন মুর্শিদাবাদ মকতবে অধ্যয়ন করেন। "দেশভ্রমণে শিক্ষার পরিসমাপ্তি" ইউরোপীয় জাতির এই মূল সূত্রটী মহম্মদ মহসীনের জীবনে রক্ষিত হইয়াছিল। শিক্ষক স্থিরাজী একজন বহুদর্শী ভ্রমণকারী ছিলেন। তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত শুনিয়া মহসীনের মনে দেশভ্রমণেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি আরব ও পারস্য দেশ ভ্রমণ করেন। এই দুই দেশে আরবী ও পারস্য ভাষা শিক্ষার তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ভাষার উৎস স্থানে তিনি উভয় ভাষার গভীর ও অকৃত্রিম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এদিকে মন্নুজান প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। বিষয়ের শাসন সংরক্ষণে তাঁহার বুদ্ধি ঐ দিকেই বিকাশ পাইতে লাগিল। যত সম্পদ তত শত্রু। মন্নুজানের শত্রুর অভাব ছিল না। কতিপয় পাপিষ্ঠ মন্নুর প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইহারা মহসীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে তাহাদের পাপচক্র লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। মহসীন মন্নুকে সাবধান করিয়া দিলেন। ভগ্নী ঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। মানুষ মানুষের প্রাণবধ করিবার জন্য হিংস্রশ্বাপদ অপেক্ষাও সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া মহসীনের মনে কি এক বৈরাগ্যের উদয় হইল। এক একটি শিলাখণ্ডের আঘাতে জলস্রোতের পার্শ্বপরিবর্ত্তন ঘটে। মনুষ্যের জীবনস্রোতও কোন আকস্মিক ঘটনায় ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। মহসীন দারপরিগ্রহ করিলেন না, নির্লিপ্তভাবে সংসারে বাস করিতে লাগিলেন। কোরাণ পাঠ, ধর্ম্মের আলোচনা, এবং পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তিনি সুন্দর অক্ষরে কোরাণের শ্লোক লিখিয়া বিতরণ করিতেন। ৬৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি হুগলী ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে চলিয়া যান।

আগা মতাহরের আদেশ ছিল, তাঁহার ভাগীনেয়ের

সহিত মন্নুজানের বিবাহ দিতে হইবে। মতাহরের ভাগীনেয় মির্জ্জা সলা উদ্দীন পারস্য দেশ হইতে আসিয়া মন্নুজানকে বিবাহ করিলেন। সলা উদ্দীনের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে মন্নুজানের স্বকীয় হস্তে পতিত হইল। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার যত্নে দিন দিন ধনসম্পদের উন্নতি হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর কাল, ধনসম্পদের সুবর্ণ দেউল ভেদ করিয়াও মানবদেহে আপন কঙ্কালস্পর্শ বুলাইয়া দেয়। মন্নুজান কালক্রমে বৃদ্ধা হইয়া পড়িলেন, বিষয়সম্পত্তির আর সেরূপ সংরক্ষণে সমর্থা হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি সহোদর মহসীনের হস্তে সমস্ত সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মহসীন তখন আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কোথায় ছিলেন কেহ তাহা জানিত না। মহসীনের অজ্ঞাতবাসবশতঃ মন্নুজানের সংকল্প পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল না। ভগ্নী ভ্রাতার উদ্দেশে নানাস্থানে পত্র লিখিলেন। মহসীন ভগ্নীর পত্র পাইয়াও প্রথমতঃ গৃহে ফিরিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে একান্ত অনুরোধে রজব আলি খাঁ ও সাকের আলী খাঁ নামে দুইজন ধর্ম্মবন্ধুসহ হুগলীতে ফিরিয়া আসিলেন। মন্নুজান সমাগত সহোদরের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নির্লিপ্ত বিষয়বিরাগী হাজি মহম্মদ মহসীন আজি অতুল সম্পদের অধিকারী! সম্পত্তির আয় সে সময়ের অর্দ্ধলক্ষ মুদ্রা। একজন উদাসীন এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহা অনেকের চক্ষে সহিল না। বান্দা আলীখাঁ নামে এক ব্যক্তি মন্নুজানের পোষ্যপুত্র সাজিয়া মহসীনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মহসীন অম্লানচিত্তে ইহাকে এই সম্পত্তি দান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে সম্পত্তি ধর্ম্মব্রতে, লোকহিতে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প জাগিতে ছিল। তিনি মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক জয়ী হইলেন। তিনি জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিষয়সম্পত্তি এক জীর্ণ কপর্দ্দকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধনসম্পদ আপনার ভোগের জন্য নহে, জনসাধারণের উপকারের জন্য। তিনি বিষয়ের মায়ায় আবদ্ধ হইলেন না। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে এক উইল * লিখিয়া সৎকর্ম্মে সর্ব্বস্ব দান করিলেন। হুগলী নগরে মহম্মদ মহসীনের দান যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল। তিনি যে ফকীর সেই ফকীর। অনেক রাজচক্রবর্ত্তীও এই ফকীরের পদধূলি লইবার যোগ্য নহেন।

হাজি মহম্মদ মহসীন।

* আমার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন, পিতার নাম হাজি ফয়জুল্লা, পিতামহের নাম আগা ফজলুল্লা, নিবাস হুগলী। আমি স্বজ্ঞানে স্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে এই উইল সম্পাদন পূর্ব্বক এই বিধান করিতেছি। যশোহরের অধীন পরগণা সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদারী ভুক্ত। হুগলীর ইমামবড়া, ইমামবাজার ও হাট, এবং ইমামবড়ার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি। আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিতেছি। আমার লিখিত বিধান অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদয় দান কার্য্য চিরকাল চলিতে থাকিবে। আমার প্রিয় সুহৃদ রজবআলী খাঁ ও সাকেরআলী খাঁকে আমি মাতোয়ালি নিযুক্ত করিলাম। ইহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নলিখিতরূপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কার্য্য চালাইবেন। তিন অংশ ফতেহা, মহরমোৎসব এবং ইমামবড়া ও মসজিদের সংস্কার কার্য্যে; দুই অংশ মাতোয়ালিগণের পারিশ্রমিক জন্য; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্ম্মচারিগণের বেতন ও আমার স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা অনুসারে, মাসিক বৃত্তিদানে এবং দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয় হইবে। কোন মাতোয়ালি, কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে তিনি অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্ত্তী করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা আমার চরম দান পত্র রূপে গণ্য হইবে। (আরবীভাষায় লিখিত উইলের মর্ম্মানুবাদ)

এই উইল সম্পাদনের পর মহম্মদ মহসীন ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। যজ্ঞসমাপনের পর তৃপ্তকাম পুরুষের নির্ম্মল হৃদয়ের চিত্র প্রদান সম্ভবপর নহে। মহম্মদ মহসীন তখন আপনার নহেন, পরের। পরের সেবায় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাত্মা মহসীন ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। হুগলী নগরে ভগ্নী মন্নুজানের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার দেহ শায়িত রহিয়াছে। হুগলী কলেজের গৃহে তাঁহার একখানি চিত্রপট নীরবে কি এক অপূর্ব্ব ভাব ব্যক্ত করিতেছে। সমাধিতে তাঁহার দেহ শায়িত, চিত্রপটে তাঁহার চিত্র নীরব; তিনি দানশীলতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহার যশোঘোষণা করিবে।

মহম্মদ মহসীনের কৃত উইলের সুফল ফলিতে অল্প সময় চলিয়া যায় নাই। রজবআলী খাঁ ও সাকেরআলী খাঁ ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাতোয়ালির কার্য্য করেন। উইলের বিধানানুসারে কার্য্য হইতেছে কি না, নানা কারণে গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট নানাদিক চিন্তা করিয়া সৈয়দ আকবর আলী খাঁকে সম্পত্তির কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করেন। অনুসন্ধানে কতকগুলি বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রজবআলী খাঁ ও সাকের আলী খাঁ একরূপ অপসৃত অবস্থায় থাকিলেন; ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা পদচ্যুত হন। তৎপরবর্ত্তী মাতোয়ালী উক্ত কণ্ট্রোলার সৈয়দ আকবর আলি খাঁ। পদচ্যুত মাতোয়ালিদ্বয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ চলিয়া যায়। এই দীর্ঘ সময়ে সম্পত্তির আয় হইতে ব্যয়বাদে প্রায় নয় লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়। এই অর্থই বর্ত্তমান হুগলী কলেজ ও বর্ত্তমান ইমামবড়ার বিশাল অট্টালিকা প্রতিষ্ঠার মূল সম্বল।

উক্ত নয়লক্ষ টাকা শিক্ষা বিস্তারের ব্যয়ের প্রস্তাবে সামান্য আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। প্রতিবাদকারিগণ বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মকার্য্যে অর্থব্যয়, মহম্মদ মহসীনের উইলের উদ্দেশ্য, শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশ্য নহে। এদিকে মহসীন যে একজন শিক্ষানুরাগী লোক ছিলেন তাহাতে সংশয় ছিলনা। তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ মহসীনের মনোগত ভাব কি রূপ ছিল, তাহা এই বিদ্যালয়ই প্রমাণিত করিয়া দিল। আপত্তির আবর্জ্জনা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল। তদানীন্তন গবর্ণর সার চার্লস্ মেটকাফ্ শিক্ষা বিস্তারে ঐ অর্থ নিয়োগ সাব্যস্ত করিলেন। বিপুল আয়োজনে হুগলীতে এক কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

প্রস্তাবিত কলেজের জন্য একটি বৃহদায়তন অট্টালিকার প্রয়োজন। জেনারেল পেরণ নামে একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনি সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য্য করিতেন। ঘটনাক্রমে জেনারেল পেরণ হুগলী নগরে স্থায়ী হন। তিনি যে অট্টালিকায় বাস করিতেন কালক্রমে তাহা প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামে একজন ধনীর হস্তগত হয়। প্রাণকৃষ্ণ অতিশয় বিলাসী লোক ছিলেন। এই বৃহৎ অট্টালিকার বিস্তৃত কক্ষ নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীতে নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত। ইনি অবশেষে এক জালের মোকদ্দমায় কারাদণ্ডিত হন এই অট্টালিকা শীল পরিবার ক্রয় করেন। শীল পরি হইতে অট্টালিকা ক্রয় করিয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে উহাতে হুগলী কলেজ স্থাপন করা হয়। এই অট্টালিকার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, চারিদিকে ফলপুষ্পের উদ্যান। এইরূপ মনোহর স্থান, মনোহর গৃহ, অল্প বিদ্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। যে গৃহ এক সময়ে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বিলাসভবন ছিল, যাহার দ্বিতল কক্ষে নর্ত্তকীগণের নূপুরধ্বনি, গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে তাল রাখিয়া উছলিয়া উঠিত, আজি সেই স্থানে উচ্চ শিক্ষার পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। এই পট-পরিবর্ত্তন একটি আকস্মিক ঘটনা নহে, উহা মহাত্মা মহম্মদ মহসীনের দানপুণ্যের অমোঘ ফল।

আগা মতাহর হুগলীতে ইমামবড়া প্রতিষ্ঠা করেন, মির্জ্জা সলাউদ্দীন উহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু হুগলীর বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ ইমামবড়া বঙ্গদেশে একটি দেখিবার বস্তু। মহম্মদ মহসীন ইহা নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই। কিন্তু ইহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের এক উৎকৃষ্ট অংশ দেখাইয়া দিতেছে। ২১৭৪১৩ টাকা ব্যয়ে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। প্রায় বার হাজার টাকা মূল্যের একটী বৃহৎ ঘড়ী উহার উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত

রহিয়াছে। ইমামবড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। উহার সম্মুখে রাজ পথ, পশ্চাতে হুগলী নদী। দুইটি উচ্চচূড়া অট্টালিকার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। সিংহ দ্বার-পথে প্রবেশ করিলেই প্রশস্ত অঙ্গন।

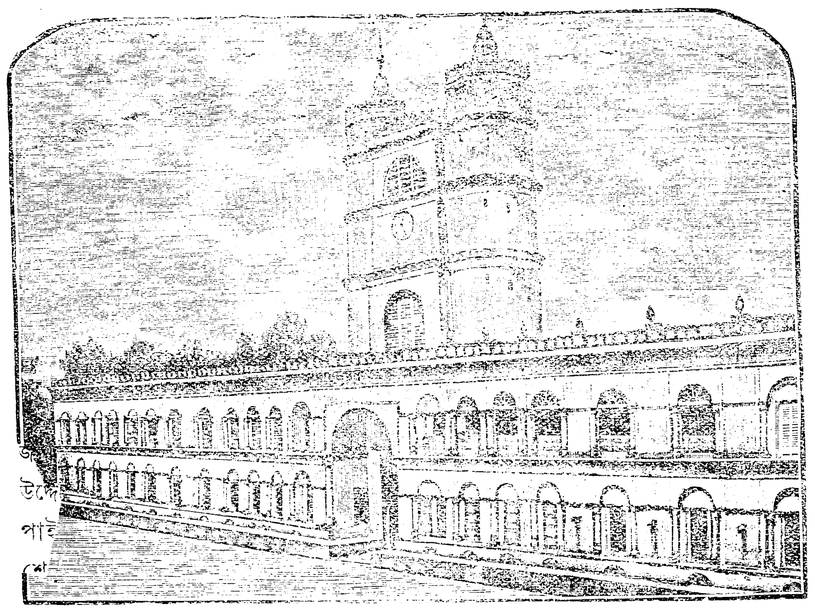

হুগলীর ইমামবড়া।

অঙ্গনের তিন দিকে দ্বিতল অট্টালিকা। সম্মুখে নানা-কারুকার্য্যখচিত ভজনালয়। অঙ্গনের মধ্যস্থানে একটি অনতিদীর্ঘ উচ্চ জলাশয়। জলাশয়ে মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে, সময়ে সময়ে কৃত্রিম উৎস হইতে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। ইমামবড়ার প্রাচীরে প্রাচীরে কোরাণের শ্লোক এবং মহম্মদ মহসীনের দানবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভজনালয়ের এক পার্শ্বে অনুচ্চ বেদী। বেদীর বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে মর্ম্মরস্তরে প্রকোষ্ঠের এক মনোহর শোভা হইয়াছে। অসংখ্য দীপাধারে গৃহ সুসজ্জিত। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, শত শত দীপালোকসমুজ্জ্বল ভজনালয়ে যখন সহস্র উপাসক সমস্থানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন, তখন মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। নগরের এক প্রান্তে হুগলী কলেজে মানসিক শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, অপর প্রান্তে এই ভজনালয়ে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। মানবজীবনের উৎকর্ষের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। মহসীনের বিপুল দানে মানসিক শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা উভয়েরই সুব্যবস্থা হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় মহসীনের দয়ার হস্ত বিদ্যমান। বঙ্গের বিভাগে বিভাগে মহসীনের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় * হইতে মুসলমান বালকগণ শিক্ষার সাহায্য পাইতেছে। হুগলীর চিকিৎসালয় মহসীনের জনহিতৈষনার আর একটী দৃষ্টান্তস্থল।

মহম্মদ মহসীনের বিপুল দান কোন সাময়িক প্রবৃত্তির সাময়িক উচ্ছ্বাস নহে। তিনি প্রকৃত দয়ালু লোক ছিলেন; দানশীলতা তাঁহার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। এ সম্বন্ধে বাবু প্রমথনাথ মিত্র কর্ত্তৃক বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ হইতে কয়েকটি আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইল ঃ—

১। মহম্মদ মহসীনের রাত্রিকালে নগরের পথে পথে ভ্রমণ করা অভ্যাস ছিল। সেই সময় দীন দুঃখীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যাহার ক্লেশ দেখিতেন তিনি তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক দিবস একটি বৃদ্ধার কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, ঐ ধনহীন নারীর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি আছে। ইহাদের প্রতিপালন করা বৃদ্ধার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর ছিল। মহসীন দেখিলেন বালকবালিকাগণ আহারাভাবে চীৎকার করিতেছে, মাতাও দুঃখে অশ্রুপাত করিতেছেন। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া মহম্মদ মহসীনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ বালকবালিকাদের জন্য রুটি আনিয়া দিলেন এবং তদবধি তাহাদের প্রতিপালনের ভার লইলেন।

* ১৮৩৬ সালের বজেট এইরূপ—সৈদপুরের আয় ৪৫০০০, অন্যান্য ১০,০০০, একুন ৫৫০০০, ব্যয় মাতোয়ালিদ্বয়ের জন্য এক নবমাংশ ৬১১১। হুগলী কলেজের জন্য এক নবমাংশ ৬১১১। ধর্ম্মকার্য্যের জন্য তিন নবমাংশ ১৮৩৩৩; এই টাকা হইতে ব্যয় ধর্ম্মকার্য্যে ৯৫৮৬, কলেজের জন্য ৮৭৪৭। বেতন বৃত্তি ইত্যাদির জন্য চারি নবমাংশ ২৪৪৪৪ এই টাকা হইতে বেতন বৃত্তি ১৩০৬৭, কলেজের জন্য উদ্বর্ত্ত ১১০৭৭। ১৮৪২ সনে ব্যয় বাদে উদ্বর্ত্ত, ৩৪৮৮৩।

২। মহসীন এক দিবস রাত্রিযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অন্ধের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। স্বামী অন্ধ; এজন্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনে বঅক্ষম নিয়া তাহার পত্নী তাহাকে প্রহার করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া গৃহের বাহির হইতে জানালা দিয়া কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা গৃহের ভিতর ফেলিয়া দিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া অন্ধের পরিবারের আনন্দের সীমা রহিল না। কে এইরূপ মুদ্রা নিক্ষেপ করিল, কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই, কিন্তু সকলেই মনে মনে বুঝিল, এই কার্য্য মহম্মদ মহসীন ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। তজ্জন্য সকলেই তাঁহার নাম লইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

(৩) মহম্মদ মহসীন দাসদাসীগণের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন। গাজী নামে একটি অল্পবয়স্ক বালক তাঁহার নিকট চাকর ছিল। সে এক দিবস তাহার ভগ্নীর সাঙ্ঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া প্রভুর সমীপে ছুটীর প্রার্থনা করিল। প্রভু অবিলম্বে তাহাকে বাটী যাইবার অনুমতি দিলেন এবং একটি মোড়ক হস্তে দিয়া বলিলেন যে, ইহাতে ঔষধ আছে, সেবন করাইয়া দিবে। বালক বাটী যাইয়া দেখিল যে, উহাতে শুধু ঔষধ আছে তাহা নহে, কয়েকটী টাকাও রহিয়াছে!

হুগলীর বৃদ্ধগণ মহম্মদ মহসীনের নিত্য দানের যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিয়া মনে হয়। তাঁহার হস্তে রোগী নিত্য ঔষধ পাইতেছে, দরিদ্র ধন পাইতেছে, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি সান্ত্বনা পাইতেছে—এই দৃশ্য, হুগলীর বাণিজ্যব্যবসায়ের কর্ক্কশ কোলাহল ডুবাইয়া অকৃত্রিম জনহিতৈষণার এক সরস স্বর্গলোক আনিয়া উপস্থিত করিত। এই জনহিতৈষণার ভিত্তি কোথায়? অকপট বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ নিষ্কাম চিত্তই উহার সুদৃঢ় ভিত্তি। সংসার ত্যাগ, তীর্থভ্রমণ ও সাধু সঙ্গে এই বৈরাগ্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। রোপিত বৃক্ষের চারিদিকে জীবিত শাখার প্রাচীর;—অনেক সময়ে শাখার সবলতাতেই বৃক্ষ বিনষ্ট হয়; বৃক্ষকেই অবশেষে আপন শিরোত্তলনপূর্ব্বক বিরাজ করিতে থাকেন। কিন্তু নিষ্কামচিত্তে এরূপ বিরাজমানতার কোন কদর্য্য চিহ্ন নাই। বৈরাগ্যাগ্নিতে আমি পুড়িয়া সমপ্রাণময় সুবিশাল এক জনজগৎ, এক জীবজগৎ আবির্ভূত হয়। মহম্মদ মহসীনের সম্মুখে এই উভয় জগৎই খুলিয়া গিয়াছিল; তাই তিনি নিষ্কামচিত্তে ধর্ম্মের জন্য লোকহিত জন্য যথা সর্ব্বস্ব স্বাহা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহম্মদ মহসীনের জীবনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই,—তাঁহাতে হিন্দুভাব অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মচারী হিন্দু ছিলেন। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি শ্মশ্রু ধারণ করিতেন না। মুণ্ডিত শ্মশ্রু মহসীন যখন হিন্দু কর্ম্মচারিগণে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রিয় সাধক যশোহরনিবাসী ভোলানাথ সিংহের গান শুনিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম জন্মিত। এদিকে তিনি মুসলমানের মুসলমান। বর্ত্তমান সময়ে দেশ যে ভাব চাহে তাঁহাতে তাহাই ছিল। মহসীন সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর এক মন্ত্র, এক জপ—উন্নতি। কিন্তু কোনও জাত আত্মত্যাগ ভিন্ন উন্নতির উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে না। অর্থ আত্মভাবের মূর্ত্ত্য পরিণতি। মুদ্রা কেবল রাজনামাঙ্কিত ধাতু নহে, উহাতে মানবের বিদ্যা বুদ্ধি, শ্রমবত্ত্ব, শাসনসংযম, সকল শক্তির মূলাঙ্ক মুদ্রিত থাকে। নিষ্কাম ধনদান এবং আত্মত্যাগে কোনও প্রভেদ নাই। আত্মত্যাগ বা অর্থত্যাগ যখন সহৃদয়তার স্বর্গীয় স্পর্শে মন্ত্রপূত হইয়া উঠে, তখন উহা এক দুর্জ্জয় শক্তি: এই মুদ্রারূপিণী মহাশক্তি যিনি নিষ্কাম পরোপকারে দান করেন, দেবতারাও তাঁহার অমর কীর্ত্তি লোভনীয় মনে করিয়া থাকেন, মহম্মদ মহসীন সুরগণেরও বরণীয় ছিলেন। মহসীন মুসলমান সমাজের গৌরব স্থল, বঙ্গদেশের দানশীলতার এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। দানধর্ম্মে তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আর কি সত্বর মহম্মদ মহসীনের ন্যায় মহাপুরুষ জন্মিবে না?

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।

'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' (A Literary History of India) এই নামে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক অল্পদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মিঃ ফ্রেজার নগণ্য ব্যক্তি নহেন; তিনি বিলাতের লণ্ডন য়্যুনিভারসিটী কলেজের তেলেগু ও তামিল ভাষার অধ্যাপক, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য; এরূপ সুবিদ্বান এবং গণনীয় ব্যক্তি ভারতীয় সাহিত্যের কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। গ্রন্থখানির আকার এবং মূল্য উভয়ই বৃহৎ; সুবিস্তীর্ণ পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনাপূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমাদের মতামত যে সর্ব্বত্র তাঁহার মতের অনুরূপ হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু তিনি কিরূপ ভাবে আমাদের সাহিত্যাদির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাহার বিবরণ বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট প্রীতিকর হইতে পারে।

জাতীয় সাহিত্যই যে জাতীয় উন্নতির ইতিহাস গ্রন্থকার ইহা মুখবন্ধেই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, "মানসিক উৎকর্ষ এবং শিল্পসম্পদের ইতিহাস দৃশ্য বৈচিত্রে রাজা ও রাজমহিষী সম্বলিত ঐতিহাসিক চিত্রের অপেক্ষা হীন হইলেও অমর রচনাবলীর মধ্যে তাহার উপাদান সংরক্ষিত থাকে, এবং তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট ও জীবন্তচিত্র পাঠকবর্গের নয়নসমক্ষে সংস্থাপিত করে। ইতিহাস লেখকগণের সংস্কার বিভিন্ন জাতি তাহাদের বীর পুরুষগণের জীবনেই অমরতা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু এ সংস্কার উন্মূলিত হইয়া এখন সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ইতিহাস সত্ত্বেও কবিগণই পৃথিবীর অধীশ্বর। কোন জাতির উন্নতির নথিপত্র সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া যদি কেবল মাত্র সেই জাতির সাহিত্য রক্ষা পায় তাহা হইলে তাহা হইতে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ইতিহাসের জ্ঞান লাভ হইতে আমরা বঞ্চিত হই না; এই জন্যই জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের অবতারণা।"

এই বৈদেশিক গ্রন্থকার ভারতীয় জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়া যে গভীর পরিশ্রম করিয়াছেন সে জন্য তিনি প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীরই ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থমধ্যে তিনি অনেক স্থানে ভারতবাসীর প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়াছেন, তাঁহার অনেক যুক্তি হয়ত অসার এমন কি হাস্যাস্পদ, কিন্তু তিনি যে আপনার হৃদয়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন এবং তাহা অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া মনে করেন নাই, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের রাজনৈতিক গৌরব তাহার অতীত যুগের চিতাভস্মের মধ্যে সঞ্জীবিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সায়াহ্ন কালে রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির অরিষ্ট শয্যায় জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতেছে! রাজনৈতিক মহাজীবন লাভের আশার সহিত অনেক আশঙ্কা বিজড়িত; ধর্ম্ম এবং ভাষার সমন্বয় ভিন্ন সামাজিক জীবনের উন্নতিও অসম্ভব; ভারতের ভাষা একটি নহে; মনু ও পরাশরের যুগও অতীত হইয়াছে; সুতরাং জাতীয় সাহিত্যই আমাদের ভরসা স্থল। অবশ্য একথা সত্য যে ভারতে এত বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত এবং সাহিত্যের অধিকার সীমা এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, তাহার উপর জাতীয় জীবনের স্থায়িত্বের অধিক আশা করা যায় না, কিন্তু আপনাকে মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতাই সাহিত্যের ক্ষমতা, প্রকৃত প্রেমের ন্যায় ইহা অবিচল; সাহিত্য মানব জাতির জ্ঞান ও মানসিক উৎকর্ষের দর্পণ স্বরূপ; সেই জ্ঞান ও উন্নতির আলোকে যখন বিশ্বের মানব জাতি আপনাদের জীবন উদ্ভাসিত দেখে, তখন তাহারা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না এবং এইরূপে তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে; এমন কি সেই ভাষা গতজীবন হইলেও তাহার সমাধি স্তম্ভের উপর জগৎবাসীর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হয়, তাহার সেবকমণ্ডলী তাঁহাদের কবিতা ও সঙ্গীতে, তাঁহাদের কাব্যে এবং চিত্রে এই মহিমাস্তূপের মধ্যে অবিচলিত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; এই জন্যই বেদ এবং উপনিষদ, গৌতম ও পাতঞ্জল, ব্যাস বাল্মিকী ও কালিদাস এই নব উন্নতি, নব নব আকাঙ্ক্ষা, আবিষ্কার, নূতন যুগের শিক্ষা ও রুচির এই ঘূর্ণ্যাবর্ত্তময় বিশাল প্রবাহ মধ্যে স্ব স্ব অস্তিত্ব অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন; ইহারা যুগে যুগে মানবের জ্ঞান ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন সমর্পণ করিতেছেন, কিন্তু ব্রহ্মাবর্ত্তের তপোবন, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ ভবন ও বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কোন দিন ধূলি রাশিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় ভাষা কখন এবং কিরূপে য়ুরোপীয়গণের চিত্ত আকর্ষণ করিল তাহার আলোচনায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানালোচনায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসেরই মনোযোগ সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট হয়, এবং তিনি কলিকাতায় একাদশ জন ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা ও বিধান সংকলনে প্রবৃত্ত করেন। তৎপূর্ব্বে এব্রাহাম নামক জনৈক ওলন্দাজ পাদরী কর্ত্তৃক ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থের অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। মুসলমান সম্রাটগণের কঠোর শাসনে অধঃপতিত হিন্দু জাতির মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং অপক্ষপাত ন্যায় বিচার লাভে তাহারা বঞ্চিত ছিল; তাহাদের এই অভাব মোচনের জন্যই হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা ও বিধান অনুবাদ বিষয়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল। এই একাদশ ব্রাহ্মণ সংকলিত বিধান ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ডে নীত হয়, কিন্তু সে সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাধারণের দুরধিগম্য বিষয় ছিল; ইহার নয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্‌স্ নামক বণিকযুবক ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় হিতোপদেশের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ যে মূল্যবান মশলা এবং মণিরত্নাদি ব্যতীত কোন মহত্তর, অধিক মূল্যবান রত্নের অধিকারী তাহা তখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহার দুই বৎসর পরে ভারতের সেক্সপিয়র কালিদাসের অমর নাটক স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হয়; এই নাটক (শকুন্তলা) হইতেই প্রকাশ হইল যে ভারতবর্ষ সাহিত্য সম্পদেরও অধিকারী; আলেকজান্দার ভন্ হনবোল্ট্ কালিদাসকে সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন এবং গেটে বিস্ময় বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রশংসা গান করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই শুধু সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নহে—পণ্ডিত বর্গের দৃষ্টিও সংস্কৃত ভাষার দিকে পতিত হইল, এবং য়ুরোপে সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল।"

গ্রন্থকার প্রথম চারি অধ্যায়ে আর্য্যভাষাতত্ত্ব এবং বেদের আলোচনা করিয়াছেন; ইহা প্রধানতঃ মোক্ষমূলর প্রণীত বেদের অনুবাদ ও ওয়েবার, গ্রিয়ার্সন্, টেলার, প্রভৃতি পণ্ডিত গণের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সংকলন এবং তাহার উপর মন্তব্য মাত্র।

বৈদিক কালের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির সমুত্থান। পৌরাণিক ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত কিন্তু ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র জয়ী। এই যুগেই ভারতবর্ষে জাতি ভেদের প্রথম পত্তন। ক্রমে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ প্রভুতা যখন সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িল এবং আর্য্যজাতি কেবল মাত্র কুরুপাঞ্চালের অধিকার সীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া দিকদিগান্তরে প্রসারিত হইল, তখন তাহারা আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব মানিতে চাহিল না, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর গুরুতর দণ্ডাঘাত করিল, এই আঘাতই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশ! ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে হিন্দু দর্শনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানেই বেদ এবং উপনিষদ ব্রহ্ম সূত্রে গ্রথিত হইল এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এই যুগ ভারতের প্রধান কর্ম্মময় যুগ।

ব্রহ্মসূত্র যাজ্ঞবল্ক্য এবংশাণ্ডিল্য বিদ্যার আলোচনার পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের অবনতি ও নব ধর্ম্মের উন্নতির মধ্যবর্ত্তী যুগে সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; এই সময় ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছিল। নিরীশ্বর বাদ ও দুর্নীতিস্রোত প্রবল বেগে বহিতেছিল; অনেকে বেদদ্বেষী হইল, অনেকে শুধু 'বেদ মানিনা" বলিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহারা বলিতে লাগিল, "স্বর্গ মিথ্যা, পরকাল নাই, চরম মুক্তির কথাটা কবিকল্পনা মাত্র;" "ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ" ইহাদেরই মত। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে নব উদ্বেলিত প্রভাবে এই শ্রেণীর উশৃঙ্খল মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের দমন হইয়াছিল। সিদ্ধার্থের পর মহাবীর নামক একজন সাধু জৈনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, ইনি কুণ্ড গ্রামের নরপতির পুত্র। এবং মহারাজ বিম্বসরের আত্মীয়। 'জীন'—'বিজয়ী" এই অর্থ

হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম করণ হইয়াছে, সত্যদর্শন, সত্যজ্ঞান এবং সত্যব্যবহার ইহাদের মূলমন্ত্র। অহিংসা শব্দ যতদূর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহারা তাহার ব্যবহারে ত্রুটী করে না। জীবনাশের ভয়ে, জল, পানের পূর্ব্বে ছাঁকিয়া লইয়া তবে গলাধঃকরণ করে, পথে চলিবার সময় সাবধানে পথ পরিষ্কার করিয়া পদক্ষেপ করে। ইহারা মোক্ষের অভিলাষী, বিষয়তৃষ্ণার বিরোধী, ত্যাগের অনুরাগী।

বৌদ্ধধর্ম্ম দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই, ক্রমে ইহা হিন্দুধর্ম্মের অংশীভূত হইয়া পড়িলে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। শুধু উত্তরে হিমাচল হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত যে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের অধিকার বিস্তার করিলেন তাহা নহে; সিন্ধুনদকূলে যদুবংশীয়গণ আপনাদের বংশতরু রোপণ করিল, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর অন্তর্দ্দেশে অন্ধ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের আলোচনা আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মে নব নব দেবতা প্রবেশ লাভ করিলেন। শাস্ত্রাধিকার এ সময়েও ব্রাহ্মণদিগের হস্তে, সুতরাং স্বকীয় প্রাধান্য স্থাপনে তাঁহাদিগকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। ধর্ম্ম ও সমাজ চালনার জন্য এই কালে কল্পসূত্রের সৃষ্টি; এই সূত্রের যুগ পঞ্চপূর্ব্ব খৃষ্টীয় শতাব্দী হইতে প্রথম পূর্ব্ব খ্রীষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত। মনু, বশিষ্ঠ, গৌতম, অপস্তম্ব, বুধায়ন প্রভৃতি ব্যবস্থাকারগণের অবস্থা অনুসারে সমাজ পরিচালিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইঁহাদের সকল ব্যবস্থার মধ্যেই পার্থক্য থাকিত। গৌতম বলেন, যে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে হাত তোলে তাহার নিকট স্বর্গের দ্বার শতবর্ষ অর্গলবদ্ধ থাকে; বুধায়ন বলিতেছেন, ব্রাহ্মণঘাতকের দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তেই তাহার মুক্তি লাভ হয়, হত্যাকারীকে খট্টাঙ্গ (খাটের পায়া) ঘাড়ে লইয়া গর্দ্দভ-চর্ম্মে আবৃত হইয়া, মৃত ব্রাহ্মণের মস্তকের নিশান তুলিয়া শ্মশানে বাস করিতে হয়, জীবন ধারণের জন্য তাহাকে প্রত্যহ সাতজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়া নিজের কুকার্য্যের কথা বর্ণনাপূর্ব্বক ভিক্ষা চাহিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ভিক্ষা মিলে ভালই, তাহারা ঘৃণাভরে তাড়াইয়া দেয় অনাহারেই দিন কাটাইতে হইবে। আবার বশিষ্ঠের মত এই যে যদি হত্যাকারী অগ্নিতে পুড়িয়া মরে কিম্বা রাজা ও ব্রাহ্মণের জন্য যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার মুক্তিলাভ হইবে। ব্রাহ্মণের দীক্ষার বয়স আট হইতে ষোল, ক্ষত্রিয়ের এগার হইতে বিশ, বৈশ্যের কুড়ি হইতে বাইশ এবং তূণ, ধনুকের ছিলা ও পশম যথাক্রমে ইহাদের যজ্ঞসূত্র। দীক্ষার পর গুরুগৃহ বাস; অপস্তম্ব বলেন, "ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে ব্রাহ্মণসন্তান ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গুরুর নিকটও শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।" গুরু শিক্ষাদানের জন্য বেতন লইতেন, শিষ্য গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া বিবাহ পূর্ব্বক গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন; ব্রাহ্মণের ত্রিশটি, ক্ষত্রিয়ের দুইটি এবং বৈশ্যের একটি দার পরিগ্রহের অধিকার ছিল এবং আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণকেও শাস্ত্রচর্চ্চার পরিবর্ত্তে রাজসেবা বাণিজ্যাদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত বৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল।

হিন্দু জাতির সমাজ ও ধর্ম্মজীবন যখন এইরূপ অতি নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত হইতেছিল; সেই সময় ভিন্নজাতীয় ঐতিহাসিকের নিকট ভারতেতিহাসের কথা শুনিলে, বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। টিসিয়ান নামক একজন গ্রীকদেশীয় চিকিৎসক পারস্য-রাজধানীতে দূতরূপে সপ্তদশ বর্ষকাল (৪১৬—৩৯৮ পূঃ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; সেখানে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা 'ইণ্ডিকা" এই নামে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া সযত্নে পরিরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ অসম্ভব এবং রহস্যময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাহাতে বর্ণিত আছে, "ভারতবর্ষের নির্ঝরিণীর জল কোন পাত্রে উত্তোলন করিবামাত্র তাহা সুবর্ণে পরিণত হয়, ভারতের সূর্য্য অন্য দেশের সূর্য্য অপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ, সমুদ্রতল চারি অঙ্গুলি গভীরতা পর্য্যন্ত এত উচ্চ যে জলের উপর মৎস্য ভাসিয়া উঠিতে পারে না।"—ভারতবর্ষে একজাতীয় রাক্ষস আছে তাহাদের মানুষের মত মুখ, চারি পাটি দাঁত, বৃশ্চিকের ন্যায় লেজ, দীর্ঘ একহাত, কিন্তু এই লেজের হুলে এমন তীক্ষ্ণ বিষ আছে যে তাহারা তৎ সাহায্যে হস্তী ভিন্ন অন্য সকল জানোয়ারকেই বধ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অগ্নিময় পর্ব্বত বিস্ময়কর হ্রদ; রোগপ্রশমনকারী নির্ঝর, চতুর্ম্মুখ পক্ষী প্রভৃতি কত অদ্ভুত পদার্থের কথাই বর্ণিত আছে। এই পুস্তক পাঠেই আমরা জানিতে পারি ভারতে

দুই হাত লম্বা মানুষ ছিল; তাহাদের মস্তক, দাঁত ও নখর কুকুরের মত এবং কুকুরের মতই তাহাদের চীৎকার, কিন্তু তথাপি তাহারা অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ।

ষ্ট্রাবো বলেন, 'যাহারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়া আসিয়াছেন তাহারা একদল মিথ্যাবাদী লোক।' এইরূপ যাহাদের মত তাঁহারা অনাবশ্যকরূপে অতি অপ্রিয় কথা বলেন, কারণ ঐ সকল ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে অনেক সত্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ভারত সম্বন্ধে মেগেস্থিনিসের অনেক কথাও অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, কিন্তু সে জন্য তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ সঙ্গত নহে, তাঁহার অনেক বর্ণনাই সত্য, তবে তাঁহার সংবাদদাতাদিগের দোষে কোন কোন অসম্ভব কাহিনী তিনি গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্লিনি বলিয়াছেন 'ভারতবর্ষে এক জাতীয় মানুষ আছে তাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাৎ দিকে উল্টান।" এ কথা কখন সত্য হইতে পারে না, কিন্তু মেগেস্থিনিস্ যেমন শুনিয়াছেন তেমনই লিখিয়াছেন, এ জন্য যাহারা মেগেস্থিনিসের সকল কথাই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, তাঁহারা প্রকৃত সত্যটুকুকেও অবিশ্বাস করিবেন।

যখন উত্তর ভারত গ্রীক আক্রমণে ব্যথিত ও বিড়ম্বিত হইতেছিল, যখন সিন্ধু ও পাঞ্জাব, মগধ ও উজ্জয়িনী সর্ব্বত্র গ্রীকজয়ধ্বজা সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, তখন কলিঙ্গরাজ আপনার জন্য সহস্র পদাতিক, সহস্র অশ্বারোহী এবং সপ্তশত গজ পরিবেষ্টিত হইয়া বঙ্গদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন, এবং বুধায়ন ও অপস্তম্বের ব্যবস্থার অনুশাসিত গোদাবরী ও কৃষ্ণামধ্যবর্ত্তী অন্ধ্ররাজ্য (মহারাষ্ট্র) লক্ষ পদাতিক, ত্রিসহস্র অশ্বারোহী, এবং সহস্র হস্তী সহযোগে প্রাচীর বেষ্টীতা নগরীর সুদৃঢ় তোরণ সুরক্ষিত করিতেছিলেন। এই কালের ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য প্রভৃতিরবিবরণ জানিতে হইলে মেগেস্থিনিসের উপরই নির্ভর করা আবশ্যক।

যাহাহউক বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যখন আপনার দেহকে নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জাতিভেদের উপর বিশাল প্রাসাদনির্ম্মাণকার্য্যে অভিনিবিষ্ট ছিল, তৎকালে আর্য্যভারত হইতে একটা ক্ষুব্ধিত অসন্তোষের আর্ত্তনাদ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছিল, জীবন যন্ত্রণাময়,—দেহের যন্ত্রণা, জগতের যন্ত্রণা, দেবতার যন্ত্রণা সর্ব্ববিধ যন্ত্রণার বিষময় তাড়নায় অস্থির হইয়া সে আর্ত্তনাদ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা প্রতিরোধের জন্য সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি। সাংখদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির অবতারণাদ্বারা আত্মা ও পরমাত্মা, দেহ ও মন প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদ্বারা দ্বিবিধ জ্ঞানের শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং মায়াবাদ আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতের মুক্তকণ্ঠে প্রসংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন, "The system of Sankara stands supreme as the loftiest height to which Eastern intuitive thought has reached. It has more influence in India than all this *phases* of thought. It is part of the life blood of the nation." গৌতমের ন্যায় এবং কনাদের বৈশেষিকও এই যুগের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফল।

প্রাচীন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সমাজ নীতি সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়া মিঃ ফ্রেজার ভারতীয় মহাকাব্য সম্বন্ধে স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদের গীতিময় ধ্বনি, উপনিষদ ও বেদান্তের জ্ঞানময়ী বাণী এবং সুরদাস ও তুলসীদাসের কবিতাময় কাহিনী জগতের সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য, কিন্তু সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। আর্য্য কবিগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানাবিধ গল্প, জনশ্রুতি, প্রবাদ, ক্ষুদ্র বৃহৎ যুদ্ধাদির বিবরণ এবং সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক মতগুলি একত্র সংবদ্ধ করিয়াছেন, সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি একটী অখণ্ড গল্পের মত দেখাইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত মহাকাব্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছে।

মহাভারত ব্যাসের রচিত বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ভারতীয় উর্ব্বরমস্তিষ্ক শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণেরই রচনা, এবং ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতার প্রতিচ্ছায়া ইহার সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। রামায়ণ দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-শক্তি বিস্তারের পরিচয় প্রদান করে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ স্বদে-

TORN PAGES.

শীয় ভাষায় রামের যে বীরত্ব ও মহত্ব গাঁথা গান করিত, ব্রাহ্মণকবি বাল্মীকি সেইগুলি একত্রে রামায়ণ নামে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থের মধ্যেই এত অবান্তর কথা আসিয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদের গল্পাংশগুলি উৎকৃষ্ট নাটক কিম্বা শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতের সেক্‌স্‌পিয়র তুলসীদাস এই সকল অবান্তর কাহিনী পরিত্যাগপূর্ব্বক রামায়ণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং তাহাকে একটি উচ্চ আদর্শরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই জন্যই নামে মাত্র মহাকাব্য (So called Epic) যে সংস্কৃত রামায়ণ, তাহা তুলসীদাসের কবিত্বশক্তির নিকট খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তুলসীদাসকে বাল্মীকির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করিতে দেখিলে শুধু বিস্ময় জন্মে না, এই প্রকার দুশ্চেষ্টাকে বাতুলতা বলিয়া মনে হয়। ভারতচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার।" বাল্মীকির রামায়ণ না বুঝিয়া, গ্রিয়ারসনের মুখে ঝাল খাইয়া—মিঃ ফ্রেজার যে বাল্মীকিকে য়ুরোপীয় পাঠকমণ্ডলীর সম্মুখে এতখানি নামাইয়া ফেলিলেন, প্রকৃত মাধুর্য্য বোধের অভাবেই তাহার কারণ বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু ইহাতে সেই আদি মহাকবির কোন অপকার হইবে না, কারণ যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিত বাল্মীকি রামায়ণের সম্যক রসাস্বাদনে সমর্থ তাঁহারা কখনই নকলকে আসল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিবেন না।

মিঃ ফ্রেজারের মতে মহাভারত যে হিন্দু নামধারী আর্য্য ও অনার্য্যগণের ঝগড়া বিবাদ, কৃত্রিম যুদ্ধ, দৃশ্য বৈচিত্র, বহুবিধ অসংলগ্ন গল্প, এক ঘেয়ে ধর্ম্মোপদেশ ও সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মণের মুরুব্বিয়ানার খিচুড়ী তাহাই নহে; কুরুপাণ্ডবের এই বিরোধকে তিনি একটি রূপক মাত্র বলিতে চান। তাঁহার বিশ্বাস, সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, বল ও দুর্ব্বলতা মনুষ্য হৃদয়ের এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তিগুলিকে মনুষ্য মূর্ত্তি দিয়া কুরুপাণ্ডবরূপে স্থাপন করা হইয়াছে; কিন্তু হয়ত কুরুপাণ্ডবের দুটো দল ছিল, ব্রাহ্মণেরা এই পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বী ও হিতৈষী, তাই তাহাদের ঘাড়ে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের গুণ কীর্ত্তন করিতে, এমন কি তাহাদের দোষেরও সমর্থন করিতে ব্রাহ্মণ উকীলগণ পশ্চাৎপদ হয় নাই, স্থানে স্থানে তাহাদের অতি গর্হিত কাজগুলি 'যেন তেন প্রকারেণ' চাপা দিয়া গিয়াছে। জতুগৃহ দাহকালে যে নিষাদ রমণী পঞ্চ পুত্রের সহিত অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, সেই নরহত্যা ও নারীহত্যার অপরাধ পাণ্ডবদেরই, ইহা তাহাদেরই ধূর্ত্ততার ফল, তাহারা গৃহে অগ্নিদান করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে এই নারীগণকে পুড়াইয়া মারিল এবং পাণ্ডবের উকীল ব্রাহ্মণেরা এই নিরপরাধী নীচ জাতীয় নিষাদের হত্যাকাণ্ডটা কিছুমাত্র অন্যায় বলিয়া মনে করিল না।

মহাভারতে একমাত্র বৃকোদরের চরিত্রই 'এপিকের' উপযুক্ত; চতুর্দ্দিকের অতি প্রকৃত ঘটনাজালের মধ্যে ভীমসেনের চেহারাই সুস্পষ্ট এবং জীবন্ত।

ভীমসেনের হিড়িম্বারাক্ষসীকে বিবাহ, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী গ্রহণ ইত্যাদি দেখিয়া মিঃ ফ্রেজার সাব্যস্ত করিয়াছেন পাণ্ডবেরা অনার্য্য জাতি হইবে; দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ অনার্য্য জাতিসুলভ এক রমণীর বহুস্বামী গ্রহণ প্রথার নিদর্শন মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা এই পঞ্চস্বামী গ্রহণের পক্ষেও একটা হেতু বাহির করিলেন, শুধু তাহাই নহে, এই অসত্য প্রথার সমর্থনও করিলেন।—বঙ্কিমবাবু বহুপূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ ব্যাপারটা সাহেবদের চক্ষে—A simple case of polyandry!

পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থনগর সংস্থাপন পূর্ব্বক যে সকল দেবতার পূজা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে প্রাচীন আর্য্যজাতির দেবতা নহেন, নবযুগের সাধারণ দেবতা, কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখেও ব্রাহ্মণগণ মস্তক অবনত করিতেন।

ফ্রেজার সাহেব মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে গোপীজনমনমোহন, রাধাবল্লভ, শ্রীনন্দনন্দন গোকুলানন্দবর্দ্ধন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কালীয়নাগবধ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ সকলের কতদূর সম্বন্ধ তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

পাশাখেলার গল্পটাতেও ফ্রেজার সাহেব ব্রাহ্মণদিগের কুরুবিদ্বেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কুরুকুল পাশায় জয়লাভ করিল, তাহার ভিতরও কৌশলের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহার পর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দৃশ্যটা অতি-

হৃদয়বিদারক; অসভ্য গ্রাম্য কবির গানে এই ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্ট সর্ব্বোত্তমা রমণীর দুঃখ ও লজ্জার কাহিনী হৃদয় স্পর্শ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য কবিতায় এই ঘটনাটী এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহা অনুবাদের অযোগ্য, অপাঠ্য, অসহনীয়, তিনি আরো বলিয়াছেন—'In the Brahmanic poem, as we now possess it PATHOS and OBSCENITY all have been mingled together by the Brahmanic redactor into the most repulsive, cold, and unrealistic description of suffering womanhood that the literature of any country has preserved." কিন্তু স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর মতে ইহাই মহাভারতের একটী অতিমনোহর অংশ, কবির উজ্জ্বল প্রতিভা এখানে সুপরিস্ফুট এবং এই অংশেই কবিত্বের চরমোৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত ভাব বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারা অনেক সময় প্রকৃত সুন্দর চিত্রেও কুভাবের অবতারণা দেখিয়া থাকেন। কোন দুরাচার দৈত্য কোন কুসুম কোমল লাবণ্যবতী অসহায়া সুন্দরীকে আক্রমণ করিলে সেই উপায়হীনা লজ্জাবতী নারী বিধাতার দয়া ও প্রসন্নতা কামনাপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে অশ্রুত্যাগকরিতেছে, চিত্রে সুন্দরীর সেই বিপন্ন সৌন্দর্য্য, সেই কাতরতা, ধর্ম্মানুরাগ এবং হয়ত নারীসুলভ দন্তের অঙ্কননৈপুণ্য দেখিয়া প্রীতি লাভ না করিয়া যাঁহারা তাহাতে সেই পাষণ্ড দৈত্যের মূর্ত্তিমতী লালসার ভীষণ ভঙ্গীরই প্রাধান্য দান করেন, এবং এরূপ চিত্র সাধারণের নয়নপথে স্থাপন করিবারও অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নীতিবিজ্ঞান প্রখর এবং রুচি অতি মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে প্রকৃত কাব্যসৌন্দর্য্যে তাঁহাদের অনুরাগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, গ্রন্থকারের মতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যে ক্রমপরিবর্ত্তন, মহাভারত তাহারই চিত্র। মহাভারতে বৈদিক দেবতাগণ অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র জীবিত থাকিলেও তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে; ইন্দ্র এখানে শুধু দেবতাদিগের দলপতি মাত্র, যম বিচারপতি এবং বিশ্বজগতের একমাত্র নিয়ামক ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত। এখানে শিব গৃহস্থ, উমা, কালি, দুর্গা, গৌরী তাঁহার গৃহিণী, যক্ষ তাঁহার ভাণ্ডারী, এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হইয়া পাণ্ডবদিগকে বিজয় দানপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তির দাবী করিতেছেন, এবং মহাভারতের ব্রাহ্মণ কারিকরগণ তাঁহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেছেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয়উপাস্য দেবতা রূপ স্থাপিত করাই মহাভারত প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কৃষ্ণকে যে মহৎ আদর্শে সৃষ্ট করা হইয়াছে তাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে এই তত্ত্ব ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ লাভ করে।

পরবর্ত্তী যুগে নাটকের সৃষ্টি হয়, ইহাও ব্রাহ্মণদিগের কীর্ত্তি। প্রথমে কিরূপে নাটকের উদ্ভব হইল তাহা নিরূপন করা কঠিন নহে। অসভ্যগণের মধ্যেও নৃত্যগীতের যৎপরোনাস্তি আদর দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে যোদ্ধৃগণও নৃত্যগীত দ্বারা আপনাদিগের কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ কতকগুলি স্থূল ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিরূপ প্রণালীতে নাটক ভারতবর্ষে অভিনীত হইত তাহার বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে তিনি বলেন ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ভারতের গৃহস্থজীবনের উজ্জ্বল চিত্র; কালিদাস সম্বন্ধে তাঁহার মত তেমন উদার বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলেন, ভারতীয় নাটক রচনায় কালিদাস সেক্ষপীয়রের খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এ কথা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে তিনি সংস্কৃত নাটকে প্রাচ্য আদর্শ অনুসারে সূক্ষ্মরূপে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; অনন্তর তিনি কালিদাসের শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, ভবভূতির মালতীমাধব, মহাবীর চরিত, উত্তররাম চরিত, সংস্কৃত সাহিত্যে এই কয়খানিকে শ্রেষ্ঠ নাটক স্বীকার করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মালতীমাধব সম্বন্ধে তিনি মিঃ গ্রীয়ারসনের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন ভারতবর্ষে এমন পণ্ডিত একজনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই যিনি ভবভূতির অতি কঠিন শ্লোক একবার মাত্র পাঠকরিয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। মালতীমাধবে হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলা

জটিল কুসংস্কারের পত্তন দেখিতে পাওয়া যায়; ভবভূতির নাটক তান্ত্রিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতির নামও উল্লেখ করেন নাই।

মালবিকাগ্নিমিত্র একমাত্র বৌদ্ধ নাটক। অনেকে কনোজের রাজা দ্বিতীয় শিলাদিত্যকে ইহার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা অন্য কোন কবির বিরচিত বলিয়াই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। সাহেবের নিজের বিশ্বাস কি এবং অন্য কবিবিরচিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবার কারণ কি তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়যন্ত্রই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিভা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। মিঃ ফ্রেজার হয়ত মনে করিয়াছেন, রাজা শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সুতরাং এই নাটকে যে কূটনীতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার কল্পনায় স্থান পাইতে পারে না, অতএব এই নাটক কোন ব্রাহ্মণেরই রচনা; ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্রাহ্মণের চাতুর্য্য যে অন্য কেহ এমন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে ইহা সম্ভব পর নয়।

মিঃ ফ্রেজার স্থানান্তরে একথা এক প্রকার স্বীকারও করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, বস্তুতঃ বৈদিক কাল হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতা ভারতবর্ষে প্রায় সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাদের চাতুর্য্য কোনদিনই অন্তর্হিত হয় নাই, এবং এখনও ব্রাহ্মণগণ স্বজাতীয় ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য বদ্ধ পরিকর; চানকোর মত ইহারা এখনও কূটপটু, সংকল্পনিষ্ঠ, গর্ব্বিত এবং ধূর্ত্ত। ব্রাহ্মণদিগের উপর সাহেবের এই আক্রোশের আমরা কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না; গরীব ব্রাহ্মণ হস্তে তিনি যে কোন দিন বিড়ম্বিত হইয়াছেন তাহাও বোধ হয় না; তবে তিনি দাক্ষিণাত্যপ্রবাসী সাহেব, সম্ভবতঃ পুনার হত্যাকাণ্ডের অভিনেতা ব্রাহ্মণ দামোদরের কথা মনে করিয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে মহানুভব তিলকের অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব দেখিয়া তাঁহার মনে এই প্রকার আক্ষেপের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন দেশবাসী একটি সভ্রান্ত সমাজের প্রতি কঠিন কটাক্ষ ও বিদ্রূপবর্ষণ মিঃ ফ্রেজারের পদগৌরব ও শিক্ষার উপযুক্ত নহে; ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত ভারতবর্ষ উপকৃত, ব্রাহ্মণগণই প্রাচ্যভূখণ্ডে জ্ঞানের প্রথম প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, সেই দীপালোকে যুগযুগান্তর ধরিয়া সমগ্র প্রাচ্যভূখণ্ড আলোকিত এবং সেই আলোক রশ্মি এখনো দিক্‌দিগন্তরের মনুষ্যহৃদয় উজ্জ্বল করিতেছে। একথা সত্য যে ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থাশাস্ত্রপ্রণেতা হইয়া কাহারো লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে সর্ব্বসাধারণের প্রতি সমদৃষ্টির অভাবও লক্ষিত হইত; কিন্তু সে জন্য অপরাধী করিবার পূর্ব্বে নিজেদের আচরণ স্মরণ করা উচিত। একালেও কি পিনালকোডের ধারা সাদা ও কালোর উপর সর্ব্বত্র সমভাবে খাটে? এই ঘোরতর সাম্যের যুগেও রূড়কী কালেজে কালোর প্রবেশাধিকার বন্ধ হইল কেন? সমদর্শিতা অতিউৎকৃষ্ট জিনিষ, কিন্তু জগতে সর্ব্বত্র তাহা দেখা যায় না, মনুষ্যের দুর্ব্বলতার কথা মনে করিয়া এজন্য গালাগালি না দেওয়াই সঙ্গত।

মিঃ ফ্রেজার আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন নাই, সংস্কৃত কাব্য বা নাটকের সৌন্দর্য্য বোধে তাঁহার ক্ষমতা নাই একথা বলা ধৃষ্টতা প্রকাশক। কিন্তু বোধ করি একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, যে চসমার ভিতর দিয়া তাঁহারা আমাদের দেশের কাব্যসৌন্দর্য্যের আলোচনা করেন তাহা কিছু অতিরিক্ত ঘোরাল, তাই সংস্কৃত সাহিত্যের শুভ্র, নির্ম্মল, প্রশান্ত সৌন্দর্য্যটুকু তাঁহারা অবিকৃত ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেননা, এজন্য তাঁহাদের অপরাধী করা চলে না; যে সুকুমার সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমরা আবাল্য পরিবর্দ্ধিত, ভাষার যে ললিত ভঙ্গীর সহিত আমরা প্রথম জীবন হইতেই পরিচিত, স্থান কাল ও পাত্রের যে মধুরস্মৃতি আমাদের জীবনের সহিত বিজড়িত, তাহাদের সহিত য়ুরোপীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কোন সংশ্রব নাই, সেই জন্যই অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে প্রকৃত রস গ্রহণে নিরাশ হইতে হয়।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে মিঃ ফ্রেজার শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মাধব প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকের তিরস্কারভাজক, সম্বন্ধ প্রভৃতি কবিগণের উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

গ্রাফ খানি, তাহার হাতের খান চারি পাঁচ পত্র—এই সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র—হিমানীর উপহার একটি অতি শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ এবং একখানি কবিতাপুস্তক এই সমস্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দ্রব্যগুলি হিমানীর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা করিতে চলিল।

আজ সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজকক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়ক্ষুরে টেবিলে তাহার ভোজনসামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উষ্ণ। চক্ষু দুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একখানি সোফায় হিমানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল, মণিভূষণ গিয়া সেই সোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে আর সে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার সুখ উপভোগ করে নাই। হিমানীর একখানি সুকোমল তপ্ত হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা যাহা যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধ্যা দশটার মেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায়গ্রহণের নিষ্ঠুর মুহূর্ত্ত নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া গদ্গদস্বরে দুই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহজগৎকে কেন জানিনা মণিভূষণের পরজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অশ্রুধৌত ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই স্বল্পালোকে নিরীক্ষণ করিল। আত্মবিস্মৃতিমোহে সে সমাজ ভুলিল, নীতি ভুলিল, পাপপুণ্য ভুলিল, বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠযুগল হিমানীর ওষ্ঠে মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল কিন্তু মুখ সরাইল না।

সহসা যেন মণিভূষণের হৃদয়ে অশান্তির তুফান কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল। সে উঠিয়া হিমানীকে বলিল—"তবে যাই।"—"তবে আসি" কথাটাই মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সংশোধন করিয়া বলিল "তবে যাই"। বলিয়া ঠিক মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই গৃহ হইতে হইয়া গেল।

হিমানী সেই সোফায় মুখ লুকাইয়া লুঠাইতে ল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর তিনটি বৎসর অতী গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মণিভূষণের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সামন্তপুর গ্রামের উত্তরসীমা হইতে কিছুদূরে নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। গ্রীষ্মে নদীটি চ হাতের বেশী হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময় পার হওয়া চলে। দুই তীরে আমবাগান, বাঁশঝা বন প্রভৃতি শাখাবিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যতাপ এই ক্ষীণতোয়া নদীটিকে রক্ষা করিতেছে।

এই নদীর তীরে মণিভূষণের নবনির্ম্মিত আব বাংলো ধরণের একটি ক্ষুদ্র বাড়ী। চারিপার্শ্বে দেশী নানাজাতীয় ফল ফুল ও পাতার গাছ। বাগান সবুজ রং করা লোহার রেলিং।

এই গৃহে মণিভূষণ একাকী বাস করে। এখ বিস্তৃত ইষ্টকের ব্যবসায়। সরস্বতীর উভয়তীরে পাঁজা দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার। যখন পড়িত, তখন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অ রাগ ছিল। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক করিয়া সে জানিয়াছে, এই স্থানের মৃত্তিকাই ইষ্টক পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বিলাত হইতে এই সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক আনাইয়া সে পাঠ কা একবৎসরকাল ক্রমাগত টেষ্ট্‌ ট্রাব্‌ ভাঙ্গিয়া এবং পোড়াইয়া একটি চূর্ণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হ যাহা কাদায় মিশাইলে ইষ্টক বেশ লাল আর খুব শক্ত হয়। এই উৎকর্ষের জন্যই মণিভূষণের ইষ্টকের অনেকদূর পর্য্যন্ত এত আদর।

এই গৃহে একটি অনতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে, সেটি মণিভূষণের অফিস্। খাতা ও পুস্তকভরা কাচের আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আসবাবই সাহেবী কেতায় সজ্জিত;—এমন কি চুরটের ছাই ঝাড়িবার পাত্রটি পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আজ বৈশাখের মধ্যাহ্নে

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মণিভূষণ আপনার নির্জ্জন অফিস্ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্ট-কের হিসাব করিতেছিল না,—কবিতা লিখিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদও সাহেবী;—খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুণ পূর্ব্বাবধিই তাহার আদব কায়দা সমস্ত সাহেবী হইয়া গিয়াছিল।

মণিভূষণের সম্মুখে যে একখানি সুন্দর বিলাতী বাঁধাই করা খাতা রহিয়াছে, সেখানি প্রেমের কবিতায় পরিপূর্ণ। এক একবার সে খাতা খানির এখানে ওখানে খুলিয়া পড়িতেছিল,—আবার বন্ধ করিয়া রাখিতেছিল। কবিতা-গুলি সমস্তই স্ত্রীলোকের উক্তি। আবরণে লেখা, শ্রীমতী হিমানী দেবী বিরচিত।

কিয়ৎক্ষণ কবিতা লেখার পর, দেরাজ হইতে মণিভূষণ তিনখানি চিত্র বাহির করিল;—তিনখানিতেই হিমানী। প্রথম খানিতে হিমানীর কুমারী বেশ; সুন্দর ঢল ঢল মুখ-খানি; চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছে; যেন কাহার নিকট কি শুনিয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের হাসি হাসিতেছে। দ্বিতীয় খানিতে হিমানী বিবাহসাজে সজ্জিতা;—মুখে সলজ্জ সু-রক্তিম হাসির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে; চক্ষু আনত। হিমানী যেন আপনাতে আপনি লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। শেষের খানিতে যুগলমূর্ত্তি। হিমানী ও মণিভূষণ পর-স্পরের মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া। সে দৃষ্টিতে অতৃপ্তি, মোহ ও চাঞ্চল্য মাখান একটা ভাব নিপুণতার সহিত চিত্রিত।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে হিমানীর সঙ্গে মণি-ভূষণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রম করিয়াছেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পর হইতে মণিভূষণ হিমানী অথবা তাহার পিতামাতার কোন সংবাদ পায় নাই এবং লয়ও নাই। হিমানী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহাও সে অবগত ছিল না।

বলিতে ভুলিয়াছি যে মণিভূষণ এখন একটা বিষম চিত্তব্যাধিতে আক্রান্ত। ডাক্তারেরা ইহাকে মনোমেনিয়া বলেন। একপ্রকার পাগল আর কি—সম্পূর্ণ পাগল নহে। এ ব্যাধি যাহার হয়, তাহার কেবল একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তবিকার ঘটে;—আর আর সমস্ত বিষয়ে তাহার মন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কিন্তু একটু পূর্ব্বের ইতিহাস বলার প্রয়োজন।

বাড়ী আসিয়া মণিভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে সে হিমানীকে ভুলিয়া স্বীয় পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী নব-দুর্গাকে ভালবাসিতে পারে। জলমগ্ন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁচাইতে হইলে, তাহার মুখপথে ফুৎকারবায়ু প্রেরণ করিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বহাইতে হয়, তাহার পর স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস পুনরাগমন করে; মণিভূষণ প্রথমে নব-দুর্গাকে এইরূপ কৃত্রিম মৌখিক ভালবাসা জানাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। সে নিজের সঙ্গে যে প্রাণান্তকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে যদি নবদুর্গার সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, এই দুরাশায় একদিন তাহাকে সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত অকপটে জ্ঞাত করিল। কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া বিপরীত হইল। স্বামীর মুখে যাহা শুনিল, তাহা ত নবদুর্গা বিশ্বাস করিলই, তাহা ছাড়া স্বামীর প্রতি অতি কুৎসিৎ সন্দেহ করিল; এবং স্বামীকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ডতপস্বী বলিল। অকথ্য ভাষায় হিমানীর প্রতিও আক্রমণ করিল। তাহার পর একটা কদর্য্য বীভৎস শপথ দিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি আমায় স্পর্শ করিও না।"

ইহার পর স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ হইল। মণিভূষণ জ্বরে পড়িল; কয়েকদিনকাল খুব জ্বর রহিল; মস্তিষ্কবিকারের সূত্রপাত তখন হইতেই। নবদুর্গা যদি আত্মীয় স্বজনের একান্ত অনুরোধে মণিভূষণকে শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে যাইত, তাহা হইলে সে রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিত। তাহার নিকট নবদুর্গার নাম পর্য্যন্ত করি-বার যো ছিল না।

জ্বর নরম পড়িল, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। ডাক্তার বৈদ্যেরা পরামর্শ করিয়া নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। জ্বর ক্রমে ছাড়িল বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সেই একটু গোলযোগ রহিয়া গেল। নবদুর্গার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সে কেমন একরকম হইয়া যাইত। নবদুর্গাকে এই কারণে পিত্রালয় হইতে আনা হইল না, এবং পরিবার-মণ্ডলীতে তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ বর্জ্জিত হইল।

ইহার পর গ্রামের চতুর্দ্দিকে মণিভূষণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে সর-স্বতী তীরে তাহার অফিসগৃহ পাঠক দেখিয়াছেন।

নির্জ্জনেই সে ভাল থাকিত; কেহই তাহার নির্জ্জনবাস

সম্বন্ধে আপত্তি করিল না। যে দিন খেয়াল হইত, সেই দিন বাড়ী আসিত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। সুতরাং নবদুর্গা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল।

অতঃপর মণি আর হিমানীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল না। মধ্যাহ্নে বিজন অফিস গৃহে বসিয়া বসিয়া হিমানীর কথা ভাবিত। বাড়ী আসিবার সময় স্বেচ্ছায় হিমানীর ফোটো-গ্রাফ খানি তাহার পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, এখন সে জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইল। কলেজে পাঠ-কালে সে চলনসই রকম ছবি আঁকিতে জানিত; হিমা-নীর একখানি ছবির জন্য সেই বিদ্যার শরণাপন্ন হইল। প্রথম প্রথম কিছুই মিলিল না; ক্রমে একটু আধটু সাদৃ-শ্যের ছায় আসিতে লাগিল। চক্ষু দুইটির ভাব যেন কিছু কিছু মিলিল। ক্রমে ওষ্ঠযুগলের ভাবও আসিল। দুই মাস পরিশ্রমের পর হিমানীর একখানি অতি সুন্দর ছবি সমাপ্ত হইল। সে দিন মণিভূষণের কি আনন্দের দিন। কত আদরে সে স্বহস্তাঙ্কিত প্রিয়ামূর্ত্তিকে চুম্বন করিল। এখানি হিমানীর কুমারী বেশের ছবি।

ছবি শেষ হইলে মণিভূষণ ভাবিল, এখানি বাঁধাইয়া না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য কাহারও হস্তে কলি-কাতায় পাঠাইতে পারিল না। স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া দোকানে বসিয়া থাকিয়া ছবি বাঁধাইল। কিন্তু যে দিন ছবি বাঁধাইল, সেই দিনই রাত্রে তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছবি খানি বক্ষে চাপিলে আর পূর্ণ না, মাঝখানে কাচের ব্যবধান রহিয়া গেল। সহ্য হয়? বিদ্যাপতির রাধিকাও ত ঐ কারণে তেন না।

তাহার পর হিমানীর হইয়া সে নিজে ব করিতে লাগিল। সংস্কৃত কবিরা লিখিয়াছে নায়িকার বিরহবিকারে নিজেকে নায়ক ভ্রম ব প্রতি প্রেমসম্ভাষণ করিয়া থাকেন। ম করিল। সে শুধু হিমানীর হইয়া কবিতা লি হইল না, হিমানীর হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত অনুকরণ ব চিত্র বিদ্যায় নিপুণ, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ ক হিমানীর হস্তাক্ষরে, কল্পিতা হিমানীর কবিতা তুলিতে লাগিল। হিমানীর ছবি খানি বাক্সের করাইয়া কল্পনা করিত যেন হিমানী তাহার একে একে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যে উন্মাদ গভীরতা আসিত, সেখানেই ছবিখানি করিত। ক্রমে তাহার স্বরচিত হিমানীকে বিব সাজাইয়া, ছবিতে তাহাকে বিবাহ করিল। কাহাকে বলে?

এইরূপ করিয়া তিন বৎসর কাটিয়াছে। তাহার নির্জ্জন আফিসগৃহে বসিয়া কবিতা ছিল।

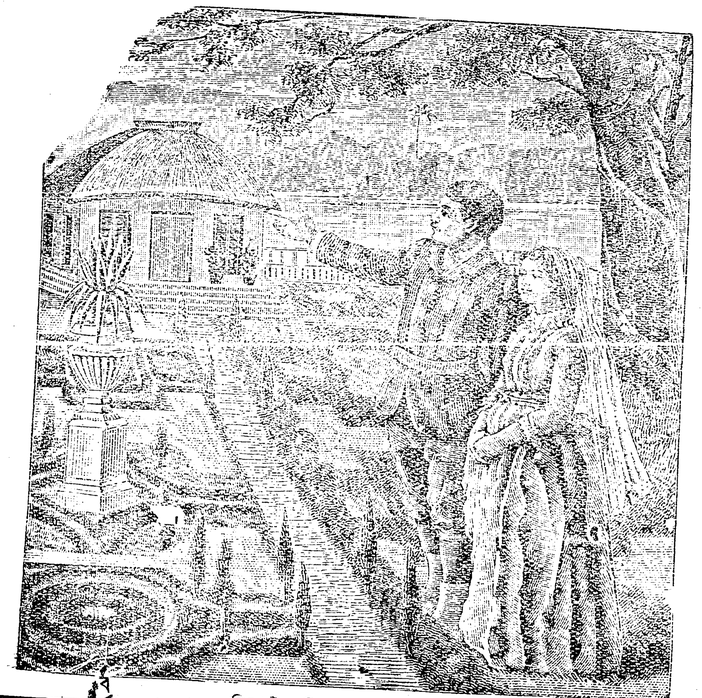

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বেলা একটা হইতে, ত করিল। কিছুক্ষণ পরে চা আচ্ছন্ন করিয়া ঝড় উঠিল মণিভূষণের গৃহের উপরিস্থ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে। সে হইয়া আকাশের পানে চ আসিতে বিলম্ব নাই।

ফিরিয়া চেয়ারে আসিয়া ব হ্নের মেঘাচ্ছন্ন আলোক ট কের মত দেখাইতেছিল কাচের মধ্যে দিয়া মণিভূ উন্মাদনৃত্য দেখিতে লাগিল দেখিল, তাহার কম্পাউণ্ডে বাগানে, একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। চি বিলম্ব হইল না,—হিমানী সিল্কের শাড়ী গাউনের মত মাথায় "ভেল", হাতে ছাতা বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতেছে গোলাপ ফুলের পাপড়ি খসি তাহার চারিদিকে পড়িতেছে। দাঁড়াইয়া চকিতা হরিণীর ম

মণিভূষণ কলের পুত্তলের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। বাগানে গিয়া হিমানীর মুখপানে চাহিল। তাহার পর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"এস"।

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া মণিভূষণ হিমানীকে একখানি চেয়ারে বসাইল। হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছিল, সুতরাং কপাট বন্ধ করিয়া দিতে হইল। এইবার বৃষ্টিও আসিল। মাথার উপর টিনের ছাদে নববর্ষাজলপাতে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হইল।

তখনও হিমানী নীরবে বসিয়া। মণিভূষণ ডাকিল—"হিমানী"।

হিমানী কম্পিতস্বরে উত্তর করিল—"কি, মণি?"

"[illegible] স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য?"

"[illegible]। স্বপ্ন হইলে বেশ হইত।"

"কেন বেশ হইত? আমার ত শঙ্কা হইতেছে, পাছে [illegible]হা স্বপ্ন হইয়া যায়।"

"দুঃসংবাদ আনিয়াছি। তোমার স্ত্রী সাংঘাতিক [illegible]ীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

"আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছি।"

"কৃষ্ণনগর!—কৃষ্ণনগরে কি করিতে গিয়াছিলে?"

হিমানী তখন সংক্ষেপে পূর্ব্ব কথা বলিল। বলিল,—তুমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে তিন মাস পরে আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য মা যীশুখৃষ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যে জেনানা-মিশন্ খুলিয়াছে, তিনি তাহার কর্ত্রী। আমিও তাঁহার কাছে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করি। এইরূপ দুই বৎসর আমরা কৃষ্ণনগরে।"

শুনিয়া মণিভূষণ বলিল—"আমার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদকে দুঃসংবাদ কেন বলিতেছ হিমা? আমার স্ত্রী যত-[illegible] বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহারও জীবন দুঃখময়, আমারও তাহাই।"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ওকথা মুখে আনিও না। স্বর্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি একথা শুনিয়া কি মনে করিবেন? আমি তোমার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইতেছি।"

মণিভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"দুটি প্রাণীকে চিরপিপাশায় দগ্ধ করা কি ঈশ্বরের মত কায?"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ও কথা বলিও না। ঈশ্বরের উপর বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা ছাড়া, তুমি কেন ভুলিয়া যাও যে তুমি বিবাহিত ব্যক্তি এবং তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান?"

মণিভূষণ বলিল—"সত্য বলিয়াছ হিমানী, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি এই ঘরেই আছেন। দেখিবে? তোমাকেও ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখিতে, তাই ভ্রম করিয়াছিলাম।"

হিমানী ভয় ও বিস্ময়ের সহিত মণিভূষণের মুখপানে চাহিল। তাহার উন্মাদব্যাধির কথা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল।

মণিভূষণ ছবি তিনখানি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিল। হিমানী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অল্প আলোকে ছবি দেখিল। ওদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে দুই ফোঁটা অশ্রু মোচন করিল। মনে মনে বলিল,—মানুষ-জন্ম অপেক্ষা ছবি-জন্ম অনেক ভাল। শেষে ছবিগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"এ তুমি কোথায় পাইলে?"

মণিভূষণ উত্তর করিল—"তুমি দিয়াছিলে, মনে নাই? আমার বুকের ভিতর রাখা ছিল, তিল তিল করিয়া বাহির করিয়াছি।"

আর হিমানী পারিল না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা তাহার কপোল ভাসাইল। মণিও কাঁদিল। হিমানী একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"মণি, এতদিন তবে কি করিলে?"

মণিভূষণ বলিল—"তুমিই বা কি করিলে?"

হিমানী বলিল—"আমি যে কি করিয়াছি তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

মণিভূষণ বলিল—"আমিও জানি, এই দেখ। বলিয়া কবিতার খাতাখানি হিমানীর হাতে দিল।

হিমানী দেখিল, তাহার স্বহস্তাক্ষর। পড়িল—তাহারই মনের কথা বটে। মণিভূষণকে একটা কথা বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু সহসা আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ভাবিল "এ কি করিতেছি! নবদুর্গার মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে, কিন্তু আমি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিতেছি। নিবান আগুণ আবার জ্বালিতে বসিয়াছি!"

তখন জল ছাড়িয়াছিল; আকাশও পরিষ্কার। হিমানী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"মণি, অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিলাম। পাঁচটার গাড়ীতে আমাকে কৃষ্ণনগর ফিরিতেই হইবে। আমার হাতে ভিন্ন নবদুর্গা ঔষধ খায় না। তুমি কাল যাইবে?"

মণিভূষণ ভাবিয়া বলিল—"যাইব।" মনে মনে বলিল—"প্রাণেশ্বরি, তোমার দেখা পাইবার জন্য নরকেও যাইতে পারি।"

হিমানী বলিল—"তবে আমি চলিলাম।"

মণিভূষণ ষ্টেশন অবধি হিমানীকে রাখিয়া আসিতে চাহিল। হিমানী আপত্তি করিল, কিন্তু মণিভূষণ শুনিল না, সঙ্গে গেল। পথে হিমানী মণিভূষণকে সাবধান করিয়া দিল, তোমার সঙ্গে যে আমি পূর্ব্বাবধি পরিচিত, তাহা সেখানে প্রকাশ করিও না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন মণিভূষণ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীর পীড়া সাংঘাতিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, একটু সুরাহা হইয়াছে। হিমানী স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছে। তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বাবা, এতদিন পরে কি মনে পড়িল! ও ছেলে মানুষ, ওর কি বুদ্ধি আছে? ওর কথা কি আর ধরিতে হয়!" মণিভূষণ অপ্রতিভের মত মাটীর পানে চাহিয়া, বামহস্তে গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল; কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

হিমানীকে সেখানে সবাই মেমডাক্তার বলিত। মণিভূষণ শুনিল, মেমডাক্তার দুই বৎসর যাবৎ নবদুর্গার সহিত সখীত্ববন্ধনে বদ্ধ। এই দুই বৎসরের প্রায় প্রতিদিনই তিনি আসিয়া নবদুর্গাকে লেখাপড়া এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম শিখাইয়াছেন। পীড়ার প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছেন। এখন যে নবদুর্গার বাঁচিবার আশা হইয়াছে, তাহা কেবল মেমডাক্তারের সযত্ন শুশ্রূষা এবং অশ্রান্ত চিকিৎসার গুণে।

শুনিয়া মণিভূষণের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেবীকে সে এতদিন হৃদয়মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছে, সে দেবীর দেবীত্ব সত্যকার—কল্পনার নহে।

হিমানী ও মণিভূষণ দুইজনে রাত্রি জাগিয়া নবদুর্গার সেবা করিতে লাগিল।

এইরূপে দুইদিন কাটিল। তৃতীয় দিনে হিমানী তাহার চিকিৎসাগ্রন্থগুলি একত্র করিয়া সমস্ত প্রভাত কাল অধ্যয়ন করিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পরিবারস্থ সকলকে বলিল,—"যদিও রোগিণীর অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন নহে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা এত অধিক, যে হটাৎ জীবন সংশয় হইতে পারে। এই দুর্ব্বলতার আশু প্রতীকারের জন্য ইঁহার শরীরের কোনও রোগশূন্য স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।"

একথা শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। জীবিত ব্যক্তি কে রক্ত দিবে? কার এত সাহস? হিমানী বলিল—"আমি দিব।"

কেহ কেহ বলিল—"তাও কি হয়! শেষে কি হইতে কি হইবে?"

হিমানী বলিল—"তাহাতে কোন বিপৎসম্ভাবনা নাই। আমি সবল ও সুস্থকায়, বয়সেও রোগিনীর সমান, আমার রক্তেই সব চেয়ে বেশী উপকার হইবে।"

নবদুর্গার দাদা বলিলেন—"ঐরূপ বয়সের কোনও ছোট লোকের মেয়েকে টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।"

হিমানী বলিল—"না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমিই দিব। কোনও ভয় নাই, ভয় থাকিলে [illegible] কায কেন করিব? প্রাণের মায়া আর কার [illegible]

লোকে মনে করিল, তা বটেও ত। [illegible] রোগীর জন্য কেন ডাক্তার এত করিতে যাইবে, [illegible] চিকিৎসায় হিমানীর বেশ পশার ছিল, তাহার [illegible] কাহারও কিছু সন্দেহ হইল না। নবদুর্গার ম[illegible]লেন—"যা তুমি ভাল বোঝ বাছা! কিন্তু [illegible] বিপদ ঘটাইও না।"

পাড়ায় একজন নবপরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিভ [illegible] হিমানী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রক্রিয়া[illegible] জন চিকিৎসা ব্যবসায়ীর সাহায্য প্রয়োজন [illegible] বলিল, "যদি সাহায্যেরই প্রয়োজন, তবে সা[illegible] আনান যাউক। ও অভিজ্ঞতা বিহীন ডাক্তারকে [illegible]

হিমানী বলিল,—"বিশেষ কিছু করিতে [illegible] কেন বৃথা অর্থব্যয় ও বিলম্ব বৃদ্ধি করিবেন।"-[illegible]নীর শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে বিজ্ঞ সাহেব ডাক্ত[illegible] তাহার চিকিৎসা প্রণালীতে বাধা দেয়।

পরামর্শ ঠিক হইল, এই রক্ত সঞ্চালন [illegible] ঠাণ্ডার সময় করিতে হইবে। নিজের হাঁসপা[illegible] হিমানী প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া রাখিল [illegible] ডাক্তারকেও বলিয়া কহিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া [illegible]

রাত্রি নয়টার সময় যথারীতি কোট প্যাণ্ট[illegible] ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া, নেটিভ ডাক্তার উপস্থিত [illegible] কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে রোগিনীর হ[illegible] একটা ধমনী ছিন্ন করিয়া যথারীতি নল ব[illegible] পরে সেই নল আনিয়া হিমানীর হস্তের ছিন্ন [illegible] যোজিত করা হইল। নেটিভ ডাক্তার ধীরে [illegible] চালাইল। হিমানীর শরীর হইতে রক্তধারা [illegible] নবদুর্গার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চলিলে, হিমানীর মুখ [illegible] করিল, চক্ষু বসিয়া গেল, হাত পা কাঁপিতে লা[illegible] স্বরে সে সহকারী ডাক্তারকে বলিল—"এইবা[illegible] আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

কল বন্ধ হইল। ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রণ[illegible] নল খুলিয়া একে একে উভয়ের ছিন্ন ধমনী [illegible] ক্ষতমুখে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিল।

নবদুর্গার মা হিমানীকে ধরিয়া তাহার শয়ন[illegible] গেলেন। মণিভূষণ আর দুই একজন তাহার সঙ্গে গেল। হিমানী শয়ন করিল। তাহার কথা জড়ান—যেন নেশা হইয়াছে। বলিল,—"আমার মুখে অল্প অল্প করিয়া সেই ঔষধ ও ব্রাণ্ডি মিশান গরম দুধ দাও।"

দুগ্ধপানে হিমানী একটু সুস্থ হইল। বলিল—"আর কিছু করিতে হইবে না। তোমরা যাও। আমি ঘুমাইব। ঘুমাইলেই সব সারিয়া যাইবে।"

সকলের সঙ্গে মণিভূষণও চলিয়া যাইতেছিল। হিমানী বলিল—"মণি, তুমি একটু অপেক্ষা কর, রোগীর সম্বন্ধে তোমাকে দুই চারিটা কথা বলিব।"

সকলে চলিয়া গেল। মণিভূষণ হিমানীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার মাথা যেন ঘুরিতেছে। কিছু বলিতে চাই—কিন্তু হয়ত কি বলিতে কি বলিব।"

মণিভূষণ হিমানীকে ব্রাণ্ডি মিশান আর একটু দুগ্ধ পান করাইল। হিমানী আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

সে রাত্রি পূর্ণিমা ছিল। সমস্ত বহির্দ্দেশ জ্যোৎস্না-বন্যায় প্লাবিত। কতকটা জ্যোৎস্না মুক্ত বাতায়ন পথে উছলিয়া আসিয়া হিমানীর শয্যার উপরেও পড়িয়াছে। নারিকেলের পাতা কাঁপাইয়া এক একবার ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে।

হিমানী বলিল,—"মণি, আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। কিন্তু এখন তাহা কতকটা সফল করিতে পারিলাম মনে হইতেছে। তুমি যদি ব্যাঘাত না দাও তবেই হয়।"

মণিভূষণ বলিল—"সে কি হিমা! আমি ব্যাঘাত দিব?"

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এলান কথায় ধীরে ধীরে বলিল,—"দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্ত—তাহা আমি নবদুর্গাকে দিলাম। উহার আত্মা লইয়া যদি আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে ঐ তোমার হিমানী হইতে পারিত।"

মণিভূষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার কি নেশা হইয়াছে? আমি যেন কত কি দেখিতেছি, শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্য্য! যেন ঈশ্বর আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, দেবদূতেরা আসিয়াছে। আমি ত যাইব না, নবদুর্গা যাউক।"

মণিভূষণ বলিল—"হিমা, তুমি অমন করিতেছ কেন? আর একটু দুধ দিব?"

হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল। আবার একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"কতকগুলা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন। দেখ মণি, আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিয়াছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই, তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে।"

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—"হাঁ হিমা, এমনিই ভালবাসিব।"

হিমানী বলিল—"তবে কালপ্রাতে আমার আত্মা নবদুর্গার সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিব। আমার ভারি ঘুম পাইতেছে।"

এই সময় নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন এক জন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল—

সুখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে প্যাসা।

হিমানীর কাণে এই গান পৌঁছিল, সে জাগিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার অল্পালোকে মণিভূষণের ম্লান মুখখানির পানে চাহিল। মণিভূষণ তখন হিমানীকে নিদ্রাতুর দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। হিমানী ডাকিল—"মণি"।

মণিভূষণ এই সোহাগের স্বরে গলিয়া উত্তর করিল—"কি হিমা?"

হিমানী বলিল—"মনে পড়ে?"

মণি হিমানীর মুখের পানে চাহিল। হিমানী বলিল—"সেই একদিন, কলিকাতায়, যে দিন তুমি আমাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলে?"

সেই হিন্দুস্থানী তখনও গলা কাঁপাইয়া পুনঃপুনঃ গাহিতেছে—

সুখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে প্যাসা।

মণিভূষণের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। হিমানী বলিল—"আমার বড় ঘুম পাইতেছে; সেদিন যাবার সময় যাহা দিয়াছিলে, তাই দিয়া যাও।"

মণিভূষণ হিমানীর বিবর্ণ শীতল ওষ্ঠাধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিল। সে চলিয়া যাইতেছিল; হিমানী বলিল—"সেবারে দুইজনেই মনে করিয়াছিলাম, এই দেখা শেষ দেখা। কিন্তু আবার দেখা ত হইল। সে দিনের বিদায় চুম্বনের যাহা গুণ ছিল,—এটিতেও যেন তাহাই থাকে—আবার যেন দেখা হয়। আমার বড় ঘুম পাইতেছে, এখন তুমি যাও।"

মণিভূষণ বাহির হইয়া গেল। হিমানীকে একাকী রাখিয়া আসিয়া তাহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার শালাজকে হিমানীর শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিল।

তিনি গিয়া দেখিলেন, হিমানীর বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, হৃৎ-স্পন্দনও থামিয়াছে। নিশ্বাসও বহিতেছে না।

চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেলেন। সকলে আসিল, ডাক্তার আসিল, আলো জ্বলিল। ডাক্তার বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! ইনি ব্যাণ্ডেজ খুলিয়াছেন, ধমনীর মুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছেন। শরীরে যাহা অল্প রক্ত অবশিষ্ট ছিল, তাও নির্গত হইয়া গিয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা।"

* * * *

মণিভূষণের পাগলামি ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা সুলক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি তাহার মন আশ্চর্য্যরূপে ফিরিয়া গিয়াছে। এখন সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।

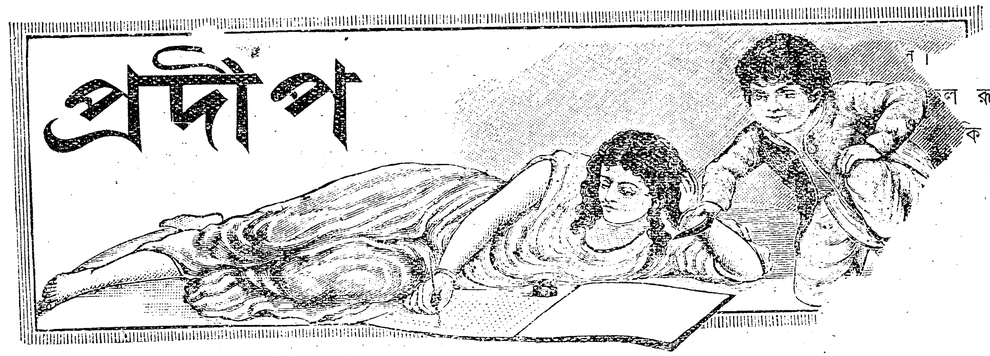

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ২৬নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির প্রেসে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

৩ ন। ল রূপসী ক বাঁশী চ্ছদ। ফিরিয়া সাকির

দ্বিতীয় ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

সেলিনা বেগম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাজাহান বাদসাহ গ্রীষ্ম যাপনের জন্য কাশ্মীরের উপত্যকায় কয়েকটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—তাহাদের সকলগুলির সাধারণ নাম ছিল "আরামবাগ।" "মোতি মহল" এই আরামবাগের প্রাসাদগুলির অন্যতম। "মোতি মহল" শোভায় সম্পদে সকল মহলকে পরাজিত করিয়াছিল; আর মোতি-মহলের অধিবাসিনী, সাজাহানের নবপ্রণয়িনী সেলিনা বেগম রূপগুণসৌভাগ্যের প্রখর জ্বালায় অপরাপর বেগমদিগের মনগুলি পলে পলে দগ্ধ করিতেছিলেন। তখনও মমতাজ বেগম সাজাহানের উপর ততটা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। সেলিনার জীবন-রজনী শেষ হইবার পর তবে মমতাজের সুখসূর্য্য উদিত হয়।

অদ্য রজনী জ্যোৎস্না ... না উঠিতেছে, সুরা বড়
করিয়া সাদা মেঘ আসি ... ছে।"
ছিল। উত্তরে অ ... বুল মিশাইয়া দে।"
শুভ্রগাত্রে চন্দ্রি ... পাত্রি হস্তে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।
আরামবাগের পা ... আরও কি একটা মিশাইল। ফিরিয়া
গিরিনদী বহিয়া ... কে পুনরর্পণ করিল।

রজতধারার মত প্রতীয়মান ... রে সজনী।
দীপোজ্জ্বল কক্ষে, উন্মুক্ত
সেলিনা ... বাঁশী কাঁদ ... না, সাকিও কাঁদিল।
... বাজাইতে সাকি সুপ্ত সুন্দরীর মুখপানে চা...
ছিলেন ... কাঁদিল। গান শেষ হইলে, আসন ছাড়িয়া
কেশে ... বেগমের শয্যার পার্শ্বে বসিল। মাদকের উত্তেজ...
কত ...
... নার গণ্ডস্থলে প্রচুর শোণিত প্রবাহ উপস্থিত
পদি ... অধিকতর রক্তিমাভ করিয়াছে। সেই তাম্বুল...
প্রভৃ ... সুরাধৌত ওষ্ঠপুট ধীরে ধীরে নড়িতেছে।
ছি ... সে যেমন কোমল বল্লরী কাঁপিয়া উঠে, সেই...
... লনার উরঃস্থল ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। নিশ্বাসের
চে ... ত সুরার গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। অলকগুচ্ছের
... ন্তসীমায় ললাটদেশে মুক্তামালার মত শ্রেণীবিন্যস্ত
ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে।

সাকি সর্ব্বাগ্রে নিজের অঞ্চল দিয়া বেগমের ঘাম মুছাইয়া দিল। মুছাইতে, তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

সেই নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া বাঁদি অনেকক্ষণ স্থির ভাবে কি চিন্তা করিল। আবার ধীরে ধীরে সেলিনার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে বেগমের

TORN PAGES.

ণের মত কঠিন, প্রেমের কোমল কুসুম তাহাতে কি করিয়া ফুটিবে? আমি বাদসাহের পত্নী, কিন্তু আমার অপেক্ষা ঐ বাঁদি অধিক সুখী।”—সেলিনা গবাক্ষ বন্ধ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধীরে ধীরে
দাঁড়াইল। ...র উপর আসিয়া বসিলেন।

হিমানী ব... ...নি আজ সপ্তাহকাল মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন,
কিছু বলিতে
মণিভূষণ ...খোঁজ খবরই নাই। “সূর্য্যাস্তের মধ্যে ফিরিব”
পান করাইল। ...কে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সে

সে রাত্রি পূ... হয় নাই। ...সওয়ার আসিয়া সংবাদ
বন্যায় প্লাবিত। ক...ব ফিরিতে আরও দুই একদিন বিলম্ব
উছলিয়া আসিয়া হিম...
নারিকেলের পাতা কাঁপাইয়া
বাতাস বহিতেছে। ... নানাবিধ সুগন্ধি দীপে উজ্জ্বলিত।

হিমানী বলিল,—“মণি, প্রস্তরগাত্রে লতাপুষ্পের চিত্রগুলি
আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। চারি পাশে চারি খানি সুদীর্ঘ
সফল করিতে পারিলাম মনে হ...ধারের উপর স্বর্ণময় ফুলদানে
না দাও তবেই হয়।”

মণিভূষণ বলিল—“সে কি হিম... মুকুরগাত্রে নাগ-কেশর ও

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এহাদের মিশ্র তীব্রগন্ধে কক্ষ-
বলিল,—“দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্তনিজবক্ষে
তাহা আমি নবদুর্গাকে দিলাম। উহার আত্মা লইয়া যবিস্তৃত।
আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে পারিতাম, তাহা হই... পট,—
সম্পূর্ণভাবে ঐ তোমার হিমানী হইতে পারিত।”

মণিভূষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিল। ভাকে

হিমানী বলিল—“মণি, আমার কি নেশা হইয়াছে? আমি যেন কত কি দেখিতেছি, শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্য্য। যেন ঈশ্বর আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, দেবদূতেরা আসিয়াছে। আমি ত যাইব না, নবদুর্গা যাউক।”

মণিভূষণ বলিল—“হিমা, তুমি অমন করিতেছ কেন? আর একটু দুধ দিব?”

হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল। আবার একটু সুস্থ হইয়া বলিল—“কতকগুলা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন। দেখ মণি, আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিয়াছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই, তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে।”

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—“হাঁ হিমা, এমনিই ভালবাসিব।”

হিমানী বলিল—“তবে কালপ্রাতে আমার আত্মা নবদুর্গার সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিব। আমার ভারি ঘুম পাইতেছে।”

এই সময় নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন এক জন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল—

সুখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে প্যাসা।

বেগম সাহেবার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। সেলিনা বলিলেন—“নূতন বাঁদিকে ডাকিয়া আন, সে বেশ গাহিতে পারে।”

সাকি নিজকক্ষে ছিল, বেগম স্মরণ করিয়াছেন শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। সাকির মুখখানি অতি সুন্দর। কিন্তু তাহার মুখছবির রেখায় রেখায় এক বিষাদ ভাব অঙ্কিত। সাকি নির্জ্জনে থাকিতেই ভালবাসে, অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা কহে না। বেগমের প্রয়োজন হইলে কেবল তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিয়া যায়। সেদিন সাকি নির্জ্জনে বসিয়া গান গাহিতেছিল, বেগম তাহার কক্ষের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। গান শুনিয়া তিনি সাকির গুণের পক্ষপাতিনী হইলেন। বেগম সাকিকে ভাল বাসেন। সর্ব্বদা কাছে রাখিতে চান, কিন্তু সাকি বেগমের কাছে বড় একটা থাকিতে চাহে না।

সাকি যে শুধু গান গাহিতে পারিত তাহা নয়, বীণ্ বাজাইতে পারিত, বাঁশীতেও তাহার নিপুণতা অল্প ছিল না। গত কল্য চাঁদিনীর রাতে নিস্তব্ধ কুঞ্জ মধ্যে বেগম তাহার বাঁশী শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাকির গুণের পরিচয় পাইয়া বেগম তাহার সহিত সখীভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাকি আসিয়া বেগমের কাছে বসিল। বেগম বলিলেন—“সাকি, তুই বীণ্ বাজাইবি না বাঁশী বাজাইবি?”

নন। সাকি একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিল—“বেগম
না। সাহেবার যাহা ইচ্ছা।”

ক্ষপ

না, সেলিনা একথা শুনিয়া বলিলেন—“সাকি, তুই কয় দিন এখানে আসিয়াছিস, একদিনও ত কই তোর মুখে হাসি দেখিলাম না।”

“কি ... “বাঁদির আবার হাসি কি?”
ছিঁড়িয়া দিয়াছেন। ... কথায় যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন
তাহা নির্গত হইয়া গিয়াছে। “... বাঁদির মত দেখি?”

* * *

মণিভূষণের পাগলামি ব্যাধি আর... আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ
কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা সুলক্ষণ দেখ...
প্রতি তাহার মন আশ্চর্য্যরূপে ফিরিয়া গিয়াছে।
স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মু...

... মুখ ভার করিয়া

কলিকাতা, ২৬নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির প্রেস সা... কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

থাকি? বাদসাহকে অনেক দিন দেখি নাই, তাই। চিরকালই কি এমন থাকি?”

সাকি মনে মনে যেন কি একটা তোলাপাড়া করিল। একটু পরে বলিল—“আপনি জানেন, বেগম সাহেবা, অভাবই দুঃখ। আপনি বাদসাহকে চান, পান না, তাই বিষণ্ণ হন। আমার এমন একটা কিছু অভাব আছে যাহার জন্য আমি চিরদুঃখিনী।”

সেলিনা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন—“তুই কি কাহাকেও ভালবাসিয়াছিস্ না কি? আমাকে বল না,—আমি তাহার সহিত তোর বিবাহ দেওয়াইব।”

সাকির কপাল ঘামিয়া উঠিল। মুখ নত করিয়া বলিল—“আমি আপনাকে ভালবাসি।”

বাদসাহের মৃগয়া যাত্রার পর আজ প্রথম সেলিনা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—“দূর পোড়ার মুখী।”

পোড়ারমুখী উঠিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সেলিনা তাহাকে বসাইলেন। বলিলেন—“যাক্ বাজে কথা, তোর সেই বাঁশীটা একবার আন। এই ঘরটা বড় গরম বোধ হইতেছে, একবার দুয়ার জানালা গুলা সব খুলিয়া দে। সমস্ত প্রদীপের আলো নিবাইয়া, চাঁদের আলো ঘরে ছাড়িয়া দে। ফুলের মালাগুলা আমার শয্যার উপর বিছাইয়া দে। আজ আমার ফুলশয্যা। বাদসাহ আসিলেন না, বিরহের জ্বালাটা এইরূপেই মিটাই। আমার কাছে বসিয়া করুণার সুর ছড়াইয়া তুই বাঁশী বাজা।”

সাকি উঠিয়া দাঁড়াইল। বেগম বলিলেন—“সাকি, বড় পিপাসা। এক পাত্র সিরাজি—”

বাঁদি সোণার পেয়ালা ভরিয়া সুগন্ধি সিরাজি ঢালিয়া আনিয়া বেগমের সম্মুখে ধরিল।

বেগম বলিলেন—“অত ফেনা উঠিতেছে, সুরা বড় উষ্ণ; গোলাপ দিয়াছিস্?”

বাঁদি বলিল—“দিয়াছি।”

“দে একটু ইস্তাম্বুল মিশাইয়া দে।”

সাকি সুরাপাত্র হস্তে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। ইস্তাম্বুল মিশাইল—আরও কি একটা মিশাইল। ফিরিয়া আসিয়া পাত্র বেগমকে পুনরর্পণ করিল।

স্বর্ণপাত্রস্থ টলটলায়মান উৎকৃষ্ট সিরাজি দীপালোকে উজ্জ্বল দেখাইল। সুরা শেষ করিয়া বেগম পাত্রটাকে মেঝের উপর ছুড়িয়া দিলেন। পাত্রটা গড়াইতে গড়াইতে গড়াইয়া গিয়া একটা ফুলদানের পায়ে ঠেকিল।

তখন সেই সুকোমল পুষ্প শয্যায় শুইয়া অতুল রূপসী তন্বঙ্গী সেলিনা মদিরালসে ঢলিয়া পড়িলেন। সাকি বাঁশী বাজাইয়া গান ধরিল—

দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া সাকির কাঁদিল—

দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী।

শুধু বাঁশী কাঁদিল না, সাকিও কাঁদিল। বাজাইতে বাজাইতে সাকি সুপ্ত সুন্দরীর মুখপানে চ... চাহিয়া কাঁদিল। গান শেষ হইলে, আসন ছাড়িয়া ধীরে বেগমের শয্যার পার্শ্বে বসিল। মাদকের উত্তেজ... সেলিনার গণ্ডস্থলে প্রচুর শোণিত প্রবাহ উপস্থিত ... তাহা অধিকতর রক্তিমাভ করিয়াছে। সেই তাম্বুল... রঞ্জিত সুরাধৌত ওষ্ঠপুট ধীরে ধীরে নড়িতেছে। ... বাতাসে যেমন কোমল বল্লরী কাঁপিয়া উঠে, সেই... সেলিনার উরঃস্থল ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। নিশ্বাসের সহিত সুরার গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। অলকগুচ্ছের প্রান্তসীমায় ললাটদেশে মুক্তামালার মত শ্রেণীবিন্যস্ত ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে।

সাকি সর্ব্বাগ্রে নিজের অঞ্চল দিয়া বেগমের ঘাম মুছাইয়া দিল। মুছাইতে, তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

সেই নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া বাঁদি অনেকক্ষণ স্থির ভাবে কি চিন্তা করিল। আবার ধীরে ধীরে সেলিনার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে বেগমের

মুখচুম্বন করিল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিরায় শিরায় যেন বৈদ্যুতিক অগ্নি ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সাকি যে দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড মুকুর। সেই কক্ষ তখনও পূর্ণোজ্জ্বলিত। সাকি চক্ষু তুলিয়াই সহসা দেখিল, দর্পণগর্ভে এক দীর্ঘকায়, উন্নতললাট, শ্মশ্রুমুখ পুরুষের ছায়া প্রতিবিম্বিত। সহসা সর্পদষ্ট হইলে মানুষের মানসিক অবস্থা যেরূপ হওয়া সম্ভব, সাকির অবস্থাও সেইরূপ হইল।

ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না। কক্ষ মধ্যে যে দণ্ডায়মান, সে নিশ্চয়ই সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছে। অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই;—তবে কি স্বয়ং বাদসাহ? সাকি তখন মুখ ফিরাইয়া সেই পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বুঝিল, এ মূর্ত্তি বাদসাহের না হইয়া যায় না। অদূরেই বাদসাহের তসবীর ঝুলিতেছিল। সাকি একবার তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই, তাহার জীবনের আশা নির্ব্বাপিত প্রায় হইল।

বেগম নিদ্রিতা, বাঁদি তাহাকে চুম্বন করিতেছে, এ রহস্য দেখিয়া সাজাহান হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সেলিনা আশ্চর্য্য সুন্দরী, স্ত্রীলোকেও তাহার রূপ দেখিয়া মোহবিহ্বল। কিন্তু এই নূতন বাঁদিকে বাদসাহ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই; তাই প্রশ্ন করিলেন—"কে তুই, এত রাত্রে বেগমের কাছে বসিয়া কি বকিতেছিলি?"

সাকি মনে মনে ভাবিল, কথা না কহাই উচিৎ।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাদসাহ বিস্মিত হইলেন। একটু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাঁদি, চুপ করিয়া রহিলি যে? কে তুই? এখানে কি করিতেছিলি?"

সাকি বলিল—"আমি যদি পরিচয় না দিই?"

বাঁদির স্পর্দ্ধা দেখিয়া ভারত-সম্রাট স্তম্ভিত হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে পার্শ্বলগ্ন তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন। উজ্জ্বল দীপালোকে তাহা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই আবার অসি কোষমধ্যে পুনঃপ্রেরণ করিলেন। পরুষভাবে বলিলেন—

"স্ত্রী-শোণিতে আমার তরবারি কলঙ্কিত করিব না। তোর গোস্তাকির জন্য এখনি প্রহরিণী ডাকিয়া উলঙ্গ করিয়া তোকে বেত্রাঘাত করাইব।"

এখন পর্য্যন্ত সাকির হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে জীবনাশার ক্ষীণালোক বর্ত্তমান ছিল। বাদসাহের এই কথা শুনিয়া তাহা নির্ব্বাপিত হইল। বলিল—"সাহান্ সা, আমার শোণিতে আপনার তরবারির কলঙ্ক হইবে না, আঘাত করুন, আমি স্ত্রীলোক নহি, পুরুষ।"

সম্রাটের চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। তরবারি পুনর্ব্বার ঝন্‌ঝনার সহিত নিষ্কোষিত হইল;—কিন্তু এবারেও আত্মসম্বরণ করিয়া অসি আবার কোষবদ্ধ করিলেন। ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন—"তরবারির মৃত্যু অতিসুখের মৃত্যু—তোর প্রতি এত দয়া করিব না। শত কুক্কুর দংশনে তোর প্রাণনাশের দণ্ডবিধান হইবে।"

সাকি দাঁড়াইয়া ছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

সেলিনা তখন সুখসুপ্তিমগ্ন। তাহার প্রতি বাদসাহ কঠোর দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া, সাকির হৃদয়ের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব বলসঞ্চার হইল। সে তখনি দৃঢ়পদে উঠিয়া দাঁড়াইল, স্থিরচক্ষে বাদসাহের প্রতি চাহিয়া বলিল—"সাহান্ সা, যদি হুকুম হয়, তবে আমার সমস্ত কথা আপনাকে বলি।"

বাদসাহ পূর্ব্ববৎ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"বল্, কিন্তু তোর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার ব্যতিক্রম করিব না।"

সাকি তখন ধীরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গেল—"ভারতের সম্রাট যে সেলিনাকে হৃদয়েশ্বরী করিয়াছেন, তাহাকে আমি আশৈশব প্রাণতুল্য ভাল বাসিয়াছি। সেলিনার পিতার আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত। সেলিনার মাতা জীবিত থাকিলে আজ আমিই সেলিনাকে লাভ করিতাম। সাহান্‌সা, আজ পাঁচ বৎসর সেলিনা আপনার অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছে। তাহাকে একবার দেখিবার জন্য কতই আকুল হইয়া ঘুরিয়াছি, কোথাও দেখা পাই নাই। তার পর এই ছদ্মবেশে আপনার হারেমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমি কে, নির্দ্দোষী সেলিনা তাহা জানে না। সেলিনা আমায় স্ত্রীলোক বলিয়াই জানে। দিবসে আমি বেগমের সম্মুখে সাধ্যমত বাহির হইতাম না। মুখ প্রায়ই অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া থাকিতাম। পাছে সেলিনা আমায় চিনিতে পারে। বাল্যে সেলিনা আমায় বড়

ভালবাসিত। তাহাকে লইয়া আমি সুখী হইব, ভূতলে নন্দনকানন তৈয়ারি করিব, এই আশায়, এই কল্পনামোহে অনেক দিন কাটাইয়াছিলাম। আপনি আমার সে আশা ভঙ্গ করিয়া দরিদ্রের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ এতদিন আমি চাপিয়া ছিলাম। আজ এই চন্দ্রালোক, পুষ্পরাশি, মদিরার উত্তেজনা, সর্ব্বোপরি এই সুবিজন অবসর, আমার প্রবৃত্তির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সিরাজির সহিত অতিমাত্রায় মাদক মিশাইয়া আমিই সেলিনাকে অচেতন করিয়াছি। আমার মৃত্যু যখন অনিবার্য্য,—তখন এ সমস্ত কথা আপনাকে শুনাইবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু পাছে আপনি স্বর্গের সুন্দরী সেলিনার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করেন, তাই বলিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার আত্মা ঈশ্বরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবে, সেই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে এ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি সেলিনার সতীধর্ম্মের তিলমাত্রহানি করি নাই। সেলিনার প্রতি যদি আপনার সকল সন্দেহ আমি দূর করিতে পারিয়া থাকি, তবে আমার মৃত্যু যন্ত্রণা যতই ভীষণ হউক, পরলোকে আমার আত্মা শান্তি লাভ করিবে।"

বাদসাহ স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন। সাকি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, বাদসাহ সেলিনার দেহমনের নিষ্কলঙ্কতায় বিশ্বাস করিলেন কিনা ভাল বুঝিতে পারিল না। সাকি নিস্তব্ধ হইলে, বাদসাহ কঠোরকণ্ঠে ডাকিলেন—

"মাহুম—"

কেহ উত্তর দিল না। এক ভীষণদর্শন তাতারিণী প্রবেশ করিয়া বাদসাহের সমীপে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইল। বাদসাহ বলিলেন—"মাহুম, এই হতভাগ্যকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ্। ইহাকে কেহ যেন রুটি জল না দেয়,—অনাহারে মৃত্যু ইহার দণ্ডবিধান করিলাম।"

মোগল রাজান্তঃপুরে এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল ছিল না। মাহুম তাতারিণী অবিস্ময়ে বাদসাহের আজ্ঞাপালন করিল। কঠিন সবলহস্তে মাহুম অপরাধীকে টানিয়া লইয়া চলিল। পথে জিজ্ঞাসা করিল, "হতভাগ্য যুবক, কেন বাঘের মুখে মরিতে আসিয়াছিলে? তোমার নাম কি?"

বন্দী বলিল—"আমার নাম মাহরুণ।"

তাতারিণী একহাতে মাহরুণকে ধরিয়া, অন্যহাতে একটি ক্ষুদ্র কক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিল। কক্ষ অত্যন্ত অন্ধকার। মাহুম বলিল—"প্রবেশ কর।"

মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও, মাহরুণের পা কাঁপিতে লাগিল। বিলম্ব দেখিয়া, তাতারিণী এক হস্তেই তাহাকে তৃণখণ্ডবৎ উত্তোলন করিয়া, সেই কক্ষমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে পাখী ডাকিয়া উঠিল। পাখীর মধুর কূজন শ্রবণে এবং শীতল সমীরণ স্পর্শে সেলিনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেলিনা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তিনি নিজকক্ষে পালঙ্কোপরি সুখশয্যায় শায়িত। গত রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকলি মনে পড়িল। মাথাটা যেন ধরিয়াছে, মনটা যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। সেলিনা মৃদুস্বরে আপন মনে বলিলেন—"সাকির সিরাজিটা বড় তীব্র ছিল।" উন্মুক্ত বাতায়নপথে একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, নীলাকাশের নিম্নে অল্প অল্প লঘু মেঘ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, সেই মেঘশিশুগুলা বায়ুবশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। নভোবক্ষে কৃষ্ণবিন্দুবৎ দুই চারিটা ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য পক্ষী উড়িতেছে। মধুর সূর্য্যকিরণ মেঘের রঙে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। প্রকৃতি উৎসবময়ী, কিন্তু সেলিনার হৃদয়ে যেন বিষণ্ণতা। সেলিনা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান না করিয়াই ডাকিলেন—"সাকি—বাঁদি এক ভৃঙ্গার জল লইয়া আয় তো।"

সাকি আসিল না, কেহ উত্তরও দিল না। "আ মলো, বাঁদি গুলো গেল কোথায়!" বলিয়া সেলিনা শয্যা ছাড়িলেন। স্নানকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে জলাদি সমস্তই সজ্জিত রহিয়াছে। দেহমার্জ্জনাদি সম্পন্ন করিয়া বেশপরিবর্ত্তন করিলেন। সেই কক্ষস্থিত পরিষ্কার সুদীর্ঘ মুকুরে নিজের পরিষ্কার মুখখানি দেখিবার জন্য

সেলিনা অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার সেই সুন্দর মুখ খানি মলিন হইয়াছে, চক্ষুর পল্লবে যেন কালি পড়িয়াছে। মৃদুস্বরে আপন মনে আবার বলিলেন, "কল্যকার সিরাজিটা বড় উষ্ণ ছিল।"

ভাবিলেন,—"একবার বাগানে পদচারণা করি, শরীরটা সারিতে পারে।" সেলিনা পর্দ্দা উঠাইয়া দ্বারের বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে এক তাতার রমণী প্রহরা দিতেছে।

সেলিনাকে দেখিয়া সে মস্তক অবনত করিল। সেলিনা একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে কেন?"

"বাদসাহের আদেশ।"

সেলিনা আগ্রহের সহিত বলিলেন—

"প্রহরিণি, বাদসাহ কি আসিয়াছেন?"

"অনেকক্ষণ, কাল রাত্রে।"

"কাল রাত্রে? আমাকে ডাকেন নাই কেন?"

"বলিতে পারি না, তিনিই জানেন।"

সেলিনার মনে একটু অভিমান হইল। তিনি বাদসাহের আশাপথ চাহিয়া দিন রাত কাটাইয়াছিলেন, বাদসাহ আসিয়া তাঁহাকে একবার স্মরণও করিলেন না! সেলিনা মনের কষ্ট মনেই সম্বরণ করিলেন। ভাবিলেন, তিন শত বেগম লইয়া যাহার কারবার, সে ভালবাসার কি বুঝিবে? অভিমানটা ধুমের মত উঠিয়া আপনি বিলীন হইল।

তখন সেলিনা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাদসাহ কোথায়?"

"এ পুরীতে নাই। জিন্নৎমহলে জিন্নৎ বেগমের কাছে গিয়াছেন।"

"বেশ—।"

অভিমানের ধোঁয়াটা আবার দেখা দিল। এবার একটু ঘনীভূত ভাবে।

"আমার বাঁদীরা কোথা গেল?"

"কোন্ বাঁদী আদেশ করুন, ডাকিয়া দিতেছি।"

"নূতন বাঁদী, সেই সাকি।"

প্রহরিণী সেলিনার অলক্ষিতে একটু মৃদু হাসিল। বোধ হয় ভাবিল,—'সাকির উপর যে ভারি টান দেখিতেছি।' প্রকাশ্যে বলিল—

"সে কারাগারে।"

সেলিনা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কারাগারে! কারাগারে তাহাকে কে পাঠাইল?"

"স্বয়ং দুনিয়ার মালিক।"

"বাদসাহ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"অপরাধ কি?"

প্রহরিণী মুখ লুকাইয়া আবার হাসিল! বোধ হয় ভাবিল—"কিছুই যেন জানেন না—ন্যাকা সাজিয়াছেন।" প্রকাশ্যে বলিল—

"অপরাধ কি, তাহা বলিতে পারি না।"

সেলিনা বলিলেন—"কারাগারের চাবি দাও, আমি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব। আমি মুক্ত করিয়াছি শুনিলে বাদসাহ কিছুই বলিবেন না।"

তাতারিণী ভাবিল—"বহুত দেখিয়াছি, কিন্তু এমন বুকের পাটা ত দেখি নাই।" প্রকাশ্যে বলিল,

"দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; বেগম সাহেবা, বেশী কথা কহিবার আমার উপায় নাই। আপনার সে দিন গিয়াছে।"

"সে দিন, কোন্ দিন?"

"সুখের দিন। দিল্লীশ্বরের আদেশে আপনি নিজগৃহে এখন বন্দিনী।"

সেলিনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—"খোদা, শেষে এই করিলে।" প্রহরিণীর পানে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—"কি অপরাধে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিল জান কিছু?"

তাতারিণী বলিল—"আমি বলিতে পারিব না বেগম সাহেবা, আমায় মাপ করুন।"

বেগমের মুখচক্ষুর কাতরভাব দেখিয়া প্রহরিণীর অন্তঃকরণ একটু কোমল হইল। পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা সে মাহরুণের নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই জানিত। তদতিরিক্ত আর কিছুই জানিত না। যে টুকু জানিত না, সে টুকু কুকল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া লইয়াছিল। এখন সহসা তাহার মনে হইল—"তবে কি বেগম সাহেবা নির্দ্দোষিনী?"

সেলিনা ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"এই মোতির মালাছড়াটা তোমাকে পুরস্কার দিলাম, প্রকৃত ঘটনা আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল।"

প্রহরিণী বলিল—"সাকি বলিয়া যে বাঁদী আপনার কাছে ছিল, সে ছদ্মবেশী পুরুষ।"

এই কথা বলিয়া সে বেগমের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। বেগমের সম্বন্ধে তাহার সংশয় তখনও দূরীভূত হয় নাই।

কথা শুনিয়া সেলিনার নয়ন বিস্ময়বিস্ফারিত হইল। বলিলেন—"পুরুষ! অসম্ভব! তাহার অমন সুন্দর কোমলতাময় মুখ; অত মিষ্ট কণ্ঠস্বর; অমন সলজ্জ হাবভাব; সে লজ্জায় আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিত না।"

"সে আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে।"

"আচ্ছা, তার পর বলিয়া যাও।"

"কাল রাত্রে বাদসাহ ফিরিয়া আসিয়া একবারে আপনার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হন। বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরে মাহরুণের তলব হইল। সে গিয়া দেখিল, আপনি পালঙ্কোপরি নিদ্রিত, বাদসাহ দাঁড়াইয়া আগুনের মত জ্বলিতেছেন, ছদ্মবেশী সাকি তাঁহার সম্মুখে অবনত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর তাহাকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে বদ্ধ করা হইয়াছে।"

সেলিনা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে সে হতভাগ্য, আমার এমন সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিল?"

"শুনিয়াছি, তাহার নাম মাহরুণ।" সেলিনা আর দাঁড়াইলেন না। দ্রুতপদে আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন, পা বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সেলিনা দেখিলেন, একজন বাঁদী তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে। তিনি তাঁহার নিজের শয্যায় শুইয়া আছেন। চেতনা প্রাপ্তির পর সেলিনার মনে বৃশ্চিকদংশনের মত তীব্র জ্বালা উপস্থিত হইল। সেলিনা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"মাহরুণ! মাহরুণ তুমিই শেষ আমার এই সর্ব্বনাশ করিলে! জগতের চক্ষে আমাকে চিরকলঙ্কিনী করিলে! কলঙ্ক লইয়া কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব! যেখানে রাজরাণী ছিলাম, সে খানে বাঁদী হইয়া কি সুখে কাল কাটাইব! ছি মাহরুণ, তোমার সে সব সুগুণ কোথায় গেল? তুমি কি আজ কাল এতই কলুষিত হইয়াছ? হে জগদীশ্বর, তুমি সাক্ষী, আমি নিষ্পাপ। আমি কখনও জ্ঞানতঃ সতীধর্ম্মের বিরুদ্ধে অপরাধ করি নাই। কিন্তু বেগমের অন্তঃপুরে—শয়ন কক্ষের মধ্যে এক-
...হতে হয়।
জন ছদ্মবেশী পুরুষ ধরা পড়িয়াছে;—ত একটী উপাদেয়
কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে! কিন্তু
বিশ্বাস বড় ক্ষণভঙ্গুর। বাদসাহের ম দ্রোহ ঘটিয়াছিল,
ভালবাসা থাকিত, তবে তিনিত একবার হইয়াছিল। ঐ সম-
করিতে পারিতেন! তাহাও করি দারের করায়ত্ত ছিল।
এ কলঙ্ক সহজে ঘুচিবে কি? শ্বর ছিলেন। তাঁহার নাম
তিনি আর পায়ে রাখিবে পুত্রের নাম তেজীসিংহ।

তবে জীবনে আর প্রয়োজন কি? মৃত্যুই এখন আমার পরম সুহৃদ। কিন্তু এ ভরাযৌবনে, সকল সাধ অপূর্ণ, কেন মরিব? বাদসাহ ভ্রান্ত, তাঁহাকে বুঝাইব, তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিব, তাহাতেও কি তাঁহার মন গলিবে না? না হয়, তখন জহর খাইয়া মরিব।”

সেলিনা শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। দাসী বলিল—“উঠিবেন না, মাথায় বড় আঘাত লাগিয়াছে।”

সেলিনা একটু হাসিলেন। সেই দুঃখের সময়েও তাঁহার মুখে হাসি আসিল। মনে মনে বলিলেন “বাঁদি, যে আঘাত হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহার মর্ম্ম তুই কি বুঝিবি?”

সেলিনা আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। মনে হইল, “যে ভালবাসে, তাহাকে অত্যন্ত হীন হইতে হয়। তিনি অনেক উপরে। তিনি দুনিয়ার বাদসাহ। আমি তাঁহার দাসী, সামান্য প্রজা, কোন্ ছার আমি? কেন না আমি তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিব? এমন দিনও ত গিয়াছে, যে দিন তিনি আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পাই কোথায়?”

সেলিনা মনে ভাবিলেন, একখানা পত্র লিখিয়া দিই। একবার ডাকিয়া পাঠাই। না আসেন, তখন যাহা মনে আছে তাহাই করিব।

পত্র খানা লিখিয়া সেলিনা নিজে শীল দিয়া মোড়ক করিলেন। একজন বাঁদীকে ডাকিয়া বলিলেন—“এ পত্র খানা জিন্নৎ-মহলে বাদসাহের হাতে দিয়া আয়। জবাব না লইয়া আসিস না।”

দাসী চলিয়া গেল; সেলিনা এখন কক্ষের দ্বার অর্গলিত করিয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে উর্দ্ধমুখ হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—“জগদীশ্বর! এই করিও যেন অপমান না হইতে হয়। তিনি যেন বাঁদীকে ফিরাইয়া না দেন। যেন [illegible] সঙ্গে সঙ্গে আসেন।”

রটা সারিতে পারে।
আসিলেন। দেখিলে
রমণী প্রহরা দিতেছে
সেলিনাকে দেখিয়া
একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন,
“বাদসাহের আদেশ।”
সেলিনা আগ্রহের সহিত বলিলেন—
“প্রহরিণি, বাদসাহ কি আসিয়াছে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুন্দর বসোরার কার্পেটের উপর বহুমূল্য ... করা আস্তরণ-শয্যা। তাহার আর পাশে বসিয়া বাদসাহ

বাদসাহ বলিলেন—“জিন্নৎ, আর এক পেয়ালা বরফ-সিরাজি দাও, বড় তৃষ্ণা। সরবৎ বড় গরম, সিরাজিতে শীঘ্র নিদ্রা আসিবে।”

কক্ষের প্রতি গবাক্ষে উজ্জ্বল নীলবর্ণ রেসমী পরদার ভিতর দিয়া অতিসুন্দর দিবালোক গৃহসজ্জাবলীর উপর বিচ্ছুরিত হইতেছে। চারিদিকে গোলাপের সুগন্ধ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মর্ম্মরের আধারস্থিত কৃত্রিম ক্ষুদ্র প্রস্রবণ হইতে মুক্তাধারার ন্যায় বারি রাশি উত্থিত হইয়া নিম্নস্থ পাত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে। স্বর্ণময় দাঁড়ের উপর কোথাও নিদ্রাতুর ভীমরাজ চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে, কোথাও রঞ্জিত বুলবুল নীরবে শস্যাংশ উদরসাৎ করিতেছে। কোথাও বা শ্যামা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

বাদসাহ চোখ বুজিয়া বলিলেন—“জিন্নৎ—প্রাণেশ্বরি, একবার বীণ্ বা এস্রাজটায় ঝঙ্কার দাও। কিছুই ভাল লাগে না যে।”

সুগঠিত, নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ দেহ লইয়া, ফিরোজা রঙের ওড়নার মধ্য দিয়া বিকীর্ণ রূপজ্যোতির তরঙ্গ খেলাইয়া, পিঠের উপর বিলম্বিত বিনায়িত বেণী দুলাইয়া, বিম্বাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া, জিন্নৎ বেগম স্বয়ং বীণাটি পাড়িয়া লইলেন। সুর বাঁধিবার জন্য বীণার কাণ মোচড়াইবার সময়, সেই সুন্দর গ্রীবাদেশ নানা ভঙ্গীতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। আওয়াজ যখন বেসুরা বোধ হইতেছে, তখন একটা বিরক্তির ভাব, আবার যখন সুর মিলিতেছে, মিঠা লাগিতেছে, বশে আসিতেছে তখন একটা হাসির রেখা, সন্তোষের চিহ্ন সেই ইন্দীবরতুল্য নয়ন ও কুসুমসুকুমার ওষ্ঠের প্রান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সুর ঠিক হইলে, বীণটার পরদায় যেন রাগরাগিণীর সুরময়ী জীবনীশক্তি জ্বলিতে লাগিল। কঙ্কণশোভিত মৃণাল-গঞ্জিত বামহস্তে যন্ত্রটি ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে জিন্নৎ বাদন আরম্ভ করিলেন। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সুরের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বাদসাহ শুইয়া শুইয়া “কেয়াবাৎ”, “খপসুরৎ”, “বহুত আচ্ছা বিবি” প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ জিন্নৎ-বেগমের প্রাণে অপার আনন্দ। অনেক দিন পরে আজ সেলিনা বেগমের কবল হইতে তিনি বাদসাহকে উদ্ধার করিয়াছেন। আজ দিল্লীশ্বর কথায় বার্ত্তায় এমন ভাব প্রকাশ করিয়া-

NALIN BEHARI MALLIK.

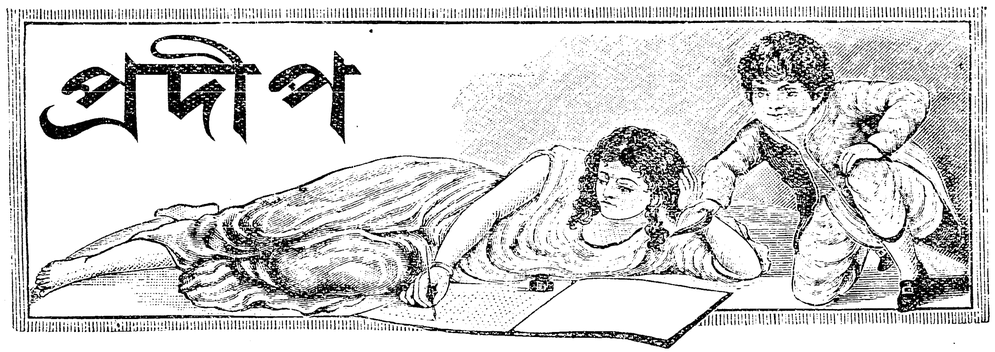

দ্বিতীয় ভাগ। বৈশাখ, ১৩০৬। পঞ্চম সংখ্যা।

বেতুল।

যখন মুনিচরণে প্রণত হইতে গিয়া বিন্ধ্যগিরি ললাটে ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল তখন মুনিবর আদেশ করিয়াছিলেন, “আমি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন না করি সে পর্য্যন্ত আর মাথা তুলিও না।” এই আদেশের পর আর মুনিবরের প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে নাই, কাজেই বিন্ধ্যগিরি অনন্তকাল প্রণমিত হইয়া রহিয়াছে। কালের তাড়নায় তাহার দেহ পাষাণে ও পৃষ্ঠস্থ লোমরাজি শালবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ঐ বিশাল পৃষ্ঠের কথঞ্চিৎ সমতলভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী জিলা অবস্থিত; তাহাদের একের নাম “ছিন্দবাড়া” ও অপরের নাম “বেতুল”।

কলিকাতা হইতে বেতুল আসিতে হইলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে জব্বলপুর পর্য্যন্ত, এবং তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথে ইটার্সী—রেল-সঙ্গমে আসিতে হয়। এই স্থানে রেল ছাড়িয়া রাস্তা ধরিয়া ৫৫ মাইল পথ বাহিয়া বেতুল পৌঁছিতে হয়। ইটার্সী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা ও ইণ্ডিয়ান মিড্ল্যাণ্ড রেলপথদ্বয়ের সঙ্গমস্থল। ইহার একদিকে ১২ মাইল দূরে নর্ম্মদা-নদীর রজতশুভ্র তীরদেশে হোশঙ্গাবাদ সহর অবস্থিত, এবং অপর দিকে ৫৫ মাইল দূরে অতিবন্ধুর গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া বেতুল সহর অবস্থিত।

ইটার্সী হইতে বেতুল যাইতে হইলে একমাত্র মেলকার্টই সম্বল; তদ্ভিন্ন দেশীয় গোশকট ছাড়া অন্য উপায় নাই। মেলকার্টের একখানা গাড়ীতে তিন জনের অধিক লোক বসিতে পারে না। ঐ গাড়ী দিবা একটার সময় ইটার্সী ছাড়িয়া রাস্তার প্রতি ৬ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলাইয়া রাত্রি ১০।১১টার সময় বেতুল পৌঁছায়। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন লোক তাঁহারা একখানি গাড়ী নিজেই ভাড়া করিয়া চলিতে পারেন। তাঁহাকে মেলকার্টের ন্যায় ঘোড়া বদলাইয়া চলিতে হয়, কিন্তু নিজ ইচ্ছামত চালাইয়া প্রায় ৮।৯ ঘণ্টায় বেতুল পৌঁছিতে পারেন।

ইটার্সী ছাড়াইয়া ৫।৬ মাইল চলিলেই রাস্তার বন্ধুরত্ব ও পার্ব্বত্যপথের বিচিত্রশোভা প্রথম উপলব্ধি হয়। ক্রমে উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় গিরিশৃঙ্গসকল যেন দৃষ্টিক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে ইটার্সী হইতে ৩২ মাইল চলিয়া সাহাপুর নামক গ্রামে পৌঁছিতে হয়। তথায় শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের বিরামের জন্য একটী উপাদেয় ডাকবাঙ্গালা আছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তখন সাহাপুরেতে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সমকালে বেতুল জিলা একজন জমীদারের করায়ত্ত ছিল। তিনি সাহাপুরের দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার নাম শিবদীন কূর্ম্মী এবং তাঁহার পুত্রের নাম তেজীসিংহ।

রামদীন শুকুল নামক জনৈক অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণের হস্তে সাহাপুর দুর্গের ভার ন্যস্ত ছিল।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে যখন বেতুল প্রথম ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্ভূত হয়, তখন শাহাপুর পরগণার অন্তর্গত ৭৩টী গ্রাম বিশ বৎসরের জন্য শিবদীন জমীদারকে ইজারা দেওয়া হয়। এই জমীদারী রক্ষার জন্যই শিবদীন সাহাপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রথমে নয়নসুখ ও তদন্তে নয়নসুখের ভ্রাতুষ্পুত্র রামদীন শুকুলকে দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে উপরোক্ত ইজারার কাল শেষ হইলে পুনরায় বন্দোবস্তের জন্য জরীপ আরম্ভ হয়। আশরফ হোসেন ও সিনক্লেয়ার নামক দুইজন ডিপুটী ঐ জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন; এবং উৎকোচ গ্রহণ তাঁহারা "উপরি" পাওনা মনে করিতেন। শিবদীনের নিকট হইতে উৎকোচ প্রত্যাশায় ইঁহারা উভয়ে একযোগ হইয়া সাহাপুর পরগণার অন্তর্গত ৭৩টী গ্রাম রামদীন শুকুলের ন্যায্য সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। শিবদীন উৎকোচাশী কর্ম্মচারিদ্বয়কে গ্রাহ্য করিলেন না এবং তাঁহাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও উৎকোচদানে সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। সিনক্লেয়ার মহাশয় বিপদ গণিয়া রামদীন শুকুলকে শিবদীনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিয়া দিলেন। আশরফ হোসেন শিবদীনের বিরুদ্ধে এক নালিশ রুজু করিলেন যে শিবদীন তাহাকে উৎকোচ দান করিতে আসিয়াছিলেন। বিচারে সিনক্লেয়ার ও রামদীনপ্রমুখ সাক্ষীদিগের বাচনিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া শিবদীনের সশ্রম চারি মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

সিনক্লেয়ার ভাবিলেন যে যদি শিবদীন কারামুক্ত হইয়া আপন ভূসম্পত্তি দাবী করিয়া নালিশ করেন তবে ঘটনা আরও গড়াইবার সম্ভাবনা; অতএব তিনি রামদীন শুকুলের সহিত একযোগ হইয়া শিবদীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাপবাদ আনয়ন করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উহা বিদ্রোহের কাল ছিল। তখন হোশঙ্গাবাদ হইতে বেতুলে ডাক যাইতে সাহাপুরের সন্নিকটে ডাক লুঠ হইত। অধিকন্তু শিবদীন ঐ সময় রামদীন শুকুলকে দুর্গ-সংস্কারের আদেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রামদীন ঐ আদেশ বিদ্রোহমন্ত্রণার সাক্ষীস্বরূপ শিবদীনের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়াছিল। বিচারে শিবদীনের ৭ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইল; এবং সাহাপুর পরগণার অন্তর্গত ৭৩টী গ্রামের অধিকার হইতে শিবদীনকে বিচ্যুত করিয়া তৎস্থলে রামদীন শুকুলকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

শিবদীনের বেতুলের জমীদারীও তাহার হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়। কারাগারে শিবদীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র তেজীসিংহ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারে শিবদীনের অনেক দোষ স্খলিত হইলেও তেজীসিংহ সাহাপুরের জমীদারী ফিরাইয়া পাইলেন না।

রামদীন শুকুলের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র রামলাল ও শ্যামলাল সাহাপুর পরগণার জমীদারী পান। এক্ষণে রামলালের পুত্র ঋষিরাম ও শ্যামলাল ঐ পরগণার ভূম্যধিকারী। তাঁহারা আপনাদের জমীদারী বিভাগ করিয়া লইয়াছেন।

সাহাপুর হইতে বেতুল পথে এক মাইল গেলে "ঘাট" সুরু হয়। (এ দেশে গিরিসঙ্কটকে ঘাট কহে।) এই ঘাট ৮ মাইল দীর্ঘ এবং উচ্চতায় ২০০০ ফীট। পাঠকগণ কল্পনা করিবেন যেন একটী ২০০০ ফীট উচ্চস্তম্ভে উঠিবার জন্য তাহাকে বেষ্টন করিয়া ৮ মাইল দীর্ঘ একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই ঘনকৃষ্ণ শালবনে সমাচ্ছন্ন। এই গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যগিরির পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতে হয়। তাহার পর রাস্তা তত বন্ধুর নহে।

পাঠকগণ যেন মনে না করেন যে উপরোক্ত গিরিসঙ্কট পার হইলে অবশিষ্ট পথ কেবলই সমতল ক্ষেত্র। বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে নানাজাতীয় স্ফোটকের ন্যায় অল্পাধিক উচ্চতাবিশিষ্ট বহুবিধ গিরিশৃঙ্গ বিরাজ করিতেছে। সমস্ত বেতুল জিলা যেন একটী অনন্ত তরঙ্গায়িত সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিক্ষোভিত।

বেতুল সহর হইতে ৩॥ মাইল দূরে বেতুলগ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম পূর্ব্বকথিত শিবদীন কুর্ম্মীর আবাস ভূমি। তাঁহার পৌত্রেরা এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন। যে স্থানে বেতুল সহর স্থাপিত হইয়াছে তাহার পুরাতন নাম "বদনূর"। এ দেশবাসিগণ এখনও সহরকে বদনূর ও গ্রামকে বেতুল কহিয়া থাকে।

মধ্যপ্রদেশে বেতুল ও ছিন্দবাড়া শৈত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার শৈলনিবাস পাঁচমারি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বেতুলই Sanitarium বলিয়া গণ্য হইত। পাঁচমারি বেতুল হইতে অধিক শীতল নহে, কিন্তু রেলপথের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়াই এক্ষণে তাহা শৈলনিবাসরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বদনূর হইতে ৪ মাইল দূরে বেতুলগ্রামের সন্নিধানে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহা যে গিরিশৃঙ্গোপরি অবস্থিত, সেই শৃঙ্গের পাদমূলে মুকুন্দগির নামক একজন সাধুর সমাধি আছে। এই সমাধি বেষ্টন করিয়া শিবচতুর্দ্দশীর দিন একটী মেলা বসিয়া থাকে। এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে মুকুন্দগির নিজের সমাধিমন্দির নিজেই নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার ভিত্তিতলে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; একদা তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় শিষ্যবর্গকে তাহার দ্বার খিলান দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিতে আদেশ করেন। প্রভুর আদেশে দ্বাররুদ্ধ করা হইল, মুকুন্দগির সেই সমাধিগর্ভে-ধ্যাননিরত অবস্থায় রহিয়া গেলেন। (এ দেশে এবম্বিধ ধ্যাননিরতাবস্থায় প্রোথিত হইয়া দেহত্যাগ করাকেই "সমাধি" কহে।)

এতক্ষণ বেতুলের স্থানবর্ণন করা হইল। অতঃপর এ স্থানের লোকবর্ণন প্রবন্ধান্তরের জন্য রক্ষিত হইল।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।

(সমাপ্ত)

মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষে যে সকল কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ফ্রেজার সাহেব তন্মধ্যে দায়ভাগরচয়িতা জীমূতবাহন, গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব, শিখধর্ম্ম প্রচারক শিখগুরুগণ, সুখনিধান শব্দাবলী প্রভৃতি প্রণেতা রামানন্দশিষ্য কবীর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মীরাবাই এবং মধ্যভারত, বোম্বে ও গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক ভাগবত পুরাণপ্রণেতা বল্লভাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন এই যুগে ধর্ম্মই সাহিত্যের প্রাণ ছিল, তাই সকল সাহিত্য গ্রন্থই অল্পাধিক পরিমাণে ধর্ম্ম দ্বারা পরিপ্লাবিত। সমগ্র ভারতের অধিকাংশ স্থলেই এ সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হইত, বিশেষতঃ বোম্বে ও গুজরাট প্রদেশের বহুসংখ্যক অর্থশালী ক্ষমতাপন্ন সম্ভ্রান্ত হিন্দু বল্লভাচার্য্যের প্রতিভা ও গুণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সকল ভক্তগণ বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মঠের মহান্তদিগকেও গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত, প্রচুর অর্থে তাহাদের পূজা করিত, কিন্তু শক্তি ও তান্ত্রিক মতের উপাসক এক দুরাচার মহান্তের ঘৃণিত রুচি ও জঘন্য প্রবৃত্তির জন্য বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের প্রভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বোম্বে হাইকোর্টে একটা অতি কুৎসিৎ মোকর্দ্দমা রুজু হয়। মোকর্দ্দমার বিষয় এই যে, বল্লভাচার্য্যের তদানীন্তন উত্তরাধিকারী কোন গোস্বামী আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সাব্যস্ত করিয়া সম্ভ্রান্ত ভক্তের শুধু পূজা ও ধনরত্ন উপহার লইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তাঁহার শিষ্যপত্নীকেও স্বকীয় সেবাদাসীস্থানীয়া মনে করিয়া সেই সাধ্বী রমণীর অপমান করিলেন। এই মোকর্দ্দমার পর মহাপ্রভুদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সাধারণের তাঁহাদের প্রতি আর সে ভক্তি শ্রদ্ধা নাই।

এই সময়ে বঙ্গদেশে দুই জন বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল, একজন বিদ্যাপতি ও অন্যজন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অনুকরণ মাত্র। চণ্ডীদাসের পদমাধুর্য্য বিদ্যাপতি অপেক্ষা অল্প হইলেও ভাবের গভীরতা অধিক।

উত্তর ভারতে কবীর যেমন এক উদার ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করেন, বঙ্গে তেমনি ব্রাহ্মণ চৈতন্য স্থানকাল পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মের সংস্কার ও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখাইয়াই কৃষ্ণের অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে যেমন—লুথার, কুহকপ্রিয় প্রাচ্যে তেমনি চৈতন্য। ভক্তি—অবতার চৈতন্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধারণা তেমন উচ্চ নহে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভক্তি-গ্রন্থাবলীর ইংরাজী অনুবাদের ভিতর দিয়া চৈতন্যের প্রেমের মহিমা যথাযথ ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় বলিয়া বোধ হয় না; যাহাহউক মিঃ ফ্রেজার কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহোদয় সঙ্কলিত শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনী ও ধর্ম্মমতের প্রশংসা করিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে কয়জন মুসলমান গ্রন্থকার প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে মিঃ ফ্রেজার বলেন, আবুল ফজেলের ভ্রাতা কবি ফৈজি, তারিখ—ই—বাদায়ুনি প্রণেতা

ঐতিহাসিক আবদুল কাদের বাদায়ুনি, এবং তাবাকতই আকবরির প্রণেতা নিজাম উদ্দীন আহাম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি রামায়ণ ও মহাভারতের পারসী অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু আইন—ই—আকবরি রচয়িতা আবুল ফজলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। হিন্দুদিগের মধ্যে রাজা বীরবল রাজকবির সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজস্বসচিব তোডরমল্ল দেশীয় ভাষায় নীতিকথা রচনা করিলেও ভাগবত পুরাণের পারস্ত অনুবাদই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। তিনিই হিন্দুদিগকে পারস্ত ভাষা শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন, এবং সরকারী নথি পত্রের ভাষা পারসীতে পরিবর্ত্তনও তাঁহার চেষ্টার ফল। আধুনিক উর্দ্দু ভাষা তিনিই প্রচলিত করিয়া যান, একথা বলা যাইতে পারে।

এই সময় হরিনাথ নামে একজন হিন্দু কবির প্রাদুর্ভাব হয়। হরিনাথের গল্প শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার ক্ষমতা কিছু অসাধারণই ছিল; রাজা মানসিংহের নিকট একটী কবিতা উপহার দিয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ করেন, সম্রাটবংশীয় এক বাদসাহজাদা তাঁহার আর দুইটী কবিতা উপহার পাইয়া তাঁহাকে দুইলক্ষ টাকা দান করেন। একদিন কবি কোন স্থানে যাইতে যাইতে এক নাগা সন্ন্যাসীকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, উভয়ের মধ্যে পরিচয় হওয়ায় নাগা হরিনাথের নিকট একটী কবিতা আবৃত্তি করে। ঐ কবিতা শুনিয়া হরিনাথ এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত উপহার সেই নাগাকে প্রদান পূর্ব্বক রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন!

মোগলরাজত্ব কালের সাহিত্য সমালোচনা উপলক্ষে লেখক বলিয়াছেন, অন্ধ কবি সুরদাস এবং তুলসীদাস আকবরের রাজত্বকালে ভারতীয় সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যের এমন গৌরব কালিদাসের পর আর দেখা যায় নাই। সুরদাসের 'সুরসাগর' ৬০ হাজার শ্লোকে পূর্ণ, সুরদাস ভারতের স্পেনসার আর তুলসীদাস ভারতের সেক্সপীয়র। পণ্ডিতেরা বেদ ও উপনিষদের আলোচনা করেন, তাহার পাঠক সংখ্যা অল্প, পুরাণেও অনেকের বিশ্বাস আছে কিন্তু 'তুলসীকৃত রামায়ণ' পাঠ করিয়া হিন্দুস্থানের বিপুল জনসাধারণ আপনাদের জীবনের গতি পরিচালিত করে; অনেকের বিশ্বাস তুলসীদাস স্বয়ং বাল্মীকি; এই পাপ কলিযুগে রামায়ণতরি অবলম্বনে জন্ম ও পুনর্জ্জন্মবিড়ম্বিত মানবসন্তানকে সংসার সাগরে পার করিবার জন্যই তাঁহার অবতার।—মিঃ ফ্রেজারের এই সকল উক্তি মিঃ গ্রীয়ারসনের তুলসীদাস সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

নবদাস বিরচিত ভক্তমালা সপ্তদশ শতাব্দীর আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ। ইহাতে ১০৮ পদে গ্রন্থকার ভক্ত বৈষ্ণব-কবিদিগের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। যে এই সকল পদ আবৃত্তি করে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও তাহাকে মুক্তি দিবার আশা দান করা হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রে শিবাজীর সময়েও হিন্দুধর্ম্মের উৎসাহ অদম্য ছিল। ব্রাহ্মণ কবি রামদাস শিবাজীর গুরুস্থানীয় ছিলেন; কিছুদিন পরে পুণার শূদ্রকবি তুকারামের আবির্ভাব হয়। তুকারাম তাঁহার উপাস্য দেবতা বিঠোবা ঠাকুরের স্তুতি গান করিয়া পাঁচ হাজার শ্লোক রচনা করেন। তুকারাম শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণগণের সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা, সঙ্গীত সমূহের জন্য এবং অতিসরলভাবে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করেন, এমন কি—শিবাজীও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারই আদর্শস্থানীয় জীবন মহারাষ্ট্রের নির্ব্বাণপ্রায় শৌর্য্যবীর্য্য এবং তেজোবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল, 'বিশ্বাসে মুক্তি' এই সত্য তুকারাম মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে সম্প্রতিষ্ঠিত করেন।

মিঃ ফ্রেজার বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন কেরি ও মার্সমানই বঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের প্রথম পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের সমাচারদর্পণই বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লালুজি লাল প্রেমসাগর রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি হিন্দীতে লিখিত হইলেও আরবী ও পারসী শব্দের পরিবর্ত্তে তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানি দ্বারা উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যের অভাব নিবারিত হইয়াছিল। ইহার পর গ্রন্থকার যথাক্রমে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের মহারথীদিগের

রচনা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী রচিত ইংরাজী কবিতাগ্রন্থের বাহুল্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনা ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় লেখক আমাদের মাতৃভাষার সহিত পরিচিত নহেন, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহে তাঁহার প্রধান অবলম্বন মিঃ দত্তের Literature of Bengal এবং যে কয়েকখানি বঙ্গীয় উপন্যাস ও নাটক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে তাহাই। তুলসীদাসকে তিনি ভারতের সেক্সপিয়র করিয়াছেন, সুরদাসকে স্পেন্সারের আসনে বসাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, অথচ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাশীদাসী মহাভারত বিপুল বঙ্গসমাজের অস্থি; বঙ্গভাষার প্রথম শৈশব এই দুই কবির মধুময়ী রচনায় আপনার জীবনীশক্তি এবং অনাগত ভবিষ্যৎক্ষোবিলীন বিজয়-গৌরবের প্রথম আনন্দ-আভাস লাভ করিয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসের পাঠক সংখ্যা যতই হোক, মিঃ ফ্রেজার সাত কোটী বাঙ্গালীর সমাজজীবনের সহিত অতি সামান্য মাত্রও পরিচিত থাকিলে জানিতে পারিতেন এই দুই কবি হিন্দু সমাজের গৃহে গৃহে নীতির সহিত ধর্ম্মের, আনন্দের সহিত শান্তির পীযূষধারা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। ভারতচন্দ্র অপেক্ষা আর কোন্ বঙ্গীয় লেখক বঙ্গভাষাকে বর্ণ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন? দামুন্যার দরিদ্র কবি মুকুন্দরাম অপেক্ষা আর কাহার দারিদ্র্যজীবনের সঙ্গীত অধিক মধুর, অধিক হৃদয়স্পর্শী, অধিক পরিস্ফুট? রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীত অপেক্ষা আর কোন্ কবির সঙ্গীতে জগন্মাতার প্রতি অধিক ভক্তি, অধিক নির্ভর, প্রদর্শিত হইয়াছে? মাতৃক্রোড়বিচ্যুত এই অসহায় আর্ত্ত কবিশিশুর বেদনাপূর্ণ তীব্র হাহাকার অপেক্ষা আর কাহার রচনা অধিকতর আবেগে বিশ্বাসহীন মানবের শুষ্ক হৃদয়ে প্রেমতরঙ্গিণী প্রবাহিত করে? কিন্তু ইহারা মিঃ ফ্রেজারের সাহিত্য-ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং ইচ্ছাক্রমেই হোক আর অজ্ঞতা বশতঃই হোক,—মিঃ ফ্রেজারের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন সম্পূর্ণ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। বঙ্গভাষাকে বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার এই ত্রুটী সামান্য নহে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

বঙ্কিম বাবুর যে কয়খান উপন্যাস ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে তাহাদের এবং দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণের সুদীর্ঘ সমালোচনাদ্বারা তিনি বর্ত্তমান বঙ্গের রুচি, গতি এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দান করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা আছে। তিনি বলেন বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্রই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ইহাই তাঁহার নাম তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

দুর্গেশনন্দিনীকে মিঃ ফ্রেজার সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস পাঠের ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে তাঁহার মোটামুটি ধারণা এই:—

"The Bengal novelist could not so readily shake himself free from the Eastern form of thought and view all things from an object point of view...He leaves us in doubt whether he is depicting life as it throbbed around him or whether he has hemmed in his characters with a surrounding of Eastern mysticism and romantic reserve born of Western conventionality."

বাবু দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের সমালোচনা উপলক্ষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "এই পুস্তকে লেখক শোকজনক ঘটনাগুলির উপর হৃদয় বিদারক দৃশ্যের স্তূপ পর পর এমনভাবে চাপাইয়া লিখিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা অল্প অতিশয়োক্তি, অল্প নাটারসদ্বারা গ্রন্থের উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইতে পারিত এবং তাহা একটা স্বাধীন সাহিত্য শিল্পকারের দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিত।

এই নাটক, সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্য ধরিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে নূতন অস্ত্র (মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা) সাধারণের হস্তে পড়িলে তাহা কিরূপে দুইটা উদ্দেশ্য সাধন করে। ইহার কার্য্যকরী শক্তি এবং অতিরঞ্জিত বিয়োগময় পরিণাম পাশ্চাত্য জগৎ হইতে গৃহীত, সম্ভবতঃ ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট ও মার্চেণ্ট অব ভিনিস নামক গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণ পাঠ গ্রন্থকারকে এই

নাটক রচনায় প্ররোচিত করিয়াছে। ইংরাজ রাজ যখন ভারতবাসীদিগকে চিন্তার কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচালনার এবং অভাব ও আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপনের স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন এইরূপ নাটক ইহার দুর্ব্বলতা ও ত্রুটী সত্ত্বেও গভীর বিপদের সম্ভাবনা ব্যক্ত করে।"—কিন্তু সাহেবের এই অতি সতর্কতাপূর্ণ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

হেমবাবু, রবীন্দ্র বাবু এবং নবীনবাবু বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট অজ্ঞাত নহে, কিন্তু মিঃ ফ্রেজার তাঁহাদের নাম এই বৃহৎ পুস্তকের কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই।

দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় মিঃ ফ্রেজার ত্রিবাঙ্কোরবাসী চান্দুসেনর প্রণীত ইন্দুলেখা নামক উপন্যাসের, বরোদাবাসী পার্সী সংস্কারক মালাবারী প্রণীত গুজরাট ও গুজরাটী ও ভারতবাসীর চক্ষে ইংরাজ-জীবন নামক ইংরাজী গ্রন্থদ্বয় এবং নীতিবিনোদ নামক নীতি বিষয়ক গুজরাটী পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর মালাবারিকে একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন 'রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মাইকেল-দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল নহেন, তাঁহাদের সৃজনোন্মুখী প্রতিভা ভারত ইতিহাসে প্রাচীনযুগের কালিদাস, চৈতন্য, জয়দেব, তুলসীদাস এবং শঙ্করাচার্য্যের সমান আসন পাইবার উপযোগী। ভবিষ্যৎ যুগেও তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিভাকিরণ চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে।'

হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সংস্কারক সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন. "এ কথা একপ্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ মহাসংস্কারক—যিনি তাঁহার প্রভাব ও অশান্তি-উত্তেজক ক্ষমতা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত করিয়া বাঙ্গালী, শিখ, মারাঠা, তামিল প্রভৃতি জাতির উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিবেন—তিনি আর যে জাতির লোকই হউন, বাঙ্গালী হইবেন না। এরূপ একজন সংস্কারকের নিশ্চয়ই আবির্ভাব হইবে। তাঁহার পিতা মাতা এবং জাতীয় পরিচয় কিছু থাক বা না থাক, তিনি তাঁহার তেজোদীপ্ত হৃদয় ধ্বনিত করিয়া কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায়ই ঘোষণা করিবেন—"আমি যোগজীবন গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করিলাম, আমার প্রেমসম্মিলনের বাসর ভগবানের গৃহে কঠোরতার মধ্যে উদ্‌যাপিত হইবে।"—কথা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এ কথারও দৈববাণী করিয়াছেন যে, "ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষ জয় করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মারাঠার সাহস, রাজপুতের সমরকৌশল, এবং শিখের অদম্য বীরত্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জেতা এ কথা স্থির জানিবেন যে ভারতে বিদ্রোহিতার প্রথম বহ্নিস্ফূরণ দূর বিস্তৃত ধর্ম্মান্দোলন হইতেই আরম্ভ হইবে। তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ নহে, তাহার আকার সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার উপযোগী। এই বিপুল ধর্ম্মান্দোলন ভিন্ন আর যে কোন আন্দোলনই হউক; না কেন একতা, বল, এবং পরস্পরের সংযোগ অভাবে তাহা অচিরস্থায়ী হইবে।"—এ বিষয়ে আমাদের কোন মতামত অনাবশ্যক, শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে মিঃ ফ্রেজার ভারতবাসীর ধর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়াই এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াছেন, কিন্তু যতদিন ভারতবাসীর ধর্ম্মান্দোলনে কোন রাজনৈতিক আঘাত না পড়ে ততদিন এ প্রকার বহ্নিস্ফূরণের আশঙ্কা দূরের কথা, তাহার কল্পনাও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জন্মান্তর সমস্যা।

শাস্ত্রে উল্লিখিত, কি কবির তুলিতে চিত্রিত স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা কল্পনা-মূলক; কিন্তু দেশের চিরন্তন বিশ্বাস-ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান জন্মান্তরসূত্র তদ্রূপ কল্পনার কথা বলিয়া আমার নিকট বোধ হয় না। অবশ্য জীবনের এ পারে দাঁড়াইয়া অপর পারের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা অনেকের নিকট অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যখন জীবনের সম্মুখে এক মহাসত্য মৃত্যুভয় দেখাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন বিজ্ঞানের নিষেধসূচক তর্জ্জনীর প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম না দেখাইয়া মানবচিত্ত যদি অজ্ঞাত রাজ্যের তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল হয়, তবে তাহা কতদূর পরিমাণে ক্ষমার্হ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অপর পক্ষে একথাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নহে যে, আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ হইলেও যোগ-ক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারে, যাহা এখন আমরা অতীন্দ্রিয় এবং কল্পনামূলক বলিয়া বিজ্ঞানের অগ্রাহ্য মনে করি। যেরূপভাবেই ধরা যাউক, অন্ততঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস দ্বারা কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে এবং জীবনের নানারূপ জটিল প্রশ্নের এরূপ একটী সদুত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় যাহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া উপেক্ষিত না হইতে পারে।

কোন ঘটনা বিশেষে পড়িয়া স্মৃতি অনেক সময় বহুদিন নিমজ্জিত প্রাচীন কাহিনীর ছিন্ন সূত্র খুঁজিয়া বাহির করে; সেই সব বিষয় মনের অজ্ঞাতসারে স্মৃতির কোন্ অন্ধকার কক্ষে লুক্কায়িত ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। হ্যামিল্টন্ তাঁহার মনোবিজ্ঞানে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রৌঢ়বয়স্কা একটী নিরক্ষর জার্ম্মান্ রমণী ভয়ানক জ্বরবিকারগ্রস্ত হইয়া একবার বিশুদ্ধ হিব্রু কথা বলিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐ রমণী তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মশালার নিকটে ছিলেন, যেখানে হিব্রু ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্ নিত্য পড়া হইত; এ পর্য্যন্ত তিনি সেই কথাগুলি কখন মনেও চিন্তা করেন নাই, বলা বাহুল্য হিব্রু ভাষায় তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কিন্তু শৈশবে শ্রুতিপ্রবিষ্ট ও অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে মুদ্রিত কথাগুলি বহুবর্ষ পরে বিকার উপলক্ষ করিয়া হঠাৎ কোন্ সূত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল কেহ কি বলিতে পারেন? কালিদাস লিখিয়াছেন, রম্য দৃশ্যাদি দেখিয়া ও মধুর শব্দাদি শুনিয়া হঠাৎ কখনও কখনও যে আমাদের চিত্ত পর্য্যুৎসুক হয়, তাহা শুধু বহুকাল বিস্মৃত ভাবস্থির পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলির স্মৃতির অস্পষ্ট উন্মেষ হেতুই হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ যোগী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি।—"আমি গুরুদেবের সঙ্গে বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, এক বিরলবসতি বহুবৃক্ষলতাগুল্মপরিবৃত শ্যামল প্রান্তরের সমীপবর্ত্তী হই; সেই স্থান দেখিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও মিছামিছি চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। এক শূন্য ভিটার সম্মুখে যাইয়া আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়ি; এক অভূতপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারে আমি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'এ স্থান আমার নিকট এত পরিচিত ও এত প্রিয় বোধ হইতেছে কেন?' তাঁহার প্রসাদে

সেই দিন আমার পূর্ব্বজন্মের ক্রীড়াভূমি দৃষ্টে সমস্ত পুরাতন কথা মনে উদিত হইয়াছিল; গত কল্যের বিষয় সম্বন্ধে মনে যেরূপ পরিষ্কার ধারণা থাকে, আমার গত জন্ম সম্পর্কে সমস্ত কথা সেইরূপই স্মৃতিতে পরিস্ফুট হইয়াছিল।" অবশ্য এরূপ কথা কল্পনা করিতেও একটু অভিনব সুখের উৎপত্তি হয়। কল্পনার প্রসার একটু বাড়াইয়া বিষয়টী চিন্তা করা যাউক।

যদি সত্য সত্যই বিগত জন্মের স্মৃতি এই ভাবে উদ্রিক্ত হয়, তবে মনুষ্য স্বসমাজে কাল করিবার অভিলাষী ও দারা পুত্রাদি লইয়া সুখী হইতে পারে কিনা? মনে করুন আমি সহসা এই জ্ঞান লাভ করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলাম কোনও স্থানে আমার দূর বংশধর অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, কোথাও শোকদগ্ধ, পদগর্ব্বিত এবং কোথাও বা চন্দনচর্চ্চিত ললাটে বহুশ্রদ্ধার সহিত আমার পিণ্ডদানে নিযুক্ত রহিয়াছে। কত চারু আবাস গৃহ, পুষ্পিত তরু ও ও কত চারু গ্রন্থপত্রে আমার হস্তচিহ্ন দীপ্যমান্ রহিয়াছে। বহু নরনারী পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ও ভগ্নী স্বরূপে জন্মে জন্মে আমার সঙ্গে মায়ায় আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের প্রাচীন প্রসঙ্গের কথা মনে করিয়া বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি অবজ্ঞা দর্শান স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, কারণ আমার পরিবার সমস্ত বিশ্বের সমস্ত জীব ও আমার গৃহ সমস্ত বিশ্বের ন্যায় বিরাট হইয়া দাঁড়ায়। আর জন্মে জন্মে বিপদে কষ্টে পড়িয়া মৃত্যু শয্যায়ও ভক্তিগলদশ্রুনেত্রে যাঁহাকে স্মরণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি, তিনি এই বর্ত্তমানেও একান্ত সুহৃদ হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যদ্রূপ দীর্ঘকালব্যাপী এরূপ আর কাহারও সঙ্গে নহে, এ কথাও মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক হয়। তৎপর Kingsley র Lady why' অর্থাৎ সাংসারিক গূঢ় সমস্যাগুলির ও দুই একটার সদুত্তর দেওয়া যাইতে পারে; এই পৃথিবীতে নিয়ন্তর কোন্ গূঢ় অভিপ্রায়ে জীব এত কষ্ট ভোগ করে? যদি মনে হয় বৃক্ষরূপী প্রাণী অজস্র কুঠারাঘাত ও শীতাতপের অত্যাচার সহ্য করিয়া যে জ্ঞান শক্তির উন্মেষ অনুভব করে, ক্ষুদ্র পিপীলিকা ইত্যাদি শতবার পদদলিত হইয়া যে শক্তির কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করে, সেই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু জ্ঞানশক্তি নানা জ্বালার মধ্যে বিকশিত হইয়া মানবের উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়; ক্ষুদ্র বীজ যেরূপ প্রকৃতির সাহায্যে

বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়, কৃমি কীটেও জীবশক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ব্যাস, সক্রেটীস্ প্রভৃতির উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া থাকে; যদি ব্যাস সক্রেটীস্ বহু শত জন্ম পূর্ব্বে সামান্য কীট ছিলেন একথা মনে স্থান দেওয়া যায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জীবের জন্মজন্মব্যাপী কষ্ট ব্যর্থ হয় নাই। পরন্তু এরূপও একটী কথা কল্পনায় উদয় হয় যে, যে কীট নিত্য পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক; সুতরাং বহুজন্মসঞ্চিত ক্রোধের বাহ্যিক বিকাশ স্বরূপ করাল বিষশক্তি লাভ করিয়া সে সর্প হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই ভাবে জীব যে যে শক্তির অভিলাষী হয়, ধীরে ধীরে ও জন্ম জন্মান্তরের চেষ্টায় তাহার উন্মেষ ও সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে; জীবন সমরে পরকর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত জড়াবস্থায় জীবের প্রতিহিংসা কামনা বলবৎ হয়, সেই কামনা যখন শুধু স্বকর্তৃত্ব-বোধে পর্য্যবসিত হয়, তখন পশু মনুষ্য হইয়া দাঁড়ায়; স্বকর্তৃত্ববোধ সম্পূর্ণরূপ তিরোহিত হইলে মানুষ যোগী কি দেবতা হইতে পারে। কথিত আছে যোগিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জগৎ উপভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ উপভোগ-শক্তি জন্মিলে যে নির্ম্মলতর আনন্দ হয় তাহার সন্দেহ নাই। কারণ গো মেষ প্রভৃতি ইতর প্রাণী জিহ্বাদি দ্বারা প্রকৃতির ফুল পল্লব আস্বাদ করিয়া থাকে, আমরা তাহা চক্ষু দ্বারা উপভোগ করিয়া কি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করি না?

মনুষ্যের পক্ষে নৈতিক দিক অবলম্বন করিয়া এই দেখা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির উদ্রেক হইলে তাহার দুঃখ কষ্টের প্রতি স্বভাবতঃ তাচ্ছল্য এবং চূড়ান্ত আদর্শের প্রতি লক্ষ্য দৃঢ় হয়, কারণ তিনি নিজের সঙ্কীর্ণ এই জীবনের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া নিজের অনাদিত্ব ও অমরত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন ও ভোগলালসার প্রতি সহজেই বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। কল্পনার প্রসার আর একটুকু বাড়াইয়া এই পৃথিবীরূপ চিড়িয়াখানার প্রতি লক্ষ্য করিলে এইরূপ চিন্তা করা যাইতে পারে যে, যে ইতর জীব হইতে ব্যক্তিবিশেষ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার চরিত্রেই উক্ত জীবের অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সর্পের ন্যায় কুটিলতা, ব্যাঘ্রাদির ন্যায় মাংসলোভ, মেষাদির ন্যায় নিরীহতা শুধু কবির উপমা ও চলিত কথায় আবদ্ধ না রাখিয়া জন্মান্তর সূত্রের অন্যতর সত্যরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। জীবশরীরের পরিণতি সম্বন্ধে বিবর্ত্তনবাদ যেরূপ সুন্দরভাবে পরিদর্শিত হইয়া বিজ্ঞানানুমোদিত হইয়াছে, জীবমনের বিকাশ সম্বন্ধেও বোধ হয় সেইরূপ সত্য নির্ণীত হইতে পারে; ডারউইন্ দেখাইয়াছেন, মাতৃগর্ভে মনুষ্য নানাবিধ ইতর জীবের মত থাকিয়া শেষে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ইতর জগৎ, যাহা মনুষ্য উত্তীর্ণ হইয়া স্বাবয়ব লাভ করিয়াছে, তাহা মাতৃগর্ভে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মনুষ্যের মানসিক শক্তির বিকাশ দেখাইতেও সেইরূপ একটী পর্য্যায়ক্রম লক্ষ্য করা যায় এবং তাহারই উপর জন্মান্তর-সূত্র স্থাপিত। বিবর্ত্তনবাদিগণ এখন স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন বৃক্ষলতা-গুল্মেরও মস্তিষ্ক-শক্তি আছে; সুতরাং জন্মান্তরবাদী ও বিবর্ত্তনবাদীর মতের হরগৌরী—মিলন করিয়া মানুষ স্বাবয়বের ন্যায় স্বমনের সম্পর্কেও বৃক্ষাদির সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান জীবন বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে একটী মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বলিয়া স্বতঃই ধারণা হয়। জন্মান্ধ অন্ধের অন্ধত্ব, মূকের মূকত্ব, দরিদ্রের দারিদ্র্য আর কোন্ নৈতিক সূত্রে ব্যাখ্যাত হইতে পারে? পূর্ব্ব পুরুষের শোণিতের দোষগুণ এবং অলঙ্ঘ্য প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা একটা মোটামুটি উত্তর হয় বটে, কিন্তু যখন আমার দুঃখ ও সুখ শুধু আমি নিজেই বিশেষরূপ অনুভব করি এবং আমার প্রত্যেক কর্ম্মের জন্যই আমাকে দায়ী করা হয় তখন অপরের কর্ম্মের দায় আমার নৈতিক জীবনের উপর কেন স্বীকার করিতে যাইব? অবশ্য পূর্ব্বস্মৃতির অভাব হেতু ফলভোগ হইতে বর্ত্তমানেও যখন ত্রাণ পাই না, তখন গত জন্মের স্মৃতির অভাব হেতু এখন যে ফল পাইব না তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? যোগিগণ বলেন সেই স্মৃতির পুনরুদ্ধার করা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন; যে কঠোর কর্ম্ম দ্বারা সেই স্মৃতি লাভ করা যাইতে পারে তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া আমরা উহা অস্বীকার করিয়া থাকি।

যদি আত্মা অজ ও অমর হন তবে ইহার একটী অতীত ও ভবিষ্য ইতিহাস আছে। আজ যাহা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়াদি বিচ্যুত হইয়া এক মুহূর্ত্ত কাল কায করিতে অক্ষম, গত-কল্য তাহা নিরবয়বে কায করিয়াছে এবং আগামী কল্য পুনশ্চ নিরবয়ব হইবে, ইহা ভাবিতে হইলে অতীত ও ভবিষ্য ইতিহাসের সহিত বর্ত্তমানের সূত্র ছিন্ন হয় এবং যখন জগতে আমাদিগের হইতে নিম্নস্তর ও উন্নত স্তর উভয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে ও যখন স্বভাবতঃই নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে জীবের কামনা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে তখন এই জগতের ইতিহাস ছাড়িয়া আমাদের স্বর্গ নরক কল্পনার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষ যখন যোগিগণের সাক্ষ্যের উন্নত ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শের সহিত ঐক্য হইতেছে, তখন তাহা অগ্রাহ্য করা সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি কি হইতে পারে? আমার কথাগুলি কল্পনার এক বৃহৎ ক্রীড়াকাননজ চিন্তা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু সেগুলি বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

'ঐতিহাসিক চিত্র।'

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; একটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি নাই। প্রশ্নটি এই; "প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস এত বিরল কেন?" আর কোনও উপকার না হউক, প্রশ্নটি আমার মনে অনেক চিন্তার উদ্দীপনা করিয়াছিল। মোটামুটি দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ হিন্দুর মানসিক স্রোতঃ স্বতই দর্শন ও ন্যায় এই দুইদিকে প্রবাহিত। ঋগ্বেদের সময় হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত এই দুই বিষয়ে আলোচনা আমাদিগের দেশে প্রায় স্থগিত থাকিত না। ইতিহাসের প্রতি দার্শনিকগণ কখনই বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতবর্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রত্যেক অঙ্গই ধর্ম্ম ও উপাসনার কোনও প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, সেরূপ অবস্থায় ইতিহাস চর্চ্চার বিশেষ কোনও কারণ উপলব্ধি হয় না। জ্যোতিষ বীজগণিত প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রে আবিষ্কৃত বিষয়গুলি যেরূপ দুর্ব্বোধ্য সূত্রসমূহে সন্নদ্ধ হইয়াছিল, এবং আবিষ্কারের উপায় যেরূপ একেবারে গুপ্ত করার প্রথা ছিল, সেরূপভাবে প্রকৃত ইতিহাস লেখা অসম্ভব হইত। পরবর্ত্তী যুগে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আধিপত্য পুনঃস্থাপন করেন তখন দেশের পূর্ব্ব ইতিহাস লিখিয়া জন সমাজে প্রচার করিলে তাঁহাদিগের প্রভুত্বের অপকার ভিন্ন উপকার হইত না। অতএব আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ইতিহাস না লেখার কারণ অনেক পরিমাণে বোধগম্য হয়। শেষোক্ত কারণ এখন আর বর্ত্তমান নাই। ইংরাজরাজত্ব ও ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদিগের মৃতপ্রায় অনেকগুলি বৃত্তিতে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আমরা অনেকগুলি নূতন বৃত্তি লাভ করিয়াছি। এই সকল বৃত্তির অন্যতম নিদর্শন জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা। আমাদিগের মধ্যে চিন্তাশীলগণ ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষাটীকে পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে হইলে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সংস্থাপন করা আবশ্যক। এই শতাব্দীর প্রারম্ভের ইউরোপীয় ইতিহাসও আমাদিগকে ইহাই শিখায়। আমরা আরও বুঝিয়াছি যে, এই জাতীয়তার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে; এবং কেবল কৃষিকার্য্য ও কেরাণীগিরি দ্বারা সভ্য জাতির সমষ্টিতে আমরা স্থানলাভ করিতে পারিবনা। এইরূপ আলোচনার অন্যতম ফল ও অভিব্যক্তি 'ঐতিহাসিক চিত্র' পাইয়া আমাদিগের হৃদয়ে অনেক আশা ও অনেক আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

ইউরোপে একটা কথা প্রচলিত আছে এবং কথাটা নিতান্ত অমূলক নয়, "ভগ্নমনোরথ শিল্পী পরে সমালোচক হইয়া দাঁড়ায়"। অতএব বলিয়া রাখা ভাল যে বর্ত্তমান লেখক কখনও ইতিহাস রচনা করিতে প্রয়াসী হয় নাই। 'ঐতিহাসিক চিত্রের' খুঁত বাহির করাই এই সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। সম্পাদক মহাশয়ের নিবেদনের শেষ ভাগের অভয়োক্তির উপর নির্ভর করিয়া, সাধারণ পাঠকের মন এরূপ প্রশংস্য এবং সাহায্যার্হ উদ্যমের প্রতি আকর্ষণ করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লইয়া ঐতিহাসিক চিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি রবীন্দ্রবাবুর আশা ও আশীর্ব্বাক্য

সফল হউক। সম্পাদক মহাশয় নিবেদনে এই নূতন ত্রৈমাসিকের উদ্দেশ্য বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কোনও দেশের ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে দুইটি জিনিষ আবশ্যক: প্রথম, লেখক। ঐতিহাসিক চিত্রের লেখকগণের **নাম** দেখিয়া আশা করা যাইতে পারে যে আপাততঃ লেখকের অভাব হইবে না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এই আশা কিছু বলবতী হয়। তবে ভয়ের কারণও অনেক আছে। বঙ্গদর্শনের যখন সূত্রপাত হয় তখন কে মনে করিয়াছিল যে কয়েক বৎসর পরেই তাহার লোপ হইবে। আমাদিগের দেশে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্য, কলাবিদ্যা বা বিজ্ঞানে জীবনোৎসর্গ করিবার সুবিধা কয়জনের আছে। ইতিহাস লেখার সহিত কল্পনা-প্রসূত নভেল এবং কাব্য-রচনার তুলনা হইতে পারে না; পরের দাসত্ব করিয়া কিম্বা অন্য কোনও জীবিকা অবলম্বন করিয়া অবসর সময় 'ইতিহাস'কে দেওয়া খুব প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অবস্থায় কায অতি অল্পই হয়; এবিষয়ে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত সুবিধা খুব কম লোকেরই হইয়া থাকে। প্রাতঃস্মরণীয় ভাতা এবং সর্দ্দার দয়াল সিংহের ন্যায় কোনও বদান্য ব্যক্তি যদি বাঙ্গালাদেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চার জন্য বৃত্তি স্থাপন করেন, তাহা হইলে অনেক সুফল হয়। আমাদিগের দেশে আজকাল বিস্তর স্কুল কলেজ হইয়াছে এবং অনেক কৃতবিদ্য যুবক সেই সকল বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। স্বদেশের ইতিহাস সঙ্কলন সম্বন্ধে যদি এই সকল শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম উপলব্ধি করেন তাহা হইলেও অনেক উপকার দর্শে।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস লিখিতে হইলে উপকরণের আবশ্যক। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "ভারত ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে"। সম্পাদক মহাশয় কিন্তু বলিয়াছেন, "অনুরাগের অভাব ছিল না, প্রতিভারও অভাব ছিল না; কেবল উপকরণগুলি অনায়াসলভ্য ছিল না বলিয়াই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই"। ভারতবর্ষে বসিয়া, কেবল এক একজনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় উপকরণ সংগ্রহ যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, 'সিরাজদ্দৌলা' লেখক বোধ করি তাহা আমা অপেক্ষা ভালরূপ বোঝেন। ইউরোপীয়গণের প্রাচ্যাগমন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আদিম হস্তলিখিত উপকরণের যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্রই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে। মুদ্রিত গ্রন্থও অনেক সময় পাওয়া যায় না। লিস্‌বন, দি হেগ্, পারিস এবং লণ্ডনে অনুশীলন না করিলে এই সকল শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস উদ্ভাবন করা অসম্ভব। অল্প দিন হইল ফরেষ্ট সাহেব ভারতবর্ষীয় ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের রেকর্ড-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে ঐতিহাসিকগণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। আমাদিগের দেশের রাজাগণের সেরেস্তাও অনেক ঐতিহাসিক রত্নে পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক চিত্রের উদ্যোগিগণ সেগুলিতে অনুসন্ধান করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন কি? মুসলমান সময়েরও যে কোনও মূল্যবান্ পুস্তক ইউরোপীয়গণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন সযত্নে ইউরোপের লাইব্রেরি সমূহে সংরক্ষিত করিয়াছেন। অতএব ইউরোপে যাইয়া অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে দেশে কলিকাতার ন্যায় প্রধান নগরীতেও সংবাদপত্র লিখিবার উপযুক্ত একটি সম্পূর্ণ "reference library" খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, সে দেশে ইতিহাস সঙ্কলন করিতে চেষ্টা অসমসাহসের কায; কিন্তু অসমসাহস ভিন্নও আজকাল আমাদিগের গতি নাই। এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কেবল উপকরণ এবং কতকগুলি লোক হইলেই ইতিহাস লেখা হয় না। যাঁহারা ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদের উপকরণগুলি ব্যবহার করিবার উপযুক্ত শিক্ষা ও ক্ষমতা থাকা চাই। একজন ছুতারকে খানিকটা পোরসিলেন মাটী দিলে সে তাহা হইতে কিছুই করিতে পারে না। কেবল কল্পনা ও প্রতিভার বলে ইতিহাস লেখা হয় না। ইতিহাস লিখিতে শেখার জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতে শেখার মত রীতিমত শিক্ষানবিশী আবশ্যক। আমাদিগের দেশে একটুকু বাঙ্গালা ও একটুকু ইংরাজী শিখিয়া অনেকেই ইতিহাস লিখিতে বসেন। ইউরোপে ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালিয়ান ও ইংরাজী এই চারিটা প্রধান ভাষা না জানিয়া—ঐতিহাসিক চর্চ্চা করিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এ ছাড়া বাল্যকালে সকলেই লাটিন ও গ্রীক শিখিয়া থাকে। ভারতবর্ষে

ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে হইলে ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ না জানিলে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কারণ তাহা না হইলে ইউরোপীয়েরা কোনও বিষয়ে কতদূর ও কিরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন অবগত হওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। কারণ ইতিহাস লিখিতে গেলে অনুবাদ ও তদনুবাদের উপর নির্ভর করা সন্তোষজনক নহে। অনেক সময় অনুবাদও পাওয়া যায় না। কেবল ভাষায় বুৎপত্তি সমস্ত নহে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিম্বদন্তী, হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক ও পুস্তিকার ব্যবহার, নানারূপ এলোমেলো স্থান হইতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার, এক কথায় Historic method বা ইতিহাস-রচনা পদ্ধতি নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রয়োজন। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে ঐতিহাসিক ছাত্রগণকে এই পদ্ধতি শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হয়। এবং ইহাতে যাঁহারা অধিক পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন তাঁহারাই পরীক্ষার উচ্চ সম্মান লাভ করেন। আমাদিগের দেশে ইহা শিখিবার কোন বিশেষ সুবিধা নাই; অতএব ঐতিহাসিক চিত্রের সম্পাদক মহাশয়কে এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগের এতকথা বলিবার উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক চিত্রের লেখকবর্গকে নিরস্ত করা কিম্বা তাঁহাদের নিন্দাবাদ করা নহে। ইহা আশাকরি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিবেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ধরাই আমাদিগের ইচ্ছা। কারণ উচ্চ আদর্শ ব্যতীত কোন মহান্ কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

এই সূত্রে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য আজ কাল cosmopolitan বা সার্ব্বজাতিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেখানে ইংরাজীতে কোনও প্রতিভা অথবা পরিশ্রমসাধ্য পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইউরোপীয় সকলবিদ্বৎসমাজেই তাহার আলোচনা হইয়া থাকে। অতএব স্বদেশপ্রিয়তার অনুরোধে সত্যের অপলাপের আশঙ্কা বড় অধিক থাকে না। আমাদিগের বঙ্গভাষা আজও সভ্যভাষাসমাজে সে উচ্চ আসন অধিকার করে নাই। বঙ্গভাষায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক চিত্র বঙ্গের ও বাঙ্গালীর বহির্ভূত অতি অল্প লোকই পাঠ করিবেন। এইরূপ অবস্থায় 'প্রদীপ' সম্পাদক মহাশয়ের আশা, "লেখকগণ নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেম অপেক্ষা সত্যপ্রিয়তার অধিক আদর করিবেন" প্রার্থনা করি সফল হইবে। ইতিহাস ও সাহিত্য বিজ্ঞানের ন্যায় সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক না হইলে সর্ব্বোচ্চ স্থানের উপযুক্ত হয় না। এইজন্য ঐতিহাসিককে ধর্ম্মাধিকরণের আসন ছাড়িয়া উকীলের পোষাক পরিতে দেখিলে দুঃখ হয়।

ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর 'সূচনা' এবং সম্পাদক মহাশয়ের 'নিবেদনের' কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অন্য সকল প্রবন্ধগুলিই অসমাপ্ত ও আনুক্রমণিক রূপে প্রকাশিত হইবে। অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা এক্ষণে অসম্ভব। suggestions স্বরূপ দুই একটা কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত ভবানী গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় মেগাস্থিনীসের ইণ্ডিকার যে সকল অংশ এখনও প্রচলিত আছে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অনুবাদ, যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, মাক্রিণ্ডেলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে সংকলিত হইতেছে। আমাদের অনুমান সত্য কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের কতকটা সুবিধা হইতে পারে। আমাদের দেশে দুঃখের বিষয় গ্রীকভাষাবিৎ বিরল—তা নহিলে মূল গ্রীক হইতে অনুবাদ হইলে ইণ্ডিকা অধিক উপাদেয় হইত। অনুবাদের অনুবাদে আসলের ছায়া বড়ই কম থাকে। ইণ্ডিকায় যে মানচিত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে সেটি অনুবাদকের **নিজের** কিম্বা কোনও গ্রীক সংগ্রহ হইতে লওয়া তাহা লিখিয়া দিলে ভাল হইত।

গত শতাব্দীর শেষভাগে মালদহনিবাসী গোলাম হোসেন লিখিত রিয়াজ্ (z) উস্ সলাতীন্ নামা বঙ্গেতিহাসের অনুবাদ ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশিত হইবে। এ সংখ্যায় কেবল সম্পাদক লিখিত উপক্রমণিকা মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদটি সুসম্পন্ন হইলে বঙ্গভাষার একটা বিশেষ অভাব দূর হইবে। ময়মন্‌সিংহনিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় উপযুক্ত মৌলবীর সহায়তায় (আশাকরি মূল পারস্য হইতে) বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এবং মুর্শিদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পাদটীকা লিখিয়াছেন। আমরা অনুবাদ ও টীকার অপে-

ক্ষায় উৎসুক থাকিলাম। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয়কে বিনীত নিবেদন যে 'ঐতিহাসিক চিত্রের' ন্যায় পত্রিকায় 'রিয়াজ্(z)-উস্-সালাতিন' রূপ প্রমাদযুক্ত transliteration বা বর্ণান্তরীকরণ শোভা পায় না। পারস্যবিদের নিকট সলাতীন্ স্থানে সালাতিন্ এবং রিয়াজ্ (ز) স্থানে রিয়াজ্ উচ্চারণ অতীব হাস্যজনক। আরব্য অক্ষরগুলির জন্য ঐতিহাসিক চিত্রের সম্পাদক আশাকরি কোনও রূপ সন্তোষজনক বর্ণান্তরিত করিবার উপায় অবলম্বন করিবেন। রিয়াজের পর মুতক্ষরীণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরীর "নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ। ইহার উপক্রমণিকা পাঠে সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা ও উপকার হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় লেখক মহাশয় সেরাজগঞ্জ মাধাই নগরে যে তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক তাহার পাঠের অনেক ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়াছেন এবং স্বকৃত পাঠ শীঘ্রই প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আশাকরি সেন মহাশয়ও তাঁহার পাঠের কারণ এবং ভিত্তিগুলি প্রকাশ করিবেন।

প্রসন্ন বাবু শতবর্ষ পূর্ব্বের রচিত রামপ্রসাদ মৈত্রের প্রণীত একটী ঐতিহাসিক কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাটি হইতে তাৎকালিক উত্তর বঙ্গের ফৌজদারী আদালত সমূহের মনোজ্ঞ ছবি পাওয়া যায়। এরূপ প্রকৃত প্রাচীন কবিতা সামাজিক ঐতিহাসিকের পক্ষে বহুমূল্য-রত্নাকর। তবে দুঃখের বিষয় অনেক পারসীক ও হিন্দুস্থানী শব্দ অত্যাশ্চর্য্যরূপে বিকৃত হওয়াতেই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক অনেকগুলি শব্দের অর্থ আমরা স্থির করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় যে টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বিস্তারিত টীকা হইলে সাধারণ পাঠকের রস লাভের সামর্থ্য জন্মে। আর একটা কথা, কবিতাটা কিরূপ (লিখিত, মুদ্রিত অথবা কণ্ঠাবৃত্ত) অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার কবি ও তারিখের নিদর্শন কি এ সকল তথ্য খুলিয়া লিখিলে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক পরিমাণে বাড়ে।

নিখিল বাবুর "জগৎশেঠ" উৎসাহ-সম্পাদকের অনুমতিক্রমে ঐতিহাসিক চিত্রে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। শেঠবংশীয়গণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গেতিহাসে প্রধান নায়কদিগের মধ্যে ছিলেন। তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। এই সময়কার ইতিহাসে নিখিল বাবুর যে অসামান্য দখল আছে তাহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কিরূপ উপকরণ হইতে তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন, যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে নিখিল বাবু আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। বংশক্রমের একটি প্রতিলিপি আমরা Long's selections from the Records of the Government of India, pp. 575—9 এ দেখিয়াছি। বোধকরি শেঠবংশের পারিবারিক পুস্তক ও কাগজ পত্রাদি হইতে নিখিল বাবু তাঁহার বিবরণ আহরণ করিতেছেন। আমরা আশাকরি উপযুক্ত সমর্থক স্বতন্ত্র প্রমাণ (corroboration) না পাইলে কেবলমাত্র কিম্বদন্তীর উপর লেখক বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিবেন না। প্রবন্ধবর্ণিত হীরানন্দের ধনলাভের সূত্রপাত পড়িয়া এ বিষয়ে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ ভয় হয়। এই বৃত্তান্তটি পড়িলে ছেলেবেলাকার রূপকথার বিষয় মনে পড়ে। জগৎশেঠ প্রবন্ধে লেখক যদি বিস্তারিতভাবে ও বিশদরূপে তাৎকালিক বাণিজ্য, মহাজনী ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রকৃত দৃঢ়ভিত্তিমূলক অরঞ্জিত বিবরণ বঙ্গীয় পাঠককে প্রদান করেন, তাহা হইলে পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইবে। বাদ্‌শাহ ফরক্‌শেরপ্রদত্ত ফর্‌মানের প্রতিকৃতিটি অত্যন্ত ছোট হওয়ায় এবং মুদ্রাঙ্কণ পরিষ্কার না হওয়ায় কোনও বিশেষ উপকার আসিবে না।

সম্পাদক মহাশয় চাঁদ কবির গাথা হইতে রেবাতট পর্ব্বতের মূল ও সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। হস্তলিখিত বা মুদ্রাঙ্কিত, কোথা হইতে প্রাপ্ত কোন্ মূল তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, লিখিলে ভাল হইত। হরিসাধন বাবুর আকবর শাহ'শীর্ষক প্রবন্ধ আগামীবারে পরিসমাপ্য। সমাপ্তির পূর্ব্বে এরূপ প্রবন্ধের আলোচনায় কোনও ফল নাই।

'পৌরাণিকী' নাম দিয়া শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এক স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয় আলাদা আলাদা ধরিলে অনেক আমোদ ও কতক শিক্ষা হয় বটে। কিন্তু "দ্রোণের ধনুর দৈর্ঘ্য ছয় অরত্নি ছিল," "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে

বেয়াল্লিশ বাজনের ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়" এবং "মহাভারতের একচক্রা নগর আরা নগরেরর নিকটে ছিল" এরূপ খাপ্‌ছাড়া বিষয় এক সঙ্গে ছাপাইবার উদ্দেশ্য আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল না। শ্রেণীবদ্ধ ও বর্ণানুক্রমিক সূচীযুক্ত করিতে পারিলে এবং সকল বিষয়েই নজীর (authority) দেখাইতে পারিলে সংগ্রহটি লেখক ও পাঠকবর্গের পক্ষে বিশেষ উপকারপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস লিখিত মল্লভূমির ইতিহাসের 'অবতরণিকা' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে বিশ্বাস মহাশয়ের ঐতিহাসিক ক্ষমতা, বর্ণনাচাতুর্য্য এবং প্রাদেশিক প্রেমের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। এরূপ প্রাদেশিক প্রেম না থাকিলে রাষ্ট্রীয় প্রেম অনেকটা ফাঁপা হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালার প্রাদেশিক ইতিহাস লেখা যেরূপ অনায়াসসাধ্য সমস্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস লেখা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টসাধ্য। বিষ্ণুপুর রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে অতি প্রাচীন বংশ এবং এই বংশের ও রাজত্বের ইতিহাস সুসম্পন্ন করিতে পারিলে শশিভূষণ বাবু বঙ্গীয় লেখকগণকে একটি নূতন পথ দেখাইতে পারিবেন।

উপসংহারে প্রার্থনা ঐতিহাসিক চিত্রের সম্পাদক মহাশয় ও লেখকবর্গ আমাদের সমালোচনার ধৃষ্টতা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের এই অবসাদাক্রান্ত দেশে তাঁহারা যেরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও পরিশ্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই তাঁহারা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইতেন। এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলি যেরূপ রচনা পরাকাষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য্য ও গুণসমষ্টি (historical spirit) পরিচয় দিয়াছে, তাহাই অক্ষুণ্ণভাবে রাখিতে পারিলে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

বুদ্ধদেব।

অধ্যাত্মরাজ্যে যে সকল মহাপুরুষ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে যাঁহারা অধ্যাত্মরাজ্য আলোকিত করিয়াছেন, যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের স্বকীয় জীবনও ধর্ম্মোপদেশের প্রভাবে মানবসমাজ উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে, বুদ্ধদেব তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। বুদ্ধের কর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের বিমল আলোক সমগ্র প্রাচ্য এশিয়া (Asia) আলোকিত করিয়াছিল। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের প্রভাব সুদূর ইউরোপ ও মিশর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণ বিমল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্মরাজ্যের প্রহেলিকাগুলির সমাধান ও মীমাংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবকালে আর্য্যসভ্যতায় কতকগুলি গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত উচ্চতর জ্ঞানলাভের অধিকার অপর কোন জাতির ছিল না। যাগ যজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়া কলাপ কেবলমাত্র তদানীন্তন দ্বিজদিগেরই অনুষ্ঠেয় ছিল। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ সত্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। কেবল তাহার স্থানে বাহ্য আড়ম্বর মাত্র ছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের অধিকার ছিল না। সামাজিক জীবনে নারীজাতি পুরুষের অনেক পশ্চাতে ছিলেন; জাতিভেদের কঠোর শৃঙ্খলে ভারত নিগড়বদ্ধ হইয়াছিল। যে উচ্চতর জীবনের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিতেন তাহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অপর কোনও জাতি সেই বিমল জ্ঞানরাজ্য ও পুণ্যময় প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিত না। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের কঠোর শাসনে নিম্নশ্রেণীর লোকগণ উৎপীড়িত হইত। তাহাদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ ছিল না। বুদ্ধদেব ভারতে আসিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। অধ্যাত্মরাজ্যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সাম্য এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র আর্য্যঋষিদিগের নিকট হইতে গৃহীত। সাংখ্যকার কপিলের আবিষ্কৃত দার্শনিক তত্ত্বগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। বুদ্ধের প্রচারিত "মায়াবাদ" প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত। তাঁহার গঠিত ভিক্ষু সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের আচরিত চতুর্থ আশ্রমের অনুকরণ মাত্র। সংসারের অনিত্যতা ও অধ্যাত্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব আর্য্যঋষিগণ প্রতিপাদন করিয়া-

ছিলেন। এ সকল বিষয়ে বুদ্ধের কৃতিত্ব বেশী নাই কিন্তু ধর্ম্ম জগতে তাঁহার নিজের কতকগুলি আবিষ্ক্রিয়া আছে। এ সকলের মধ্যেই তাহার মৌলিকত্ব নিহিত। জগতে তাহার তুলনা নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিতর একটী গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মের বিমল আলোক লাভ করিবার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই করায়ত্ত ছিল। অপর জাতিগণ ধর্ম্মযাজকদিগের ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ছিল। ধর্ম্ম জগতে ও স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে তাহারা কিছু করিতে পাইত না। তাহাদিগের বিবেক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, ঈশ্বরারাধনা করিবার অধিকার তাহাদিগের ছিল না। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের হইয়া অর্চ্চনাদি করিতেন। তাহারা ব্রাহ্মণদের সেবা করিতেন। এইরূপে প্রাচীন আর্য্য-সমাজে জাতিবিশেষের পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল। বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। সেই বেদ-শাসিত ও ব্রাহ্মণপ্রপীড়িত সমাজের সম্মুখে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করিলেন যাগ যজ্ঞ ও বাহ্য অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম লাভ হয় না। প্রত্যেক জীব তাহার স্বকীয় কর্ম্মের জন্য দায়ী। নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক মানবকে কর্ম্ম করিতে হইবে। নৈতিক জীবনের উন্নতি না হইলে বাহ্যানুষ্ঠানে ধর্ম্ম হয় না। তাহার গম্ভীর আহ্বানে মৃত সমাজ জাগিয়া উঠিল। ভারতের নব জীবন আরম্ভ হইল। মানব বুঝিল শারীরিক কৃচ্ছ্র দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মানসিক ব্যাধির ঔষধ মনের ভিতর প্রয়োগ করিতে হইবে।

জাতিভেদ রূপ যে কঠোর শৃঙ্খল ভারতকে বন্ধন করিয়া ইহার জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল বুদ্ধদেবই সর্ব্বপ্রথমে তাহা ভঙ্গ করেন। তাঁহার পবিত্র আহ্বানে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্তজাতি এক মঞ্চে সমানীত ও সম্মিলিত হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জগতে সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেন। বুদ্ধের জনৈক প্রধান শিষ্য চণ্ডাল ছিলেন। পতিত ও নিরাশ্রয় জনগণকে তিনিই আশ্রয় প্রদান করেন। আর্য্যসমাজে যাহারা ঘৃণিত হইত, দয়ার অবতার বুদ্ধদেব তাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিলেন এবং উচ্চতর জীবনের পথ প্রদর্শন করিলেন।

একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, যে সমাজে নারী-জাতি যে পরিমাণ সম্মান প্রাপ্ত হয় সেই সমাজ সেই পরিমাণে উন্নত ও সভ্য। নারীজাতির সম্মান ও অধিকার সভ্যতার পরিচায়ক। প্রাচীন আর্য্যসমাজে নারীজাতির উচ্চ আসন ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তাহারা সেই আসনচ্যুত হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে নারীজাতির অবস্থা হীন ছিল। অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ ছিল; পুরুষের সেবাই তাহাদের একমাত্র ব্রত ছিল। বুদ্ধদেব নারীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছিলেন। সামাজিক জীবনে ও ধর্ম্মজীবনে নারীগণ পুরুষের সঙ্গে এক আসন পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকের স্থান ছিল। কত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। নারীজাতি এই মহাপুরুষের নিকট অশেষ রূপে ঋণী।

বুদ্ধদেব দয়ার অবতার। এই মহাপুরুষ জগতে অতুলনীয়। "Love your neighbour" এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়া যীশুখ্রীষ্ট জগতে মৈত্রীর বীজ রোপণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ভারতভূমি নিরীহ যজ্ঞীয় পশুর রক্তে কলুষিত হইত, সেই ভারতে বুদ্ধদেব সমস্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিরামিষ ভোজন প্রবর্ত্তিত করেন। সমস্ত প্রাচ্যভূখণ্ড এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রাণী হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। বৌদ্ধভারতে পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজও জাপানবাসী বৌদ্ধগণ এবং ভারতীয় অধিকাংশ হিন্দুগণ নিরামিষ ভোজী।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেব সমস্ত মানবমণ্ডলীর জন্য ধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মপ্রচারের অবতারণা করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচারকসম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৌদ্ধ প্রচারকগণ সমস্ত এশিয়াভূমে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। এমন কি বৌদ্ধ প্রচারকগণ এশিয়ামাইনর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার মরুপ্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

বুদ্ধদেব ভারতবাসীকে পাপ পুণ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি জগতে অতুলনীয়। অনেকে অনুমান করেন খ্রীষ্টের ১০ টী আজ্ঞা বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত দ্বাদশ আদেশের অনুকরণ মাত্র। বুদ্ধদেব বহুবিবাহ ও দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আর্থার লিলি (Arther Lilly) তাঁহার প্রণীত "Popular Life of Buddha" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধদেব প্রাচীন সমাজে নিম্নলিখিত কয়েকটী মহৎ কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ১ম—অহিংসাও নিরামিষ ভক্ষণ। ২য়—মদ্যপান হইতে বিরতি ৩য়—দাসত্ব মোচন। ৪র্থ—ক্ষমা প্রদর্শন, ৫ম—সর্ব্বভূতে দয়া ও ৬ষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারক সম্প্রদায়ের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি, সংযম ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা এবং ৭ম স্ত্রীলোকের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে পুরুষের সহিত এক আসন প্রদান। যে মহাত্মা ইহার কোন একটী সম্পাদন করিতে পারেন তিনিই মানব সমাজে পূজনীয়। যিনি এতগুলি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি মানুষ নহেন দেবতা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

অভাব।

কি করে কাটাই দিন কি মোহেতে ভুলে,
ভাবিলে অবাক হয়ে রই,
এই মোহমুগ্ধ ক্ষণ জীবনের কূলে,
জানি আছি শুধু দণ্ড দুই।
তবু কেন সাধ বাঁধি এ মায়া শৃঙ্খলে
নিজ কাজে নেই নিজ মন,
এই কি জীবন ব্রত এমনি করিলে,
সে ব্রত কি হবে উদ্‌যাপন!
আজ নয় কাল হতে করিব সাধনা
কাল হতে সব হবে যেন!
আপনি ভুলের স্রোতে হারায়ে আপনা,
দিন যায়, শুধু স্বপ্ন হেন।
দিন যায়, তবু কেন বুঝিতে পারিনা,
যাইতেছি অতি ধীরে ধীরে
এই সুখস্বপ্ন হতে কোথায় জানিনা—
অন্য কোন জীবনের তীরে।
মাঝে মাঝে এই সব সুখালয় হতে,
অতি ধীরে উঠিছে নিশ্বাস।
এই খর রৌদ্র ভরা জীবনের পথে,
কেন উঠে মেঘের আভাস!
শান্ত মৃদু সমীরণ মৃদু বহে যায়—
কেন উঠে ঝটিকা ভীষণ।
কেন শান্তজ্যোৎস্না ভরা পূরণিমা রাতে
বারি ধারা হয় বরিষণ!
যাই হোক জানি মনে আজ যাহা আছে,
রবে নাক কাল তাহা আর।
তবু কেন এ অলস জীবনের মাঝে,
জাগে নাক নিজ কার্য্য ভার।
কেন এসেছিনু হেথা, কোন শুভ কাজে,
এ জীবন কি ভাবে কাটিল,
শুধু নিজ স্বার্থে ভোর, আপনার মাঝে
দরিদ্রতা জাগিয়া রহিল।
দরিদ্রের দরিদ্রতা কাঞ্চন রতন,
মোর কাছে তাহা কভু নয়,
অন্তরের দরিদ্রতা করি আভরণ,
তাই লয়ে কাটানু সময়।
এসেছিনু অঙ্গে লয়ে, সুন্দর শোভন
সাজ সজ্জা স্বর্গীয় অতুল,
নিখিলের দৈন্যতায় ফেলি সে ভূষণ,
কাটিয়াছি সে শোভার মূল।
তাই এত হাহাকার, এত অশ্রুজল,
দুঃখে, শোকে, পরাণ অধীর,
তাই অবিশ্বাস এত, হৃদয় বিকল
কিছুতেই হয় নাক স্থির।
সবি মিথ্যা, সবি ছায়া, কল্পনা সকল
এই শুধু মনে পড়ে হায়,
একবার মন শুধু ভাবেনা কেবল,
কিছুরি না সমষ্টি ফুরায়।
কিছুরি সমষ্টি হেথা কভু না ফুরায়,
অবশিষ্ট রয়ে শুধু যায়।
আত্মার অনন্ত প্রাণ কভু না মিলায়,
হেথা হোতে অন্যেতে মিশায়ে,
মানবের শেষ ছাই সে যায় কোথায়
ধূলি হয়ে ধূলি সাথে রবে!
ভঙ্গুর এ দেহ বটে, আত্মা কোথা যায়
কোথা গিয়ে সে বিলীন হবে?
এ চপল চিত্ত হতে উঠিছে নিশ্বাস,
যেন কিছু পড়িতেছে মনে!

রবি করে দীপ্ত এই বিমল আকাশ,
কোন কথা জাগায় পরাণে।
কি করে কাটাই দিন, কি মোহ বিকাশ
প্রাণে মোর, যাক তাহা দূরে।
জ্যোতির্ম্ময়, সুপবিত্র, অনন্ত প্রকাশ
হোক এই অন্ধ হৃদি পুরে।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

ঘুমপাড়ানিয়া মাসী।

আমার যাদুর তরে ঘুম নিয়ে এস
ওগো ঘুমপাড়ানিয়া মাসী।
সাঁঝের আঁধার ধীরে নেমে আসে,
কোটীতারা ফুটে সুদূর আকাশে,
আঁধার-সাগরে শুধু আশে পাশে
জোনাকীরা ফিরে ভাসি'।
ধীরে ধীরে থেমে আসে দিবসের যত
কল-কোলাহল রাশি;
নিখিল নীরব, শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব
কাণে পশিতেছে আসি'।
আমার যাদুর চোখে ঘুম কেন আজ
এখনও আসেনি রে!
আর আর দিন বাছা এতক্ষণ
বিছানায় থাকে ঘুমে অচেতন,
স্বর্গসুষমা সেই অতুলন
মুখখানি থাকে ঘিরে।
তুমি এসে একবার সুকোমল কর
স্নেহে বুলাইয়া শিরে,
অতি সযতনে বাছার নয়নে
ঘুম দিয়ে যাও ধীরে।
ছুটে' এসে ওগো ঘুমপাড়ানিয়া মাসী
যাদুরে লওগো কোলে:
ওই শোন, ডাকে শিয়ালের দল,
উড়ে' উড়ে' যায় পেচক সকল,
বাছা মোর বড় ভয়ে বিহ্বল
মুখ আর নাহি তোলে;
আকুল হৃদয়ে তার সান্ত্বনা আনি'
দাও মধুমাখা বোলে,
বাটা ভরা পান করিব গো দান
ত্বরা করে' এস চলে'।
বীণা হাতে এস ঘুমপাড়ানিয়া মাসী!
ধর নব নব তান,
কুসুম গন্ধ মন্দ পবন
লয়ে এস সাথে করিয়া যতন।
চাঁদ হতে সুধা করি আহরণ,
বাছারে করাও পান।
কোমল কপোলে তার অনিবার শত
চুম্বন কর দান,
বসিয়া শিয়রে গাও মৃদুস্বরে
ঘুমপাড়ানিয়া গান।
সোণার যাদুর লাগি' নিয়ে এস ওগো
স্বপনের জাল গাঁথি'।
হেমময় পুরী মণিদীপ জ্বালা,'
একাকিনী সেথা কোন্ রাজবালা
তুলি পারিজাত গাঁথে বসি' মালা,
আননে হাসির ভাতি;
করে দাও তারে তুমি, ওগো কুহকিনি,
যাদুর খেলার সাথী।
সুখনিদ্রায় যেন কেটে যায়
এই ঘন ঘোর রাতি।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পরলোক তত্ত্ব।

হে গোলাপ, কহ তুমি কার প্রণয়িনী?
কেন দুদণ্ডের লাগি
হেথায় উঠিলে জাগি?
দেখাতে কি রূপ শুধু ওগো গরবিনি?
গোলাপ কহিল—"শুন আমার কাহিনী।
বহুদিন হ'ল গত,
তোমা সবাকার মত
মানুষ ছিলাম আমি, স্বামীসোহাগিনী;
এখানে এসেছি আজি
সুমধুর বেশে সাজি,
আমার সে প্রিয়মুখ দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী;—
এখনি এ পথ দিয়া যাইবেন তিনি।"
এ কথা শুনিয়া মনে পরম বিস্ময়
উপজিল, কহিলাম করিয়া বিনয়:—
"হে দেবি, আমার প্রিয়া
আমারে ছাড়িয়া গিয়া

কোথা, করে, কি কি বেশে মোহিয়া হৃদয়,
হয়েছেন, কহ, মম নয়নে উদয়?"
গোলাপ কহিল হাসি—"হে প্রেমিকবর,
কত তার লেখা দিব—কহিতে বিস্তর।
যে ফুল দেখিয়া তুমি বলেছ—সুন্দর,
যে তারা দেখিয়া তুমি বলেছ—সুন্দর,
যে গান শুনিয়া তুমি বলেছ—সুন্দর,
যে কাব্য শুনিয়া তুমি বলেছ—সুন্দর,
সে কুসুমে, সে তারায়,
সে গানে, সে কবিতায়,
তোমার প্রেয়সী এসেছিল নিরন্তর।
"আমরা পৃথিবী ছাড়ি চলিয়, যে আসি,—
যত কিছু সেথাকার,
দেহ ও বাসনাভার,
চিতানলে হয়ে যায় ভস্ম রাশি রাশি।
শুধু থাকে হেমবৎ প্রেম অবিনাশী।
প্রণয় আস্পদে তাই
ঘিরে থাকি সর্ব্বদাই,
শত ছদ্মবেশ ধরি আপনা প্রকাশি।
নয়নের জল হই, বয়নের হাসি।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রৌঢ় রবিন্ গ্রে।

AULD ROBIN GRAY.

"When the sheep are in the fauld" &c.

Lady A Lindsay.

নিত্য ভেড়াগুলি গোঁয়াড়ে বাঁধিয়া গাভীরা ফিরিলে ঘরে—
ঘুমায়ে পড়িলে সমগ্র ধরণী নিদ্রার বিরাম ক্রোড়ে—
ওগো মরমের ব্যথা আঁখিতে বরষে রাখিতে পারিনি যে—
তবু পারশে শুইয়া সোয়ামী আমার প্রৌঢ় রবিন গ্রে!
জেমী বালিকা বয়সে চিত্ত-বিনিময়ে মাগিল আমার পাণি,
তার আধুলী ব্যতীত আপন বলিতে না ছিল টাকা কি গিনি;
তাই আধুলীগুলিরে মোহর করিতে সুদূর সাগর-পারে,
জেমী গেল গো চলিয়ে বহু বহুদিন আমারি' আমারি' তরে!
জেমী গিয়াছে বিদেশে সপ্তাহ-হিসাবে হইবে দুই কি তিন,—
বাবা কার্য্যগতিকে ভাঙ্গিলেন বাহু,—গাভীরা হইল ক্ষীণ
আহার-বিহনে,—মা পড়িয়া রোগে,—জেমী ত সাগর বাসে;—
ওগো হেনই সময়ে প্রৌঢ় রবিন আমাদের গৃহে আসে!
হেথা বাবা কি জননী পারে না কাটিতে ধান কি চরকা-সুতা,—
আমি দিবস যামিনী করি পরিশ্রম, সকলি হইল বৃথা!
ওগো নিজের খরচে দয়ায় রবিন তাঁদের আহার দেয়,—
আর সাশ্রু-নয়নে চাহে নিতি নিতি আমা সহ পরিণয়!
হায়! হৃদয় আমার শুনে না সে কথা চাহিয়া জেমীর পানে—
হেথা প্রতিকূল বায়ু প্রবল হইয়ে ডুবাল সাগর-যানে!
হায়! তরী ত ভাঙ্গিল, তথাপি জেমীর জীবন না গেল কেন?
তা'লে বুকের ভিতর সন্তাপ আগুনি বহিতে হ'ত না হেন!
বাবা বলিলেন কত অনুরোধ বাণী,—মা কিছু না কহে কথা,—
তবু চাহিলে তাঁহার ম্লান নয়নে হৃদয়ে বাজিত ব্যথা!
তাঁরা রবিনের করে সপিলেন কর, আমার রহিল মন—
ওগো সাগরের জলে ব্যথায় তরণী স-জেমী আরোহি-জন!
হেথা রবিনের সহ বিবাহের পর মাসেক হইল গত,—
একা বসিনু একদা কুটীর দুয়ারে বিষাদে মগন চিত,—
দেখি জেমীর মতন আকৃতি গঠন কে যেন দাঁড়াল দূরে
বলে "এসেছি ফিরিয়া গৃহের মহিষী জেনি গো! করিতে তোরে!"
ওগো কত যে আদরে চুমিল আমায় কহিল কত যে মোরে—
তবু পাষাণীর মত নিদয় বিদায় করিনু তারে!
পরে কাতর পরাণে মরিতে চাহিনু—মরণ নহিল তবু—
হায়! ধরায় জনমি' 'কিহ'ল' বলিয়ে কেহ কি কাঁদে গো কভু!
এবে প্রেতের মতন ঘুরিয়ে বেড়াই কাজেতে মন না যায়—
ওগো জেমীর ভাবনা ভাবিবনা আর—পাপ যে হইবে তায়!
সদা যতন করিব হইব যাহাতে গৃহিণী গুণেতে গুণী—
ওগো বড় যে দয়ালু প্রৌঢ় রবিন সোয়ামী আমার যিনি!

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

বাবা লছমন দাস।

কিছু দিন হইল ষ্ট্র্যাণ্ড্ ম্যাগাজিন 'জীবন্ত দেবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এক জন পাঞ্জাবী বাজীকরের অদ্ভুত কৌশলের বৃত্তান্ত ইংরেজ পাঠকদিগের দৃষ্টিগোচর করিতে গিয়া হিন্দুযোগশাস্ত্রের বিষয় অবতারণা করেন। লেখকের বিবেচনায় হিন্দুযোগ কেবল মাত্র কতকগুলি প্রক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ, আধ্যাত্মিক উন্নতি উহা দ্বারা কতদূর সম্ভব সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান; উদাহরণ স্বরূপ তিনি বাবা লছমন দাসের প্রক্রিয়ার বর্ণন করিয়াছেন।

যোগ শাস্ত্রের বিষয় আমরাও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং ঐ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য অকিঞ্চিৎকর হইবে সন্দেহ নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ইংরেজ লেখকও তাঁহার মত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং উক্ত প্রবন্ধ তাঁহার সেই অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। বাবা লছমন দাস এক জন 'বাজীকর' মাত্র, তিনি 'যোগী নহেন। তাঁহার অদ্ভুত কৌশলে বিলাতে তিনি অনেক লোককে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

লছমন দাসের জীবনী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল; ইতিহাস পাঠকেরা সকলেই সে সম্বন্ধে অবগত। লছমনের দরিদ্র পিতামাতা ঐ বিপ্লবের সময় আরও দৈন্যদশাপন্ন হইয়া পড়িল এবং পুত্র প্রতিপালন করিতে অক্ষম হওয়ায় মধ্যভারতের পর্ব্বত-বাসীদিগের নিকট তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। লছমন সেই স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বহুদিন ঐ স্থানে থাকিয়া তাহার বর্ত্তমান শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কাশীতে গিয়া ঐ সব অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে-ছিল। এক দিন পথের ধারে এই অবস্থায় তাহাকে এক জন পার্শী সদাগর দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইল; পরে তাহার সমস্ত প্রক্রিয়া দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল যে উহাকে লইয়া বিলাতে গেলে তামাসা দেখাইয়া বিস্তর উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। যথেষ্ট অর্থের প্রলোভনে ব্রাহ্মণ লছমনও সমুদ্র পার হইতে সম্মত হইল।

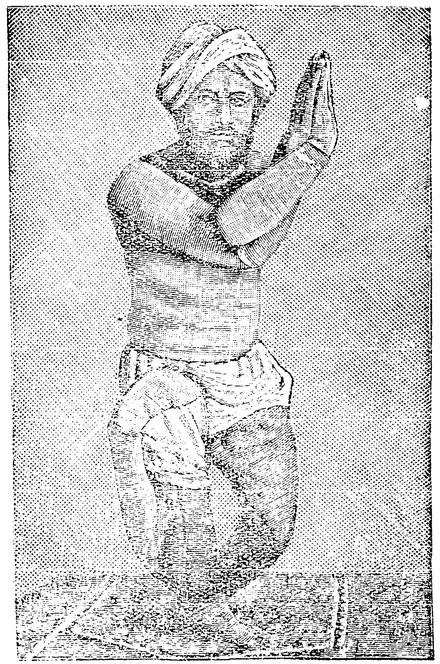

ইংলণ্ডের যে স্থানে লছমন এই সব অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিতেছিল তাহার বাহিরে পাঁচশত পাউণ্ডের এক খানি চেক ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল; প্রদর্শিত কৌশল যদি কোন ব্যক্তি অনুকরণ করিতে পারিত তবে ঐ অর্থ তাহাকে প্রদত্ত হইত।

লছমনকে নিম্নের অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া এক জন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিয়াছিল "Might as well make it £5000, no body could ever do them tricks." অর্থাৎ পাঁচ শত না হইয়া পাঁচ সহস্র পাউণ্ড দিতে প্রতি-শ্রুত হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না; কারণ উহা কেহই কখন করিতে পারিবে না।

এই অবস্থায় আমরাও অনেক সময় অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি কিন্তু এই প্রকার অবস্থা নিশ্চয়ই বিস্ময়সূচক।

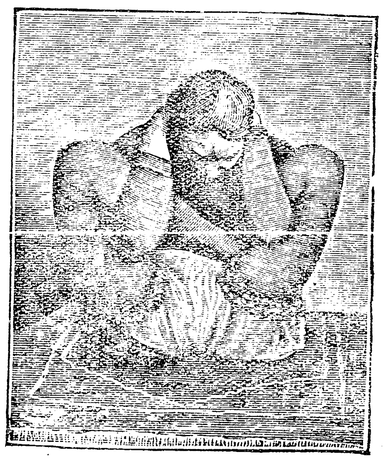

সেণ্ট জর্জ্জ হাঁসপাতালে জনৈক অধ্যাপক যোগ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লছমন দাস উপস্থিত থাকিয়া অনেক প্রকারের অবস্থায় আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছিল। অধ্যাপক একটি মনুষ্যের কঙ্কাল ঝুলাইয়া প্রদর্শিত অবস্থায় উহা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তাঁহার মতে লছমন দাসের ন্যায় মনুষ্যমাত্রেরই পাইবার কোন আশা নাই এবং পাইলেও আশৈশব তাহার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। অস্থি স্থানচ্যুত হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

নিম্নের চিত্রের ন্যায় অবস্থায় লছমন প্রদর্শিত হইলে দর্শকগণ বলিয়া উঠিল 'Doctors defied and baffled', the most stupendous marvel of the age ইত্যাদি। এই ভাবে বাবা লছমনদাস প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার ঘোটো তুলিতে ছবি একবারও নষ্ট হইয়া যায় নাই; ইহা হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে সে তাহার কৌশল সম্বন্ধে কত অভ্যস্ত।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের অবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। পাঠক পাঠিকাগণ দেখিবেন সমস্ত শরীরের ভার লছমন কেবল মাত্র কয়েকটি অঙ্গুলির উপর ন্যস্ত করিয়া স্থিরভাবে অব-স্থিত ছিল। সাত দিন পর্য্যন্ত সে ঐ প্রকার অবস্থায় থাকিতে পারে।

লছমন বিলাতে গিয়াও হিন্দুয়ানী রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সমর্থ হয় নাই, সদাগর আশা দিয়াছিলেন যে দেশে ফিরিয়া স্বধর্ম্ম পুনঃ প্রাপ্ত হইতে যত অর্থের প্রয়োজন হইবে তিনি তাহা দিবেন।

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া লছমন এই জনপ্রবাহে কোথায় মিশিয়া গিয়াছিল সে সংবাদ কেহ রাখে নাই।

সম্ভবতঃ লছমন ইহলোকে আজ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু ইংরেজ লেখক সমাজচ্যুত লছমনের জন্য দুঃখ করিয়া আজ কিপ্‌লিঙ্গের ভাষায় তাহার হইয়া বলিতেছেন ঃ—

If pain be the price of yogaship,
Lord God I ha' paid it in.

শ্রীমন্মথলাল রায় সরকার।

মৃতদারের পুনর্ব্বিবাহ উচিত কি না।

আজকাল আমাদের দেশে কোন ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিলে তাহার পুনর্ব্বিবাহ এত সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে* ইহাতে কোন অভিনবত্ব দেখিতে না পাইয়া কার্য্যটী উচিত কি অনুচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার বিবেচনা বিষয়ে উদাসীন থাকেন। কিন্তু যখন দেখিতে পাই এরূপ আচরণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সেকেলে লোকদিগকে অতিক্রম করিয়া সুশিক্ষিত, সভ্য, ভব্য, নব্যবঙ্গের যুবক-মণ্ডলীর মধ্যেও যথেষ্টরূপ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন এবিষয়ে একবারে উদাসীন না থাকিয়া ইহার দোষ গুণ গুলি লইয়া একটুখানি আন্দোলন ও আলোচনা করিলে এই লাভ হয় যে ভবিষ্যতে মৃতদারগণ পুনরায় বিবাহে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে কার্য্যটী কতদূর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন, এবং জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট নিরাশা ও অশান্তি হইতে হয়ত মুক্ত থাকিতে পারিবেন।

২। কয়েক বৎসর হইল "ভারতী" তে 'দার্জ্জিলিঙ্গের পত্র' শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার এক স্থানে পত্রলেখিকা একজন সুশিক্ষিত তিব্বদ্দেশীয় লামার সহিত তাঁহার কথোপকথনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। লামা তাঁহার স্বজাতীয়দিগের বিবাহ পদ্ধতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশের লোকের ন্যায় তাঁহাদের দেশে বিপত্নীকগণ (বিশেষতঃ যাহাদের সন্তান সং

* গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রদীপে" 'অকাল মৃত্যু' নামক কবিতা-লেখক এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"কহে বালা, দেখ সখি, দেখ ঐ কত জন
কত লক্ষ জন
এইরূপে পৃথিবীতে করিতেছে প্রণয়ের
বিশ্বাস ঘাতন।"

বর্ত্তমান তাহারা) প্রায়ই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বিপত্নীকের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ বিষয়ে বাঙ্গালীর নাম প্রবাদ বিশেষে (bye word) পরিণত হইয়াছে, এবং অসভ্য তিব্বতও এবিষয়ে তাহাদিগকে উপহাস করিয়া শিক্ষাদানে অগ্রসর হয়। বাস্তবিক কে বলিবে আমরা এই অপবাদের যোগ্য নই? একটী স্ত্রীলোক বিধবা হইলে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও সমাজনীতি দ্বারা আমরা প্রমাণ করিয়া দেই যে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিলে সাধ্বীগণের লীলাভূমি ভারতবর্ষ হইতে সতীত্বের মহান্ আদর্শ অচিরাৎ লোপ পাইবে, লোকের আত্মসংযম ক্ষমতা থাকিবে না, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে, লোক-সংখ্যা অপরিমিত রূপে বাড়িয়া যাইবে, অনেককে চিরকুমারী থাকিতে হইবে ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির মুখে এইরূপ যুক্তি শুনিতে পাই, তাহাদিগকেই যখন স্ত্রী বিয়োগের অশৌচ অতীত হইতে না হইতে পুনরায় বিবাহের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিতে দেখি, তখন কেন তাঁহারা পূর্ব্বকথিত যুক্তি সমুদয় ভুলিয়া নূতন সুরে তার বাঁধেন! বস্তুতঃ তখন আমরা দেখিতে পাই যে, যাহার চিত্ত কখনও মাতৃভক্তিরূপ দোষে কলুষিত ছিলনা, সে ঘোরতর মাতৃবৎসল হইয়া উঠিয়াছে; পিতা অথবা অন্যান্য গুরুজনের কথা যে ভ্রমেও পালন করে নাই, তাহার পিতৃ অথবা গুরুভক্তির অবধি থাকে না; বা প্রেমপূর্ব্বপক্ষের সন্তানগুলিকে তাহাদের মাতা বর্ত্তমানে তাহা যে একবার জিজ্ঞাসা করে নাই, সেই যেন সে পারে—বতে কর্ত্রী না থাকায় ছেলেপিলেদের কি প্রিয় প্রচ্ছন্নভাবে হইতেছে তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়ে কিন্তু মাতৃহীন সত্ত বয়সে নবীন হন, তাহাহইলে তিনি বাস্ত অংশ যে অঙ্কিকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বারের বিবাহে, বারের তাহার প্রকৃত বিবাহ হইবে, তাহা প্রমাণ করিতে ছাড়েন না। আর তিনি যদি নবীন না হইয়া প্রবীণ হন, তবে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" কথাটী তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে লাগিয়া থাকে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রী ব্যতীত যে সেবাশুশ্রূষা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ একবারে অসম্ভব, তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করিয়া দেন। ফলে দেখিতে পাই এই, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে করিয়া আমরা যতই কেন নাসিকা কুঞ্চিত না করি, বহুবিবাহের বিপক্ষে যতই কেন বক্তৃতা না দেই, বিবাহের উচ্চাদর্শ ও মহান্ উদ্দেশ্য আমরা (অবশ্য দুচারিজন সাধু পুরুষ ব্যতীত) আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, আমাদের পত্নী বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বিবাহের আগ্রহ দেখিলে তাহা বোধ হয় না। তবে প্রভেদ এই, সেকেলে লোকদের আমাদের মত এত বক্তৃতাশক্তি ছিল না, আমাদের প্রতিভা নানাবিষয়িণী ও পল্লবগ্রাহিতাও যথেষ্ট, এজন্য আমরা কথায় কথায়ই যুক্তি উপস্থিত করিতে পারি, এবং আজ যাহার নিন্দা করিলাম, স্বার্থের খাতিরে কল্যই তাহা করণীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে আমাদের আটকায় না।

৩। আমাদের দেশে বিপত্নীকগণ দ্বিতীয়বার দারপরি-গ্রহের জন্য এই যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমাদের chivalryর অভাব তাহার একটী মূল কারণ। পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ যখন শিকাগো Parliament of Religions অর্থাৎ ধর্ম্মের মহাসভায় বক্তৃতা করিয়া মার্কিণবাসীদিগকে তোলপাড় করিয়া লন, তখন তাঁহার সহিত এক ব্যক্তি দেখা করিতে গেলে তাহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে যদি আধুনিক সভ্যতা অর্থে স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ বুঝা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে অন্য কোন দেশ অপেক্ষা কম সভ্য বলা যায় না, কারণ সুসভ্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকার লোক যত স্ত্রৈণ, ভারতবাসিগণ তদপেক্ষা কিছুতেই কম নহে। বাস্তবিক নব্যবঙ্গ যে তাহাদের প্রপিতামহের আমল অপেক্ষা অধিকতর স্ত্রৈণ, তাহার ভুল নাই। কারণ আজকাল আমরা কথায় কথায়ই "দেহি পদপল্লবমুদারং" উচ্চারণ ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করি, আর মনে মনে হয়ত ভাবি যে স্ত্রীজাতির প্রতি যথার্থ সম্মান করিতে আমরাই শিখিয়াছি, —আমাদের chivalryর আর সীমা নাই। কিন্তু যত দিন চক্ষের সম্মুখে গোরাকর্ত্তৃক কোন স্বদেশীয়া স্ত্রীলোককে অপমানিত হইতে দেখিয়া তাহার উদ্ধারার্থ অগ্রসর না হইয়া "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" নীতির অনুসরণ করিয়া থাকি, ততদিন আমাদের chivalry আছে মনে করাও লজ্জাকর। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন যে সভ্যতার একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু স্ত্রৈণতা ও স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান এক কথা নহে—অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। কথায় কথায় স্ত্রীর পদ-

TORN PAGES

লেহন করা, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন পত্নীর কোন দোষ পাইয়া শাসন করিতে গেলে অমনি স্ত্রীর পক্ষ হইয়া তাঁহাদের সহিত ঝগড়া করা, স্ত্রীর কোন অন্যায় দেখিলে তাহার শাসন না করিয়া বরং প্রশ্রয় দেওয়া, এগুলি আমাদের রোগ বিশেষে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে স্ত্রীর প্রতি ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, প্রকৃত স্ত্রীত্বের (womanhood) বরং অবমাননাই করা হয়। কারণ যাহারা এরূপ আচরণ করে, তাহারা ইহা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় অনুমান করিয়া লয় যে, তাহাদের পত্নীগণ এতদূর নীচান্তঃকরণ যে তাহাদের স্বামীগুলি সর্ব্বদা তাহাদিগকে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করে ইহাই তাহারা চায়, এবং কেহ তাহাদের দোষগুলি দেখাইয়া দিলে বুঝি তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। এই অনুমানে যে তাহাদের স্ত্রীত্বের কতদূর অবমাননা হয়, তাহা স্বামীগণ বুঝিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ ব্যবহারে আমাদের স্ত্রৈণতা প্রকটিত হয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানের পরিবর্ত্তে অসম্মানই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির প্রতি এই সম্মানজ্ঞান আমাদের না জন্মিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এক স্ত্রীবিয়োগান্তে অন্য স্ত্রীগ্রহণে আমরা একটুকুও ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করিব না।

৪। আমাদের দেশের বিবেকসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পত্নীবিয়োগানন্তর কি ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন, এবং তাহার ফলই বা সাধারণতঃ কি হয়, এখন তাহাই আলোচনা করা যাউক। স্ত্রীবিয়োগের পর প্রথম প্রথম তাঁহাদের মনে অবশ্য একটা নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হয় বটে, এবং হয়ত তখন তাঁহারা পুনর্ব্বিবাহের চিন্তা মনেও ধারণা করেন না। তখন তাঁহাদের বিষাদময় মুখমণ্ডল এবং সুগভীর বেদনাব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রকৃতই দর্শকের মনে সমবেদনা ও সম্মানের ভাব আসিয়া পড়ে। কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে, ততই তাঁহারা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কি জানি কেমন একটা অভাব অনুভব করিতে থাকেন,—কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়াছি, এরূপ একটা অর্দ্ধস্ফুট কাতর ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহাদের হৃদয় হইতে যেন সর্ব্বদাই উত্থিত হইতে থাকে। এই অভাবের অনুভূতি ক্রমেই বলবত্তর হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে, যদি পুনরায় দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ হওয়া যায়, তবেই বুঝি সেই অভাব পূর্ণ হইবে। এইরূপে মন যখন স্ত্রীবিয়োগে কাতর থাকে, যখন ভবিষ্যৎ মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক প্রতীয়মান হয়, তখন আশা মায়াবিনী তাহার কুহকপূর্ণ অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা তথায় পুনর্ব্বিবাহরূপ জলাশয় দেখাইয়া দেয়। সুতরাং প্রথম অভাব, তৎপর আশা হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; এবং ক্রমে ক্রমে আশা ও আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ তারস্বরে তাঁহাদের অযাচিত উপদেশের বোঝা হতভাগ্য বিপত্নীকের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে কসুর করেন না,—বিবাহ করিলেই সব কষ্ট সারিয়া যাইবে, মনের অভাব ও অশান্তি দূর হইবে, অবিবাহিত থাকিলে গৃহকর্ম্মের অসুবিধা ও পিতামাতার মনোকষ্ট হইবে, ইত্যাদি। তখন তিনি মনে করেন বাস্তবিক ইহারা যাহা বলিতেছে তাহাই ঠিক, এই যে সংসারে বিরাগ ও সকল কার্য্যে অনাস্থা উপস্থিত হইয়াছে বিবাহই বুঝি তাহার মহৌষধ, এবং পুনরায় বিবাহ করিলেই বুঝি পূর্ব্বের ন্যায় সুখী হওয়া যাইবে। ইহার পরই বিবাহ হয়। কিন্তু কৈ, পূর্ব্বে যে জলাশয় মরুভূমে মনোহর শোভা বিস্তারপূর্ব্বক পিপাসাতুর পথিককে প্রলোভিত করিয়াছিল, তাহা এখন কোথায়? হায়! সে যে মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র! ক্রমে অনুতাপ আসিয়া সমগ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলে, বিবেক শতসহস্রবৃশ্চিকদংশনে চিত্তকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লয়, তখন মনে হয় পুনরায় বিবাহ করিয়া কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কা[illegible] হইয়াছে; যে দুঃখ ভুলিয়া যাওয়ার নিমিত্ত বিবাহ, তাহা [illegible] পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, যে অভাব পূর্ণ করিবার [illegible] বিবাহ, সে অভাব পূর্ণ হয় না, ও বিবাহে যেটুকু [illegible] না ঘটিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে [illegible]লি ভুগিতে হয়, সেগুলিও কেবল পূর্ণমা[illegible]কে।

৫। বস্তুতঃ [illegible] প্রায়ই সুখপ্রদ হয় না, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। দুটী আত্মা একত্র সম্মিলিত হইতে হইলে উভয়েরই একভাবাপন্ন ও একরূপে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মৃতদারের এবং তাহার শেষ পরিণীতা পত্নীর মধ্যে প্রভেদ কতদূর! একজন একবার প্রেমের লীলাখেলা খেলিয়াছে, ভালবাসার মাধুর্য্য, মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ সে একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে; অন্যে প্রেম যে কি এপর্য্যন্ত তাহাই জানে না, প্রেমের আনুষঙ্গিক সুখদুঃখগুলিত দূরের কথা। একের নিকট

দাম্পত্যজীবনের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত, অন্যে সে সকল বিষয়ে একবারে অজ্ঞ,—তাহার নিকট এখনও——

"Life's realities are all romance."

একের নিকট সকলই পুরাতন, উপভুক্ত, আবেগশূন্য, স্তব্ধতাময়, অপরের নিকট সকলই নূতন, উপভোগ্য, আবেগপূর্ণ, উদ্বেলতাময়। একের চিত্ত বিষাদমাখা, আশা নিরাশায় জড়িত, অন্যের মন বালিকা অথবা যুবতীসুলভ প্রফুল্লতাময়, ও আশাপরিপূর্ণ। একের দৃষ্টি অতীতের প্রতি নিবদ্ধ, অন্যের দৃষ্টি ভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত। বিপত্নীক দ্বিতীয়া পরিণীতাকে ভাল বাসিতে চাহে বটে, কিন্তু স্মৃতি ও তুলনাই সে চেষ্টাকে বিফল করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে তরুণ হৃদয়ের প্রথম ভালবাসা যেরূপ গভীর ও স্থায়ী হয়, আর কোন ভালবাসাই তদ্রূপ হইতে পারে না। এজন্যই কবি গাইয়াছেন—

"Deep as first love."

৬। ইহার উপরে যদি প্রথমা স্ত্রীর সন্তানাদি বর্ত্তমান থাকে, তবেত আরও প্রতুল। এরূপ অবস্থায় সংসারে অশান্তি প্রায়ই না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়াকে যে বয়সে বিবাহ করা যায়, সে বয়সে তাহার মাতৃভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না,—সন্তান যে কতদূর প্রিয় বস্তু তাহা বুঝিবার সময় তাহার তখনও হয় নাই। সে তখন চায় কেবল পতির প্রেম—হৃদয়ভরা প্রেম। কিন্তু সে ত তাহা পায় না। প্রথমা স্ত্রীর জন্য তাহার স্বামীর যে কি কষ্ট হয় তাহা সে নাও বুঝিতে পারে—কারণ অনেক সময়েই সেটা ভূগর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে স্বামী হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত থাকে—কিন্তু মাতৃহীন সন্তানগণ তাহার স্বামীর হৃদয়ের খুব একটা মস্ত অংশ যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে ইহা স্বামীর আচার ব্যবহারে স্পষ্টই জানিতে পারে। ইহাতে তাহার উদ্দাম অতৃপ্ত প্রেমপিপাসু হৃদয়ে সন্তানদিগের প্রতি স্বতঃই কেমন একটা ঈর্ষ্যার ভাব আসিয়া পড়ে। প্রথমে সে হয়ত তাহাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতে চায়, কিন্তু তাহার হৃদয়ে মাতৃভাব সঞ্চারিত না হইলে সে তাহা পারিবে কোথা হইতে? পক্ষান্তরে সন্তানগণও হয়ত বিমাতাকে আপন মায়ের ন্যায় ভালবাসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন দেখিতে পায় যে, মায়ের যে অকৃত্রিম অসীম স্বর্গীয় স্নেহের উৎস তাহাদের হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিত তাহা এখানে এখনও জন্মে নাই, এবং ইহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাদের স্নেহ পিপাসা যেন মিটেনা, তখন তাহারা বিমাতাকে মাতৃস্থানীয়া করিবার আশা ছাড়িয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয়া স্ত্রী ও পূর্ব্ব পক্ষের সন্তানগণের মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন বৈরিভাব উৎপন্ন হয়, এবং দ্বিতীয়ার গর্ব্ভে সন্তানাদি জন্মিলে উহা স্ফুট হইয়া পড়ে। তখন প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে গৃহস্বামীকে একপক্ষ অবলম্বন করিতে হয়, এবং 'সংসারে শান্তির আশা' নিতান্তই 'মরীচিকার যথা জল' গোছের হইয়া দাঁড়ায়।

৭। এখন দেখা যাউক প্রেমের জন্ম কোথায়, এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও প্রেমের আদর্শ কি হওয়া উচিত। প্রকৃতিতে যেরূপ শূন্যস্থান (vacuum) থাকিতে পারে না, মনুষ্যের হৃদয়ও সেরূপ প্রেমবিহীন থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর পুরুষের অন্তঃকরণে স্ত্রীলোকের জন্য, এবং স্ত্রীলোকের হৃদয়ে পুরুষের জন্য এরূপ একটী নৈসর্গিক আকর্ষণী শক্তি দিয়াছেন যে, যৌবনসমাগমে এক অপরকে দেখিলে তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমবৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এবং সেই অপরজাতীয় একজনকে আপন করিয়া লইয়া প্রাণের সমগ্র ভালবাসা তাহাকে অর্পণপূর্ব্বক উহা স্নিগ্ধ মধুর জ্যোতিতে দুটী জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া 'সুদীর্ঘ জীবন পথ'টী সুখে অতিক্রম করিয়া যাইবার ইচ্ছা স্বতঃই মনে প্রবল হইয়া উঠে। এরূপ ইচ্ছা স্বাভাবিক, এবং সৎপাত্র অথবা পাত্রীতে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার চরিতার্থ করাও ন্যায়সঙ্গত বটে। যদি সেই ইচ্ছা আমরা পূর্ণ না করি, চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হই, তাহা হইলে আমাদের চিত্ত হয় অসচ্চিন্তায় অথবা কুৎসিৎ আচরণে কলুষিত হইবে, নতুবা জীবন মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, এবং শ্মশানবৈরাগ্য আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে; দয়ামায়াস্নেহের প্রস্রবণগুলি একে একে শুকাইয়া যাইবে, হৃদয়ের অন্যান্য কোমল কমনীয় বৃত্তিগুলি কঠোরতা প্রাপ্ত হইবে, এবং জীবন উদ্দেশ্যবিহীন হওয়াতে কেন্দ্রভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় আমরা প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে ঘুরিতে থাকিব। (অবশ্য যাঁহারা কোন মহৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে অবিবাহিত থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে সক্ষম। এস্থলে যে মহৎকার্য্যে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ

করেন, সেইটী তাঁহাদের প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনী স্থানীয় হয়; যে প্রেম অন্যলোকে আপন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে প্রদান করিয়া প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করে, সেই প্রেম তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব অভিলষিত কার্য্যে সমর্পণ করেন।) মনুষ্য-হৃদয়ের স্বভাবজাত এই প্রেম প্রবৃত্তির সম্পূর্ণতা সাধনার্থই বিবাহের প্রথা বর্ত্তমান, এবং ইহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুটী হৃদয়কে অচ্ছেদ্য প্রণয়-ডোরে বন্ধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য এই যে, একের প্রেম অন্যে প্রতিফলিত হইয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করুক, এবং সেই পূর্ণ-বিকশিত প্রেমের প্রভাবে আলোক ও উত্তাপের প্রভাবে তরুগুল্মাদির ন্যায় পরস্পরের হৃদয়ের সদ্‌গুণগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, আপনাদের এবং অন্যান্যের জীবনকে সুখী করুক ও জগতের হিতসাধনে সক্ষম হউক। বিবাহের এই মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে, প্রেম যে কতদূর উচ্চ তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিব, এবং নীচজনোচিত ত্রৈণতাকে 'প্রেম' নামে অভিহিত করিয়া শব্দটীকে কলঙ্কিত করিব না। এই প্রেম এক বই দুই জানে না, ইহার গভীরতা অতলস্পর্শী, ইহার পাদদেশ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া থাকিলেও ইহার শীর্ষ স্বর্গে। যে একবার উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এই প্রেমের রসাস্বাদ করিয়াছে, সে কখনও ইহা ভুলিতে পারে না। এই প্রেম কাল ও দূরত্বকে অতিক্রম করিয়াছে। ভালবাসার বস্তু নিকটেই থাকুক বা দূরেই থাকুক, ইহ-লোকে তাহার সহিত দেখা হউক কি পরলোকেই হউক, তাহাতে উহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। উহা আত্মবিস্মৃতিময়, সেই ভালবাসার বস্তুই উহার ধ্রুবতারা, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়াই উহা জীবনসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম। বিবাহ করিয়া যে যে পরিমাণে প্রেমের এই উচ্চা-দর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে, তাহার বিবাহ সেই পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এবং যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন তাঁহারা বাস্তবিকই স্ব স্ব স্ত্রীকে ভালবাসেন, প্রকৃত ভালবাসার পূর্ব্বোক্ত উচ্চাদর্শ তাঁহা-দের স্মরণ রাখা উচিত। ভালবাসা যে কেবল কুসুমশয্যা নহে ইহা তাঁহাদের জানা উচিত। উহাতে যেমন স্বর্গসুখ আছে, তেমনই গুরুতর দায়িত্বজ্ঞানও নিহিত, এবং যেমন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ আছে, তেমনই কঠোর আত্মসংযমও আবশ্যক। যাঁহারা প্রেমের এই উচ্চাদর্শ হৃদয়-ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত প্রেমিক, এবং তাঁহাদের ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা। তাঁহাদের প্রেম এত গভীর যে প্রণয়িনীর মৃত্যুতে উহার ব্যতিক্রম হয় না,—পুনরায় বিবাহের চিন্তা তাঁহাদের মনেও স্থান পায় না, মরণান্তে আত্মায় আত্মায় পবিত্র মিলনের আশায় নির্ভর করিয়া ধীর প্রশান্ত ভাবে, প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় জীবনের কর্ত্তব্যগুলি একে একে সমাধা করিয়া সসম্মানে তাঁহারা নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করিয়া যান।

৮। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ভালবাসা বস্তুতঃই ভালবাসা নামের অযোগ্য, কেবল কামের ও ভোগলালসার মোহমাত্র—শিক্ষিত বিপত্নীকগণের পুন-র্ব্বিবাহের নিমিত্ত আগ্রহই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা প্রথম বিবাহিতা প্রণয়িনীর নিকট যেরূপ আবেগপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া থাকি,—জীবনে তাহার ব্যতীত আর কাহারও হইব না—যতবার তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করি, দ্বিতীয় পরিণীতা পত্নীকেও সেইরূপ পত্র লিখিয়া থাকি, ও ততবার তাহার নিকট তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা করি। প্রথমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেরূপ ঘুরিয়া বেড়াই, তাহাকে একদণ্ড না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি না, দ্বিতীয়ার সম্বন্ধেও তাহাই। যখন ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত, এবং প্রথমার ন্যায় দ্বিতীয়ারও যৌবন গত হয়, তখনই কেবল ভ্রমরবৃত্তি আমরা দ্বিতীয়ার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করি, এবং উভয়ের গুণের পার্থক্যই যে এই অনাস্থার প্রকৃত কারণ, হঠাৎ এই সুমহৎ সত্য আবিষ্কার করিয়া বসি। এইরূপ ক্ষণিক ও লালসাপূর্ণ ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নামের যোগ্য নহে। ইহাতে আড়ম্বর আছে গভীরতা নাই—বাক্যচ্ছটা আছে ভাব নাই—নকল আছে আসল নাই।

৯। এখন প্রশ্ন এই, তবে মৃতদারের কোন্ পথ অব-লম্বন করা কর্ত্তব্য? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আশার মিথ্যা প্রলোভনে পড়িয়া সচরাচর মৃতদারের পুনরায় বিবাহ করি-বার জন্য একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। যখন মনের ভাব এরূপ হয়, তখন প্রত্যেক মৃতদারেরই ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত যে তিনি উক্ত আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে সক্ষম কি না। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত, উক্ত বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একদিনের কার্য্য নহে, কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালব্যাপী আত্মপরীক্ষা দ্বারা

ছেন, যাহাতে জিন্নৎ-বেগম আশা করিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার এ সৌভাগ্য কিছুকাল স্থায়ী হইবে। তাই তিনি নিজের বীণাবাদন শুনিয়া নিজেই বিভোর, মনের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া গান ধরিলেন—

তেঁসু ফুলি মতিয়া বন বাগানে।
বোলে ডোলে কোয়েলিয়া
কুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জরে ভৃঙ্গণমে—
পাপিয়া কুকারে পিয়া পিয়া পিয়া।

আস্থায়ীর উপর বাধা পড়িল। একজন বাঁদী আসিয়া এক খানি পত্র বেগমের নিকট ধরিল।

বেগম বলিলেন—"কেয়া খবর বাঁদী?"

বাঁদী বলিল, নয়া-বেগম জাঁহাপনাকে চিঠি দিয়াছেন, জবাবের জন্য সে খাড়া আছে।

বাদসাহ তখন কতক বা সুরার মাদকতায়, কতক বা বেগমের কোমল কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তিতে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। জিন্নৎ, বাদ-সাহের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, পরে পত্র পড়িতে লাগিলেন:—

জীবিতেশ্বর,

দাসী অপরাধিনী নহে। যে কলঙ্ক তাহার শিরে স্পর্শি-য়াছে, তাহার সম্বন্ধে সে একান্তই নির্দ্দোষী। বাদসাহ যাহা ভাবিয়াছেন, তাহা ভ্রম।

যদি সন্দেহই হইয়াছিল, তবে অধিনীকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য যে সে এত শীঘ্র আপনার বিশ্বাস হারাইল।

সাহান্ সা, চির অধিনীর উপর এ নিগ্রহ কেন? যদি যথার্থই অপরাধিনী বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করিয়া একটা কীর্ত্তি রাখুন।—তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শনের অভি-লাষিনী। এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে সে সুখে মরিতে পারিবে। হতভাগিনী—সেলিনা।

পত্র পড়িয়া জিন্নৎ-বেগম ঈর্ষায়, ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। মনে ভাবিল, এই সুযোগে কণ্টকটাকে দূরীভূত করিতে না পারিলে আমার আর শুভগ্রহ নাই। বাদসাহের নামে পত্র—তাঁহাকে দিতেই হইবে।

জিন্নৎ দেখিলেন—বাদসাহের দিব্য নেশার ঝোঁক ধরি-য়াছে। হিন্দুস্থানের সম্রাট, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন। জিন্নৎ-বেগম—ধীরে বাদসাহের নিকট-বর্ত্তী হইয়া বলিলেন—"সাহান্ সা, এক পত্র আসিয়াছে।"

বাদসাহ একবার চক্ষু চাহিলেন। বিজড়িত স্বরে বলিলেন—"কাহার পত্র? স্বর্গ হইতে কোনও হুরীর পত্র আসিয়াছে নাকি?"

জিন্নৎ একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—"স্বর্গের হুরী নয়, তবে এই মর্ত্ত্যের বটে। সেলিনা বেগম পত্র লিখিয়াছে।"

বাদসাহ তখন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, জিন্নৎ বলিলেন—"জাঁহাপানা, পত্র বড় জরুরি, একবার পড়িয়া হুকুম হইলে ভাল হয়।"

বাদসাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার পত্র?"

জিন্নৎ উত্তর করিলেন—"সেলিনা বেগমের।"

নাম শুনিয়া বাদসাহের মুখে ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব প্রকটিত হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"আমি ও শয়তানীর পত্র স্পর্শ করিব না।"

জিন্নৎ তাহাই চান। বলিলেন—"আমি পড়িয়া শুনাইব?"

বাদসাহ বলিলেন—"পড়িতে হইবে না, কি লিখি-য়াছে, সংক্ষেপে বল।"

জিন্নৎ বলিলেন—"লিখিয়াছে, তাহার যখন কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।"

পাঠক জানেন, পত্রে এ কথা ছিল না।

বাদসাহ অনেক কষ্টে চক্ষু খুলিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"পাপীয়সীর এখনও চৈতন্য হয় নাই? তাহাকে ছাড়িয়া দিব, কি কুক্কুর দিয়া খাওয়াইব?"

জিন্নৎ-বেগম বলিলেন—"সাহান্-সা, আপনি দুনিয়ার মালিক—সে সামান্য স্ত্রীলোক—অতি ক্ষুদ্র, আপনার ক্রোধের যোগ্য নহে। তাহাকে ছাড়িয়া দিন। সে হতভাগিনীর অপরাধ গুরুতর বটে, কিন্তু তাহাকে বধ করিলে আপনার মহৎ নামে কলঙ্ক হইবে।"

জিন্নৎ মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, এখন বেশী কথা কহাইলেই বাদসাহ উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন। তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি। তাই নানা কথার ছলে বাদসাহকে ব্যস্ত করিতেছিলেন।

বাদসাহ বলিলেন—"জিন্নৎ বিবি, কোন কথা শুনিতে চাহি না। যাহা বলি, জবাব লিখিয়া দাও।"

জিন্নৎ লিখিতে লাগিলেন। মর্ম্মার্থ এই—

"লজ্জা হইল না, তাই আবার পত্র লিখিয়াছ? তুমি পিশাচী—ক্ষমার পাত্র নও। আজ হইতে তোমার নির্জ্জন কারাবাস আরম্ভ হইল। অন্য দণ্ডের কথা পরে বিবেচনা করিব।"

বাদসাহ নিজের অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিলেন। তাহার ছাপ পত্রের পাদদেশে পড়িল।

বাদসাহ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া জিন্নৎ বেগম এই কয় ছত্র যোগ করিয়া দিল—

"পার যদি, বিষ খাইয়া মরিও। এ লজ্জার ভার বুকে লইয়া আর বাঁচিবার প্রয়াস করিও না।"

এ কয় ছত্র পাঠকালে পুনর্ব্বার বাদসাহকে শুনান হইল না।

পত্র লইয়া বাঁদী চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জিন্নৎ বেগমের কার্য্যতৎপরতায় আর একখানি পরোয়ানা সহি-সংযুক্ত হইয়া মোতিমহলে মাহুম তাতারিণীর হস্তে পৌঁছিল। সেখানি সেলিনার নির্জ্জন কারাবাসের আজ্ঞা।

——o——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সব যায়, কেবল আশা শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া যায় না। সেলিনার সব গিয়াছে, কিন্তু আশা আর কিছুতেই বিদায় চাহে না। প্রত্যেক পাদশব্দে সেলিনা চমকিয়া উঠিয়া বসে—ভাবে, "বুঝি অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—সন্দেহ দূর হইয়াছে—তাই আসিতেছেন।" কেহই আসে না।

দিবসের তৃতীয় প্রহর পূর্ণপ্রায়,বাঁদি তখনও ফিরিলনা। সেলিনা তখন আশাকে ধীরে ধীরে বিদায় দিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল! এত বেলা সেলিনার অনাহারে কাটিয়াছে। দাসীরা নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য দিয়া গিয়াছে, সেলিনা তাহার বিন্দু-মাত্রও স্পর্শ করেন নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—তিনি না আসিলে,—এখানে আহারের পথ শেষ উঠাইব।

অনেকক্ষণ পরে বাঁদি ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ শুষ্ক দেখিয়া সেলিনা সবই বুঝিলেন। তবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কই?"

বাঁদি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তিনি আসিলেন না।"

"আসিলেন না? কখন আসিবেন বলিলেন?"

বাঁদি উত্তর না করিয়া পত্র খানি তাঁহার হাতে দিল। সেলিনা পত্র খুলিয়া দেখিলেন—জিন্নৎ বেগমের হস্তাক্ষর। ঘটনা বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না।

সেলিনা দুঃখে, মনস্তাপে, অভিমানে ফুলিতে লাগিলেন। বাঁদিকে বলিলেন—"তুই বাহিরে যা, আমি একটু ঘুমাই।"

বাঁদি বাহিরে গেল। সেলিনা দ্বার বন্ধ করিয়া আছাড় খাইয়া মেজের উপর পড়িলেন। ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া অনেক-ক্ষণ কাঁদিলেন।

সূর্য্যদেব তখন হিমাচলের পশ্চিমচূড়ার অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেলিনা উঠিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া ভাবিলেন। মুখে শান্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার করাল ছায়া।

মসী লেখনী লইয়া সেলিনা বাদসাহকে জীবনের শেষ কথাগুলি শুনাইবার জন্য পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন;—

"জীবিতেশ্বর—বাদসাহ—দুনিয়ার বিচারপতি, তোমার হুকুম—আমি বিষ খাইয়া মরিব। অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। কিন্তু জিন্নৎ বেগমের ছলনায় পড়িয়া যে আমার এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিল ইহা ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে! স্বামিন্! তুমি স্বহস্তে নিকটে দাঁড়াইয়া যদি বিষের পাত্র তুলিয়া দিতে, দেখিতে দাসী কিরূপ সাহসে বুক বাঁধিয়া তোমার মুখের দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দে বিষপান করিত।

"আমি নির্দ্দোষী। হিন্দুস্থানের বাদসাহ, তুমি ঠিক বিচার করিতে পারিলে না। কিন্তু এই দীন দুনিয়া যাঁহার বিচারে চলিতেছে তাঁহার কাছে আমি সুবিচার পাইব।

"জাঁহাপনা, প্রাণ ত অতি তুচ্ছ। এ প্রাণ তোমারই সেবায় সমর্পিত হইয়াছিল। তোমার কাজে যখন লাগিল না, তখন আর প্রাণ রাখিয়া ফল কি?

"আমার বড় সাধ হইয়াছিল, মরিবার পূর্ব্বে তোমায় একবার দেখিব! সে আশা পূর্ণ হইল না। কোনও সাধই পূরিল না। চাঁদের আলোয় মরিতে বড় সাধ যায়, কিন্তু

চাঁদ অনেক রাত্রে উঠিবে—ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। নির্ঝরিণীর গান শুনিতে শুনিতে মরিতে বড় সাধ যায়, কিন্তু কে আমায় নির্ঝরিণীর তটে পৌঁছাইয়া দিবে? জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া, ফুলের শয্যায় শুইয়া, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে সাধ যায়, কিন্তু কে সে সাধ পূর্ণ করিবে। একটা শেষ অনুরোধ এই করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়ত রক্ষা করিও। আমার উত্তরের জানালা খুলিলে, উপত্যকার যে গিরিনদী দেখা যায়, উহার তীরে, চন্দ্রো-দয়ের সময়, আমাকে সমাহিত করিবার হুকুম দিয়ো। আর সেখানে কখনও কোনও প্রহরী সিপাহী রাখিয়া আমার নির্জ্জন বিশ্রাম ভঙ্গ করিও না।"

সেলিনা পত্র সমাপ্ত করিয়া তাহাকে শীল করিলেন। বাদসাহের নামে নামাঙ্কিত করিয়া, একখানি স্বর্ণময় রেকাবীতে গুটিকয়েক ফুলের সঙ্গে পত্র খানিকে রাখিলেন। বাদসাহ কিম্বা অন্যকাহারও সহসা চখে পড়ে, এমন স্থানে তাহা রাখিয়া দিলেন!

সেলিনার হস্তে এক সুবৃহৎ অঙ্গুরীয় ছিল। বাদসাহ প্রেমোপহার স্বরূপ একদিন সেলিনাকে তাহা দিয়া-ছিলেন। সেই অঙ্গুরীয় মহাবিষের আধার জহরখণ্ড বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেলিনা তাহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিলেন। সেই চিন্তাক্লিষ্ট, মলিন, পাণ্ডুবর্ণ মুখে,—যে মুখে এখনও রূপের জ্যোতি ঝিকি ঝিকি জ্বলিতেছিল—হাসির দীপ্তি যেন দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্বে উজ্জ্বলতার মত প্রতীয়মান হইল।

সেলিনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রেম গিয়াছে, আশা গিয়াছে, জীবনের অবলম্বন গিয়াছে, সেলিনা হৃদয়ে যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিয়া একবার অঙ্গুরীয় লেহন করিলেন। দ্বিতীয়বার লেহনকালে আকাশের দিকে চাহিলেন—কাতরকণ্ঠে অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ঊর্দ্ধকরে বলিলেন—"দয়াময়, তুমি সাক্ষী, চলিলাম। তোমার পায়েই লুটাইতে চলিলাম। তোমার এত বড় জগতে আমার যখন স্থান হইল না, তখন আর অন্য উপায় কি? কিন্তু যদি তোমার পদে মতি থাকে, পিপাসা ইতি পূর্ব্বে যেন একবার তাঁহাকে দেখিতে যাহারা তাঁহার উচ্চ
হইয়াছিল, কেবল পুনঃ পুনঃ অঙ্গুরীয় লেহন করিতে লাগিলেন।

মহাবিষ সেলিনার পুষ্পসুকোমল শরীরে শীঘ্রই কার্য্য প্রকাশ করিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সেলিনা নিজ দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। কাতরস্বরে বলিলেন—"মাহরুণ! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমায় অত ভালবাস, আমি তোমায় চিরদিনই অনুৎ-সাহিত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি। বাদসাহ—প্রাণেশ্বর—ক্ষমা কর। আমি অপরাধিনী নহি। দয়াময় জগদীশ ক্ষমা কর, যেন এই আত্মহত্যার পাপে সয়তানে আমার দেহ স্পর্শ করিতে না পারে। কোরাণে লেখা আছে, স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতার স্বরূপ;—আমি দেবতার আজ্ঞায় যাহা করিতেছি, তাহার জন্য যেন আমাকে পাপস্পর্শ করে না।"

সেলিনা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে বাদসাহ সাজহান সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আলো জ্বলিতেছে, সেলিনা শয্যায় শয়ানা।

মুখের কাছে গিয়া দেখিলেন, সেই কাঁচা সোণার মত রঙ নীলাভ হইয়া গিয়াছে।

বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। রুদ্ধনিশ্বাসে বাদসাহ ডাকিলেন—

"বিবিজান—বিবিজান—পিয়ারি—" সেলিনার ওষ্ঠ দুইটি নড়িয়া উঠিল। নিশ্বাস খরতর বেগে বহিল। চক্ষুর পল্লবযুগল কাঁপিল, অল্পে অল্পে সেলিনা চাহিলেন।

"সেলিনা—পিয়ারি—কি হইয়াছে?"

সেলিনার চক্ষুর্দ্বয় আর একটু বিস্ফারিত হইল। সে বাদসাহের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন ভাল চিনিতে পারিতেছে না।

বাদসাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি করিয়াছ?"

সেলিনা জড়িতকণ্ঠে বলিল—"প্রিয়তম, আসিয়াছ! তোমার হুকুম প্রতিপালন করিয়াছি, বিষ খাইয়াছি।"

বাদসাহ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সেলিনার মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নামিলেন। দ্বারদেশে প্রহরিণী ছিল, চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হকিম—শীঘ্র হকিম ডাক।"

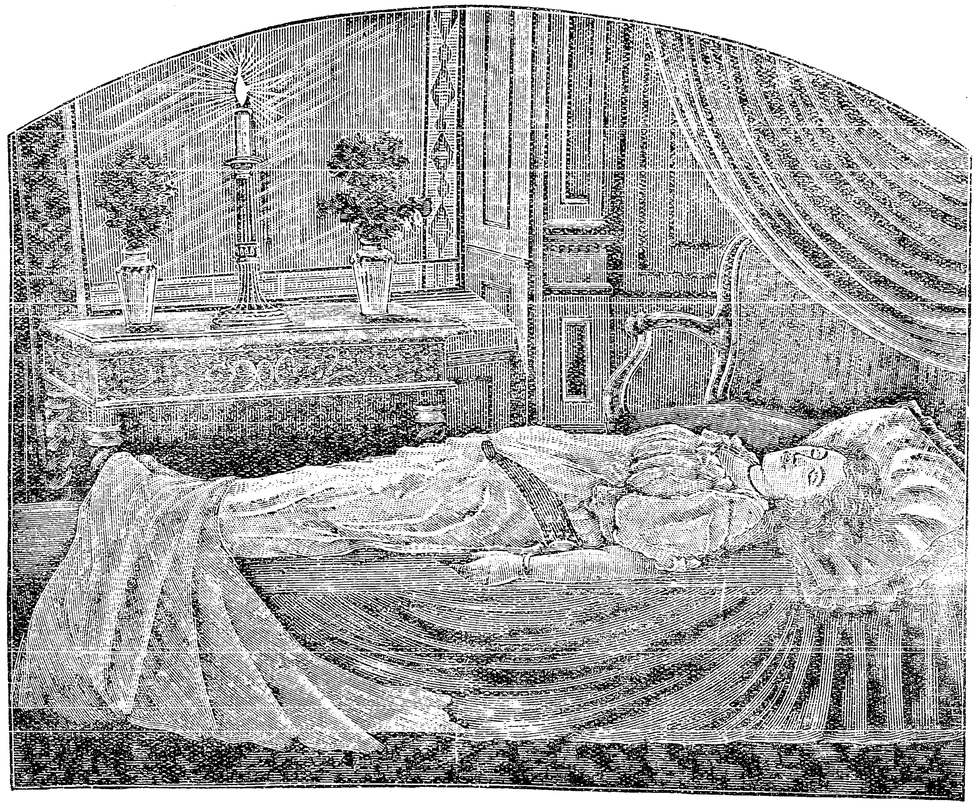

সেলিনার কাণে একথা পৌঁছিল। বলিল—"প্রভু, হকিম আর কি করিবে? আমি যে বিষ পান করিয়াছি, তাহা হইতে বাঁচান ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই।"

বাদসাহ সেলিনার শয্যার নিম্নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সেলিনার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"সেলিনা, একাজ কেন করিলে?"

সেলিনা জড়িতকণ্ঠে বলিল—"প্রাণাধিক, যদি আর একটু আগে আসিতে! তাহা হইলে মরিতাম না। তোমায় দেখিলে আবার বাঁচিবার সাধ হইত।"

বাদসাহ উন্মাদবৎ সেলিনার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিলেন। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন—"সেলিনা, আমি নরঘাতক, তোমার প্রেমের উপযুক্ত নহি। তুমি স্বর্গের দেবী, আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি আমায় ছাড়িয়া চলিলে কেন? সেলিনা, সেলিনা, কথা কও, মার্জ্জনা কর।"

কে কথা কহিবে? সেলিনার ক্ষীণগণ্ডে তখন আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। কণ্ঠরুদ্ধ প্রায়—জীবনীশক্তি ক্রমশঃ পর্য্যবসিত। দুঃখ, কষ্ট, নিরাশা, ভগ্ন হৃদয়, উপেক্ষা, অনাদর, অপমান, সবই এই পৃথিবীর—পৃথিবীর জিনিস, পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিয়া—সেলিনা হৃদয়ে এক স্বর্গীয় শান্তিলাভ করিয়াছে। বাদসাহের কাতর কণ্ঠ—কাজেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

বাদসাহ ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হকিম—হকিম।"

কিন্তু হকিম আসিবার বিলম্ব সহিল না। প্রদীপ নিবিল, সব ফুরাইল।

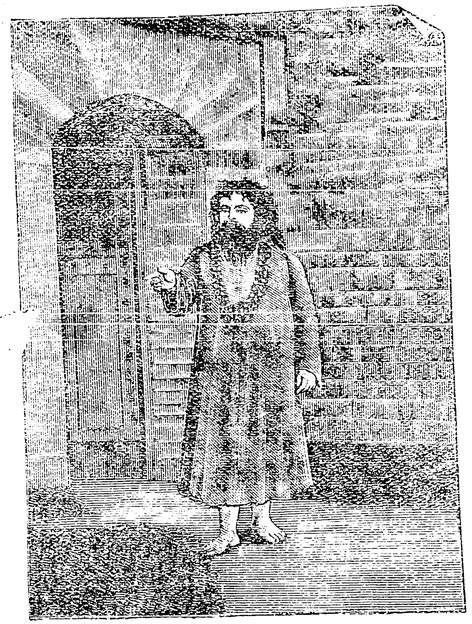

সেই দৃঢ়চিত্ত অসীমশক্তিসম্পন্ন ভারতের পূর্ব্বে তো.. তখন বালকের ন্যায় শয্যার উপর · কোনও সাধই লাগিলেন। ..ধ যায়, কিন্তু

বলা বাহুল্য, সেই পুরুষ আর কেহই নহেন, স্বয়ং বাদসাহ সাজাহান। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সাজাহান নিজে সেলিনার পত্র পাঠ করেন নাই, জিন্নৎ বেগমের মুখে একটা বিকৃত সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন মাত্র। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন মাদকমোহ অপগত হইল, তখন তিনি স্বয়ং সেলিনার পত্র খানি পাঠ করিলেন।

মাহরুণ যখন বলিয়াছিল, সেলিনা নির্দ্দোষী, তখন সাজাহান তাহা বিশ্বাস করেন নাই। সেলিনাও যখন পত্রে লিখিল সে নির্দ্দোষী, তখন প্রথম বাদসাহের একটা সংশয় উপস্থিত হইল। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মাহরুণের কারাকক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

মাহরুণকে কৌশলে প্রশ্ন করিয়া এখন তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি মনে মনে মাহরুণের প্রাণদণ্ডবিধান রহিত করিলেন। তখনি কারারক্ষককে ডাকিয়া হুকুম দিলেন—বন্দীকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য দিয়া আইস, যেন কোনও রূপে তাহার কষ্ট না হয়। সাজাহানের শোণিতপিপাসা ইতিহাসে মসীবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার উচ্চাভিলাষের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগেরই রক্তপানে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই, ...স্মৃচক শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিতে তাঁহার কখনও ছিল না।

ছদ্মবেশ ত্যাগ না করিয়াই সাজা... রাশিকৃত ফুল। সমাধিগর্ভের পুরে প্রবেশ করিলেন। সেলিনাকে সাজা...ছে। বাসিতেন। অনর্থক তাহাকে কষ্ট দিয়াছেন ভাবিয়া ...লাপজলে বড় ব্যথা পাইলেন। সেলিনাকে সান্ত্বনা করিয়া, আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া আঘাত-বেদনা বিস্মৃত করাইবেন। সপ্তাহ কাল সেলিনার মহলে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ উৎসবে মাতিবেন। সেলিনার মনস্তুষ্টির জন্য—তাহার প্রতি আর যে কোনও সন্দেহ নাই, প্রমাণ করিবার জন্য, মাহরুণকে কারামুক্ত করিবেন। যদি সেলিনা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার আজ এ সন্ন্যাসী বেশ কেন? তিনি বলিবেন, সখি, বাদসাহ হইয়াও তোমার প্রেমের জন্য ফকীর হইয়াছি। এই সকল নানা কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে, হিন্দুস্থানের সম্রাট অপরাধীটির মত সেলিনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সেই তমসাবৃত কারাকক্ষে মাহরুণ বসিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে। ঊর্দ্ধে ছিদ্রপথের আলোকরশ্মি অতি ক্ষীণ—বাহিরে যে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তাহারই সংবাদ।

আবার নিষ্ঠুর অন্ধকার মাহরুণকে গ্রাস করিতে আসিতে লাগিল। কক্ষের কোণে তখনও খাদ্য দ্রব্যাদি দেখা যাইতেছে—তাহার অতি অল্পমাত্রই মাহরুণ স্পর্শ করিয়াছিল। এই গুলি যোগাইতে একজন প্রহরী দুইবার তাহার কক্ষে দর্শন দিয়াছিল;—তাহার সহিত মাহরুণ কথামাত্র কহে নাই।

নীরবে চিন্তা করিয়া মাহরুণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—"খোদা! আর কত দিন এ যন্ত্রণা সহ্য করিব! সাপের মাথার মণি ত পাইলাম না, দংশনের বিষেই জ্বলিয়া মরিলাম। আমার অদৃষ্টে ত এই হইল, কিন্তু জানি না সেই নির্দ্দোষী সেলিনাকে ভাগ্য কোন পথে লইয়া গিয়াছে। সেলিনা! সেলিনা! আমার

...ন, তুমি কি আর ...রণীর তীক্ষ্ণ অসিতে বিদ্ধ ...য়াছে। হায় হায় সেলিনা, আমিই ...কারণ হইলাম।"

...কথা গুলি মাহরুণ পাগলের মত চীৎকার করিয়া ...লিল।

সহসা লোহ কবাটের বাহিরে শব্দ হইল। মাহরুণ বুঝিল, আহার সামগ্রী লইয়া প্রহরী আসিয়াছে। প্রহরী প্রবেশ করিয়া লণ্ঠন রাখিল। আহার্য্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিল।

লণ্ঠনের তীব্র আলোক মাহরুণের চক্ষে সহিল না; সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রহরী বলিল—"মাহরুণ, কেমন আছ?" এ প্রশ্ন বিদ্রূপবাণের মত মাহরুণের হৃদয়ে আঘাত করিল। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"একটা সামান্য কীটকে পদদলিত করিয়া লোকে তখনি আহা করিয়া উঠে, আর তোমরা একটা মানুষকে এত যাতনা দিতেছ? তোমাদের হৃদয়ে কি দয়া মায়া কিছুই নাই?"

প্রহরী বলিল—"মাহরুণ, দয়া করিবার ক্ষমতা আমাদের কই? আমরা হুকুমের চাকর। তোমায় অনাহারে রাখিবার আদেশ আছে, আমিই কেবল দয়া করিয়া তোমায় খাবার দিয়া যাই।"

মাহরুণ তীব্র হাসি হাসিয়া বলিল—"তোমাদের জল রুটি ফিরিয়া লইয়া যাও। যাহা দিয়াছ, তাহা প্রায় সমস্তই মজুত রহিয়াছে।"

"কেন, তুমি কি কিছুই খাও নাই?"

"খাইবার প্রয়োজন নাই। জীবনে যাহার সাধ থাকে সে খাদ্যগ্রহণ করে। আমার মরিতে সাধ। একটু বিষ দিয়া উপকার কর না কেন?"

প্রহরী তখন চলিয়া যাইবে বলিয়া লৌহদ্বার খুলিয়াছিল। দুইটি কবাটের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া, মাহরুণের প্রতি চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাই বিষ খাইবে কেন? বাদসাহের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া কত মজা লুটিয়াছ, কত—

প্রহরীকে আর বলিতে হইল না। মাহরুণ ক্ষিপ্ত-হস্তীর মত উঠিয়া সমস্ত দেহভারে অর্দ্ধোন্মুক্ত কবাটে আঘাত করিল। দুই কবাটের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া প্রহরী ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইল। মাহরুণ টানিয়া কবাট খুলিবা মাত্র হতভাগ্যের মৃতকল্প দেহ কারাকক্ষে লুণ্ঠিত হইল।

মাহরুণ তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। শীঘ্রহস্তে প্রহরীর পায়জামা আংরাখা প্রভৃতি খুলিয়া লইয়া নিজে পরিধান করিল। চাপরাশ, কোমরবন্ধ সমেত হাতিয়ার, খুলিয়া লইল। চাপরাশে প্রহরীর নাম লেখা ছিল, সেটা আলো ধরিয়া পড়িয়া লইল। তাহার পর লণ্ঠনটি উঠাইয়া কারাগারের বাহিরে আসিল। কারাদ্বার বন্ধ করিতে ভুলিল না।

তিনটি ফাটক পার হইয়া মাহরুণ এক গহ্বরমুখে উপস্থিত হইল। প্রহরী এই তিনটি ফাটক খুলিয়া রাখিয়াছিল, মাহরুণ একে একে সে গুলি বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর প্রস্তরময় সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল। বাহিরের মুক্তবাতাসে উপস্থিত হইয়া মাহরুণ বলিয়া উঠিল,—"আঃ—এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।"

সম্মুখেই প্রাঙ্গণ। মাহরুণ নিঃশব্দে প্রাঙ্গণ পার হইল। উপর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল "কে যায়?"

"প্রহরী মহম্মদ হোসেন।"

আর কেহ কোনও কথা কহিল না। অদূরেই সেলিনার পুরী। গবাক্ষে গবাক্ষে যত আলো জলিত, তাহার এক চতুর্থাংশও জলিতেছে না। মাহরুণ ধীরে ধীরে পুরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। মনে ভাবিল—"সেলিনা, তুমি কি জীবিত আছ? আর একবার তোমায় দেখিব। জন্মের শোধ দেখিয়া চলিয়া যাইব। আর তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না।"

দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়াই মাহরুণ যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে চমকিত হইল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বক্ষের শোণিত প্রবাহ দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে দেখিল, মশাল লইয়া অনুমান শতাধিক লোক বহিস্তোরণ অভিমুখে আসিতেছে। অগ্রপশ্চাৎ সৈনিকবৃন্দে পরিপূর্ণ—মধ্যে শববাহীরা শবাধারে কাহার মৃত দেহ লইয়া আসিতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ—মুখে কথাটি মাত্র নাই। অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তী সৈনিকগণের হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। মশালবাহীরা পাশে পাশে চলিয়াছে। সেই মশালের আলোক সৈনিকদিগের অস্ত্রফলকে, শবাধারের বহুমূল্য মণিখচিত আবরণবস্ত্রের উপর পড়িয়া জলিতেছে।

...াহরুণ বুঝিল, সেলিনা আর ইহলোকে নাই। বুঝিল অভিমানিনী দর্পিতা পতিপ্রেমনিরতা সেলিনা আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্কের হাত এড়াইয়াছে। কিন্তু কে সেলিনার এই মৃত্যুর কারণ! মাহরুণের হৃদয় ক্রমশঃ বিকল হইয়া পড়িতে লাগিল। দুই দিন কাল প্রায় অনাহার, তাহার পর এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরা তাহাকে যেন একটা জড়-...ৎবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। সে মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেই শববাহী দলের পশ্চাতে ছুটিয়া ধীরে ধীরে দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

শববাহীরা কতক পথ আসিয়া উপত্যকা-প্রবাহিনী গিরিনদীর তীরভূমিতে উপস্থিত হইল। গভীর নিশীথে সেই স্থান বড়ই গম্ভীর দেখাইতেছিল। চতুর্দ্দিক হইতে বন্য পুষ্পের সুগন্ধ আসিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ তরুরাজির মাথায়, কোলে, শাখায়, পল্লবে, মাণিক্য-বিন্দুর মত জোনাকি জলিতেছে। পার্ব্বত্য শীতল বায়ু উপত্যকার প্রত্যেক লতাবল্লরীর সুগন্ধী কুসুমগুলিকে নীরবে চুম্বন করিয়া চকিত কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

কৃষ্ণপক্ষ। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। আকাশে অল্প অল্প মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্র নাই, দীপ্তি নাই, কেবল অন্ধকার। অন্ধকার মৃত্যুর প্রাবরণ। তাই আজ অন্ধকারের এত বাড়াবাড়ি—এত ঘনীভূত ভাব।

মশালধারীরা পর্ব্বতের উপত্যকার একান্ত ভাগে দাঁড়াইল। অস্ত্রধারীরা তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল। শবাধার নামাইয়া, তাহার চারিদিকে প্রচুর স্থান রাখা হইল। সকলেই যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। তখন মোতিমহলের তোরণের নিকট সহসা মশালের আলোক দেখা গেল। সকলেই বুঝিল, সময় হইয়াছে। প্রহরীরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। চারি জন মৌলবী সমভিব্যাহারে স্বয়ং দিল্লী-শ্বর আসিয়া সেই উপত্যকায় দাঁড়াইলেন। সৈনিকেরা অস্ত্রমুখ অবনত করিয়া সম্মাননা করিল।

সমাধির সমস্ত আয়োজনই পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। মৌলানাগণ নিশাকাশ ধ্বনিত করিয়া সুগম্ভীর স্বরে কোরাণ হইতে শান্তিসূচক শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শবাধারের উপর রাশিকৃত ফুল। সমাধিগর্ভের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ফুলের মালা বিছান হইয়াছে।

সেলিনার মৃতদেহ বাহির করিয়া সুগন্ধী গোলাপজলে স্নান করান হইল। তৎপরে অগুরু চন্দন ও ... সুগন্ধিদ্রব্যে সেই সুন্দর দেহ চর্চ্চিত করা হইল। সে... শবাধার সেই সমাধিগর্ভে নামাইবার সময় বাদসাহ আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"সেলিনা, পরলোকে আবার তোমার সহিত মিলিব। তোমার উপর যে অত্যাচার করিলাম, এ জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্তে শেষ হইবে না।"

দুই চারিটি পবিত্র অশ্রুবিন্দু বাদসাহের চক্ষু হইতে কবরের উপর পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেলিনার মৃত্যুর পর দশ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বাদসাহ বড় একটা কাহারও সহিত মেশেন না। মন সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত। এ কয়দিন তিনি সেলিনার মোতিমহলেই যাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে মনে মনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সপ্তাহকাল সেলিনার মহলে উপস্থিত থাকিবেন তাহা ধর্ম্মবিধানের মত করিয়া পালন করিলেন,—কিন্তু আনন্দ উৎসবের স্থানে কাঁদিয়া সপ্তাহ কাটিল।

জিন্নৎ মহলের নাম করিলে সাজাহান ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন। বাদসাহের বিষনয়নে পড়িয়া, বিপদ গণিয়া জিন্নৎ বেগম কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া চুপে চুপে দিল্লীযাত্রা করিয়াছেন।

সাজাহান সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবেন—"আমিই সেলিনার মৃত্যুর কারণ। মিথ্যা সন্দেহে সেলিনাকে আমিই নষ্ট করিলাম।"

মাহরুণের অবরোধের কথা বাদসাহ এতদিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সমাধির আয়োজনে, সেলিনার শোকে, তাঁহার এ সম্বন্ধে সংবাদ লওয়ার অবসরও ছিল না। যে দিন সংবাদ লইলেন, সে দিন শুনিলেন, বন্দী কারাকক্ষে স্বেচ্ছাকৃত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মাহরুণ যে প্রহরীকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছিল, তাহা তৎপরদিবসই ধরা পড়ে। কারাগার হইতে বন্দী পলাইয়াছে, এ সংবাদ বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে কাহারও

প্রাণ থাকিবে না, কাজেই কারাধ্যক্ষপ্রমুখ প্রহরীরা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রচার করিল "বন্দী অনাহারে আত্মহত্যা করিয়াছে"।

আজ বাদসাহের ইচ্ছা হইল একবার সেলিনার কবর দেখিতে যাইবেন। কবরের উপর শুইয়া মর্ম্মজ্বালার শান্তি করিবেন। কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। একাকী বাহির হইয়া উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গভীর নিশীথে সেই জনহীন উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহজাহানের বীরহৃদয়ও কম্পিত হইল। কাল কাল গাছের পাতার মধ্যে লুকাইয়া যেন কে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "ঐ হত্যাকারী আসিতেছে।" তারকামণ্ডিত নভোদেশে বসিয়া যেন সেলিনা বলিতেছে—"এস, এই খানে উপরে এস। আমায় পাইবে। কবরে আমার যাহা ছিল, তাহা মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে।" নৈশ-সমীরণ হতাশস্বরে যেন কাণে কাণে বলিতেছে—"ছি অবিশ্বাসী!—এ প্রেম তোমার পূর্ব্বে কোথায় ছিল!"

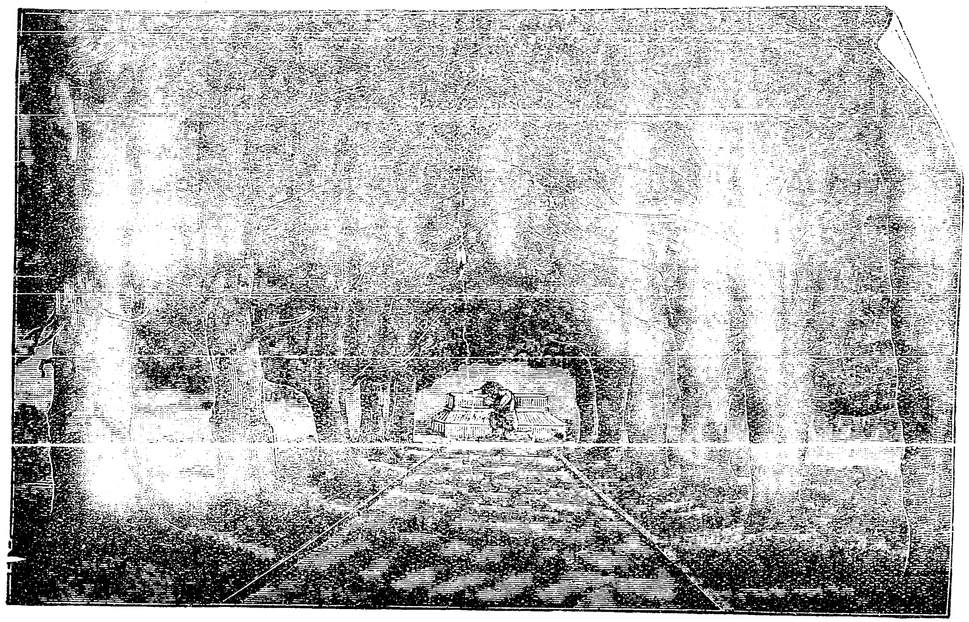

তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ। গাছের পাতায়, লতাগুল্মের দেহে, গিরিনদীর স্রোতে আর সেই অদূরবর্ত্তী শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত সেলিনার সমাধির উপর কৌমুদী পড়িয়াছে।

সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুর বংশীরব উত্থিত হইল। উপত্যকায়, গিরিকন্দরে কন্দরে, অল্পান্ধকার নদী-গর্ভে, সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসময়ীস্বরলহরীপূর্ণ বংশীধ্বনি দশ দিক সমাকুল করিয়া ফিরিতে লাগিল। বংশীর সেই সকরুণ বিলাপসঙ্গীত বাদসাহের প্রাণ উন্মাদ করিয়া ফেলিল। তিনি ভীতবিস্মিত পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে সমাধির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

একটা বৃক্ষ কিয়ৎক্ষণ সমাধিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বৃক্ষটা পার হইবা মাত্র বাদসাহ দেখিলেন, সমাধির উপর এক মনুষ্যমূর্ত্তি। হস্তে বংশী ধারণ করিয়া আছে। বাদসাহের শরীর কণ্টকিত হইল। ভাবিলেন—"এ গভীর নিশীথে এ সমাধির উপর কে বসিয়া?" তিনি সাহসে ভর করিয়া সমাধির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঝরণার জল বহিয়া একটি ক্ষুদ্র পয়োনালী হইয়াছিল, সেইটি পার হইবার জন্য যেমন সাহজাহান নিম্নে নামিলেন, অমনি কতকগুলি পাথর খসিয়া একটা শব্দ হইল! বাদসাহ তাহাতেই একটু অন্যমনস্ক ভাবে নিম্নে দৃষ্টি করিলেন। মুখ তুলিয়া দেখেন, সমাধির উপর যে বসিয়াছিল, সে নাই।

সাহজাহান সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সমাধির উভয় পার্শ্বে কাল শাদা অনেকগুলি উপলখণ্ড

পড়িয়া আছে। কাল পাথরের জমীতে শাদা পাথর বসাইয়া যেন অক্ষর রচনা করা হইয়াছে। বাদসাহ ঝুঁকিয়া চাঁদের আলোতে পাঠ করিলেন, ফারসী অক্ষরে উভয় পার্শ্বে লিখা রহিয়াছে—

"সেলিনা।"

"মাহরুণ।"

সমাধির উপর রাশিকৃত অনেক ফুল। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—শাদা ফুলের জমীর মধ্যে লাল ফুল দিয়া লিখা রহিয়াছে—

"সেলিনা।"

"মাহরুণ।"

দেখিয়া বাদসাহের বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল। তখন তিনি সেই জনমানবশূন্য উপত্যকায় দাঁড়াইয়া আকুল-কণ্ঠে চীৎকার করিলেন—"মাহরুণ! মাহরুণ! কোথায় তুমি—একবার দেখা দাও। তুমি এখন স্বর্গের জীব। আমার সেলিনার সংবাদ বলিয়া যাও।"

কেহই আসিল না।

বাদসাহ সেই গভীর নিশীথে, ধীরপদবিক্ষেপে প্রাসাদাভিমুখে ফিরিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ পথ আসিবার পর, সেই সমাধিস্থান হইতে আবার সুরময়ী স্বরলহরী উত্থিত হইল। কিন্তু এবার বাঁশী নহে। যেন কিন্নরকণ্ঠজাত সঙ্গীত।

বাদসাহ দাঁড়াইয়া শুনিলেন। গানের কথাগুলি স্পষ্ট বুঝা গেল।—

দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী।

পরিচিত গান। শতবার শুনিয়াছেন। কিন্তু কখনও এমন ভাববিহ্বল হন নাই।

মোতিমহলে ফিরিয়া সাহজাহান শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যেন তখনও গান শুনা যাইতে লাগিল। এইরূপ রাত্রির পর রাত্রি সেই নদীতীরস্থ সমাধিস্থান হইতে কখনও বংশীধ্বনি কখনও বা সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। অধিক দিন কাশ্মীরে থাকিতে পারিলেন না। দিল্লীতে ফিরিয়া, মমতাজ বেগমের রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

অনেক দিন অবধি উপত্যকাবাসীরা সভয়চিত্তে বেগমের সমাধিস্থান হইতে ঐরূপ গান ও বংশীধ্বনি শুনিতে পাইত, কিন্তু কেহ কখনও সাহস করিয়া তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করে নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য।

ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সন্ধিস্থলে সমুদ্রগর্ভে সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি বহুসংখ্যক দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা এই সকল দ্বীপে আর্য্যভাষা, আর্য্যধর্ম্ম, ও আর্য্যপ্রভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহার স্মৃতিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। মোসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্পেনরাজ্য হইতে ভারত-মহাসাগরের পূর্ব্বসীমাস্থিত এই সকল দ্বীপপুঞ্জে মোসলমানশক্তি প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি অধিকাংশ দ্বীপের লোকে আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিপ্লব সহসা সংঘটিত হয় নাই। দ্বীপবাসিগণ কিছুদিন ইহার গতিরোধের চেষ্টা করিয়া অবশেষে ক্রমে ক্রমে নবধর্ম্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। যাহারা পারিয়াছিল, তাহারা মোসলমান-সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্য নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বালি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ;—তথায় এখনও হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান।

সুদূর সমুদ্রপারের ক্ষুদ্র দ্বীপে এখনও যে হিন্দুরাজ্য বর্ত্তমান আছে, তাহার সবিশেষ পরিচয় লাভ করিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু স্বাভাবিক কৌতূহল যতই প্রবল হউক, তাহাকে, সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। হিন্দু এই হিন্দুদ্বীপের পুরাবৃত্ত সঙ্কলনের চেষ্টা করেন নাই;—ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ানগণ যাহা কিছু সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সম্বল। তাঁহারা যাহার অনুসন্ধান করেন নাই এমন কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার কেহ নাই। তাঁহারা যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহারই সারমর্ম্ম সঙ্কলিত হইল।

ইউরোপীয় নাবিকবর্গ ভুবনভ্রমণব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইয়া কত ক্লেশে কত সাহসে কত অধ্যবসায়ে সংকল্প সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিলেও বিস্মিত হইতে হয়! তাঁহারাই প্রথমে নানাদিগ্দেশের সমাচার স্বদেশে বহন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট সন্ধান লাভ করিয়া বণিগ্বর্গ অর্থলালসায় নবাবিষ্কৃত রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বহুবিড়ম্বনার পর কিরূপে সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহাও অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারক-গণ নানাস্থানে "পরিত্রাণের সুসমাচার" বিতরণ করিতে গিয়া কিরূপে উৎপীড়িত ও নিহত হইয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া কত লেখক যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি কেবল জ্ঞানান্বেষণের জন্যই কত পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৃথিবীর কত অজ্ঞাতখণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যম কিছুতেই অবসন্ন হইতেছেনা! ইঁহাদের সকল শ্রেণীর ভ্রমণকারীই ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং এক বিষয়ে একাধিক ভ্রমণকারীর সাক্ষ্য একরূপ হইলে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ হয় না। বালিদ্বীপ সম্বন্ধে এইরূপ সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আল্‌ফ্রেড্ রসেল্ ওয়ালেস্ নামক প্রাণিতত্ত্ববিৎ ভ্রমণকারীর গ্রন্থ * অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন, জুলাই মাসে বালি ও তন্নিকটস্থ লম্বক দ্বীপে ভ্রমণ করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তদ্বিবরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বালি এবং লম্বক দ্বীপ যাভা অর্থাৎ যব দ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এই দুইটি দ্বীপেই এখনও হিন্দুরাজ্য বর্ত্তমান। ওয়ালেস্ সাহেব সিঙ্গাপুর হইতে চীনা জাহাজে চড়িয়া বিংশতি দিবসে এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র দ্বীপের কৃষি-কৌশল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নিতান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—"আমার যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ বোধ হইল; কারণ আমি তাহার কয়েক বৎসর পরে যবদ্বীপ দেখিতে গিয়াছিলাম, সুতরাং তৎকালপর্য্যন্ত আমি ইউরোপের বাহিরে এমন সুন্দর ও কৃষিপ্রধান রাজ্য আর কোথায়ও দেখি নাই।" * নারিকেল ও তিন্তিড়ী বৃক্ষে সুশোভিত সমতলক্ষেত্রে কত গ্রাম, কত নগর; আবার ভূমিতল ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মধ্যস্থলে হরিদ্বৃক্ষ সুশোভিত পর্ব্বতমালা গঠন করিয়া সর্ব্বতোভাবে মনোহর দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছে! প্রাণিতত্ত্ববিৎ ওয়ালেস্ তথায় কত জীবরহস্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে দ্বীপবাসীদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কত তথ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলেও পুলকিত হইতে হয়!

বালি ও লম্বক দ্বীপের পার্শ্বস্থ সমুদ্র সর্ব্বদাই তরঙ্গসঙ্কুল, সামুদ্রিক স্রোত প্রবহমাণ থাকায় অর্ণবপোতের গতিবিধি নিতান্ত নিরাপদ নহে। দূরে পোত হইতে অবতরণ করিয়া দেশজ ক্ষুদ্র নৌকায় তীরে উপনীত হইতে হয়। তদ্দেশের লোকে গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকে যে, তাহাদের সমুদ্র যেন বুভুক্ষিতের ন্যায় বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও কবলিত করিতে পারিলে তাহার আর নিস্তার নাই! ইহাই প্রকৃতিদত্ত মহাবল; এই বলে বলীয়ান হইয়া বালি ও লম্বক দ্বীপ মোসলমানের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল!

এমন দুর্গম স্থানেও ইউরোপীয় বণিক্ বিপণি সংস্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে। রাজার অনুমতি লইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বন্দরে তাঁহাদের কুঠি গঠিত হইয়াছে। ওয়ালেস্ এই স্থানে আশ্রয়লাভ করিয়া ভ্রমণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

লম্বক দ্বীপের আদিম অধিবাসীর নাম "শশক"; তাহাদিগকে পদানত করিয়া বালিদ্বীপের হিন্দুগণ এখানে রাজ্যস্থাপন করেন। শশকেরা এখন মোসলমান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শাসকগণ হিন্দুই রহিয়াছেন। ইঁহারা আদিম অধিবাসিগণের উপর কোনরূপ দৌরাত্ম্য করেন না; রাজ্য যদিও রাজতন্ত্র তথাপি রাজশাসন জনসাধারণের অপ্রীতিকর নহে। তবে কোন কোন অপরাধের শাস্তি বড়ই কঠোর—চৌর্য্যাপরাধীর প্রাণদণ্ডের

* The Malay Archipelago: The land of the Orang—utan and the bird of Paradise, a narrative of travel, with Studies of man and nature.

* I was both astonished and delighted; for as my visit to Java was some years later, I had never beheld so beautiful and well-cultivated a district out of Europe.—The Malay Archipelago, P. 151.

ব্যবস্থা অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হইতেছে! পরদারামর্ষণে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। সতীত্বের সম্মান রক্ষার্থ অসতীমাত্রকেই বধ করা হয়। একবার একজন ইউরোপীয় বণিক্ একটি অসতীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; রাজদূত তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই অসতীর শিরশ্ছেদ করিয়া চলিয়া গেল, এবং বলিয়া গেল—সাহেবকে তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য রাজা এইরূপ পুরস্কার দিলেন।

বালি ও লম্বক দ্বীপের অধিবাসীর মধ্যে যাহারা হিন্দু তাহারা প্রায় সকলেই শৈব, দুই চারি জন মাত্র বৌদ্ধ। শৈবগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত, তাহার নাম তদ্দেশের ভাষায়—ব্রাহ্মণ, সত্রিয়, বিষিয়, শূদ্র; বলাবাহুল্য ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বিকৃত উচ্চারণ মাত্র। বালির লোকে চতুর্ব্বর্ণকে "চতুর্জন্ম" বলে। উচ্চজাতীয় ব্যক্তি নিম্নজাতীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কন্যাদান করিতে পারেন না। কদাচ এরূপ ঘটিলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিচিত হয়। ধর্ম্মানুমোদিত উদ্বাহ কিন্তু সবর্ণেই হইতে পারে; অসবর্ণ বিবাহে বাধা না থাকিলেও তাহা ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সমাজে স্বীকৃত হয় না। প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের বহির্ভাগে কুম্ভকার, বস্ত্র-রঞ্জক, চর্ম্মকার ও শৌণ্ডিকগণ বাস করে। ইহাদের সাধারণ নাম চণ্ডাল—তাহারা সকলেই অস্পৃশ্য!

বৈশ্য এবং শূদ্রেরাই দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ কোনরূপ মূর্ত্তিপূজা করেন না। * ব্রাহ্মণের প্রতাপ অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের ভক্তিও অকৃত্রিম। ক্ষত্রিয়গণ সেনাবিভাগে ও বিচারকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ শিখাধারণ করেন, কিন্তু দ্বিজাতিমাত্রে কেহই সূত্রধারণ করেন না। মন্ত্রোচ্চারণে ওঙ্কারের ব্যবহার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার উচ্চারণ "ওঙ্গ"। শিবারাধনায় তাঁহারা "ওঙ্গ শিব চতুর্ব্বজ" বলিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। উহা "ওঁ শিব চতুর্ভুজ" শব্দের বিকৃত উচ্চারণ মাত্র।

খাদ্যাখাদ্য বিচারে বালিদ্বীপে কোনরূপ কঠোরতা নাই। হিন্দুগণ গোমাংসও আহার করিয়া থাকেন, গৃহপালিত কুক্কুটের ত কথাই নাই! * বরাহমাংসই উপাদেয় খাদ্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাহারী; যাঁহারা গোঁড়া, তাঁহারা আবার ফল মূল ভিন্ন আর কিছুই ভোজন করেন না।

বালিদ্বীপে ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় শারীরিক দণ্ড বহন করিতে হয় না, গোময় গোমূত্রও গলাধঃকরণ করিতে হয় না;—প্রিয়তম খাদ্যদ্রব্য ত্যাগ, গিরিগুহায় অজ্ঞাতবাস বা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। সতীদাহ প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার নাম "সত্য"। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যেই এই প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত। একজন বহুদারগ্রহণে অধিকারী বলিয়া কখনও কখনও একের অভাবে বহুসংখ্যক বিধবা চিতাপ্রবেশ করিয়া থাকে। মৃতের সংকার-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। মৃত্যুর সপ্তাহ অন্তে এক মাসের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে; এপর্য্যন্ত তৈলাদি সংযোগে দেহ রক্ষা করা হয়!

রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও রাজ্ঞীকুলের সহমরণ প্রথা কিছু স্বতন্ত্র ব্যাপার। পর্ত্তুগীজগণ প্রথমে ইহা লিপিবদ্ধ করেন, তৎপরে ক্যাভেণ্ডিস্ নামক বিখ্যাত নাবিক ইহা শ্রুত হইয়াছিলেন, পরকাসের পুস্তকেও এতদ্বিবরণ লিখিত আছে। তিনি বলেন :—রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে চিতাভস্ম রক্ষিত হয়। তাহার পাঁচ দিবসের মধ্যে রাজ্ঞীগণ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমবেত হইলে পাটরাণী একটি গোলক নিক্ষেপ করেন; উহা যেখানে পতিত হয়, রাজ্ঞীগণ তথায় সমবেত হইয়া বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সকলেই জীবন বিসর্জ্জন করেন। †

বিদেশী ভাষায়
তারিখটা থাকে
হয় ত রামের বি

* [Br]ahmans declared to me that they wor-[ship no ido]l whatever, not even those of the Hindu [r]eligion of Bali, p. 238.

* The strange and wanton prejudices on the subject of food are paid little regard to by the body of the people, who eat beef without scruple, and among whom the domestic fowl and hog afford the most favourite articles of food.—Ibid, p. 240.

† The custome of the countrey is, that whensoeuer the king doth die, they take the body so dead, and burne it, and preserue the ashes of him, and within fiue days next after, the wiues of the said king according to the custome euery one of them goe to

বণিক
জী তাতার নাম বিশেষভাবে

বালিদ্বীপে অদ্যাপি শালিবাহনের শকাব্দা ব্যবহৃত হইতেছে; তাহারা উহাকে "শকবর্ষচন্দ্র" বলিয়া নামকরণ করিয়াছে। শৈবদিগের নিকট অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধান গ্রন্থের নাম তদ্দেশে এইরূপ:—আগম, আদিগম, সারসমুশ্চয়াগম, দেবাগম, মৈশ্বরলত্ব, শ্লোকান্তরাগম ও গম্যাগমন ইত্যাদি। অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—ভারতবর্ষে তাহা পাওয়া যায় কি না তদ্বিষয়ে তাহারা ভ্রমণকারিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে।

বালিদ্বীপের হিন্দুগণ প্রথমে যবদ্বীপে বাস করিতেন। তথা হইতে মোসলমানভয়ে বহুবাহু নামক রাজার সহিত তাঁহারা বালিদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কবে কি সূত্রে যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, সে কথা ক্রমে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবে শুনিতে পাওয়া যায়, কলিঙ্গদেশের শৈবগণই যবদ্বীপে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত করেন।

ভাষা, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সমস্তই দেশভেদে বিভিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু বিভিন্ন হইলেও তন্মধ্যে অনেক পুরাবৃত্ত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। বালিদ্বীপের ভাষা, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের মধ্যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপের ভাষার সহিত সংস্কৃতের সংস্রব কত ঘনিষ্ঠ ও তদ্দ্বারা তাহাদের সাহিত্য কতদূর সমুন্নত হইয়াছে, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব।

ভারতমহাসাগরের এই দুইটি হিন্দুদ্বীপের প্রকৃত পুরাবৃত্ত এখনও তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে; অথচ তাহার সহিত আমাদের ইতিহাসের নিকটসম্পর্ক দেদীপ্যমান! কবে কি সূত্রে এই সকল দ্বীপপুঞ্জে আর্য্যগণ উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কি বিদেশে কি বালিদ্বীপে, কুত্রাপি তাহার লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহা হইতেও নিঃসন্দেহে কোন কথা বলিতে পারা অসম্ভব।

শৈবদিগের দ্বারা উপনিবেশ সংস্থাপন করা সত্য হইলে তাহা বৌদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহনের শকাব্দা প্রচলিত দেখিয়া তাহাকেও বৌদ্ধাবির্ভাবের পরকালবর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই সকল দ্বীপে যে অতি পুরাকাল হইতে আর্য্যাভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহারও পরিচয়ের অভাব নাই। মৃত্যুর পর এক মাস পর্য্যন্ত শব রক্ষা করা অতি পুরাতন পদ্ধতি; তাহা বৌদ্ধাবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যাইত।

এই সকল কারণে ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের ন্যায় দুই চারিটি কথার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষের ভাষা দ্বীপান্তরিত হইয়া অসভ্য ভাষার সহিত আদান প্রদান বশতঃ যেমন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের আচার ব্যবহারও যে সেইরূপ পরিবর্ত্তনের অধীন হয় নাই তাহা স্বীকার করা যায় না। স্থান কাল ও পাত্রভেদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কত বিভিন্ন আচার ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। কোথায়ও খাদ্যাখাদ্যই হিন্দুয়ানীর তুলাদণ্ড হইয়াছে, নৈতিক সদাচারের প্রতি তেমন লক্ষ্য নাই;—সর্ব্বজনপরিচিতা ব্যভিচারিণী বিধবা হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া দিলে সমাজে তাহা গৌরবের সহিত চলিয়া যাইতেছে। কোথায়ও বা সদাচারের প্রতি অতিরিক্ত লক্ষ্য থাকায় খাদ্যাখাদ্যের প্রতি তেমন দৃষ্টি পড়িতেছে না; নাপিতের হস্তে ব্রাহ্মণেও পক্বান্ন আহার করিতেছেন! আজ যে প্রদেশে যে সকল আচার ব্যবহার দেখিতেছি, তাহাই যে তৎপ্রদেশের সনাতন পদ্ধতি তাহাও বলিবার উপায় নাই। কালক্রমে সমস্তই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং বালিদ্বীপের আচার ব্যবহারও এইরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে for as

এই পরিবর্ত্তনসাধনকালে তদ্দেশের অ ad never strict out জাতিও যে কিয়ৎপরিমাণে সহায়তা করে বলিতে পারা যায় না। ভাষাগঠনে তাহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে; মানবচরিত্র ও আচার গঠনেও সহায়তা করা অসম্ভব নহে। ভাষা ও সাহিত্যনিহিত প্রমাণ ভিন্ন এ বিষয়ের অন্য কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

and the chiefe of the women which was nearest vnto him in accompt, hath a ball in her hand, and throweth it from her, and to the place where the ball resteth, thither they g‹ e all, and turn their faces to the eastward, and euery one, with a dagger in their hand, (which dagger they call a *crise*, and is as sharp as a razor,) stab themselves to the heart, and with their hands all to bebathe themselves in their owne blood and falling grouelling on their faces, so ende their d... This thing is as true, as it seenceth to any

Orang—utan and the bird of Pa has's Pilgrims, Vol I. B. travel, with Studies of man and n

ভাভার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় অধীনতার কথা উঠিলে আমরা সচরাচর শাসনবিষয়িণী অধীনতার কথাই ভাবিয়া থাকি; যেমন আমাদের অধীনতার কথা উঠিলে আমরা ভাবি, আমরা ইংরেজ কর্ত্তৃক বিজিত, ইংরেজ আমাদের রাজা। কিন্তু আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া থাকি যে আমরা অন্য প্রকারেও পরাধীন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা সকলেরই মনে পড়িবে। রাম ইস্কুলে যাইবে। তাহার কাপড় চাদর সম্ভবত বিদেশ হইতে আসিয়াছে। কামিজ ও কোটের কাপড়ও তাই; হয় ত সেগুলি বিদেশ হইতে আনীত কলে সেলাই হইয়াছে। দেশী দরজির হাতের সেলাই হইলেও ছুঁচ সূতা বিদেশজাত। বোতামও বিদেশ হইতে আনীত। রামের বাবা যদি পয়সাওয়ালা লোক হন, তবে তার জুতা বা বুট বিলাতী; দেশী মুচির প্রস্তুত হইলেও জুতার ফিত, রিং, সূতা, রবরের স্প্রিং প্রভৃতি বিদেশে প্রস্তুত। ছাতাটি বিদেশী। মোজাও বিদেশী। দোয়াত, কলম, কালী ও কাগজ অনেক স্থলেই বিদেশজাত। ছেলের স্লেট, পেন্সিল, লেড্ পেন্সিল বিলাতী। অনেক পুস্তকও বিদেশী। রাম খেলেন বিদেশী ক্রিকেট ও ফুট্বল খেলা। হাত পা ভাঙ্গিলে বিদেশজাত ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করেন। রাত্রে বিদেশী দিয়াশেলাইয়ে বিদেশী কেরোসিন তৈলের বিদেশী ল্যাম্প জালিয়া পাঠ করেন। রাত্রি জাগিয়া পড়িতে পড়িতে অসুখ করিলে বিদেশী সাগু, বার্লী প্রভৃতি তাঁহার পথ্য। কলিকাতায় কলেজে পড়িতে গিয়া বাবাকে পত্র লেখেন বিদেশী ভাষায় 'আমার প্রিয় বাবা' বলিয়া; চিঠির উপরে তারিখটা থাকে ইংরাজী। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই হয় ত রামের বিবাহ হইয়াছে। তিনি প্রিয়াকে সম্ভবত বিলাতী সুন্দর কাগজে পত্র লেখেন। পত্র লিখিতে লিখিতে একখানার বেশী চিঠির কাগজ লিখিয়া বসিলে বিদেশী আলপিনে কাগজগুলি আঁটিয়া দেন। পূজার বন্ধের সময় প্রিয়ার জন্য রাম বিলাতী সাবান চিরুণী ইত্যাদি উপহার লইয়া যান। এইখানেই পালা সায় হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু তা যে হয় না। অনেক পরিবারে আজকাল শিশুকে "বেবী" বলিয়া আদর না করিলে ভাল লাগে না; "বেবী"র কাছে তার বাপ মা আর চুমো চান না; একটা কিস্ অথবা বেবীর ভাষায় "কিচ্" চান। ইহাকেই বলে দাসত্ব।

আর এক দিক্ দিয়া দেখি। আমাদের প্রধান প্রধান শিক্ষক বিদেশী; জ্ঞান বিদেশ হইতে আনীত; যদি আমরা কিছু চিন্তা করি তাহা বিদেশী রকমে; বিদেশী ভাষার সাহায্য ভিন্ন দুটা বাক্য বলিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাচীন কালে বিদ্যার কোন কোন শাখার সূত্রপাত এবং কোনকোনটির কিয়ৎ পরিমাণে উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন, সেই গর্ব্বে আমরা বাঁচিনা। কিন্তু সেই পুরাকালের খবরটা আমরা বিদেশীর মুখে শুনিয়াছি। আমাদের ঋগ্বেদ বিদেশী পণ্ডিতে প্রথম মুদ্রিত করিয়াছেন। বিদেশবিদ্বেষ উদ্দীপন আমার উদ্দেশ্য নয়; বিদেশের সবই খারাপ, আমাদের সব ভাল ইহাও আমি বলি না; বিদেশের নিকট আমাদের অশেষ বিষয় জানিবার শিখিবার রহিয়াছে। আমার উদ্দেশ্য, আপনাদের স্বদেশপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতটুকু তাহাই ভাবিয়া দেখা। বিদেশজাত পরিচ্ছদে আমাদের নগ্নতা ঢাকিতেছে না; বিদেশী পুস্তক হইতে কণ্ঠস্থ বিদ্যায় মানসিক দারিদ্র্য দূর হইতেছে না। ডসনের জুতার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য চীৎকার আর ভাল লাগে না। জাতীয় উন্নতি লাভ করিতে হইলে জাতীয় জীবনের সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় আসিয়াছে। বলা বাহুল্য আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী নহি।

সুখের বিষয় এ বিষয়ে স্বদেশপ্রেমিকগণ একেবারে উদাসীন নহেন। একজনে সকল বিষয়ে না হউক, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই স্বদেশপ্রেমিকগণের মধ্যে বোম্বাইয়ের পার্সী বণিক শ্রীযুক্ত জামসেদ্জী নুসেরবান্জী তাতার নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। তাতার বয়স ৬২ বৎসর। বোম্বাই ও নাগপুরে তাঁহার দুটি কাপড়ের কারখানা আছে; তিনি আর দুটি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। রেসম উৎপাদন বিষয়ে উন্নতিসাধনের চেষ্টায় তিনি মন দিতেছেন। মিসরদেশীয় দীর্ঘআঁসযুক্ত কার্পাসের চাষ ভারতবর্ষে ভালরূপে হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষাও তিনি করিতেছেন। তিনি একটি জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা কল কারখানা চালাইবার চেষ্টায় আছেন। এই কর্ম্মিষ্ঠ বণিক নিজের কলে কাপড় বুনিয়া আমাদের নগ্নতা দূর করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি আমাদের মানসিক দারিদ্র্য দূর করিবার একটা উপায় স্থির করিয়াছেন। যাহাতে ভারতের রূঢ় দ্রব্যসহযোগে ভারতেই আমাদের প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, পরোক্ষভাবে তাহার ব্যবস্থা করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান। তদর্থে ৩০ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রস্তুত আছেন। অবশ্য এই ত্রিশলক্ষ টাকাতেই তাঁহার বিশাল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমেই গৃহাদি নির্ম্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পুস্তকাদি ক্রয় প্রভৃতিতে আন্দাজ তের লক্ষ দশ হাজার টাকা লাগিবে। অধ্যাপকগণের বেতন, ছাত্রদের বৃত্তি, নূতন নূতন যন্ত্র পুস্তকাদি ক্রয় প্রভৃতিতে বৎসরে আন্দাজ ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং এত ব্যয় কেন হইবে, এত টাকাই বা কে দিবে, তৎসমুদয় বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। এখানে তাতা মহাশয়ের আর একটি প্রশংসার কথা বলা উচিত। টাকা অনেকেই দেয়, কিন্তু প্রদত্ত টাকার সদ্ব্যবহার কিরূপে হইবে, তজ্জন্য চিন্তা করিতে, পরিশ্রম করিতে অল্প ধনীই রাজী হন। তাতা শ্রীযুক্ত পাদশাহ মহাশয়কে য়ুরোপের নানা দেশে পাঠাইয়া নিজের প্রস্তাবটি সুসাধ্য ও পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্বন্ধে কাহার কি বলিবার আছে, তাহা জানিবার জন্য এবং সাধারণের সহানুভূতি লাভের জন্য পাদশাহ ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার লিখিত সুদীর্ঘ পত্র সকল তাতা পাঠ করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও স্থান হইতে প্রাপ্ত সমালোচনার বিষয়ে চিন্তা করেন।

ভারতবর্ষে বি. এ. পরীক্ষার্থীরা গণিতাদি অনেক বিষয়ে যাহা শিক্ষা করেন, বিলাতের অনেক ইস্কুলে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার জর্ম্মানীর প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রবেশিকা পরীক্ষা বিলাতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বি. এ. পরীক্ষার সমান কঠিন। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আমরা নামে উচ্চ শিক্ষা পাইলেও বাস্তবিক কত কম শিক্ষা করি। শিক্ষার পরিমাণ সম্বন্ধে ত আমাদের অবস্থা এইরূপ। শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। আমরা পুস্তকে লিখিত অপরের চেষ্টা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান স্মৃতিশক্তির সাহায্যে মনের মধ্যে সঞ্চয় করি মাত্র। অনেক স্থলে তাহা নিজের করিতে পারি না, আত্মার নিজস্ব, মজ্জাগত, রক্তমাংসবৎ করিতে পারি না। তাহার পর জ্ঞান লাভের উপায় কি তদ্বিষয়ে আমরা কোনই উপদেশ পাই না। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অপরে স্ব স্ব মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, আমরা তাহাই মুখস্থ করি, কিন্তু আমরাও কেমন করিয়া নিজের চেষ্টায় নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহা কোথাও শিক্ষা করি না। ইহার কারণ দুটি :— (১) ভারতবর্ষপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষ; (২) শিক্ষিত শিক্ষকের অভাব। আমাদের শিক্ষকেরা বি. এ. এম্. এ. পাশ করেন, কিন্তু কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, তাহা শিক্ষা করেন না। সকল শিক্ষকই যে অকর্ম্মণ্য ইহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু অনেকেই কোন উৎকৃষ্ট প্রণালীমতে শিক্ষা দেন না। ধরুন, শিশুদের শিক্ষা। পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশেই আজকাল কিণ্ডর গার্টেন, স্লইড প্রভৃতি পদ্ধতিক্রমে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষক এ সকল প্রণালীর নামও জানেন না; হাতে কলমে এই সকল প্রণালী শিখিয়াছেন এমন শিক্ষক অধিক আছেন বলিয়া আমরা জানি না। যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে গবেষণা শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, যদি কোন যুবক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে তিনি অপরের লিখিত ইতিহাস মুখস্থ করেন মাত্র। পরস্পর

বিরোধী ইতিহাসলেখকগণের বিভিন্ন বৃত্তান্তের তুলনা কেমন করিয়া করিতে হয়, ঐতিহাসিক তথ্য কোন্ কোন্ উপায়ে, কোথা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, কাহার প্রামাণ্য অধিক, ইতিহাস কেমন করিয়া লিখিতে হয়, ইহার উদ্দেশ্যই বা কি, শিলালিপি, তাম্রশাসনাদির পাঠোদ্ধার, তাহাদের কাল নির্ণয় প্রভৃতি কিরূপে করিতে হয়, এ সকল বিষয়ে আমাদের ছাত্রেরা কোন শিক্ষা পান না। ভাষাবিজ্ঞান শিখিতে গিয়া আমরা গ্রিমের নিয়ম শিখি, পাশ্চাত্য ভাষাসমূহে তাহা কিরূপে খাটে, তাহা শিখি, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের পরস্পর সম্পর্কাদি নির্ণয় করিতে আমরা শিখি না। সকল বিদ্যাতেই আমাদের শিক্ষা এইরূপ অসম্পূর্ণ।

আমাদের শিক্ষার আর একটি মহৎ দোষ এই যে ইহা কেবল লেখা পড়া লইয়াই ব্যস্ত। কোন বালককে ইস্কুলে পাঠাইতে হইলে সমস্ত বালকটাকে ইস্কুলে দেওয়া উচিত। আমরা অনেক সময়ে তাহার স্মৃতিশক্তিটাকেই ইস্কুলে পাঠাই। হাত, পা, চোক, কাণ, পর্য্যবেক্ষণ ও উদ্ভাবন শক্তি, অবিকশিত ও অশিক্ষিতই থাকিয়া যায়। যত বিদ্যা যেন পুঁথি হইতেই পাওয়া যায়! শিল্প শিক্ষা আমরা পাই না বলিলেই হয়। ভারতের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব নানা পদার্থ হইতে মানুষের ব্যবহার্য্য বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ধনশালী হন। উদ্যম, অর্থ ও শিক্ষার অভাবে আমরা যে গরীব সেই গরীবই থাকিয়া যাই।

এক্ষণে আমরা তাতার প্রস্তাব কি তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিব। কিরূপে আমাদের শিক্ষার কোন কোন অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে স্বাধীন করিবে, তাহাও ঐ বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় তিন বিভাগে বিভক্ত —বিজ্ঞান ও শিল্প, চিকিৎসা, এবং দর্শন ও শিক্ষা। বিজ্ঞান ও শিল্পের নিম্নলিখিত শাখায় শিক্ষা দেওয়া হইবে ও গবেষণা করা হইবে। ১। পদার্থবিদ্যা। পদার্থবিদ্যাসংশ্লিষ্ট গণিত এবং বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং ইহার অন্তর্[illegible]। ২। রসায়ন। ইহা চারি প্রশাখায় বিভক্ত। (ক) উচ্চ অজৈব রসায়ন। (খ) জৈব রসায়ন (গ) রাসায়নিক বিশ্লেষণ। (ঘ) কৃষি বিষয়ক রসায়ন। ৩। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিল্পসংসৃষ্ট রসায়ন। এই সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ অধ্যাপক রাখিতে হইবে। ১। একজন অধ্যাপক ও একজন সহকারী অধ্যাপক। ২। (খ) ও (গ) এর জন্য দুইজন বিশেষ অভিজ্ঞ অধ্যাপক, পদার্থ ? এবং (ক, গার তুলনা করা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ২ জ নড়া নেড়ীর দল”— একজন অধ্যাপক। পদার্থবিদ্যার জ বরাগীদিগের মস্তক পরীক্ষাগার, রসায়নের জন্য একটি পরীক্ষ জল খেয়ে লা ষ্ট নানা দ্রব্যের একটি চিত্রশালা muse য়া’। আর একটি পুস্তকালয়ের প্রয়োজন হইবে

এই বিভাগের দ্বারা আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি বিভাগের জন্য উপযুক্ত লোকও এ বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবে এই বিভাগদ্বারা বিজ্ঞানের দুইটি শাখায় আমরা সুশিক্ষিত হইবার সুযোগ পাইব। ভারতবর্ষে যে সকল উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা বিদেশে গিয়া আমাদের ব্যবহার্য্য নানা সামগ্রীতে পরিণত হয়। আমরা শিল্পে সুশিক্ষিত হইলে নিজেই সে সকল প্রস্তুত করিতে পারিব। কৃষিপদ্ধতির উৎকর্ষ সাধিত হইলে ভারতবর্ষজাত শস্য ত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবেই; অধিকন্তু আমরা বিদেশী অনেক খাদ্য সামগ্রী স্বদেশে জন্মাইতে পারিব। তদ্ভিন্ন কার্পাসের ও ইক্ষুর উন্নতি করিতে পারিলে ভারতবর্ষের দুইটি পুরাতন ব্যবসায় উচ্ছেদ পাইবে না, পরন্তু উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

চিকিৎসা বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা হইবে। ১। অণুজীববিদ্যা। ২। স্বাস্থ্যতত্ত্ব। ৩। শারীরস্থান ও নিদানবিষয়ক রসায়ন। ভারতবর্ষের নানাবিধ রোগের উৎপত্তির কারণ, ভারতবর্ষে বসিয়া যেরূপ নির্ণীত হইতে পারে, বিদেশ হইতে তেমন হইতে পারে না। বিদেশের স্বাস্থ্যবিদ্যারও সমুদয়টা ভারতবর্ষে খাটে না। এখানকার শীতাতপ, জলবায়ু, ভূমির প্রকৃতি, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করিলে তবে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ও রোগতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। এই বিভাগের জন্য নিম্নলিখিতরূপ

অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। ১। একজন অধ্যাপক ও একজন সহকারী। ২। একজন অধ্যাপক ও একজন সহকারী। ৩। একজন অধ্যাপক ও দুজন সহকারী। এই বিভাগের জন্যও পরীক্ষাগার, চিত্রশালা এবং পুস্তকালয় থাকিবে।

দর্শন ও শিক্ষা বিভাগে তি পারে কিনা দেওয়া হইবে। ১। শিক্ষাপ্রণা। তিনি একটি জল্তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব। ৩। ভারতবর্ষের পরিণত করিয়া । ৪। অর্থনীতিবিদ্যা ও statist. আছেন। এইা-বিজ্ঞান। এই বিভাগের জন্য ৫ জন অধ্যা দর নগ্নতাক্ত হইবেন। এই বিভাগের জন্য একটি পুস্তকালয় মাদেরে। শিক্ষা-প্রণালী শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। আজকাল ধর্ম্মনীতিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব শিক্ষাতত্ত্বের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন উহাদের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ত আছেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন যে আমাদের পক্ষে কিরূপ আবশ্যক তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বিদেশীর লেখা ইতিহাস পড়িয়া আমরা আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস কখনই জানিতে পারিব না। অন্য দেশের অর্থনীতিও ভারতবর্ষে ঠিক্ খাটিতে পারে না। ভারতবর্ষের অবস্থা অনুসারে উহার অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা দু এক কথা বলিয়াছি।

তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের প্রাণে অনেক নূতন আশার উদ্রেক করিয়াছে। আজ আমরা জাতি-সমাজে পতিত। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের আমরা উপযুক্ত নহি; উপযুক্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি; এখনও নানা প্রকারে উপকৃত হইতে বাকী আছে। সুতরাং এই অধীনতার ফলস্বরূপ কোন কোন কারণে আমরা মধ্যে মধ্যে প্রাণে ব্যথা পাইলেও মোটের উপর ইহাতে আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা যে অন্যান্য নানা প্রকারে বিদেশীর অধীন, তাহা বড়ই শোচনীয়। সে দাসত্ব মোচনের চেষ্টায় রাজদ্রোহিতা নাই, মনুষ্যত্ব আছে। জ্ঞানরাজ্যে, শিল্পের বাজারে যদি আমরা কখনও বিদেশীর সমকক্ষতা করিতে পারি, তবে আমাদের পাতিত্য ঘুচিবে। এই পাতিত্য মোচনের আশা প্রাণে জাগাইয়া তাতা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন।

তাতার প্রস্তাব ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বিশেষের জন্য নহে, সমস্ত ভারতবাসীই তাঁহার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা উপকৃত হইবেন। সকল প্রদেশের ছাত্রই তথায় শিক্ষিত হইবেন। যখন গ্রীষ্মকালে স্কুল কলেজ সকল বন্ধ হয়, তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের জন্য বিশেষ শ্রেণী খুলিবার কথা আছে। তাহা হইলে আমাদের মত শিক্ষাব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বড়ই সুবিধা হইবে। আমরা অনেক নূতন বিষয় শিখিবার সুযোগ পাইব, পুরাতন অধীত বিষয়েও পরিচা পড়িবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোন স্থানে স্থাপিত হইবে যেখানে গ্রীষ্মকালেও পাখা ব্যবহার করিতে হয় না। কারণ গবেষণার কাজ হাওয়া খাইতে খাইতে করা চলে না। অন্ততঃ তাহা ভাল করিয়া হয় না। ইহাতে কোনও প্রদেশের ছাত্রগণের অধিক অসুবিধা হইবার কথা নয়। কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অতি অল্প হইবে। ছাত্রগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তি পাইবে, প্রয়োজন হইলে ছাত্রদের রাহাখরচ যাহাতে অল্প হয়, তদ্রূপ বন্দোবস্ত করা হইবে। এসকল কথা আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত পাদশাহ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

চৈত্র, ১৩০৫।

ভাষা রহস্য।

অন্যান্য ভাষার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বঙ্গ ভাষায় এরূপ কতকগুলি শব্দ, প্রবচন, প্রবাদ সর্ব্বদাই আমরা ব্যবহৃত দেখি, যাহাদের উৎপত্তি কিম্বা প্রকৃত অর্থ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু আবাল্য আমরা তাহাদের সহিত পরিচিত বলিয়া ঐ সকল শব্দ, প্রবাদ বা প্রবচন আমাদের নিকট কিছু মাত্র রহস্যসঙ্কুল বা দুর্ব্বোধ্য বোধ হয় না। বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি বঙ্গভাষার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা সহসা এই সকল কথার হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এবং আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারি কি না তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহারো জানিবার সম্ভাবনা নাই। তখন এই ভাবিয়া আক্ষেপ জন্মে যে এই সকল সহজ কথার মূল কি তাহা আমরা জানি না, অথচ অবলীলাক্রমে আমরা তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি! অবশ্য এসকল বিষয়ে অভিধান সম্পূর্ণ নিরুত্তর, বঙ্গভাষার অভিধানের সম্পূর্ণতা সম্পাদিত হয় নাই, কত দিনে হইবে তাহাও বলা যায় না; সুতরাং নিজের অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ের সীমা রহে না। আমি নিম্নে কতিপয় অতিপরিচিত প্রবচন ও কথার উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের উৎপত্তির হেতু বা মূল সম্বন্ধে যদি "প্রদীপের" যোগ্যতর লেখকগণ আলোচনা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ অনুগৃহীত রহিব। কিন্তু ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার বোধ হয় এই বিষয়গুলি বঙ্গভাষার হিতৈষিগণের আলোচনার অযোগ্যও নহে; কারণ এরূপ আলোচনায় ভাষাতত্ত্ব-শিক্ষার্থিগণের উপকার আছে, এবং ভাষানিপুণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আলোচনায় কূটার্থবোধক গ্রাম্য শব্দাদির প্রকৃত অর্থ বাহির হইলে ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার সুবিস্তীর্ণ এবং সম্পূর্ণ অভিধান রচনা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন বিষয়গুলি যতই সামান্য হউক উপেক্ষণীয় নহে।

১। "মৃত্যু" অর্থ বুঝাইবার জন্য 'শিঙ্গা ফোঁক।' ও 'পটোল তোলা' এই দুইটি কথা ব্যবহৃত হয়। "শিঙ্গা" বা "পটোলের" সহিত মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ আছে কি না। "গোল্লায় যাও" বলিলে "যমের বাড়ী যাও" এইরূপ বুঝায়। যমের বাড়ীর সহিত উক্ত মুখরোচক বর্ত্তুলাকার দ্রব্যটির কি যোগ?

২। "ঘোল খাওয়ান" ও "ঘোল বলান" (আমারে 'ঘোল' বলাইয়াছে"—নীলদর্পণ ৪৩ পৃষ্ঠা) ইহাদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে কি না? কোন রকম অসুবিধায় ফেলাকে 'ঘোল খাওয়ান' বলে কেন? 'আতান্তরে পড়েছি'—এখানে 'আতান্তর' বিপদ বা দুরবস্থা বোধক। "আতান্তরের" উৎপত্তি কিরূপে হইল?

৩। ভয়ে 'আড়ষ্ট' হওয়াকে ভয়ে 'আকাট' হওয়া এবং অহঙ্কারের প্রশ্রয় দেওয়াকে 'আমড়া গেছে করা' বলে কেন?

৪। 'গদাই লস্কর চাল,' 'ভেরেণ্ডা ভাজা,' 'ভ্যাবা গঙ্গারাম,' 'গোবর গণেশ' 'হাঁদা রাম'—এই শব্দগুলির উৎপত্তির কারণ কি?

৫। "মাকড় মার্‌লে 'ধোকড়' হয়" ও "মেরে' পদ্মা" উড়িয়ে দেব"—এই কথা দুটিতে 'ধোকড়' এবং 'পদ্মা' এ দুটি কি পদার্থ? 'জলের মত সোজা'—যাহা সহজ জলের সহিত তাহার তুলনা করা হয় কেন?

৬। "নেড়া নেড়ীর দল"—ইতর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বলে কেন? বৈরাগীদিগের মস্তক মুণ্ডিত বলিয়া কি?

৭। 'আদাজল খেয়ে লাগা'র অর্থ 'কোন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হওয়া'। আদাজলের সহিত মনঃসংযোগের কি সম্বন্ধ?

৮। "বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর।" "আটমণ তেলও পুড়বেনা রাধাও নাচবেনা।" "ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।"—এই তিনটি প্রবচনের উৎপত্তির কারণ কি? 'বামুনের' সহিত 'লাঙ্গলের,' আটমণ তৈল 'পোড়ার সহিত রাধার নৃত্যের এবং ঘুঘুর সহিত ফাঁদের কি সম্বন্ধ? ফাঁদ বোধ হয় এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত নহে।

এইরূপ আরো অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রথম আলোচনায় এই গুলির উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বেতুল (২)।

গত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বেতুল একটী পার্ব্বত্য-প্রদেশ। দার্জ্জিলিং পাহাড়ের মত শীতল ও অতিবন্ধুর না হইলেও স্থানবৈচিত্রে ইহা অপর সমতল বিভাগ হইতে অনেক শীতল। এক্ষণে গ্রীষ্মাতিশয্যে সমতল বিভাগ সমূহে যেরূপ মানুষকে হা হুতাশ করিতে হইতেছে বেতুলে তাহা করিতে হয় না। স্থানের উচ্চতানিবন্ধন রৌদ্রোত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলেও ছায়াতলে বিশেষরূপ শীতলতা অনুভব করা যায়। বেতুল হইতে হোসঙ্গাবাদ ৬৬ মাইল মাত্র ব্যবধান হইলেও হোসঙ্গাবাদে যেরূপ উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহে শরীর দগ্ধ হইতে থাকে বেতুলে তাহা বিন্দুমাত্রও অনুভূত হয় না। অথচ এখানকার বায়ু বঙ্গদেশের বায়ুর ন্যায়

জলীয়বাষ্পাপ্লুত নহে। বায়ুর শুষ্কতানিবন্ধন এ স্থান স্বাস্থ্য বিষয়ে অতিশয় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

বেতুলের এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও ইহার একটী দোষ অপরিহার্য্য। বায়ুর শুষ্কতা এবং স্থানের উচ্চতাই ঐ দোষের প্রধান কারণ। তাহা এই যে গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে জলাভাব ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা সহরে থাকেন তাঁহারা এই অভাব আদৌ অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ অনুভব করা যায়।

বেতুল জিলা দুইটী পরগণার বিভক্ত; ইহার একের নাম বেতুল এবং অপরের নাম মুলতাই। এই জিলার পার্ব্বতীয় জঙ্গলাকীর্ণ বিভাগ লইয়াই বেতুল পরগণা গঠিত, এবং অপেক্ষাকৃত সমতল বিভাগে মুলতাই পরগণা অবস্থিত। বেতুল পরগণা হইতে মুলতাই পরগণাতে গ্রাম ও লোকসংখ্যা অনেক অধিক। বেতুল পরগণার প্রায় সর্ব্বত্রই গোঁড়জাতি বাস করে। ইহারা অসভ্যজাতি হইলেও সভ্যতার সহচর ছলকপটতা বিষয়ে ইহাদের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। অপর সকল জাতিরা গোঁড়দিগকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারাও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, এ কারণ অপর সকল জাতির সহিত একত্র বসবাস করিতে ভালবাসে না। গোঁড়জাতিকে কোন উপায়ে চাকুরী করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদ্যাশিক্ষা করিতেও তাহারা একান্ত নারাজ। কৃষি ও কাঠুরিয়া বৃত্তিই ইহাদিগের প্রধান জীবিকা। এতদ্ভিন্ন গোমেষমহিষাদি পালন ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই ইহাদিগের নিকট সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত। যে গ্রামে নানাজাতির বসতি আছে তথায় দেখা যায় যে গোঁড়গণ স্বতন্ত্র হইয়া গ্রামের বহির্ভাগে আপনাদিগের বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কোথাও দেখা যায় গ্রামের বাহিরে একটীমাত্র কুঁড়ে ঘরে অতিদীন একঘর গোঁড়ের বসতি রহিয়াছে। সমস্ত গ্রামে সে একক এক-জাতীয়, তথাপি সে অপর জাতীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এক পল্লীতে বাস করিবে না। ইহারা ঠগ প্রধান মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী হইলেও লোককে প্রতারণা করিতে অপটু। কাহারও খাঁটি দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতের প্রয়োজন হইলে অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ও শিক্ষিত সমাজে তাহা যত দুষ্প্রাপ্য হইবে গোঁড়ের গৃহে তাহা আদবেই দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

গোঁড়জাতি মদ্যপান ও নৃত্য অতিশয় ভাল বাসে। এদেশে মহুয়া হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়; তাহাই ইহাদের প্রধান পানীয়। ইহাদের দৈনিক ব্যয়ের হিসাবে অশনবসনের ন্যায় মদ্যপানেরও একটী হিসাব থাকে। আর আবালবৃদ্ধ সকলেই নৃত্যপ্রিয়। অপরাপর জাতির নৃত্য হইতে ইহাদিগের নৃত্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া নৃত্য করে বটে কিন্তু সকলে একত্রে কিম্বা ইউরোপীয় ধারাতে যোড়া যোড়া হইয়া নৃত্য করে না। সকল রমণী কিম্বা সকল পুরুষ মিলিয়া একদীর্ঘ সারি বান্ধিয়া পরস্পরের কক্ষ বেষ্টন করিয়া পাশাপাশি ভাবে দণ্ডায়মান হয়। তাহার এক প্রান্তে দলের একজন সেনাপত্নী বা সেনাপতি একটী ময়ূরপুচ্ছের চামর হাতে করিয়া ছড়া গাহিতে থাকে ও সেই ছড়ার তালে সকলে একত্রে পা ফেলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিতে নাচিতে পাশের দিকে চলিতে থাকে। ইহারা বাল্যকাল হইতে এমত ভাবে শিক্ষা পায় যে সকল নৃত্যকারী বা নৃত্যকারিণীর পা একত্রে চলিতে থাকে এবং অঙ্গ দোলানও সকলের একত্রে হয়। কিন্তু এই নৃত্যের প্রধান বিশেষত্ব পার্শ্বমুখী চলন। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই একত্রে এক একটী সারিগঠন করে এবং যখন চলিতে থাকে তখন সেই সারিবন্ধন যেন সর্পের ন্যায় মনে হয়। একদল গোঁড় কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একবার নৃত্য আরম্ভ করিলে, তাহারা মদ্যপানার্থ অর্থ না লইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

গোঁড়েরা সহরে থাকিতে ভালবাসে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যেখানে অনেক ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস সেখানে তাহারা কখনই বাস করিবে না। গোঁড়রমণী একান্ত ভিখারিণী হইলেও কখনও নিরাভরণা থাকিবে না। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু। কিন্তু ইহারা অতিশয় কাল, এবং কদাকার। গোঁড়জাতি দেখিলেই চিনিয়া লইতে পারা যায়।

বেতুল পরগণার প্রায় সকল গ্রামেই গোঁড় বাস করে। কোন কোন গ্রামে গোঁড় ভিন্ন অন্য কোন জাতির বসতি নাই। মুলতাই পরগণায় গোঁড় অপেক্ষাকৃত অল্প। গোঁড়দিগকে অতিশয় ছলকপটতাশূন্য পাইয়া ইহাদিগকে প্রতারণা করিয়া অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে অনেক কুচক্রী মাড়োয়ারী বণিক এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা

এক্ষণে এক এক গ্রামের অধীশ্বর হইয়া মূলতাই বিভাগে জমীদারী পাতিয়া বসিয়াছে।

ঈসপের একটী গল্প আছে যে এক কাঠুরিয়া একটী কুড়ালী হস্তে করিয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দেখিতেছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া বনস্পতি শালরাজ তাহাকে বনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাঠুরিয়া উত্তর করিল "আমার কুড়ালীর বাঁট নাই, তাই একখণ্ড সুদৃঢ় কাষ্ঠ খুঁজিতেছি।" শালরাজ দয়া করিয়া নিজ দেহ হইতে একটী শাখা ছিন্ন করিয়া তাহাকে দিল। কিন্তু সেই কাঠুরিয়ার কুড়ালীতে বাঁট হইল অমনি দেখিতে না দেখিতে সেই মহান শালবৃক্ষই সর্ব্বাগ্রে ধূলি চুম্বন করিল। এপ্রদেশে মাড়োয়ারী ও গোঁড় অধিবাসীদিগের মধ্যে আদান প্রদানের ব্যবহার ঠিক উপরোক্ত কাঠুরিয়া ও শালবৃক্ষের ন্যায়।

বেতুল জিলা ইক্ষুপ্রধান। এখানে যেরূপ ইক্ষু জন্মায় ভারতে আর কোথাও এরূপ জন্মায় কিনা সন্দেহ। এখানকার ইক্ষু অতি সরল না হইলেও অত্যন্ত সুমিষ্ট। এখানে গুড়ের ব্যবসা গোঁড় ভিন্ন অপরজাতীয় অধিবাসীদিগের একটী প্রধান উপজীবিকা। ইক্ষুরসের সময় কোন পল্লীগ্রামে গেলে গৃহস্থের বাটীতে গুড় ভক্ষণ ও ইক্ষুরস পান করিতে দেওয়া অতি উপাদেয় অভ্যর্থনা বলিয়া গণ্য হয়। কৃষক যে স্থানে গুড় প্রস্তুত করে তাহাকে "ঘানা" কহে। গুড় প্রস্তুতের সময় যে কোন লোক ঘানাতে যাইবে তাহাকেই বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ গুড় ভক্ষণ ও ইক্ষুরস পান করিতে হইবে নতুবা ঘানাস্বামীর অবমাননা করা হয়। কোন সাহেব লোক ঘানা দেখিতে গেলে তাঁহাকে গুড় ভক্ষণ ও রসপান করিতে অনুরোধ করিবার ধৃষ্টতা কৃষকের না হইলেও সাহেবের সঙ্গে কয়েক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড প্রেরণ করিয়া আতিথ্য দেখাইতে তাহাকে কিছুতেই বিরত করা যাইবে না।

এদেশের গুড়ের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহা ঠিক দোবারা চিনির চাকার ন্যায় দানাদার। এখানকার গুড় মুলতাই হইতে অমরাবতী (বেরারের প্রধান নগর) হইয়া বোম্বাই অঞ্চলে রপ্তানী হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এদেশে এত ইক্ষু ও গুড় উৎপন্ন হইলেও তাহা হইতে এ যাবৎ কেহ চিনি প্রস্তুত করিতে যত্ন করে নাই। বর্ত্তমান চিনিশুল্কের দিনে বেতুলে একটী কিম্বা একাধিক চিনির কারখানা খুলিলে যে কি পরিমাণে লাভবান হওয়া যাইতে পারে তাহা বর্ণনাতীত। ইক্ষুর চাষে জলের বিশেষ প্রয়োজন। একারণ যেখানে কিঞ্চিৎ জলসেকের সুবিধা আছে সেখানেই ইক্ষুক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা গম প্রভৃতি শস্য হইতে ইক্ষু উৎপাদন করাকে অধিক লাভজনক মনে করে। তবে পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া জলাভাব ঘটাতেই তাহারা সময় সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

এদেশে অনেক মহারাষ্ট্রীয়ের বাস। কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া চাপরাশী, জমীদার, হাকিম, কেরাণী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই মহারাষ্ট্রীয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় এই উভয় ভাষাতেই কথা কহিয়া থাকে।

আমরা যখন প্রথম বেতুলে আসি তখন এখানে কেবল একজন মাত্র বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাই। ইনি একজন ডাক্তার, বেতুল সহরের হাঁস্পাতালের সহকারী। ইনি এই স্থানে একাকী অনেকদিন হইতে বাস করিতেছেন। ইঁহার পরিবারে একমাত্র যুবতীস্ত্রী ও একটী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র। ক্রমে জানিতে পারিলাম এখানে কৃষ্ণনগর অঞ্চলের একঘর ব্রাহ্মণ জমীদারী করিতেছেন। তাঁহারা দুই ভাই; বাঙ্গালীসুলভ দ্বন্দ্বপ্রিয়তা বশতঃ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া দুই গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা যথায় থাকেন সে গ্রামদ্বয় বদনূর (বেতুল সহর) হইতে ২৮ মাইল দূরে; কাজেই কার্য্যোপলক্ষভিন্ন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবার অন্য সম্ভাবনা নাই।

এখানকার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে (আমরা যখন আসি তখন) তিন জন ইংরাজ, একজন পার্সী (সিবিল সার্জ্জন), আমি বাঙ্গালী ও দুই জন মহারাষ্ট্রীয় ইহা লইয়াই গবর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগ গঠিত। এক জন ইংরাজ বন্দোবস্তের কার্য্যে ছিলেন। তাহা শেষ হওয়াতে তিনি পদ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অপর দুই জন ইংরাজ উভয়েই অবিবাহিত, পার্সী সিবিল সার্জ্জন মহাশয়ও অবিবাহিত। মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিদ্বয়ের মধ্যে একজন (জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তা) বিধবাবিবাহিত অপর জন গোঁড়া হিন্দু। যিনি বিধবাবিবাহিত, তিনি সমাজচ্যুত হইয়া একাকী বাস করেন। আমরা আসিলে তাঁহারই সহিত আমাদের প্রথম ভাব হয়। পার্সীডাক্তার মহাশয়ও

আমাদের সঙ্গে খুব মিশিতেন। ইনি একজন সার্জ্জন মেজর এবং অতিদক্ষ লোক। তিনি পার্সীসমাজে আপন মনোমত কন্যা না পাওয়াতে এযাবৎ বিবাহ করিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার অবিবাহিত থাকিবার একমাত্র কারণ। পার্সী-জাতির কতকগুলি সংস্কার আছে, যাহা উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের অনুমোদিত হয় না এবং কোন শিক্ষিতা মহিলা ঐ সকল সংস্কার উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। ইহাঁর সহিত আমাদের অতিশয় আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল কিন্তু আমরা এখানে মাসাধিক থাকিতেই তিনি অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার স্থলে একজন বাঙ্গালী দুইমাসের জন্য আসিয়াছিলেন। এখন তিনিও চলিয়া গেলেন ও সেপদে একজন ইংরাজ আসিয়াছেন। এইরূপে আমরা আমাদের পার্সী বন্ধু হারাইয়া যে একজন স্বজাতীয় পাইয়াছিলাম, আবার সরকারী কার্য্যের তাড়নায় তাঁহাকেও হারাইয়াছি। ভাল, লোকে যে বলে মানুষ সকলেই এক জাতীয় তাহা কি সত্য? তবে কেন আমি বলি যে আমার এক জন স্বজাতীয় চলিয়া গেলেন? এখানকার একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে এইরূপ স্বজাতিশূন্য স্থানে তাঁহার বহুদিন থাকিতে ভাল লাগে না. আমি তদুত্তরে বলিয়া ছিলাম যে "তোমরা দুইজন ইংরাজ ও আমরা দুইজন বাঙ্গালী ছিলাম; এখন একজন বাঙ্গালী গিয়া এক জন ইংরাজ আসিলেন, তোমরা তিন জন হইলে আমি একা পড়িলাম। বল দেখি, কাহার দুঃখ করিবার অধিকার বেশী?" পাঠকগণ কি মনে করেন?

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

মোকদ্দমা ও সালিসী।

মোকদ্দমা দিন দিন বাড়িতেছে। মামলার বন্যায় দেশ ডুবিতেছে; মামলার বহ্নিতে ধনী ও নির্ধন পতঙ্গের ন্যায় পড়িতেছে ও মরিতেছে। দেশের লোক ত্রিবিধ অপমৃত্যুতে মরিতেছে; ত্রিবিধ অপমৃত্যু, যথা—দুর্ভিক্ষে অপমৃত্যু, ম্যালেরিয়ায় অপমৃত্যু আর মামলায় অপমৃত্যু। এই ত্রিতাপ আমাদিগের দেশের লোককে দগ্ধ করিতেছে। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক জঠরানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। ইহা অতীব শোকাবহ ঘটনা। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতেছে। ইহাও নিতান্ত শোচনীয়। কিন্তু মামলার নরককুণ্ডে লোকে ক্ষিপ্ত হইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে, অনেকটা ইচ্ছা করিয়া শান্তি ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া লাখ লাখ লোক জহন্নামে যাইতেছে, ইহা কেবল শোকের বিষয় নহে, ইহা শোকের এবং লজ্জার বিষয়। কেন না দুর্ভিক্ষে ও ম্যালেরিয়াতে যে মরণ, তাহা পার্থিব জীবনের শেষ, সুতরাং দুঃখেরও অবসান; আর তাহারা প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ত্তাধীন নহে; তাহাদের হাত এড়াইতে হইলে পরমমঙ্গলময় শিবের কৃপা আবশ্যক। কিন্তু মামলা আমাদিগের স্বেচ্ছাকৃত ও স্বায়ত্তাধীন; স্বেচ্ছাকৃত পাপে লোকে জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহাতে বাঁচিয়া কেবল মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। মামলা দেশের যে কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা অতি বাজে লোকেই ভাবেন, অতি অল্প লোকেই তাহা বুঝেন। দেশের অধিকাংশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শিক্ষিত লোক অর্থলাভের কুহকে ও পার্থিব সুবিধার প্রলোভনে উকীলের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। মামলাই তাঁহাদিগের উপজীব্য, আর মামলা বৃদ্ধিতে তাঁহাদের লাভের বৃদ্ধি। সুতরাং মামলার অপকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সাংসারিক স্বার্থে কুঠারাঘাত করিতে অগ্রসর হইবেন তাহা আশা করা যায় না। বরঞ্চ যদি কোন বিধি ব্যবস্থাতে, মামলা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা দেখাইয়া দিয়া থাকেন যে মামলা কমিলে দেশের অনিষ্ট হইবে, সুবিচারের পথ বন্ধ হইবে। মামলা কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আপীলের সংখ্যা হ্রাস করিবার একটা সংকল্প একবার প্রকাশ করেন। আপীলের সংখ্যা কমিলে যে দেশের বিশেষ হানি হইবে তাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী উকীলেরা অনায়াসে প্রতিপন্ন করিলেন যে আপীল কমিলে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ হইবে, লোকের স্বত্ব লোপ পাইবে, সুবিচার একবারে উঠিয়া যাইবে। তাঁহাদের কথা শুনিলে বোধ হয় যেন আপীল আদালতে অবিচার ব ভ্রম নাই, যাহা কিছু ভ্রম বা অবিচার তাহা কেবল নিম্ন আদালতে

হইয়া থাকে। আবার যাঁহারা অতিতীক্ষ্ণবুদ্ধি উকীল, তাঁহারা একথাও বলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায়ই উকীলেরা করেন; অতএব গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা তাঁহাদিগকে দমন করেন; আপীলের সংখ্যা হ্রাস করিলে উকীলেরা দমিত হইবে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত হইবে, এই গবর্ণমেণ্টের অভিসন্ধি। সুতরাং আপীলের উপর আপীল চলুক, বাদী ও প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত হউক তাহাও সহনীয় কিন্তু আপীলের সংখ্যা যেন কোন রকমে না কমে। তবেই দেশের যে শ্রেণীর লোক বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা মামলার অপকারিতা প্রতিপন্ন করা দূরে যাউক, যাহাতে মামলা কমিবার সম্ভাবনা তাহাও তাঁহারা অনুমোদন করেন না এবং কখনও যে করিবেন তাহারও প্রত্যাশা করা যায় না। যাঁহারা হাকিম, মামলা যে বিশেষ অনিষ্টজনক, তাঁহারাও তাহা স্বীকার করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে মামলা অমঙ্গলকর বলিলে আদালতে সুবিচার হয় না অর্থাৎ নিজেরা অকর্ম্মণ্য এই কথা স্বীকার করা হয়।

আবার এ দিকে, আইনের পরিবর্ত্তন প্রায় নিত্য ঘটনা। প্রায় প্রত্যহই কোনও আইন সংশোধিত হইতেছে, কোনও আইন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কখন কোনটার পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই পরিবর্ত্তনের স্রোত কখন কি ভাবে বহিতেছে তাহা উকীলেরাই সকল সময় ঠিক জানিয়া উঠিতে পারেন না। যাঁহারা উকীল নহেন তাঁহাদিগের পক্ষে এ পরিবর্ত্তন সংবাদ রাখা বড়ই কঠিন। প্রথমতঃ ব্যবস্থাপক সভার বিশ্রাম নাই; আইন ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন, কোনও আইন নূতন সৃষ্টি হইতেছে, পুরাতন আইনের কোনও ধারা বাদ দেওয়া হইতেছে, কোনও ধারা যোগ করা হইতেছে, কোনও ধারা বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার উপর হাইকোর্ট বিচার কালে কোন্ ধারার কখন কোন্ ব্যাখ্যা করেন, তাহাও ব্যবস্থাপক সভার বিধির ন্যায় অবশ্য মান্য ও জ্ঞাতব্য। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে অধিকাংশ লোকের নিকট আইন একটা অনিশ্চিত পদার্থ; এমন কি আইন ব্যবসায়ী উকীলের নিকটও অনেক স্থলে আইন অনিশ্চিত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে আইন অনিশ্চিত, সেখানে মোকদ্দমা হইবার অধিক সম্ভাবনা, কারণ উভয় পক্ষই ক্রোধে বা লোভে পড়িয়া জয়লাভ করিবার আশা করেন।

তাহার পর মোকদ্দমার ফলাফল আইনের উপর নির্ভর করে না, আইন এবং প্রমাণ এই উভয়ের উপরই নির্ভর করে। বরুন কোন স্থলে আইন নিশ্চিত এবং পরিষ্কার। কিন্তু আদালতে কাহার পক্ষে প্রমাণ প্রবল হইবে তাহা কেমন করিয়া স্থির করা যাইবে? সুচতুর মিথ্যাবাদী সাক্ষীর গুণে আদালতে মিথ্যা সত্য হইতেছে, সত্য মিথ্যা হইতেছে। এদিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকীলের জেরার জালে জড়িত হইয়া নিরীহ সত্যবাদী সাক্ষী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইতেছেন। মোকদ্দমা ও আদালত সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানেন তাঁহারাই জানেন মোকদ্দমার অবস্থা তদ্বিরের উপর নির্ভর করে; বিষয়কার্য্যের অভিধানে ঐ তদ্বিরের অর্থ, ভিতর ভিতর সত্য সাক্ষী ভাঙ্গা, নিজের অনুকূলে সত্য সাক্ষী না থাকিলে মিথ্যাসাক্ষী উৎকোচ দিয়া সংগ্রহ করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, অন্তর্গত আছে। কেহ কেহ মনে করেন উকীলেরা সাক্ষীকে যে জেরা করেন, সেই জেরা সাক্ষীর প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করিয়া দেয়। এটা নির্ব্বোধ মিথ্যাবাদী সাক্ষীর পক্ষে সত্য হইতে পারে, কিন্তু সুচতুর মিথ্যাবাদী সাক্ষীর পক্ষে জেরা কোন কাজেরই নহে আবার যাহারা চতুর নহে, তাহাদিগকে যদি বুদ্ধিমান মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তি ভাল করিয়া তালিম দিয়া মিথ্যাসাক্ষ্য অভ্যাস করায়, কি কি জেরা হইতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর অভ্যাস করায়, তাহা হইলে নির্ব্বোধ ব্যক্তিও মিথ্যাসাক্ষীতে উকীলের জেরাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। এমন কত মোকদ্দমা হইতেছে যাহাতে মিথ্যাসাক্ষী দেওয়াইয়া জয়লাভ হইতেছে। এইত গেল মিথ্যাসাক্ষীসংগ্রহ ও প্রস্তুত করা পক্ষে। সাক্ষী ভাঙ্গা আরও কত সহজ। ধর তোমার পক্ষে যাহারা সত্য সাক্ষ্য দিবে তাহারা দরিদ্র, তাহার উপর তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল নহে; তোমার বিপক্ষদল তাহাদিগকে ঘুস দিল, তাহারা আদালতে বলিল আমরা এ সকল বিষয়ের কিছুই জানি না। এক কথায় সব চুকিয়া যাইল। এই কথা বলিতে কোনও বুদ্ধিও লাগে না। আর যদি তোমার সাক্ষী সত্যবাদী লোক হইল, টাকার প্রলোভনে মজিল না, তাহা হইলেও হয়ত তোমার বিপক্ষ তাহাকে ভয় দেখাইয়া সরাইয়া দিল।

তাহার পর বিচারকের ঝোঁক কোন্ দিকে হইবে তাহাও পূর্ব্বে স্থির করা যায় না। তিনি মোকদ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু নিজে জানেন না; কতকগুলি দলিল যাহা অকৃত্রিম ও কৃত্রিম, কতকগুলি সাক্ষী সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, এবং উকীলদিগের কতকগুলি বক্তৃতাজাল যাহাতে মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার চেষ্টা ও অধ্যবসায় প্রসিদ্ধ এবং কতকগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাখ্যাসম্বলিত ব্যবস্থা আইন কানুন—এতগুলি ব্যূহ ভেদ করিয়া বিচারক বেচারা সত্যের গূঢ় তত্ত্বে উপনীত হইবেন কি না, সুবিচার করিবেন কি না; এই প্রশ্ন সততই গাঢ় সংশয়ে আচ্ছন্ন থাকে।

সুতরাং যেদিক দিয়া দেখুন, মোকদ্দমার ফল সর্ব্বদাই অনিশ্চিত। ইহাতে জয়লাভ করিতে হইলে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, সয়তানীশিক্ষা করিতে হয়, পরিপক্ক বদমায়েস হইয়া উঠিতে হয়। মোকদ্দমায় ধন যায়, ধর্ম্ম যায়, শান্তি যায়, সুখ যায়। পাপ ও অশান্তির শিখা, ধর্ম্মের চিতানলের শিখা হৃদয়ে ধু ধু জ্বলিতে থাকে। যে জীবন একদিন শোভা ও সুরভিতে, সুখ, শান্তি ও পবিত্রতাতে, নন্দনকানন-সদৃশ ছিল, তাহা রুধিরলোলুপ-শিবাশকুনি-সেবিত, অস্থি-কঙ্কাল-বিকীর্ণ, হাহাকার-নিনাদিত, ভূতপ্রেতের আবাস-ভূমি ভীষণ শ্মশানে পরিণত হয়। যখন দেখিলাম কোনও গৃহস্থ উকীলের গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে, তখন বুঝিলাম দুইটা পরিবারের সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। যখন দেখিলাম, মক্কেল আদালতে উকীলের শরণাগত হইয়া উদ্বেগব্যাকুলনেত্রে হাকিমের দিকে চাহিয়া আছে, তখনি নবমীর ছাগের কথা মনে হইল। ভাই! তোমার গৃহে আগুন লাগিলে কি কর? তুমি কি বল না, "প্রতিবাসিগণ, তোমরা দৌড়িয়া আইস, আমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, আমাকে রক্ষাকর, আমার ঘর রক্ষা কর!" তোমার ঘরে যখন একটা মামলার সূত্রপাত হইয়াছে তখন জানিবে তোমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সময়ে রক্ষার উপায় কর, আগুন নিবাও, পাড়ার লোক ডাক। আর পাড়ার তোমরা সকলে, দেখ লোকটার ঘরে আগুন লাগিয়াছে; মামলার আগুন একটা ঘর ছারখার করিবে, তোমরা দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবে, আগুন নিবাইবে না? এই আগুন না নিবাইলে ক্রমে তোমাদিগের ঘরও ভস্মীভূত হইবে, দেশ ছারখার হইবে। দেখ, তোমরা কেহ কিছু করিতেছ না, দেশ ছারখার হইতেছে, সোণার সংসার মামলা'র আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে কি ভয়ানক অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। হায়! দেখিতে দেখিতে এই মামলার বহ্নিতে কত বিশাল সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। কল্য যাহাদের প্রভূত ধন সম্পত্তি ছিল, অদ্য তাহারা মোকদ্দমাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের কাঙ্গাল, ভিখারীর যন্ত্রণায় মর্ম্মাহত। মামলার গুণে কল্য যে দেবতা ছিল অদ্য সে সয়তান হইল।

আগুন লাগিলে যদি সেই আগুন নিবান প্রতিবাসী-দিগের কর্ত্তব্য কাজ হয় তাহা হইলে মামলা বাধিবার উপক্রম হইলে, তাহা কি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দেওয়া তোমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে? দেশ যে মামলায় কিরূপে উৎসন্ন যাইতেছে তাহা কি বুঝিতেছ না? যদি বুঝিয়া থাক, চিন্তা করিয়া দেখ—

সালিসী হয় না কেন?

এখন কথা এই মোকদ্দমায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, তথাপি সালিসীতে বিবাদ মীমাংসা হয় না কেন? পূর্ব্বে অধিকাংশ বিবাদ ত মধ্যস্থ দ্বারা মিটিয়া যাইত। পূর্ব্বে হইত এখন তাহা হয় না কেন? এক কথায় ইহার উত্তর, আমরা পূর্ব্বের অপেক্ষা দিন দিন মন্দ হইতেছি।

সালিসীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইলে এই কয়েকটি অবস্থার প্রয়োজনঃ—

যাঁহারা মধ্যস্থ হইবেন, তাঁহারা বিবাদী বিষয়ের অবস্থা স্বয়ং অবগত থাকা প্রয়োজন, নিতান্ত পক্ষে প্রধান সাক্ষীদিগের চরিত্র কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে সালিসীতে বিচার ও আদালতে বিচার এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এই সকল মধ্যস্থ লোকের প্রতিপত্তি থাকা প্রয়োজন এবং তাঁহাদের বাদী প্রতিবাদীর বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা যাহা মীমাংসা করিবেন তাহা ঈশ্বরাদেশের ন্যায় উভয় পক্ষই মান্য এবং পালন করিতে বাধ্য হইবেন। যদি কেহ তাঁহাদের মীমাংসা সহজে পালন না করেন, যদি কোন পক্ষ তাহার প্রতিকূলাচরণ করেন, তাহা হইলে সামাজিক শাসন তাঁহাকে পালন করাইবে।

ক্রমশঃ

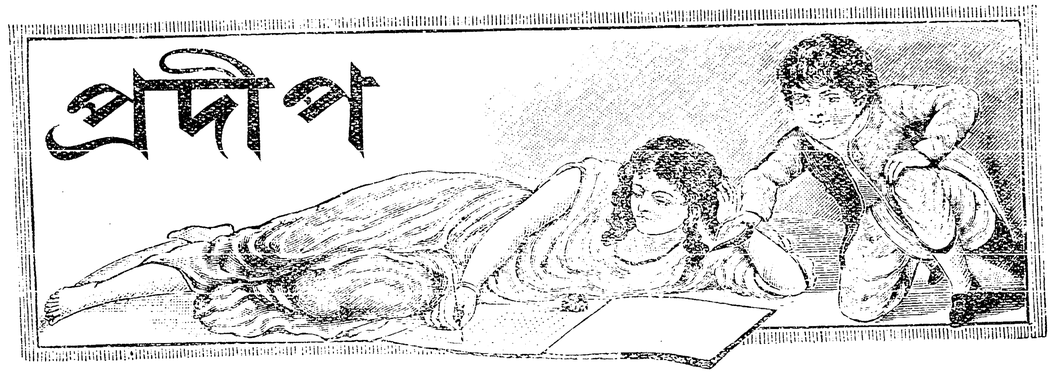

দ্বিতীয় ভাগ। আষাঢ়, ১৩০৬। সপ্তম সংখ্যা।

মোকদ্দমা ও সালিসী।

(২১৪ পৃষ্ঠার পর)

আর এক কথা, যাঁহারা মধ্যস্থ হইবেন তাঁহাদিগের অবকাশ থাকা এবং তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে পরের এবং সমাজের উপকারের জন্য পরিশ্রম করিতে সম্মত হওয়া আবশ্যক। সংক্ষেপে যাঁহারা মধ্যস্থ হইবেন তাঁহাদিগের স্থানীয় জ্ঞান, অবকাশ, প্রতিপত্তি, সাধুতা এবং পর-হিতার্থে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার প্রভৃতি সদ্‌গুণে মণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। এখন ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক দেশের অবস্থা কি প্রকার।

১। পূর্ব্বে যখন রেলপথ প্রভৃতি ছিলনা, তখন গ্রামের লোক প্রায়ই গ্রামে থাকিত। এখন যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায়, চাকরী বা ব্যবসা সূত্রে অনেক সময় লোকে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করে; গ্রামের বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় আর খবর রাখে না। সহরে, লোকে স্ব স্ব ব্যবসা বা কার্য্যে ব্যস্ত; এপাড়ার লোক ওপাড়ার খবর রাখে না, প্রতিবেশীদিগের অবস্থার সংবাদ রাখা অনাবশ্যক মনে করে। এমন কি অনেক সময় দুইটা পাশাপাশির বাড়ীতে একের অপরের সহিত পরিচয় থাকে না। গ্রামেও যেন ক্রমে ক্রমে এই বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেখানে ক্রমে ক্রমেই প্রতিবেশীর অবস্থার খবর রাখা কমিয়া যাইতেছে। ক্রমে ক্রমে লোক নিজের নিজের লইয়া আপনাকে সীমাবদ্ধ করিতেছে। 'আমার প্রতিবেশী কি করে না করে আমার খবর রাখা দরকার কি? যদি কাহারও অবস্থার সহিত আমার স্বার্থ জড়িত থাকে, তবেই আমি তাহার অবস্থার সংবাদ রাখিব, নতুবা নহে'—এইরূপ স্বার্থপর ভাবটা প্রবল হইতেছে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোক এখনকার দিনে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সালিসীও দুঃসাধ্য।

২। অবকাশ ও নিঃস্বার্থ ভাবে শ্রমস্বীকার। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন লোকের অবকাশ কম। বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং আয় বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হইয়াছে। ধনের আকাঙ্ক্ষা এখন লোকের মিটে না। এমন কি চির-জীবন দাসত্ব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ডেপুটী বা সদরালা পেন্সন লইয়া জমীদারের ঘরে মোটা মাহিনার চাকুরীর জন্য লালায়িত। "টাকা চাই, আরও টাকা চাই" ইহাই লোকের এখন চিন্তা ও ধ্যান, আর কিছু চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। এখন লোক অধিক স্বার্থপর হইয়াছে। নিজের স্বার্থব্যতীত অন্যকোন বিষয়ে শ্রম করিতে অস্বীকার। একে লাভ নাই, তাহার উপর অবকাশ কম সুতরাং লোকে সালিস হইতে এখন ইচ্ছুক নহে।

৩। তাহার পর যদি কাহারও অবকাশ বা সালিস হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেও ভাললোক পাওয়া দুষ্কর। ফল কথা, পরস্পরের উপর লোকের এখন বিশ্বাস নাই। সমাজে ধর্ম্মের বন্ধন খসিয়া গিয়াছে। তাহাতে অধিকাংশ

লোকেই কপট ও প্রতারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি কপট ও প্রতারক যে নহে তাহাকে লোকে man of business অথবা practical man বিবেচনা করে না। শ্রদ্ধাভাজন বা বিশ্বাসী লোক দুর্লভ হইলে সালিসীও দুঃসাধ্য।

৪। যাঁহারা সালিস হইবেন তাঁহারা যাহা মীমাংসা করিবেন তাহা পালন করিতে বাদী প্রতিবাদী বাধ্য হইবেন এইরূপ সমাজশাসন থাকা উচিত। এখন সমাজে কোন শাসন নাই। পূর্ব্বে কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে অথবা গ্রামের সমাজপতিগণের বাক্য অমান্য করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইত। তাহাতে তাহার চৈতন্য হইত। ইউরোপীয় সভ্যতার গুণে এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না। কেহ কাহারও কথা শুনিতে চাহে না। অর্থশূন্য, ক্ষিপ্ত, আবিল, ব্যাধি-গ্রস্ত, পঙ্কিল, বিকৃত সাম্য-বাদ সমাজকে ডুবাইতেছে। এই সাম্যবাদের অভিধানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং বিনয় লোপ পাইয়াছে। বৃদ্ধ যিনি তাঁহাকে যুবা আর পূর্ব্বের ন্যায় মানিতে চাহে না, তাঁহাকে আর তেমন সম্মান করে না। ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে উদ্ধত ও লুব্ধ পিশাচগণ আর শ্রদ্ধা বা ভয় করে না। সমাজে আর এখন সচ্চরিত্রের সম্মান নাই, সাধুতার সম্মান নাই, ধর্ম্মের সম্মান নাই, সদনুষ্ঠানের সম্মান নাই। এখন কেবল সম্মান আছে টাকার। এখন সমুদয় পূজা ও অর্চ্চনা উঠিয়া গিয়াছে; কেবল আছে ও বৃদ্ধি পাইতেছে মুদ্রাপূজা। কিন্তু ধনী লোকের ধনের উপর সাধারণ লোকের যতই ভক্তি থাকুক না কেন, তাহাদিগের ন্যায়পরতার উপর ভক্তি নাই। সুতরাং বিবাদ স্থলে লোকে তাহাদিগকে মধ্যস্থ স্বীকার করে না। অন্য লোকের ত কথাই নাই। ইহার ফল এই, পূর্ব্বে যে সমাজশাসন ছিল এখন তাহা নাই।

সমালোচনা করিয়া দেখা গেল সালিসী হওয়ার জন্য সমাজে যে যে অবস্থার আবশ্যক, এক্ষণে তাহার বিশেষ অভাব হইয়াছে। লোকের স্থানীয় জ্ঞানের অভাব, অবকাশের অভাব, পরার্থে শ্রমস্বীকারের অভাব, বিশ্বাসের অভাব, সমাজশাসনের অভাব। এস্থলে কিরূপে সালিসী বিচার হইতে পারে। অর্থাৎ দেশের লোকের চরিত্র সংস্কার না হইলে, তাহারা বিলাস ত্যাগ না করিলে, সমাজের আবার নূতন গঠন বা সংস্কার না হইলে মধ্যস্থের দ্বারা বিবাদ মীমাংসা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ফল কথা, মামলাই বল, ধনতত্ত্বই বল, কৃষকদিগের উন্নতিই বল, দেশের উন্নতিই বল, সমাজের যে কোন মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে চাহিবে, অবশেষে দেখিতে পাইবে মূলমন্ত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই মূলমন্ত্র প্রচার করা আবশ্যক।

আমাদের দেশে জমিদারী পঞ্চায়েত বলিয়া একটি সভা আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। আদালতে না গিয়া আপোষে যাহাতে বিবাদ মীমাংসা হয় এইটী ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের একজন সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ মহারাজা ব্রতী। কিন্তু জমীদার প্রজার ভিতর যে বিবাদ ও মামলা হয়, তাহা নিবারণ বা মীমাংসা করা বোধ হয় এ সভার কার্য্য নহে। যদি তাহা হয়, দুঃখের বিষয়। কেন না দেশের অধিকাংশ লোক যাহাতে সংসৃষ্ট, সেখানে জমীদার পঞ্চায়েত সভা সংসৃষ্ট নহেন। যেখানেতে ধনীতে ধনীতে বিবাদ, জমীদারে জমীদারে মোকদ্দমা, সেইখানে জমীদার পঞ্চায়েতের কার্য্যক্ষেত্র। যদি বাস্তবিকই কার্য্য-ক্ষেত্র এইরূপ সঙ্কীর্ণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলেও এই সভাটীর আবির্ভাব একটী মঙ্গলসূচক লক্ষণ। তবে এই-রূপ সভার সফলতার জন্য আভ্যন্তরিক আন্দোলন আবশ্যক, বহুবিস্তৃত প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন, স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় কি পরিমাণে এই সভাতে সঞ্চারিত তাহা জানি না। তবে এই জানি যদি এই সভা দেশের উপকার করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহাকে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে মূল সভার শাখা-সভা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। আর, এই সভার উদ্যোগী পরহিতৈষী পুরুষগণ প্রতি বৎসর শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধের ন্যায় নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গিয়া বক্তৃতার দ্বারা হউক, অনুনয় বিনয় দ্বারা হউক, উপদেশ বাক্য দ্বারা হউক, নিজের সাধুচরিত্রের দ্বারা হউক, মোকদ্দমার নারকী পরিণাম অঙ্কিত করিয়া হউক, যদি শান্তির ধর্ম্ম প্রচার করেন, লোকের লোভ ও ক্রোধরিপু প্রশমিত করিতে পারেন, লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে শাখা-সভা

দ্বারা সুফল ফলিতে পারে। সভাকে স্মরণ রাখিতে হইবে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত কোন সামাজিক উন্নতি হইতে পারে না, আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত ব্যর্থ কংগ্রেস, ব্যর্থ পঞ্চায়তি, ব্যর্থ সালিসী সভা। নৈতিক উন্নতি ব্যতীত এ সকল চেষ্টাই পণ্ডশ্রম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

শ্রীঅদ্বৈত শ্রীহট্টবাসী।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের ভাগ্য যবন-রাজ কর্ত্তৃক নিয়মিত হইলেও, তাহাদের শক্তি সর্ব্বত্র সম-ভাবে প্রকটিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ অনেকদিন পরে যবন-কবলিত হয়; সেই সঙ্গে শ্রীহট্টের ভাগ্যসূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়ে। শ্রীহট্ট তখন ভাগত্রয়ে বিভক্ত ছিল;—জয়ন্তী বা জন্তা, শ্রীহট্ট বা গৌড় (এ গৌড় মালদহের প্রসিদ্ধ গৌড় নগরী নহে), এবং লাউড় রাজ্য। এই তিন ভাগই তিনজন বিভিন্ন হিন্দুনৃপতিকর্ত্তৃক শাসিত হইত।

শ্রীহট্টের (গৌড়াংশের) শেষ হিন্দু নৃপতি ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সমসুদ্দিনের সময়ে যবন (সাহাজলাল) কর্ত্তৃক বিজিত হন। অপর অংশদ্বয়,—জন্তা ও লাউড় বহুকাল পর্য্যন্ত স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া-ছিল। লাউড়ের সীমা তখন ময়মনসিংহ জিলার অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ সবডিভিজনের সদর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে একটী বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিলক্ষিত হয়; ঐ স্থানটী একদা একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল; ইহাই "লাউড়ের জঙ্গল।" লাউড়ের রাজধানীর নাম নবগ্রাম। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবগ্রামের সিংহাসনে এক-জন ব্রাহ্মণ নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালের কঠোর তাড়নে আজ নবগ্রামের চিহ্ন মাত্র নাই; অনুসন্ধিৎসু সেই জঙ্গলে ভ্রমণ করিলে, ক্বচিৎ কোন স্থানে ভগ্ন গৃহাবশেষাদি প্রাপ্ত হইয়া, রাজবাটী প্রভৃতি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যে একটী বিশাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বঙ্গসমাজকে কম্পিত করিয়াছিল, সেই তরঙ্গের আদি ক্ষীণ রেখা এই নবগ্রাম হইতেই সমুত্থিত হয়। আমি প্রাচীন বৈষ্ণবাধিনায়ক অদ্বৈত প্রভুর প্রসঙ্গ স্মরণ করিতেছি। যে অদ্বৈত প্রভু দ্বারা সর্ব্ব প্রথম মৃতপ্রায় বৈষ্ণব-সমাজশরীরে জীবনীশক্তির ঈষৎ আভা বিভাসিত হইয়াছিল, যে অদ্বৈত প্রভুর প্রভাবে শান্তিপুর একটী হিন্দু তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান এই লাউড়ের নবগ্রাম; একথা অনেকেই অবগত নহেন। অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরবাসী বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার জন্মস্থান শান্তিপুর নহে,—শ্রীহট্টের লাউড়।

গৌড়াধিপতি আদিসুর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে ভাস্কর বৈদান্তিকের পুত্র আরুওঝা নাড়ুলী গ্রামে বাস করিতেন। কুলমর্য্যাদা স্থাপন কালে আরুওঝা নাড়িয়াল (নাড়ুলীবাসী) সিদ্ধশ্রোত্রিয় পদ প্রাপ্ত হন। আরুওঝার বংশোদ্ভব শ্রীপতি লাউড় প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। * যাঁহার মন্ত্রণাবলে দিনাজপুরের রাজা গণেশ, গ্যাসুদ্দিনের পৌত্রকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন, তিনি এই লাউড়-বাসী এবং তিনিই অদ্বৈতপ্রভুর পিতামহ। অদ্বৈতানুচর ঈশান-রচিত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে:—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরুওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহের যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদসাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥
যাঁর কন্যা বিবাহে হয় 'কাপের' উৎপত্তি।
লাউড় প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি॥"

কৃষ্ণদাস কে, প্রস্তাবান্তরে তাহা কথিত হইবে। কৃষ্ণদাসের বালালীলাসূত্র অবলম্বনে ঈশান ১৪৯০ শকে অদ্বৈতপ্রকাশ রচনা করেন।

গণেশ রাজার মন্ত্রিত্বানুরোধে অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে বিদেশে ক্ষেপণ করিতে হইত বলিয়া গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আর একটী আবাস বাটী প্রস্তুত করেন; কিন্তু লাউড়দেশ একবারে পরিত্যাগ করেন নাই; পুত্র পরিবারাদি লাউড়েই থাকিতেন। নৃসিংহের একমাত্র পুত্রই পণ্ডিত প্রধান কুবের তর্কপঞ্চানন। যথা ভক্তিরত্নাকরে:—

"বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান॥" ইত্যাদি।

---

* কৃষ্ণদাস কৃত বালালীলা সূত্রম্।

ইতিপূর্ব্বে লাউড়ের ব্রাহ্মণ নৃপতির উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নাম দিব্যসিংহ। কুবের পণ্ডিত এই দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। যথা অদ্বৈতপ্রকাশে ঃ—

"লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার যাহা রাজত্ব বিলাস।"
"রাজধানীতে ছিল তাঁর দ্বারপণ্ডিত কার্য্য।"

কুবের পণ্ডিতের অনেকগুলি সন্তান অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়; তিনি তখন গঙ্গাতীরে গমন করেন; তদীয় স্ত্রী নাভাদেবীর তথায় পুনঃ গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যা'হো'ক, কুবের অধিক দিন শান্তিপুরে থাকিতে পান নাই, রাজার পত্র পাইয়া শীঘ্রই তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইয়াছিল। যথা অদ্বৈতপ্রকাশে—

"বিবাহান্তে ক্রমে তাঁর বহুপুত্র হৈলা।
পুত্রগণ মৈলে তাঁর বিবেক হইলা॥
তবে গঙ্গাতীরে রম্য শান্তিপুরে আইলা।
নাভা সহ কিছুদিন তাহা গোঙাইলা॥
একদিন শ্রীকুবের তর্ক পঞ্চানন।
আকারে জানিলা নাভার গর্ভের লক্ষণ॥
নারায়ণ পূজা কৈলা নানা উপহারে।
ব্রাহ্মণ দরিদ্র অন্ধে তুষিলা আহারে॥
হেনকালে রাজপত্রী কুবের পাইলা।
বনিতা সহিতে নিজ দেশেরে চলিলা॥"

১৩৫৬ শকাব্দে মাঘী সপ্তমী তিথিতে নাভাদেবী নবগ্রামে যে পুত্ররত্ন প্রসব করেন, তিনিই শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য। অতএব অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরের লোক নহেন, তিনি যথার্থই শ্রীহট্টবাসী। বাল্যলীলাসূত্রে লিখিত আছে ঃ—

"শাকে রসপ্রাণ গুণেন্দুমানে শ্রীলাউড় পুণ্যময়েহি মাঘে।
শ্রীসপ্তমী পুণ্যতিথৌ সিতেহভূদদ্বৈতচন্দ্র কৃপয়াবতীর্ণঃ॥"

অন্যত্র, যথা—

"ছিলট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম॥"—অদ্বৈত মঙ্গল।
"নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥"—ভক্তিরত্নাকর।

কুবের বৃদ্ধকালে পুত্ররত্ন লাভ করিয়া অতি উল্লাসিত চিত্তে বিপুল ধন দীনদরিদ্রে দান করিয়াছিলেন। প্রাচীন গীতকর্ত্তা ঘনশ্যাম তাহা এইরূপে গাইয়াছেন ঃ—

"মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ,
হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত,
নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সুতিকা মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে,
দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধায়া আসি,
পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্য ফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে,
পাইলেন পুত্ররতন যেন॥
পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ,
অলক্ষিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনী,
ভণে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু॥"

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

বঙ্কিম চন্দ্র।

(১)

বঙ্কিম বাবু যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন ইংরাজি ১৮৬৪ সাল। সে বৎসরের ৫ই অক্টোবরের সাইক্লোনে (cyclone) ডায়মণ্ড হার্ব্বার, কুল্পি, মুড়াগাছা, টেঙ্গরাবিচি, করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মণিরটাট প্রভৃতি গ্রাম ঝড়ে ও জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে ঝড়ে এ দেশের অধিকাংশ বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়া যায়, পরে কয়েকটী সমুদ্রতরঙ্গ বঙ্গোপসাগর হইতে বাত্যা-তাড়িত হইয়া আসিয়া সাগরকুলবর্ত্তী দক্ষিণ প্রান্ত ভাসাইয়া লইয় যায়। এই দৈব-দুর্ঘটনায় প্রদেশস্থ বহুসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া, কয়েক জন ধনশালী পার্সী ও কতিপয় গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারী ও এ-প্রদেশস্থ জমিদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্যদান করিয়া সত্বরই একটী প্রচুর ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিম বাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখ কষ্ট দুর করি-

বরোদায় বুনিয়াদী লোকের বাস অধিক। গুজরাটীরা যৎপরোনাস্তি কৃপণ, একজন ভিক্ষুকেরও পাঁচ সাত শত টাকার সংস্থান আছে। গুজরাটের জমীর মত উর্ব্বরা শস্যশালিনী ভূমি,—ভারতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। উর্ব্বরতায় ইহা আমাদের শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুজরাটের জৈন বণিকগণ অগাধ অর্থের অধিকারী ও ইহাদের অধিকাংশই রত্ন-ব্যবসায়ী। এখানে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা বিক্রয় হয়, আমাদের দেশের তুলনায় মুক্তা অনেক সুলভ।

জৈনেরা মৎস্যমাংস ভোজন করে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। গুজরাটী ব্রাহ্মণেরাও মৎস্যমাংস ভোজনবিদ্বেষী। যাহারা মৎস্যমাংস আহার করে, ইহারা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করে। বরোদার নগরপ্রাচীরের মধ্যে গুজরাটীদিগের বাস। যেখানে ইহারা বাস করে তাহার সন্নিকটে মারাঠাদিগকে বাস করিতে দেখা যায় না। ইহারা পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। উভয় জাতির চরিত্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; মারাঠারা সাহসী, বীর, সদাপ্রফুল্ল, সরল, আতিথেয়, দাতা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, উন্নতিশীল; গুজরাটীরা ভীরু, দুর্ব্বল, অসন্তুষ্ট, ক্রূর, কৃপণ, অত্যন্ত অপরিষ্কার। বরোদার গুজরাটীগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহে বাস করে, কিন্তু তিন চারিতল বিশিষ্ট ইষ্টকালয়গুলি পারাবতের খোপের ন্যায়, কুড়ি পঁচিশটা বাড়ী এরূপ ভাবে সংলগ্ন যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করা যায় না। গৃহগুলিতে যাহাতে আলোক ও বায়ুপ্রবাহ প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য বিশেষরূপ আয়োজন করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বাতায়ন প্রায় নাই, অধিকাংশ দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহের একদিকে অতি অপ্রশস্ত কাঠের বারেন্দা বাহির করা, সেই বারান্দার উপর দুই হাত বা আড়াই হাত দীর্ঘ একটী জানালা। কাঠের কাজ গুজরাটে অত্যন্ত অধিক। আমাদের দেশে ধনিগৃহের প্রাচীরে বালি ও চূণের সংযোগে নানাপ্রকার মূর্ত্তি গঠিত হয়, এদেশে এরূপ মূর্ত্তির অভাব, তৎপরিবর্ত্তে গৃহের সম্মুখে কাষ্ঠনির্ম্মিত তোরণ-শ্রেণী ও কার্ণিসে বহুবিধ কারুকার্য্য বর্ত্তমান। যুদ্ধাদির অনেক ছবি আছে। কৃষ্ণবলরাম, বৃষ, ও নানাপ্রকার রমণীমূর্ত্তি প্রায় প্রতি গৃহেই দেখা যায়। অনেক স্থলে কার্ণিসের উপর কাঠের অতি সূক্ষ্ম লতা পাতা ফুলকাটা; দেখিয়া যথেষ্ট ব্যয় বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বুঝিতে পারা যায় এক সময় গুজরাটীরা এই শিল্পে সুদক্ষ ছিল,—কিন্তু চিত্রগুলির মধ্যে একটী অনায়াস-সুলভ নৈপুণ্য এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না।

গুজরাটে হিন্দুধর্ম্মের পরিপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু গুজরাটীদিগের ভক্তি ও নিষ্ঠা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জড়বন্ধনে জড়ীভূত। যে ভক্তির মধ্যে, আত্মসমর্পণের ভাব নাই, যে নিষ্ঠার মধ্যে পাপতাপ ও অপবিত্রতার পঙ্ক ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থানপূর্ব্বক বিশ্বাসভরে অনাদি অনন্ত দেবতার নির্ব্বিকার মহিমাচ্ছটায় আপনাকে সমাহিত করিবার প্রবৃত্তি নাই, সে ভক্তি, নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস মনুষ্যহৃদয়ে সংস্কার ও শান্তি দান করিতে সমর্থ নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম অপেক্ষা অনুষ্ঠানের উপদ্রব এখানে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার দৃষ্টান্ত গুজরাটীদিগের মনুষ্যের সহিত সহানুভূতির অভাব কিন্তু ইতরপ্রাণী সমূহের প্রতি তাহাদের অসাধারণ করুণা-প্রকাশ। গৃহদ্বারে যদি একজন অতিথি অনশনে প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে গুজরাটী বণিক তাহাকে তণ্ডুলমুষ্টি দান করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবে কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে একথা অজ্ঞাত থাকে না, যে, ইহারা অনেকেই সকালে ও বিকালে শর্করা ভারে অঞ্চল পূর্ণ করিয়া পথের ধারে তাহা পিপীলিকার গর্ত্তে ছিটাইয়া বেড়ায়, পথপ্রান্তস্থ কুকুর দলের সম্মুখে রাশিরাশি জিলাপি নিক্ষেপ করে, এবং অতর্কিতভাবে জীবননাশের আশঙ্কায় নাসারন্ধ্র সূক্ষ্মবস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া পথ চলে ও সতর্কতা সহকারে পানীয় জল না ছাঁকিয়া তাহা গলাধঃকরণ করে না। হিংসার অর্থ কি শুধু হত্যা? যে উদার, সুবিস্তীর্ণ বিশ্বজনীন প্রেম-নীতির উপর বৌদ্ধধর্ম্মের সুবিপুল মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা শুধু পশুপ্রীতির সংকীর্ণ সীমায় রুদ্ধ করিয়া ইহারা মনুষ্যের সহিত ব্যবহারে প্রতিদিন বিদ্বেষপূর্ণ ক্রূর নীতিরই পরিচয় দিয়া আসিতেছে।

গুজরাটী ব্রাহ্মণ কিম্বা জৈন বণিক সম্প্রদায় মৎস্যমাংস আহার করে না, এবং মৎস্যমাংসভোজীগণকে ইহারা মৎস্যমাংস অপেক্ষাও অপবিত্র বলিয়া মনে করে। এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ তদ্দেশীয় একজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর

আনীত জল অনায়াসে পান করিতে পারে, কিন্তু মৎস্য-মাংসভোজী ব্রাহ্মণও যদি সে জল স্পর্শ করে তবে সে তাহা অস্পৃশ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু রমণীর পতিব্রতাধর্ম্ম ইহাদের নিকট কিছুমাত্র গৌরবজনক নহে—অন্ততঃ ইহাদের ব্যবহারে সতীধর্ম্মের কোন গৌরবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না।—সেই জন্যই বলিতেছি প্রাণহীন প্রথা ইহাদের সমাজ-জীবনের আপাদমস্তক সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আছে; সে বন্ধনপাশ ছিন্ন না হইলে গুজরাটবাসীর মৃতপ্রায় দেহে শোণিতপ্রবাহ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরোদায় গুজরাটী পল্লীতে একজন বাঙ্গালী বাবু বাস করেন। তিনি মণিকার, কলিকাতা অঞ্চলে বাড়ী, টাকা কড়ি অনেক আছে কিন্তু শিক্ষিত লোক নহেন, আহম্মদাবাদ ও বরোদায় তাঁহার দোকান আছে; এ দূর দেশে বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ লাভ একান্ত দুরূহ বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই সাহায্য বিশেষ প্রীতিদায়ক বলিয়া অনুভূত হয়। আমি দুই একদিন উক্ত 'জুয়েলার' বাবুটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, গুজরাটী বেণিয়াদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে; মাছ মাংস প্রকাশ্যে আহার করিবার ত উপায় নাই-ই, অপ্রকাশ্যে আহার করিলেও কাঁটা ও হাড় অতি সাবধানে ভৃত্যকে দিয়া নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করাইতে হয়; কারণ তাঁহার আশঙ্কা তাঁহার প্রতিবেশীগণ ঘুণাক্ষরেও তাঁহার কার্য্যকলাপ জানিতে পারিলে তাঁহাকে সে পল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। আমি সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এত কষ্ট স্বীকারে গুজরাটী পল্লীতে বাস করিবার কি আবশ্যক? মারাঠা পল্লীতে গিয়া বাস করিলে কোনই গোল থাকে না। তিনি হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর করিলেন না। নীতি-জ্ঞান অতি প্রখর এবং পবিত্রতার আদর্শ উচ্চ না হইলে গুজরাটে আসিয়া কোন প্রবাসী আপনাকে রমণীর মোহ হইতে অব্যাহত রাখিতে পারে না!—দুই একজন বাঙ্গালী এ অঞ্চলে আসিয়া যে কলঙ্ক নিশান উড়াইয়া গিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে তাঁহারা কলুষিত করিয়াছেন। সে কলঙ্কের ইতিহাস আজ আমার স্বদেশে বসিয়া আমার দেশের কাগজে প্রকাশ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতির মুখ অবনত করাইতে ইচ্ছা নাই।

কিন্তু প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও কিছু গুজরাটী বৈচিত্র্যের উল্লেখ করিব। বলিয়াছি গুজরাটে হিন্দুধর্ম্মের আদর অত্যন্ত অধিক, সুতরাং বলা বাহুল্য দেবমন্দিরের সংখ্যাও অল্প নহে। নগরের রাজপথ প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে অজ্ঞাতনামা, বহুদেবতার অপরূপ মূর্ত্তি ত আছেই, তদ্ভিন্ন নগরের মধ্যে ছোট বড় কত মন্দির আছে তাহা নিশ্চয়রূপে বলা কঠিন। কোন মন্দিরের দেবতা গণপতি, কোন মন্দির মহাদেবের, অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণের বা বিষ্ণুর কোন মূর্ত্তির। গুর্জ্জরদিগের মধ্যে বিষ্ণুউপাসকের সংখ্যা অনেক অধিক; কিন্তু চৈতন্যদেবের নাম ইহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, বল্লভাচার্য্য চৈতন্যের স্থান অধিকার করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্যের শিষ্য-শ্রেণীর মধ্যে বঙ্গের বৈষ্ণবাদিগের মতই অপবিত্রতা ও ভণ্ডামী প্রবেশ করিয়াছে।

সন্ধ্যাকালে যখন সমস্ত দেবমন্দিরে আরতি আরম্ভ হয় তখন সুবৃহৎ নগরের মধ্যে তালে তালে একটা সুমধুর ঝঙ্কার উঠিয়া সন্ধ্যার ধূসর আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, হৃদয়ের মধ্যে একটা মধুর শান্তি ও প্রীতি, ধূপ ও চন্দনরসের ন্যায় পবিত্র এবং স্নিগ্ধগন্ধময় একটী অনবদ্য ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। এখানে আরতির সময় যে স্তবপাঠ হয় তাহার ভাষা গুজরাটী, কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরে সন্ধ্যারতির ন্যায় তাহা দীপ, ঘণ্টা ও করতালের তালে তালে ধ্বনিত হইয়া উঠে। দেবমন্দিরে স্ত্রী পুরুষ সকলে এক দ্বার দিয়া একই সময়ে প্রবেশ করে, বোধ হয় ইহার শেষ ফল বিশেষ শুভজনক হয় না। নীতিজ্ঞান এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবল না হইলে কিম্বা আত্মসম্মানরক্ষার ক্ষমতা না জন্মিলে যদি স্ত্রীস্বাধীনতা সমাজে প্রবর্ত্তন করা যায় তাহা হইলে সেই সমাজে যে সকল বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী, গুজরাটের উচ্চ নীচ সর্ব্বশ্রেণীর সমাজে সেই সকল বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীপুরুষের বিবাহে অসমবয়স গুজরাটের মানবজীবনের পক্ষে একটা শোচনীয় বিড়ম্বনার বিষয়। অবশ্য রাজপথে সর্ব্বদাই দেখা যায় যে তিন বৎসর বয়স্ক শিশু অশ্বারোহণে বিবাহ করিয়া আসিতেছে, এবং তাহার দুই বৎসর বয়স্কা প্রণয়িণী দোলায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরন্তু একজন করিয়া বয়স্ক লোক বর ও কনের দেহ রক্ষা করিতেছে।— এ বিবাহকে হয়ত অনেকে অসমান বিবাহ বলিতে প্রস্তুত হইবেন না, কিন্তু যখন দেখা যায় দশ বৎসর বয়স্ক গুজরাটী ছাত্রকে তাহার অষ্টাদশ-

বর্ষ বয়স্কা যুবতী স্ত্রী,—সঙ্গে করিয়া পাঠশালায় আগাইয়া দিতে যাইতেছে,—প্রকৃতপক্ষে বালক স্বামীটির সে একটি অতি যোগ্যা অভিভাবিকা; তখন বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। শুনিয়াছি পুরাণে লিখিত আছে, কন্দর্পদেব হরকোপানলে ভস্ম হইয়া মনুবংশে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলে বহুকাল পরে তিনি বানভবনে রতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হন; এ গল্পটা গুজরাটী অঞ্চলের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

মারাঠারা খুব হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। কিন্তু গুজরাটীদের দেখিলে কিছু মাত্র ভক্তির উদয় হয় না। দেহ হাড় এবং হাড়ের উপরই চর্ম্ম, মাংসের পরিমাণ অসম্ভব রকম কম। শুনিতে পাই আফিং খাইয়াই ইহারা দেহটিকে এমন করিয়া শুকাইয়া তুলে। বার আনা লোক কি তাহারও বেশী আফিংখোর। ইহাদের অভিফেনানুরাগ দেখিয়া চীনেদের আফিং খাওয়ার গল্প মনে পড়ে। কেহ মামলা, মোকর্দ্দমা জিতিয়াছে, কাহারো নূতন চাকরী হইয়াছে, কাহারও কোন সুখবর আসিয়াছে—গুজরাটীরা সমারোহপূর্ব্বক দল বাঁধিয়া বসিবে। একতাল আফিং জলে গুলিয়া এবং তুলায় ছাঁকিয়া সরবৎ করিবে ও সেই সরবৎ সকলে একটু করিয়া পান করিবে, বিদায় ভোজ ইত্যাদি উপলক্ষে সাহেবদের সমাজের Health drink করা অপেক্ষাও এই আফিংএর সরবৎ খাওয়া বেশী রকম সামাজিক।

এদেশে তামাকের খুব চলন আছে। কিন্তু আমাদের দেশের মত তামাক খাইবার প্রথা প্রচলিত নাই; নবাবী আমোলের ওড়গুড়ি ও ফরসির কায়দা ইহাদের নিকট অজ্ঞাত। কদাচিৎ দুই চারি জন মুসলমানকে ফরসি টানিতে দেখা যায়। নারিকেল মালার হুকাও দুই একটি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা দেখিয়া "বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি"র কথা মনে পড়ে। হয়ত আধহাত উঁচু একটা ডাবাহুঁকা তার নলটা আড়াই হাত লম্বা, অতি বিশ্রী দেখিতে। ইতর ভদ্র সকল লোকেই সিগারেট টানে। সিগারেট অবশ্য দুই রকম; ভদ্রলোকে বিলাতী সিগারেট ভিন্ন দেশী সিগারেটে ওষ্ঠদ্বয় কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন না, সাধারণ লোকে দেশী সিগারেটই টানে। দেশী সিগারেটের নাম "বিড়ি"। বৃক্ষ বিশেষের পত্রে শুষ্ক তামাকচূর্ণ জড়াইয়া 'বিড়ি' প্রস্তুত হয়। এই 'বিড়ি' পয়সায় পাঁচ সাত গণ্ডা বিক্রীত হয়। কেহ কেহ কলিকায় শুষ্ক তামাকচূর্ণ লইয়া তাহার উপর অগ্নিদান পূর্ব্বক ধূম পান করে। এই কলিকাগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে—অত্যন্ত বেশী লম্বা এবং তাহার পশ্চাদ্দেশের ছিদ্র অতি সংকীর্ণ।

গুজরাটীদিগের সহিত পথে বাহির হওয়া এক মহা বিপদ। পোষ্ট আফিসে যাইব বলিয়া যদি কোন গুজরাটীকে সঙ্গে লইয়া বেলা পাঁচটার সময় বাসা হইতে বাহির হন তাহা হইলে রাত্রি আটটার আগে এক মাইল দূরবর্ত্তী ডাকঘরে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। পথে একজন গুজরাটীর সহিত সঙ্গী বন্ধুটীর সাক্ষাৎ হইলে আর রক্ষা নাই, দুজনে যে আলাপ আরম্ভ হইল তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। আপনার বিশেষ তাগাদায় যদি সঙ্গী বন্ধুটি আগন্তুককে পরিত্যাগ করে তথাপি বিশ্বাস নাই, দুই তিন মিনিট কাল চলিয়া আবার দুজনে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গল্প আরম্ভ করিবে। এইরূপ পাঁচ সাতবার ফেরাফুরা করিয়া অবশেষে অগত্যা তাঁহাদের আলাপ শেষ হইবে। তাহার পর বন্ধুটি যদি দ্বিতীয় এক পরিচিত ব্যক্তির হাতে পড়েন তাহা হইলে আপনাকে হয় তাঁহার আশা, না হয় তাঁহার অভিপ্রেত কাজের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; সময়ের মূল্য সম্বন্ধে আমরা বাঙ্গালী বড়ই উদাসীন—কিন্তু সময়ের যে একটা মূল্য আছে, গুজরাটীদের এ ধারণা আছে বলিয়াই বোধ হয় না।

শোকের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও গুর্জ্জর রমণীদিগের অনুষ্ঠানের উপদ্রব দেখা যায়। একজন গুজরাটীর মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারে শোক প্রকাশের যে প্রকার আয়োজন উপস্থিত হয় তাহা অতি ভয়ঙ্কর। আত্মীয়া প্রতিবেশিনী যে যেখানে থাকে সকলকেই মৃতের গৃহে উপস্থিত হইতে হয়, বিশ পঁচিশ জন সমবেত হইলে তাহারা গোল হইয়া দাঁড়ায় এবং মৃত ব্যক্তির গুণবর্ণনাপূর্ব্বক সকলে সুর করিয়া সমস্বরে রোদন করে ও উভয় হস্তে বুক চাপড়ায়। এই প্লেগের হাঙ্গামার সময় কোন পল্লীতে এরূপ এক দল স্ত্রীলোকের ক্রন্দনরোল শুনিয়া মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি প্রলয় আরম্ভ হইয়াছে; কোন পল্লীতে দুই তিনটি গুজরাটী লোক মরিলে সে পল্লীতে অনভ্যস্ত ব্যক্তির বাসকরা দুঃসাধ্য; মৃত্যুভয়টা যেন দায়ার ন্যায় দিবারাত্রি কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্লেগের সময় গুজরাটী রমণীদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে মনটিকে চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের খাতার সামিল করিয়া রাখিতে

হয়। ইহা এই মারাত্মক রোগের অভ্যর্থনা সূচনা করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গুজরাটী রমণীগণ রঙ্গকরা বস্ত্র ভিন্ন ব্যবহার করে না। ঘাগরার মত করিয়া কাপড় পরা, তাহার মধ্যে আর একটা আবরণ থাকে, ধরিতে গেলে বস্ত্রপরিধান বিষয়ে ইহারা বঙ্গরমণীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের সূক্ষ্মবস্ত্রগুলি লজ্জাশীলতাকে পরিপাটীরূপে বিসর্জ্জন দিয়া অসঙ্কোচে সৌখীন বঙ্গরমণীমহলে রাজত্ব করিতেছে, কিন্তু গুজরাটীরা কখন পাতলা বস্ত্র ব্যবহার করে না। মারাঠীদের মত ইহারাও কাঁচুলী ব্যবহার করে, কিন্তু তাহাকে ঠিক বক্ষাবরণ ভিন্ন অন্য নাম দেওয়া যায় না। পিঠের দিক সম্পূর্ণ অনাবৃত। বোধ হয় ইহারা কাপড় বাজে খরচ করিতে চাহে না;—গুজরাটী কৃপণতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত! কিন্তু মারাঠী কাঁচুলী এরূপ অসম্পূর্ণ নহে। গুজরাটী রমণীদিগের দন্ত আর একটি আলোচনার উপযুক্ত পদার্থ। সাদা দন্ত কাহারও নাই; কাহারো দাঁত Stephen এর Blue black কালি শুকাইলে যেমন অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়, সেইরূপ দাঁতে মিশির বার্ণিস লাগানোর মত, কাহারও দাঁত লাল—হিঙ্গুল বিনিন্দিত লোহিত, অতি কদর্য্য দেখায়। আর একশ্রেণী আছে—সম্ভবতঃ ইহারা আভিজাত্যলোলুপ, এবং সুবর্ণের মূল্য জীবনের সুখ শান্তির মূল্য অপেক্ষা অধিক বিবেচনা করে, কারণ ইহারা অবলীলাক্রমে প্রকৃতিদত্ত দন্তগুলি বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্ণদ্বারা কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত করাইয়া তাহাই ব্যবহার করিতে ভালবাসে, জানি না তাহাদের উদ্দেশ্য এই কি না যে—'একটু হাস্য করি, অদৃষ্টবন্তগণ, আমাদের সুপীত দন্তচ্ছটা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনের অন্ধকার বিনাশ কর।'

গুজরাটের বিভিন্ন ব্রাহ্মণশ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রথা (Intermarriage) প্রচলিত নাই। এবিষয়ে আমাদের রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি এবং গুজরাটের ঔদিচ, নাগর প্রভৃতির আদর্শ অভিন্ন। শুনিয়াছি পরস্পরের গৃহে ভোজনে বাধা নাই। 'দয়াভ্রষ্টাতু নাগরাঃ" অতিরিক্ত শুচিপ্রিয়--বিশেষতঃ রমণীগণ। পৃথিবীতে দেখা যায় যাহারা যত বেশী ভণ্ড তাহারা তত বেশী অনুষ্ঠানের আড়ম্বর করে। আমাদের স্বদেশও এরূপ ভক্তিহীন অনুষ্ঠানপ্রিয়ের সংখ্যা অল্প নহে। নাগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই একটা প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখা যায় যে স্নান করিয়া তাহারা রন্ধনশালায় প্রবেশ করে ও আহারের পর একেবারে দিবসের মত পাকগৃহ ত্যাগ করে; ইতি মধ্যে দৈবাৎ যদি তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য দুই একবার রন্ধনাগার ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেকবারের জন্য তাহারা স্নান করিতে বাধ্য।

ইহাদের আহার সম্বন্ধে যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি তাহাও অল্প বিস্ময়কর নহে। মনে করুন বড় একটি ব্যাপার উপলক্ষে একস্থানে অনেকগুলি গুজরাটীর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তখন কিরূপ ফলাহারের দৃশ্য আপনার কল্পনা নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইবে? গ্রেট ঈষ্টার্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ীর bill of fare পর্য্যন্ত মিলাইলেও গুজরাটী ফলাহারের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবার যো নাই। এ ফলার অদ্বিতীয়, কারণ প্রথমেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের লাড়ু ভক্ষণ, ইহা ঘৃত, ময়দা ও চিনির পাক, আস্বাদন শুনিয়াছি ভালই। এই লাড্ডু এক একটার পরিমাণ প্রায় আধসের, এই প্রকার আট দশটি লাড্ডু ভক্ষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করা হয়। তাহার পর লুচি আসিল—সঙ্গে সঙ্গে তরকারী। আমাদের দেশে গরম লুচি একটি অন্যতম সুখাদ্য পদার্থ, কিন্তু গুজরাটীরা গরম লুচির নামও সহিতে পারে না। এমন অপকারী পদার্থ দুনিয়ায় দ্বিতীয় নাই বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস, সেই জন্য লুচিটাকে কিছুকাল রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। তরকারীর পর পায়েস; পায়েসে লুচির পত্তন মিটিয়া গেলে ভাত ও টুমুরের ডাল পরিবেশন আরম্ভ হয়। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" কথাটা গুজরাটী ফলারে একেবারেই খাটে না।

গুজরাটী মহাশয়দের অনেক নিন্দা করিলাম। প্রশংসা করিবারই ইচ্ছা ছিল, ঠিকভাবে দোষগুণ দেখাইতে গিয়া যদি কোন ত্রুটী করিয়া থাকি তবে তাহা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে। বলিয়াছি গুজরাট এখন অন্ধকার, এক সময় গুজরাটের অতি উন্নতি হইয়াছিল, এখন অবনত, ঘোরতর অবনতি। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে' কথাটা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে আবার গুজরাট উঠিবে, কিন্তু কত কালে তাহা কে বলিবে? এক কথা, এখন গুজরাটে মানুষ নাই।

গুজরাটী সাহিত্যের অবস্থা শুনিয়াও এই কথাই মনে হয়। অল্প দিন পূর্ব্বে 'কেরন ঘেল' (The last of the Rajput kings in Guzrat) নামক একখানা বহি হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। পুস্তকখানি বাঁধান অতি সুন্দর, কাগজ ভাল, পাঁচ সংস্করণে পড়িয়াছে; দেখিয়া পুস্তকখানি পড়িবার জন্য একটু কৌতূহল হইল। কিন্তু একরাজা প্রথম দিকের এক সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদে কেবল প্রাসাদ হইতে নগরে বাহির হইতেছেন দেখিয়াই ভক্তি চটিয়া গেল। 'কেরন ঘেল' সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুজরাটী উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু যে উপন্যাসে রাজা বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী আয়োজন করিয়া নগরে বহির্গত হন সে উপন্যাস প্রকৃত কাব্য-সৌন্দর্য্যের অগ্নিপরীক্ষায় টিকিবে কি না সন্দেহ। প্রথম শ্রেণীর সৃজনোন্মুখী প্রতিভা হইতে অসার বাহুল্য কথা বহির্গত হয় না। আমার এক জন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু বলিতেছিলেন যে তিনি একদিন গুজরাটী ভাষায় 'নলদময়ন্তীর' উপাখ্যান পাঠ করিতেছিলেন। দময়ন্তীর হাত হইতে দগ্ধ শোলমৎস্য পলায়ন করায় নলের ভারি রাগ, শুধু রাগ নয় অবিশ্বাস, নল বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "পোড়া মাছ কি আর কখন জলে পলাতে পারে, ও মিথ্যা কথা; আমায় ফাঁকি দিয়া তুই মাছটী খেয়েছিস্।" প্রাতঃস্মরণীয়া সতীশ্রেষ্ঠা মধুরচরিত্রা দময়ন্তী ক্ষুধিত স্বামীকে বঞ্চিত করিয়া শোলমাছ চুরী করিয়া খাইয়াছে! ইহাতে শুধু কাব্য-সৌন্দর্য্য নয়—কাব্যের নায়ক-নায়িকাদিগকে পর্য্যন্ত জবাই করা হয়। গুজরাটের হিন্দু (অধিকাংশস্থলে ব্রাহ্মণ) লেখকগণ এইরূপেই জবাই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এই অপূর্ব্ব কথা পাঠ করিয়া আমার প্রস্তাবিত বন্ধু মহাশয় অতঃপর এই গুজরাটী কাহিনী পাঠে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই।

এক্ষণে একটিমাত্র রহস্যের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গুজরাটের একজন গুজরাটী লেখক শুনিয়াছি বঙ্গভাষায় সুবিদ্বান। তিনি নাকি কিছুদিন কলিকাতাতেও ছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া তিনি দুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদে কৃতসঙ্কল্প হন, কিছুদিন পূর্ব্বে এই অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু অনুবাদে যে প্রকার ভ্রমপ্রমাদ আছে তাহাতে উক্ত অনুবাদক মহাশয়ের যে বঙ্গভাষার সহিত কিছু পরিচয় আছে এমন বোধ হয় না। বোধ হয় তিনি দুর্গেশনন্দিনীর ইংরাজী অনুবাদ হইতে গুর্জ্জর ভাষায় তাহা ভাষান্তরিত করিয়াছেন; এইরূপ 'সাতনকলে আসন খাস্ত' হইয়াছে। ইংরাজ অনুবাদক না বুঝিয়া "গোপাল উড়ের যাত্রার" অনুবাদে লেখেন "journey of flying Gopal" আর আমাদের এই গুজরাটী অনুবাদক মহাশয় একস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন, "ভেক প্রাসাদশিখরে বসিয়া গম্ভীর স্বরে শব্দ করিতে ছিল।" দুর্গেশ নন্দিনীতে আয়েসার গৃহচূড়ায় উপবিষ্ট পেচকের কর্কশ কণ্ঠধ্বনি, অনুবাদে ভেকের 'মকধ্বনি'তে রূপান্তরিত হইয়াছে; এই স্বরগত বিভ্রাটের জন্য আমাদের গুজরাটী বন্ধুর ত্রুটী উপেক্ষা করিতে পারা যায়; কিন্তু অসময়ে প্রাসাদশিখরে ভেকের আনন্দসঙ্গীতের অসম্ভাব্যতা যিনি বুঝিতে অক্ষম, কোন দেশের পাঠক তাঁহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চাণক্য।

মহাত্মা চাণক্য যে কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন উহার কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রসিদ্ধ মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের জীবনীর সহিত তাঁহার জীবনী এত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ যে, চাণক্যের আবির্ভাবের কাল সেই সময়ে নির্দ্দেশ করিলে কোনও প্রমাদ দৃষ্ট হইবে না।

উইলসন্, কোলব্রুক, টার্ণার, প্রিন্সেপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত সময় নিরূপণে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অবশেষে বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ সুপ্রসিদ্ধ রিস্ ডেভিড্স্ স্থির করিয়াছেন যে প্রায় ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হয়। * সুতরাং সেই সময়েই আমাদের মহাত্মা চাণক্যদেব যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন উহাতে অণুমাত্র সংশয়ের কারণ নাই। আমাদের ইহা অতীব দুরদৃষ্টের বিষয় যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের জীবন-

* Numismata Orientalia, 1877. p. 41 on the Ancient coins and Measures of Ceylon. By T. W. Rhys Davids.)

বৃত্তান্ত ঘোরতম অন্ধকূপে নিহিত, সুতরাং এই সকল লুপ্ত মহার্ঘ্য রত্নরাজির বিবরণ নিঃসংশয়রূপে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, চাণক্যের জীবনবৃত্তান্ত ঘোর তমসাচ্ছন্ন নহে। বৈদেশিক ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় চাণক্যজীবনী সম্বন্ধে অনেক বিষয় নির্ণয় করিতে পারা যায়।

চাণক্য দেবের প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। নীতিশাস্ত্রবিদ্ প্রসিদ্ধ চণক মুনির বংশোদ্ভূত বলিয়া তাঁহার নাম চাণক্য। এতদ্ভিন্ন তাঁহার 'দ্রোমিল', 'অংগুল', 'কৌটিল্য' প্রভৃতি আরও কয়েকটী নাম ছিল। 'কৌটিল্য'—এই নামটিও তাঁহার বংশসূচক উপাধি। কামন্দক নীতির প্রসিদ্ধ টীকাকার 'কৌটিল্য' নামের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "কূটো ঘটস্তং ধান্যপূর্ণং লান্তি সংগৃহ্ণন্তি ইতি কূটলাঃ কুম্ভীধান্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেষাং গোত্রাপত্যং কৌটিল্যো বিষ্ণুগুপ্তো নাম", 'কূট' অর্থাৎ ধান্যপূর্ণ কুম্ভ যাঁহারা সঞ্চয় করেন, তাঁহাদিগকে 'কূটল' বলে। কূটল শব্দের অপর পর্য্যায় 'কুম্ভীধান্য', যাঁহারা এক বৎসরের জীবিকার উপযোগী ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাদৃশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরা 'কূটল' বা 'কুম্ভীধান্য' নামে খ্যাত হয়েন। চাণক্যের আদি পুরুষেরা ঐরূপ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া চাণক্য 'কৌটিল্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'কুটিল' শব্দ হইতেই 'কৌটিল্য' নামের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি কুটিল রাজনীতির উপাসক ছিলেন বলিয়া 'কৌটিল্য' নামে সুপরিচিত। এইজন্য অধ্যাপক উইলসন চাণক্যকে ভারতের ম্যাকিয়াবেল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জীবনীর সহিত মহাত্মা চাণক্যের জীবনী এতদূর সংবদ্ধ যে, চাণক্যের জীবনী আমাদের পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে হইলে, চন্দ্রগুপ্তের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত না করিলে তাঁহারা কোনক্রমেই উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

মগধদেশে পুরুবংশীয় সুবিখ্যাত জরাসন্ধের রাজত্বের পরে ক্রমে ক্রমে ৩৭ জন ভূপাল রাজত্ব করেন। তৎপরে মহাবলশালী দৌর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত নন্দ মহীপাল মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমে উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলই স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, যৎকালে বীরশ্রেষ্ঠ আলেক্‌জেণ্ডর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, নন্দরাজ বিংশতি সহস্র হয়, ও দুই লক্ষ পদাতি এবং বহুসংখ্যক হস্তিসৈন্য সমভিব্যাহারে সেই প্রচণ্ড বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। নন্দের নয়টি তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ। চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ হইলেও এক রাজকিঙ্করীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইলেও দাসীগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সুযোগ পাইলেই তাঁহার অপমান করিত, সুতরাং তাঁহার নিকট জীবন অতীব কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হইত এবং এইজন্য তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই গভীর দুঃখসাগরে মগ্ন থাকিত। মহারাজ নন্দের রাক্ষস ও শকটার নামে দুই বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিল। নন্দ কিছু ক্রোধশীল ছিলেন। কোন দোষের কারণ সংঘটিত হইলেই জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারণ করিতেন। একদা কোন কারণ বশতঃ মন্ত্রী শকটার কোন ক্রোধোদ্দীপক কার্য্য করেন। এই বিষয় অবগত হইয়া নন্দের রোষবহ্নি প্রচণ্ড কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি শকটারকে সপরিবারে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ কারাবাস এবং অনশন যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া শকটারের সমস্ত পরিবার একে একে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কেবল শকটার বৈরনির্য্যাতন পিপাসা মিটাইবার জন্য কোনমতে প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে কারামুক্ত হইলেন এবং পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি একাকী দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ মনোযোগ সহকারে কুশগাছ সমূলে উৎপাটন করিতেছেন। এই ঘটনা সন্দর্শনে শকটার অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"মহাশয়! আমার নাম বিষ্ণুগুপ্ত। পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত যাতনাভোগ করিয়াছি এবং এই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কুশমূল এককালে সমূলে বিনষ্ট করিব।" শকটার

চাণক্যের কার্য্য ও বাক্যে সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞাশালী,বুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি। কোনও কৌশলে নন্দের প্রতি চাণক্যের ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিয়া দিতে পারিলেই নন্দবংশ সমূলে ধ্বংস এবং তাঁহারও প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইবে। অনন্তর তিনি গললগ্নীকৃতবাসে অবনতজানু হইয়া চাণক্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং কহিলেন, মহাত্মন্, এদাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আমার সহিত নগরে আসিয়া বাস করুন। আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব। চাণক্য শকটারের ভক্তি ও বিনয় দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন ও তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইয়া শকটারের গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রাজার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিন আসিল। প্রাচীন বিশ্বাসী মন্ত্রী রাক্ষসের উপর একজন বিজ্ঞ পাত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য সমস্ত ভার অর্পিত ছিল, কিন্তু রাক্ষসের এবং অন্যান্য সকলের অজ্ঞাতসারে চাণক্যকে লইয়া শকটার রাজবাটিতে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া ছলপূর্ব্বক সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রাক্ষস সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া চাণক্যকে দর্শন করিলেন এবং উহার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মহারাজ নন্দকে এই ঘটনা জ্ঞাত করাইলেন। রাজা নন্দ শকটারের এই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া দ্রুতপদে শ্রাদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন এবং চাণক্যকে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানে সেই উচ্চাসন হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ এই বিসদৃশ অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। রাজানুচরগণ চাণক্যের শিখাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আসন হইতে নামাইয়া দিলেন।

ভীমদর্শন ভুজঙ্গম যেমন চরণাঘাতে গর্জ্জন করিয়া উঠে, ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, সভামধ্যে অপমানিত হইয়া তেজস্বী চাণক্যেরও রোষবহ্নি সেইরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি কম্পান্বিত কলেবরে ভূমিতলে ভীমনাদে পদাঘাত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "অরে পাপিষ্ঠ! তুই যেমন বিনা কারণে আমার এই ঘোর অপমান করিলি, যত দিন না আমি নন্দবংশ সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিব তত দিন আমি আর এই শিখা বন্ধন করিব না।" এই বলিয়া মহাতেজে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তদীয় কৃষ্ণবর্ণ শিখা কালসর্পিণীর ন্যায় দোলায়মানা হইতে লাগিল।

চাণক্যের কালানলসদৃশ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই সুচতুর শকটার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। নন্দের অশেষ দোষ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘোষণ পূর্ব্বক চাণক্যের রোষানল অধিকতর প্রজ্বলিত করিলেন। চাণক্য শকটারের নিকট হইতে সমস্ত গৃহচ্ছিদ্র বিশদরূপে অবগত হইলেন।

চন্দ্রগুপ্তও তদীয় ভ্রাতৃগণের অযথা ও অসহনীয় অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন। চাণক্যের ন্যায় কৌশলী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা লাভ করিতে পারিলে তিনি যে, দুঃখ-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন উহা তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলেন। কার্য্যসিদ্ধির জন্য অবশেষে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং চাণক্যও তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলেন। চন্দ্রগুপ্তও নগর পরিত্যাগ করিলেন এবং তপোবনে সঙ্গোপনে চাণক্যের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা ম্লেচ্ছাধিপ পর্ব্বতেন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কথা হইল, যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে পর্ব্বতেন্দ্র অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবেন।

তদনুসারে ভীষণ সমরানল উপস্থিত হইল। নন্দের সিংহাসন ভীষণ ভূকম্পনে কম্পিত হইল। চাণক্যের প্রদীপ্ত সুদর্শনতুল্য কৌশল অস্ত্রে ঠেকিয়া নন্দের সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া ভূমিতল চুম্বন করিল। নন্দের অভ্রংলিহ গৌরবচূড়া ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। চাণক্যের কৌশলে একে একে সকলেই নিহত হইলেন। মহাবুদ্ধি রাক্ষসমন্ত্রী চাণক্যের প্রাণ বিনাশের জন্য অকাতরে শত শত কৌশলজাল বিস্তার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। চাণক্য পণ্ডিত অদ্ভুত বুদ্ধি প্রভাবে বিপক্ষপক্ষ ধ্বংস করিয়া গভীর প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইলেন। নন্দের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তকে অভিষিক্ত

করিয়া প্রবলপ্রতাপে ও অতুল গৌরবে তদীয় মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য সকল শত্রুই শমনভবনে গমন করিল বটে, কিন্তু চাণক্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আততায়ী রাক্ষস কিছুতেই বিনষ্ট হইলেন না। রাক্ষসও মহাবুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়শীল ছিলেন। তিনি অশেষরূপে চন্দ্রগুপ্তের ধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী রাক্ষস কর্ম্মসূত্রে চাণক্যের ভীষণপ্রতিযোগী ও পরম শত্রু হইলেও, মহাত্মা চাণক্য উঁহার নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি, অসীম কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অপ্রতিহতপ্রভাব, অসামান্য মন্ত্রণাকুশলতা ও দৃঢ়অধ্যবসায় দর্শন করিয়া মনে মনে উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং উঁহাকে ঐকান্তিকী ভক্তি করিতেন।

চাণক্য মনে মনে ইহা চিন্তা করিলেন,—আমি যে কুটিল নীতিসাগরে ঝম্ফ দিয়া পড়িয়াছি উহা কোন অংশেই পবিত্র ব্রহ্মবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণের উপযোগী নহে। আমি যে প্রতিজ্ঞার জন্য এই কুটিল নীতিতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হইয়াছে। অতএব আমাকে শীঘ্রই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে গমনপূর্ব্বক সেই যোগজীবন দেবাদিদেব ব্রহ্মার আরাধনা করিতে হইবে, কিন্তু মহাবুদ্ধি রাক্ষস বিপক্ষ থাকিলে এবং স্বয়ং মন্ত্রিত্বপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, প্রাণাধিক প্রিয়শিষ্য চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কদাচ কণ্টকশূন্য হইবে না। এই চিন্তা করিয়া তিনি রাক্ষসকে পবিত্র ও সুদৃঢ় প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধিতে স্থির করিলেন। চাণক্যের বজতুল্য নীতিকৌশলে অবশেষে তাহাই সংঘটিত হইল। চাণক্য আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাদ্বারা রাক্ষসের প্রীতি সম্পাদন করিলেন, এবং তাঁহাকে শপথ করাইয়া মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৺

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

—০—

বুদ্ধগয়া।

বুদ্ধগয়া ভারতের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। শুধু ভারতের কেন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটী পুণ্যভূমি বলিয়া খ্যাত। যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল এবং যাহা আজিও পৃথিবীস্থ অর্দ্ধেক জনমণ্ডলীর আশ্রয় সেই বিমল জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্মেষ এই স্থানেই হইয়াছিল। কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, শ্রাবস্তী, বৈশালী ও কুশীনগর এই কয়টী স্থান বুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কপিলবস্তু বুদ্ধের জন্মস্থান। বুদ্ধগয়া তাঁহার সিদ্ধিভূমি। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ বা মৃগদাবে তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। শ্রাবস্তী ও বৈশালী তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। কুশীনগরে তিনি দেহত্যাগ ও নির্ব্বাণলাভ করেন।

বহুদিন যাবৎ সাধ ছিল বুদ্ধগয়া দর্শন করিব। নানা কারণে অনেকদিন পর্য্যন্ত সে সাধ পূর্ণ হয় নাই,—সনের ফাল্গুন মাসে আমার জনৈক বন্ধু এবং আমি দুইজনে হাবড়া হইতে রওয়ানা হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা ছাড়িয়া আর কখনও পশ্চিমদিকে যাই নাই। সুতরাং আমরা আগ্রহের সহিত রেল পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিতে লাগিলাম। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আমাদের সন্ধ্যা হইল। আমি সে রাত্রে নিদ্রা যাই নাই বলিলেও হয়। যখন গাড়ী সমতল বঙ্গভূমি ছাড়াইয়া পর্ব্বতশ্রেণীপরিশোভিত প্রদেশে যাইয়া পড়িল তখন সেই শুভ বাসন্তী জ্যোৎস্নায় প্রকৃতির যে স্বপ্নময়ী মাধুরী দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। আমরা পরদিন বাঁকীপুর পৌছি। বাঁকীপুরে একদিন থাকিয়া আমরা গয়ার দিকে রওয়ানা হইলাম। আধুনিক পাটনা পুরাকালে পাটলীপুত্র নামে অভিহিত হইত ও বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল। আমরা এই ঐতিহাসিক ভূভাগের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে মনে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলাম। গয়ার নিকটে রেলপথের পার্শ্বে অনেক গুলি পাহাড় আছে। এই সকল স্থানে প্রাচীন কালের অনেক ধ্বংশাবশেষ আছে। ৩ ঘণ্টা পরে আমরা গয়া পৌছিলাম। রাজগৃহ, পাটলীপুত্র প্রভৃতির ন্যায় গয়াও এক সময়ে প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে গয়া হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই নগরী অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর তীরস্থ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য হৃদয়গ্রাহী। এখানে দর্শনীয় জিনিষ অনেক আছে। আমরা সে গুলি দর্শন করিয়া বুদ্ধগয়া যাত্রা করি। বুদ্ধগয়া, গয়া হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে। বুদ্ধগয়া যাইবার পথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি আম্র বাগান ও খেজুর বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হয়। সে গুলি বড় সুন্দর দেখায়।

বুদ্ধগয়া পৌঁছিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধগয়ার ভুবনবিখ্যাত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

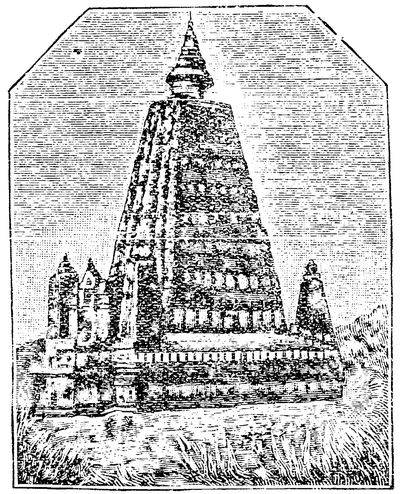

বুদ্ধগয়ার মন্দির বহুকালের প্রাচীন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ইহা খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ্বংসী কালের প্রভাবে এই উন্নত মন্দিরটী একবারে পতনোন্মুখ হইয়াছিল। এমন কি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাক কিম্বা অন্য কোন পক্ষী বসিলে ইহার প্রস্তর খসিয়া পড়িত। ১৮৮০ খ্রীঃ সহৃদয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার হয়। আমরা মন্দিরের সম্মুখীন হইয়াই মন্দিরের গায়ে প্রস্তরে খোদিত নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিলাম।

This ancient temple of Mahabodhi erected on the holy spot where Prince Sakya Sinha became Buddha was repaired by the British Government under the order of Sir Ashley Eden, Lieutenant-Governor of Bengal. A. D. 1880.

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপাকটাক্ষপাত না হইলে ভারতের একটী অতুলনীয় প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট হইত। তাই মনে মনে বঙ্গের ছোটলাট ইডেন সাহেবকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম।

মন্দিরটী সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিতল। নিম্নতল হইতে ইহার চূড়া ১০০ ফুট। যাঁহারা বৌদ্ধ মন্দির কখনও দেখেন ই, তাঁহাদিগকে ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া ঠিন। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের ময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। মূর্ত্তির উপরে সোণার গিল্টি আছে। পূর্ব্বে এই মন্দিরে কৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত বুদ্ধের একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহা স্থানান্তরিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ উপরোক্ত মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি আছে। নিম্নতলে যে কক্ষে বুদ্ধের মূর্ত্তি তাহা পার হইয়া আর একটী বৃহৎকক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ভিতর "মায়া দেবীর" মূর্ত্তি সংস্থাপিত।

মন্দিরের পশ্চাদ্দেশে পশ্চিমদিকে সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম। বোধিদ্রুম দেখিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস মনে পড়ে। শাক্যসিংহ গৃহত্যাগের পর কিয়ৎকাল রাজগৃহের সন্নিকটে দুই জন ব্রাহ্মণ যোগীর নিকট অধ্যয়ন করেন। শারীরিক কৃচ্ছ্র ও অনশনাদিই মুক্তিলাভের উপায় তাঁহাদের নিকট এই শিক্ষা করিয়া পাঁচ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে তিনি দক্ষিণপূর্ব্বদিকস্থ উরুবিল্ব নামক গভীর অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এখানে আসিয়া এক বৃহৎ বিটপীমূলে ৫ বৎসরেরও অধিককাল তিনি অনশনাদি কৃচ্ছ্র সাধন করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার শান্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ হইল না। তখন গভীর সন্দেহ ও নৈরাশ্য শাক্যসিংহের প্রাণ আকুল করিল। এই সময়ে মানবের শত্রু পাপরূপী "মার" আসিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিল। শাক্যের সহিত মারের সংগ্রাম ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে অলৌকিক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে শয়তান কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের প্রলোভন কাহিনী আমাদের মনে পড়ে। "মার" পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, এবং শাক্য দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। অনশনাদি শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন নির্ব্বাণের পথ নহে। কর্ম্মানুষ্ঠান এবং বাসনার বিনাশই নির্ব্বাণমুক্তির একমাত্র উপায়। এই মহৎ সত্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। মহত্তর জীবনের উপদেশ প্রদান ও সত্যপ্রচার এখন হইতে তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তিনি বুদ্ধ হইলেন। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে শাক্য দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তর কালে ইহা "বোধিদ্রুম" নামে খ্যাতি লাভ করে। প্রাচীন "বোধিদ্রুম" এখন নাই। বহুকাল অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া সেই পবিত্র বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে ও তাহার কতকগুলি খণ্ড "কলিকাতা মিউজিয়ামে" রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন বোধিদ্রুমের স্থানে আর

একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাচীন বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। বৃক্ষের নিম্নে একটী বেদি আছে। যে স্থানে বুদ্ধ উপবেশন করিতেন সেই স্থানেই পরে বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটী পুষ্করিণী আছে; ইহা বহু-কালের প্রাচীন। বুদ্ধ-মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ সমস্তই মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত ছিল। অধুনা খননের পর বহির্গত হইয়াছে। মৃত্তিকার নিম্নে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেকগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে স্থানান্তরিত ও রক্ষিত হইয়াছে।

বুদ্ধগয়া "নৈরঞ্জনা" তীরে অবস্থিত। নৈরঞ্জনা'র পূর্ব্বদিকে সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়া হইতে দেড়ক্রোশ দূরে একটী গ্রাম আছে। তত্রত্য ভূম্যধি-কারীর "সুজাতা" নাম্নী একটী কন্যা বুদ্ধের তপস্যাকালে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন ও তাঁহাকে আহার্য্য প্রদান করিতেন। এডুইন আরনল্ড (Edwin Arnold) প্রণীত "এসিয়ার আলোক"(Light of Asia) নামক গ্রন্থে এই বিষয়টী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বুদ্ধগয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমরা মহা-ন্তের বাড়ী দেখিতে গেলাম। মহান্ত একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। এ স্থানে ৭।৮টী শিবমন্দির ও একটী দশভুজার মন্দির আছে। পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মশালা বা অতিথিনিবাস। কিয়দ্দূর দক্ষিণে একটী সুরম্য অট্টালিকা আছে। উহাতে ইউরোপীয় দর্শকগণ সময় সময় বাস করেন।

বুদ্ধগয়া দেখিয়া আমরা গয়া ফিরিয়া আসিলাম। এই স্থানের স্মৃতি হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—০—

মানসী।

আর কত বল ভুলাবে আমারে,
মানসকুঞ্জবাসিনি!
নবীন শোভায় নিত্য বিকশি'
চিত্তগগনে পূর্ণিমা-শশী,
একি গো রঙ্গে খেলাকর বসি'
সুন্দর শুভহাসিনি!

নব নব সাধ জাগাও পরাণে
নীরব মঞ্জুভাষিণি!

হেরি রূপ তব নিত্য নূতন,
অয়ি নির্ম্মলবরণে!
মনে নাই কবে কোন্ সুলগনে
কোথা আমাদের দেখা দুইজনে;
কি মূরতি ধরি' অয়ি বরাননে
নূপুর-মুখর চরণে
পশেছিলে আসি' হৃদয়ে আমার,
আজ নাই তাহা স্মরণে।

সংসার নিতি আসে মোর পাশে
হাতে লয়ে মায়া-শিকলি,
প্রকৃতি আমায় করে আবাহন
দেখায়ে তাহার শোভা অগণন,
পারে না বাঁধিতে কেহ মোর মন
তুচ্ছ নেহারি সকলি।—
উজ্জ্বল তব রূপ অতুলন
জেগে থাকে হৃদে কেবলি!

তাই হেথা বসি' বিজন বিপিনে
বনমর্ম্মর পবনে,
মানসে ও মুখ করি' দরশন,
শুনি' শুধু তব অমিয় বচন,
ভুলে আছি আমি জীবন মরণ
কঠিন মলিন ভুবনে।
দিবস রজনী রেখেছ ভুলায়ে
স্বর্গের নব স্বপনে।

কত নব নব ছলনার পাশে
রেখেছ হৃদয় বাঁধিয়া!
কভু মুখ ঢাক টানি' আবরণ,—
কখনো মুক্ত অবগুণ্ঠন,
কভু হাসি,—কভু মান অকারণ,
কখনো বা উঠ কাঁদিয়া!
কখন মৌন, কখনো সোহাগে
সান্ত্বনা কর সাধিয়া।

কাছে থাকি' তবু থাকিবে কি দূর,—
কখনও চির-জীবনে,
অয়ি মায়াবিনি অরুণ-অধরা
আকুল-অলকা নীল-অম্বরা,
বাহু বন্ধনে দিবে নাকি ধরা
মর্ত্ত্য বাসর শয়নে!—
বাহিরিয়া আসি' অন্তর হ'তে
থাকিবে নয়নে নয়নে!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

—০—

সোণার ছবি।

হেমন্তেরি নীরব স্নিগ্ধ শান্ত দুপর বেলা,
বকুল তলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধূলা নিয়ে আপন মনে খেলা করে' খানিক
ঘুমিয়ে গেছে জাদু আমার ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।

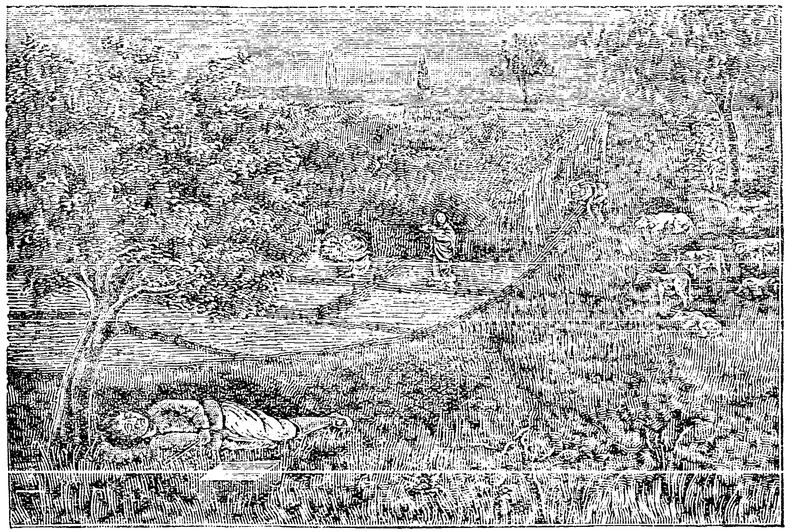

ধূলার প্রাসাদ তৈর করে' বাছার গরব ভারি;
নিজের বাহাদুরিটুকু কর্ত্তে যেন জারি
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙা,
হাস্তে আরো মিষ্ট করে' ওষ্ঠ দুটি রাঙা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে;—
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে,
হাতের কাঠি রৈল হাতে মুখের হাসি মুখে,
চক্ষু দুটি মুদে এল;—শীতের শান্ত দুপর
সোনার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

মন্দীভূত করে' আরো শীতের সুর্য্যতাপে
বহে বাতাস;—চুলগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে।
মর্ম্মরিয়া শৌভ্রতলে তরুর পত্র নড়ে,
ঝিকিমিকি কিরণ বাছার মুখে এসে পড়ে;
উপর দিকে ঘনশ্যামল চন্দ্রাতপ রাজে;
নীচের শাখে ঘুঘু ডাকে পাতার কুঞ্জমাঝে;
ঘিরে তারে চারিধারে, হরিৎ ক্ষেত্র হেন
রবির করে ছবির মতন—নড়ে নাক যেন;
বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে;
বাজায় বেণু রাখাল বালক বাবলা গাছের তলে;
সিঁচোয় বারি কৃষক-নারী আলুর ক্ষুদ্র মাঠে;
সুদূর জলায় পুরুষগুলি শীতের ধান্য কাটে;
পথের গায়ে ইক্ষু ছায়ে হরিণ বসে থাকে;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কাঁকে;—
চারি দিকে এমন শান্ত নীরব মধুর ছবি,
ধূধূ করে ধূসর আকাশ, কিরণ দিচ্ছে রবি,
তার মাঝেতে সবার সেরা, সবার মধ্যস্থলে,
ঘুমিয়ে গেছে আমার বাছা বকুল গাছের তলে।

ওগো তোরা কতই জিনিষ দেখেছিস্, না জানি,
দেখেছিস কেউ কোন খানে এমন ছবি খানি ?
একা একা—না হতে তার সাঙ্গ ধূলা খেলা,—
এমন স্থানে এমন নিদ্রা এমন দুপর বেলা ;—
পায়ের তলে ফেটে পড়ে তরুণ স্বর্ণপ্রভা,
ঘুমিয়ে দুইটি মুঠোর ভিতর দুইটি রক্তজবা,
দুইটি গণ্ড' পরে' দুইটি রক্ত পদ্ম ফোটে ;
অরুণ-রেখা লেপেছে কে দুইটি রাঙা ঠোঁটে,
বৃক্ষমূলে হেলান দিয়ে বৃক্ষে রেখে মাথা,
বিরল দুইটি ভুরুর নীচে আঁখির দুইটি পাতা ;
বকুল গাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধরে ছাতি ;
মাটির উপর দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি' ;
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী উপরে নীল গগন ;—
মাঝখানে তার জাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

শরৎকালের পূর্ণ শশী বড়ই মধুর বটে
তারায় যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে ;
দেখ্‌তে মধুর শৈবালেতে ঘেরা শতদলে
যখন একটি ফুটে থাকে সুনীল স্বচ্ছ জলে ;
নাইক কিন্তু বিশ্বে কিছু এমন মনোলোভা
শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাছার শোভা।
তাহার শুধু শোভার জন্য সবার সৃষ্টি হেন ;—
গরবিনী পৃথ্বী তারে বক্ষে ধরে যেন
দেখ্‌তে সবাই পিছে যেন সারি বেঁধে দাঁড়ায়,
বসুন্ধরা নিয়ে তারে ঘুমটি কেমন পাড়ায়।

একি খেয়াল বাছারে তোর ? গাছের তলে, ভুঁয়ে,
কেবল দুটো ঘাস বিছানো ধূলার উপর শুয়ে ?
মৌরুষি তোর মায়ের কোলে বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে বাছারে তুই হেথায় শুয়ে কেন ?
আয়রে আমার ননীর পুতুল, আয়রে আমার পাখী ;
—ধূলায় কেন ? আয়রে তোরে বুকে কোরে রাখি।
না না ;—ঘুমা এমনি করে'—আহা মরি একি
মধুর ছবি !—ঘুমা আমি নয়ন ভরে' দেখি !
এমন বকুলতলায় এমন শান্ত বনভূমি
আরো খানিক থাক্‌রে যাদু মগ্ন গাঢ় ঘুমে।

—চিত্রকরটি হতাম যদি তোরে এমন দেখে
রেখে দিতাম যত্ন করে' সোণার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হয়ে' দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোণার জাদু, ঘুমা আমার মাণিক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

—০—

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সিদ্ধান্তদর্পণঃ। মহামহোপাধ্যায়-সামন্ত-শ্রীমচ্চন্দ্রশেখর-সিংহেন বিরচিতঃ। কটক রাজকীয়-পাঠশালায়াং বিজ্ঞানাধ্যাপকেন এম্, এ, ইত্যুপাধিধারিণা শ্রীযোগেশচন্দ্র-রায়েণ সম্পাদিতঃ। কলিকাতা-রাজধান্যাং কলেজষ্ট্রীটস্থ চতুঃষষ্টি-সংখ্যক-ভবনস্থিতাং ইণ্ডিয়ান্-ডিপজিটরী নামক-পুস্তকালয়াং প্রকাশিতঃ। মূল্যম্—মুদ্রাত্রয়ম্।

এই পুস্তকখানি জ্যোতিষ-বিষয়ক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বলা আবশ্যক ইহা ফলিত-জ্যোতিষ-বিষয়ক নহে। আমরা জ্যোতিষ জানিনা ; সংস্কৃত অল্পই জানি। সুতরাং গ্রন্থখানির প্রকৃত সমালোচনা আমরা করিতে পারিব না। কেবল সম্পাদক মহাশয়ের সুলিখিত ইংরাজী ভূমিকা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

গ্রন্থখানিতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে লিখিত আড়াই হাজার শ্লোক আছে। ইহার মধ্যে গ্রন্থকার ২২৮৩টি শ্লোক নিজে রচনা করিয়াছেন ; বাকী ২১৬টি প্রাচীন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সকল হইতে উদ্ধৃত। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই শ্লোকগুলির লালিত্য ও রচনা-কৌশলের প্রশংসা করিবেন।

গ্রন্থখানির বিশেষত্ব কি ? আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণ জানেন না এমন কোন তথ্য ইহাতে নাই। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণের অজ্ঞাত কোন কোন তথ্য সিংহ মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন ; কোন কোন বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়াছেন। অনেক পর্য্যবেক্ষণ, এবং হিন্দুজ্যোতিষীদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ানুযায়ী গণনার অনৈক্য লক্ষিত হয়। তিনি স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই অনৈক্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং অনেকস্থলে দৃক্‌গণিতৈক্য সাধন করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই। এই সমুদয় কার্য্য তিনি নিজ

নিষ্কাম বিদ্যানুশীলন, কঠোর পরিশ্রম, অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে করিয়াছেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুজাতি নিজ গবেষণাদ্বারা জগতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে পারেন নাই। আজকাল দুই একটি এমন লোকের নাম শুনা যাইতেছে, যাঁহারা হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্ঞানগৌরব মনে পড়াইয়া দিতেছেন। ইঁহারা কিন্তু সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছেন। কেবল চন্দ্রশেখর পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই। তাঁহার কার্য্যের পরিচয় পাইয়া স্বতই মনে হয় যে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রতিভার বীজ একবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণের অজ্ঞাতপূর্ব্ব কোনও তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া না করিলেও চন্দ্রশেখর যাহা করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয়, আবিষ্ক্রিয়ার শক্তি তাঁহার আছে, এবং উপযুক্ত শিক্ষা, সুযোগ ও উৎসাহ পাইলে তিনি সম্ভবতঃ সমুদয় জাতির পক্ষেই নূতন অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিতেন।

হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রশেখরের প্রভাব অনুভূত হইয়াছে। তাঁহার পরিশ্রম বৃথা যায় নাই। হিন্দুর জীবন নানাবিধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ। এই সমস্তই শুভলগ্নে করা প্রয়োজন। শুভলগ্ন নির্ণয়ার্থ গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান জানা আবশ্যক। এইজন্য হিন্দুর গৃহে পঞ্জিকা একটি একান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক। পঞ্জিকার গণনায় ভুল থাকিলে, ঠিক্ লগ্নে কোন কাজ হয় না ; সুতরাং হিন্দুর চক্ষে উহাতে কোন ফল হয় না। বর্ত্তমানে কোন দুটি পঞ্জিকার গণনায় মিলে না। উপায় কি ? হিন্দুগণ পাশ্চাত্য নাবিকপঞ্জিকার অনুসরণ কখনই করিবেন না। পঞ্জিকার কোন সংস্কার করিতে হইলে, সংস্কারক হিন্দু হওয়া চাই, এবং প্রাচীন পূজ্য ঋষিগণের গ্রন্থ হইতেই ভ্রম সংশোধনের বৈধতা প্রমাণ করা চাই। চন্দ্রশেখর চলিত পঞ্জিকা সকলের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ঋষি-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহা করিয়াছেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে পণ্ডিত ও জ্যোতিষীদিগের একটি সভা আহূত হয়। উদ্দেশ্য, কোন্ পঞ্জিকা অনুসারে জগন্নাথদেবের প্রত্যাহিক পূজাদি নির্ব্বাহিত হইবে, তাহা স্থির করা। সভা চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্তদর্পণানুসারে গণিত পঞ্জিকারই অনুমোদন করেন। তাঁহার একজন ছাত্র একটি পঞ্জিকা প্রতি বৎসর রচনা করেন। তাহা কেবল পুরীতে নয়, উড়িষ্যার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। তাঁহার আর এক শিষ্য বাঙ্গালা একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহারও কাটতি বড় কম নয়।

তাঁহার কার্য্যের মূল্য বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন-চরিত জানা দরকার। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের ভূমিকা হইতে গ্রন্থকারের জীবন সম্বন্ধীয় কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। পশ্চিম উড়িষ্যার পার্ব্বত্য ও বনাকীর্ণ প্রদেশে খণ্ডপাড়া নামক গ্রামে ১৭৫৭ শকাব্দে চন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি কটকের পশ্চিমে ২৫।৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা খণ্ডপাড়ার করদ রাজার রাজধানী। চন্দ্রশেখর ক্ষত্রিয় এবং রাজকুলোদ্ভব। খণ্ডপাড়ার বর্ত্তমান রাজা চন্দ্রশেখরের পিতৃব্যের পৌত্র। গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ নাম চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত হরিচন্দন মহাপাত্র। হরিচন্দন ও মহাপাত্র পুরীর রাজার প্রদত্ত উপাধি ; রাজবংশীয় বলিয়া তাঁহার উপাধি সামন্ত।

চন্দ্রশেখর বাল্যকালেই সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি কিছুকাল ধরিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, আয়ুর্ব্বেদ এবং প্রধান প্রধান কাব্যগুলি অধ্যয়ন করেন। দশ বৎসর বয়সে চন্দ্রশেখরের একজন পিতৃব্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা দেন। তাঁহার বালসুলভ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে কতকগুলি নক্ষত্র দেখান। নক্ষত্রগুলি কোন দুই রাত্রি এক স্থানে দৃষ্ট হয় না। এই যে দৃষ্টতঃ স্থান পরিবর্ত্তন, এই বয়সেই চন্দ্রশেখর তাহা নিজ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিতে ভাল বাসিতেন। এই প্রকারে তাঁহার জ্যোতিষানুশীলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাঁহাকে এই বিজ্ঞানটি শিক্ষা দিবার কোন লোক ছিল না এবং চন্দ্রশেখরও সংস্কৃত ও উড়িয়া ভিন্ন কোন ভাষা জানিতেন না এবং এখনও জানেন না। যাহা হউক তিনি নিজ গৃহে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত সিদ্ধান্ত দেখিতে পান এবং টীকার সাহায্যে তাহাই পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন।

পনর বৎসর বয়সে তিনি যখন, "লগ্ন" কথাটির অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইলেন, তখন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে গণনা দ্বারা যে সময়ে নক্ষত্রগুলি ক্ষিতিজের উপরে দৃষ্ট হওয়া উচিত, তখন দৃষ্ট হয় না, এবং গ্রহগুলিও ঠিক্ যায়গায় দৃষ্ট হয় না। কাজেই তাঁহার মনে প্রাচীন

সিদ্ধান্তগুলির নিয়মাবলীর শুদ্ধতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার কোন মানমন্দির ছিল না ; উৎকৃষ্ট জ্যোতিষিক যন্ত্রাদিও ছিল না। তিনি নিজে মোটামুটি রকমের কয়েকটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া লন। আকাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার কতরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিত না, তাঁহারা তাঁহাকে বাতুল মনে করিতে লাগিল ; এবং নানা প্রকারে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। প্রকৃত জ্যোতিষ ও ফলিতজ্যোতিষের প্রভেদ আমাদের দেশের অনেকেই জানে না। অনেকে ভাবিতে লাগিল যে গণক দৈবজ্ঞের কার্য্য তাঁহার বংশের অনুপযুক্ত। খণ্ডপাড়ার রাজা নিজ খুল্লতাতের কার্য্যে আপনাকে অবমানিত মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না।

তেইশবৎসর বয়সে চন্দ্রশেখর তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফল নিয়মিত রূপে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। ইহার তিনবৎসর পরে এক খানি গ্রন্থে তৎসমুদয় নিবদ্ধ করিবার সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়। ছয় বৎসর তিনি গ্রন্থ রচনা ও তালপত্রে লিখনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

তাঁহার দেহ কোন কালেই সবল ছিলনা, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। তিনি চিররুগ্ন হইয়া পড়িলেন। গত ত্রিশ বৎসর তিনি দিনে একবারও পূর্ণমাত্রায় ভোজন করিতে সমর্থ হন নাই। জ্যোতিষানুশীলনে তাঁহার এমনি অনুরাগ যে যাহাতে তাঁহার দৈনিককার্য্যের ব্যাঘাত হয় এরূপ কোন চিকিৎসায় তিনি রাজী হন না ; এই ৬৪ বৎসর বয়সে ভগ্নদেহ লইয়াও তিনি জ্যোতিষানুশীলনার্থ সানন্দে সমস্ত রাত্রি জাগিতে প্রস্তুত আছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাকে কটক আসিতে হইয়াছিল। দরবারের পর তিনি একদিনও কটকে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। কারণ কয়েকদিন পরেই সূর্য্যগ্রহণ হইবার কথা। তাঁহার যন্ত্রাদি লইয়া গ্রহণ দর্শন না করিয়া কি তিনি থাকিতে পারেন ?

তিনি জ্যোতিষে পণ্ডিত, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে বড়ই অনভিজ্ঞ। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি নিজ ভৃত্যবর্গের উপর নির্ভর করেন। রাজসম্পর্কীয় লোক হইলেও তাঁহার জীবনযাত্রানির্ব্বাহ কষ্টে হয়। অথচ বংশপরম্পরায় যেমন একদল ভৃত্য তাঁহার পরিবারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তিনিও তাহাই করিতেছেন। কয়েকটি ক্ষুদ্রগ্রাম হইতে তিনি যে বার্ষিক ৫০০৲ টাকা ও কিছু শস্য পান, তাহাতে তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহ হয় না। এইজন্য বৃদ্ধবয়সে তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। গত কয়েক বৎসর তিনি একজন কটকের পুস্তকবিক্রেতাকে পঞ্জিকা গণিয়া দিতেছেন। তাহাতে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা পান। পরিশ্রমের তুলনায় দক্ষিণা সামান্য বলিতে হইবে।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকগণের একটি গুণ এই যে তাঁহারা নিজে অন্তরেন্দ্রিয় বা বাহেন্দ্রিয়ের গোচর না করিয়া কোন তথ্য সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চান না। চন্দ্রশেখরেরও এই গুণটী পূর্ণমাত্রায় আছে। যোগেশবাবুর বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। চন্দ্রশেখর এক খানি উড়িয়া গ্রন্থে পাঠকরেন যে উজ্জ্বল সূর্য্যবিম্বে কখন কখন কতকগুলি কলঙ্ক বা কৃষ্ণচিহ্ন লক্ষিত হয়। একদা কটক প্রবাস কালে তিনি যোগেশবাবুকে দাগগুলি দেখাইতে বলেন। যোগেশবাবু তাঁহাকে দাগগুলি যে আছে তাহা মানিয়া লইতে বলিলেন। কিন্তু জ্যোতিষী বলিলেন নিজের চোখে কলঙ্কগুলি না দেখিলে তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবেন না। তাহার পর কয়েকটি কৃষ্ণ চিহ্ন তাঁহাকে দেখান হইল।

কাশীর সুবিখ্যাত জোতির্ব্বিদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী "প্রদীপে" প্রকাশার্থ সিদ্ধান্তদর্পণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন।

সুধাকর দ্বিবেদিনির্ণীতা সিদ্ধান্তদর্পণ সমালোচনা ঃ—

কামারিবামসংমান্যম্ মুরারিমন্থু সংমতং।
নমামি মনসা নিত্যম্ রামমেব মনোরমম্ ॥
রীতিনীতি কবিতা বিতানকে বাসনানয়নমার্গমন্তরা।
ভাস্করীয় কৃতিভানুযায়িনী চন্দ্রশেখর কৃতির্বিভাতি মে ॥
অত্র যে খচর পর্য্যায়াদিকা ভভ্রম ক্ষিতিদিনাতিসংখ্যকাঃ।
যাশ্চ পাঠ পঠিতা বিভেদ তস্তাশ্চ যুক্তিরহিতা নমে মতাঃ ॥
যত্রকুত্র মুনিসৎকৃতৌ ভবেৎ কালপর্য্যযর্যবশাৎ ত্রুটি র্যদি।
সা চ গোলগণিতোপপত্তিভিঃ পূরিতা ভবতি পূজিতা বুধৈঃ ॥
ব্রহ্মগুপ্তকৃতি মার্গনাদিকম্ দৃষ্টিকর্ম্ম বলনাদিকম্ যথা।
বাসনাভিরুপপাদ্য তৎখিলং ভাস্করেণ গদিতো নবো বিধিঃ ॥

অতোহত্র যে নূতন পর্য্যায়াদিকা মহর্ষিসিদ্ধান্তমতাবরোধিনঃ।
যুক্ত্যা কয়া কেন তথাচ হেতুনা সিদ্ধাবিভিন্না ইতি তে বিলেখ্যাঃ ॥
সৌরা যথা সপ্তগজাগ্নি তুল্যা শিরোমণিস্থাঃখগজাঙ্কয়শ্চ।
সূর্য্যোচ্চ জা যে ভগণাস্তদীয় স্থানে যুগাগ্ন্যাগ্নিমিতা কথং তে ॥
স্ফুটো রবির্ব্বর্ধশেন জায়তে মন্দোচ্চতো মন্দফলং প্রজায়তে।
মধ্যাদ্রবেস্তত্র চ কেন হেতুনাহ্ কোচ্চেচ ভেদো নচ মধ্যমেরবৌ ॥
ভাস্করোহিরবিজিষ্ণুজোদিতান্ পর্য্যয়ান্খলু বিলোক্য তান্ খিলান্।
স্বীয় বেধবশতো সতোনয়াৎ সংস্ফুটাংশ্চ স্বকৃতৌ লিলেখ সঃ ॥
চন্দ্রশেখর মহাশয়া ইতি স্বীয় বুদ্ধিবিভবাদ্দন্তাহো।
তন্নভাস্কর ; তাববাপাতে বাসনাবিরহিত স্ফুট বিদাম্ ॥
বেধমার্গমতিদুর্গমন্নৃণাম ভাস্করোহি বহুহায়নং জগৌ।
জিষ্ণু জোক্ত ভগণাদিকান্ কজান্ তেন স্বস্বগণিতে লিলেখতান্ ॥
ইতোবম্ বিমলোপপত্তিবিমলশ্চেদ্দর্পণোজায়তে।
প্রাচীনাগম গোলযুক্তি বিলসৎ সৎপাত্রমধ্যস্থিতঃ ॥
ব্যক্তাব্যক্ত সহস্রযুক্তি সুরমোৎপন্নপ্রভাবস্তদা।
নোদায়ার্ক সুধাকরাদি বিদুষাম্ নূনস্তবেদ্দর্শনে ॥
সিদ্ধান্তদর্পণে ভূভৃচ্চন্দ্রশেখর নির্ম্মিতে।
ইয়ম্ সম্মতিরত্রাস্তি শ্রীসুধাকর শর্ম্মণঃ ॥ ইতি।

৬—৩—৯৯। সুধাকরদ্বিবেদী।

ইংলণ্ডের নেচার্ (Nature) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রে সিদ্ধান্তদর্পণের নিম্নলিখিত সমালোচনা বাহির হইয়াছে।

A MODERN TYCHO.

Any one who reads the very interesting introduction of sixty-one pages that Professor Ray has attached to this Sanskrit work will regret very much his inability to fathom the work that follows. For therein is contained the results of the patient and industrious inquiry of one who, unaided by the accumulated knowledge of Western astronomers, resolutely set himself to solve the problem of celestial mechanics by the aid of such instruments as he could fashion himself, and where the time-honoured clepsydra supplied the place of the sidereal clock. The only assistance he seems to have had were the similar rough observations of Bhaskara (born 1114) and some still older observers. Professor Ray compares the author very properly to Tycho. But we should imagine him to be a greater than Tycho ; for without the same assistance, without encouragement of kings and the applause of his fellows, he has advanced his favourite science quite as effectually as did the Danish astronomer. It is especially curious to notice that the system at which Chandrasekhara ultimately arrived, and the explanation he offers of it, bears a very considerable resemblance to that which Tycho taught. The author has never been able to convince himself that the earth turns on its axis, or that it goes round the sun ; but to the planets he assigned heliocentric motion, much as Tycho did.

We get some notion of the success that attended the work, and of how much it is in one man's power to accomplish, if we examine the differences between the values he assigns to some of the constants of astronomy and those in use with ourselves. The error in the sidereal period of the sun is 206 seconds ; of the moon, second ; Mercury, 79 seconds ; Venus, about 2 minutes ; Mars, 9 minutes ; Jupiter an hour; and Saturn, rather more than half a day. The accuracy with which he determined the inclination of the planets to the ecliptic is still more remarkable. Mercury offers the largest error, and that is only about two minutes. In the case of the Solar orbit the greatest equation to the centre is only 14 seconds in error. In the Lunar theory, the revolution of the node has been concluded with an error of about $5\frac{1}{2}$ days, less than the thousandth part of the whole period ; while he has independently detected and assigned very approximate values to the evection, the variation, and the annual equation.

The main object that Chandrasekhara had before him seems to have been to correct the calendar, and regulate the daily ritual of the Hindu religion. No two almanacs, Professor Ray tells us, agree ; but any attempt to introduce the Nautical almanac and its acknowledged accuracy would prove unsuccesful. The necessary corrections and unification must, to be acceptable, come from within and be the work of a Hindu, uninfluenced by foreign education. The work of Chandrasekhara has received the sanction of the honoured Rishis, and the adoption of the corrections which he has shown to be necessary will exert upon native society a beneficial influence, whose importance can be hardly over-rated in a community where a correct almanac is an indispensable equipment of every household. We should like much to linger over Professor Ray's remarks on the subject of precession and his chronological deductions. These and many other points are discussed with great ability, though Professor Ray modestly disclaims any special astronomical capacity, The effect is to leave

us at every page with a higher opinion of the author laboriously recording his observations on palm-leaf, and unselfishly devoting his life to the services of his countrymen, who do not appreciate the nobility of the effort and the entirety of his devotion. We are in full sympathy with the editor when he writes thus of the author, of his privations and his star-gazing.

"What has he done after all?" Asks the impatient critic. To him I would say—Is it not enough to find in this man a true lover of science, who, regardless of other people's unfavourable opinion of his work, their taunts and dissusions, has devoted his whole life to the one pursuit of knowledge; who has shown the way to original research amidst difficulties serious enough to dishearten men in better circumstances; who has employed his time usefully, instead of frittering it away like the usual run of men of his rank, on a work which guides the daily routine of millions of his countrymen."

উদ্ধৃত অংশটি দীর্ঘ হইল। ইংরাজ কিরূপ গুণগ্রাহী তাহা দেখাইবার জন্য ইহা তুলিয়া দিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যোগেশ বাবু এই গ্রন্থখানি অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রারম্ভে চন্দ্রশেখরের একখানি হাফ্‌টোন চিত্র ও উড়িয়া অক্ষরে তাঁহার স্বাক্ষরের প্রতিলিপি আছে। ইংরাজীভাষায় গ্রন্থকারের জীবনী সংবলিত বিস্তৃত ভূমিকা সম্পাদকমহাশয়ের লিখিত। ইহা অতিশয় দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে; যাঁহারা জ্যোতিষ জানেন না, তাঁহারাও ইহা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন। ইহার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ৩৲ টাকা দিয়া পুস্তক খানির এক এক খণ্ড ক্রয় করিলে গুণের আদর ত করা হইবেই, অধিকন্তু দারিদ্র্যপীড়িত জ্যোতিষী মহাশয়েরও সাহায্য করা হইবে।

প্রাচীন ঋষি জীবনে "Plain living and high thinking" এর উজ্জ্বল আদর্শ দৃষ্ট হয়। সিংহ মহাশয় বর্ত্তমান বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ সভ্যতার যুগে সেই আদর্শ আমার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কত অল্প আয়োজন ও আড়ম্বরে কত বড় কাজ করা যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার সম্মুখে আমাদের মস্তক স্বতই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে প্রণত হয়।

—o—

বঙ্গের রমণীকবিগণ।

রমণীকবিগণের প্রসঙ্গে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বলিয়াছিলেন রমণীগণের প্রতিভা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে স্ফূরিত না হইয়া তদ্দ্বারা পুরুষগণ উদ্রিক্ত হইলেই বোধ হয় স্বাভাবিক হয়। কামিনী এবং কুসুমগণ কবিত্বশক্তি জাগরিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই ভাল হয়। এই কথাগুলিতে বেশ কবিত্ব আছে। কিন্তু রমণীকুল কি সত্যই কুসুম যে আমরা তাহাদিগকে যথেচ্ছা ছিঁড়িয়া, পরিয়া বাসি হইলে ফেলিয়া দিব? মনুষ্য জাতির মর্য্যাদার এক শ্রেষ্ঠ অংশ কি তাহাদের প্রাপ্য নহে?

অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে কয়েকটী রমণীকবি দেখা দিয়াছেন; তদপেক্ষাও সুখের বিষয় এই যে তাঁহাদের মুখে আমরা সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি মর্ম্মের উক্তি শুনিতে পাইতেছি। আমাদের সমাজে নানারূপ বিসদৃশ ঘটনার অভিনয় হইয়া থাকে। একদিকে যখন পলিতকেশ মহাদেবগণ অষ্টম বর্ষীয়া গৌরীগণের পাণিপীড়ন করিতেছেন এবং এই উৎকট বিবাহ যজ্ঞে

"আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥"

প্রভৃতিরূপ নাতবিলাপ পুরোহিত-মুখনিঃসৃত উৎকট বৈদিক মন্ত্রপ্রভাবে একান্ত প্রপীড়িত হইতেছে, তখন অপর দিকে আমরা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বালবিধবাগণের জন্য অতিশয় শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক পঞ্জিকা খুঁজিয়া উপবাসের দিনগুলি বাহির করিতেছি এবং নিষ্কামবৃত্তি, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও শুষ্ক কণ্ঠের ব্যবস্থা করিতেছি।

আমাদের অনুভব-শক্তির এতদূর অভাব ঘটিয়াছে যে এই নিয়পরাধিনী বালিকাগণের পক্ষসমর্থনার্থ বিদ্যাসাগরের ন্যায় একটি প্রবীণ পণ্ডিত আজীবন শাস্ত্রের নজীর ঘাঁটিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। আমরা প্রকৃতই "ক্ষুরধার সূক্ষ্মবর্ত্ম অদ্যে নির্দ্দেশিয়া" আপনারা "বাসনার রাজমার্গে" চলিতেছি। বালিকাগণের প্রতি এই অত্যাচার ও নিগ্রহপরায়ণ পুরুষজাতিতে ইন্দ্রিয়লোলুপতার একশেষ এবং বাৎসল্যের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বঙ্গের বিধবা এবার নিজে তাঁহার মর্ম্মের উক্তি জ্ঞাপন করিতেছেন:—

"কারে গো সাজা'স ভাই মুক্ত সন্ন্যাসিনী?
না বাঁধিতে হাতে হাত
আগে "হবিষ্যান্ন" ভাত
না হতে "সমাজ্ঞী" আগে পথ-ভিখারিণী;
কে তোরা হৃদয় হারা
কি বলিলি—"ধ্রুবতারা,"
পাখীরে পড়ালি কেন "হরে কৃষ্ণ" বাণী?

বয় আট নয় দশে
সিঁথীর সিন্দুর খসে,
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি!
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য
"ব্রহ্মচর্য্য" তার সাধ্য?
না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণাকাণি,
এই তোর শাস্ত্রতত্ত্ব—হায় অভিমানী!"

বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিরুদ্ধ-প্রমাণ আমরা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এমন কি কোন কাপুরুষ আছেন, যে কামিনীকণ্ঠের এই তীব্র ভর্ৎসনার প্রতিকূলে একটী কথা কহিবেন? সংস্কৃত শ্লোক অপেক্ষা আমরা এই সকল উক্তি উৎকৃষ্ট নজীর মনে করি।

আমরা শুনিয়াছি, কোন তীর্থের পথে একাদশী দেবতার একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই তীর্থগামিনী বিধবাগণ প্রত্যেকে উক্ত প্রস্তর মূর্ত্তির গণ্ডদেশে "ঠোণা" মারিয়া গণ্ডের একাংশ ক্ষয়িত করিয়া দিয়াছেন।

বৈধব্য-কষ্টজনিত ক্রোধের এই নীরব অভিব্যক্তি ভিন্ন গত সহস্র বৎসরের মধ্যে বিধবাগণ সমাজ-ভয়ে মুখ ফুটাইতে পারেন নাই। আজ সুশিক্ষার ফলে চির অত্যাচারাভ্যস্ত রমণীপ্রাণের মিথ্যা লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার তীব্র গঞ্জনা শুধু বালবিধবার পক্ষ সমর্থনে পর্য্যবসিত হয় নাই, গৃহে গৃহে যে স্বামীনামধারী উৎকট সম্রাটগণ যথেচ্ছাতন্ত্র প্রচলন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও রমণীকবির তীব্র কটাক্ষ আছে:—

"কেউ বা কোণের বউ—যা করেন পতি;
যে পথে চালান প্রভু, সেই পথে চলে তবু—
যোগাইতে মন তার হয় না শকতি।
সদা তার আঁখি রাঙ্গা, কথাগুলি হাড় ভাঙ্গা,
দিবা রাতি উপদেশ অযুক্ত যুকতি;
ক্ষণে প্রীতি ক্ষণে রোষ, দোষে গুণ গুণে দোষ
রমণী জানে না কি সে মিলিবে মুকতি,
আমাদের দেশে এই নারীর বসতি।"

পতিতা রমণীগণের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজ দৃঢ়রূপে অর্গল বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমতী কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত কবিতাটী উচ্ছলিত মাতৃকরুণার নিদর্শন। নির্ম্মম সমাজ ইহা হইতে একটী মূল্যবান সৎশিক্ষা লাভ করিতে পারেন:—

"পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নতশিরে;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তোরা আন্ ডাকি।

ফিরা'নে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি,
আজি আন্ স্নেহ-সুধা লোচন বচন ভরি।
অতীতে বরষি ঘৃণা কিবা আর হবে ফল?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি' হাত ধরে লয়ে চল্।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্, ওরে ডেকে আন্।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু-পাশে
বেঁধে ফেল; আজ গেলে আর যদি না-ই আসে।

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণা ক্রোধ,
একটী জীবন তোরা হারাবি জনম শোধ।
তোরা না জীবন দিবি? উপেক্ষা যে বিষবাণ,
দুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্।"

রমণীকবিগণের অভ্যুদয় বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে প্রকৃতই শুভলক্ষণ; যাহাদের স্নেহ-মিষ্ট স্বর আমাদের সুখ দুঃখের নিত্য-সম্বল, বঙ্গসাহিত্যে সেই স্বরের সুধামাখা প্রতিধ্বনি পাইয়া কে না সুখী হইবেন? সে ভাষায় যদি কিছু গঞ্জনা ও তীব্রতা থাকে তাহা পীড়িত সমাজের পক্ষে মাতা কি ভগ্নীপ্রদত্ত ঔষধের ন্যায়ই গ্রহণীয়। কবিত্ব-হিসাবে "গাথা," "আলো ও ছায়া," "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি," "অশ্রু-

কণা।”ও “নির্ঝরিণী,” প্রভৃতি কাব্য সাহিত্যিক মর্য্যাদার কি অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা পরে আলোচনা করিব। আমরা অদ্য পঞ্চদশ বর্ষবয়স্কা একটী প্রতিভাময়ী বালিকা কবির কথা উল্লেখ করিব। অল্পদিন হইল আমার এক বন্ধু শ্রীমতী পঙ্কজিনী বসুর কতকগুলি কবিতা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; উক্ত বালিকার পড়াশুনা অতি সামান্য কিন্তু বেশ প্রতিভা আছে। স্বভাবের কৃপা হইলে অশিক্ষিত কবিও বাগ্দেবীর বীণায় সুর বাঁধিতে পারেন; আমরা আশা করি শ্রীমতী পঙ্কজিনী কালে বঙ্গীয় অপরাপর যশস্বিনী মহিলা কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবেন।

আমরা যখন সভা কাঁপাইয়া জগজ্জয়ী প্রেমের আড়ম্বর সূচক বক্তৃতা করি এবং অজস্র করতালি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত প্রেমিক নামে অভিহিত হই, তখন আমাদের পল্লীবাসিনী স্নেহবিধুরা ভগ্নী আমাদের স্নেহ-কৃপণ অন্তঃকরণ হইতে বিন্দু পরিমাণ মমতায় একান্তরূপে বঞ্চিত হইয়া একটু শ্লেষ-মিশ্র দৈন্য জানাইয়া নিম্নলিখিত কবিতা লিখিতে পারেন, তাহাতে আমাদের বালিকা পঙ্কজিনীর উপর রাগ করিবার যথেষ্ট কারণ নাই ঃ—

“শতকাজে আছে ব্যস্ত দেশবাসিগণ,
অনুক্ষণ শোভে হাতে বিজ্ঞান দর্শন ;
দেশহিত করিবারে, কতই যতন করে,
এরা কি শুনিতে পারে তোদের রোদন ?
শতকাজে আছে ব্যস্ত দেশবাসিগণ।

সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন,
যেখানে দুহিতা মাতা ভার্য্যা ভগ্নীগণ ;
কূপমণ্ডুকের মত, দৃষ্টি সদা আত্মগত,
কি বিষম দুঃখ লয়ে যাপিছে জীবন,
সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন ?

কতই বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া,
জীবে প্রেম, আত্মত্যাগ, বড় কথা দিয়া
একটী স্নেহের কথা, অভাবেতে পায় ব্যথা,
যাহারা, তাদের যায় অবজ্ঞা করিয়া ;
এদিকে বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া।”

আমার বন্ধু, পঙ্কজিনীর প্রথম যে কবিতাটী আমাকে পাঠাইয়া দেন, তাহা আমি কোন পণ্ডিত মহাশয়ের লেখা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক পল্লীবালিকা যে হঠাৎ দার্শনিক সাজিয়া পরলোকতত্ত্ব ও আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এরূপ সারগর্ভ কবিতা লিখিয়াছেন তাহা জানিতে পারিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। সেই কবিতাটীর একটী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

“আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।
শুনে হাসি পায়,
কহিলে মরণ কথা, পিতা করে হেট মাথা,
জননীর দর দর অশ্রু বয়ে যায়,
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।

শুনে হাসি পায়,
যবে আশীর্ব্বাদে মোরে, স্বজন স্নেহের ভরে,
শতবর্ষ সুখে বেঁচে থেক্ এ ধরায়,
আমার মরণ হবে শুনে হাসি পায়।

শুনে হাসি পায়,
করোনাক অবিশ্বাস, এহেন অসত্য ভাষ
ঈশ্বরের প্রতিরূপ আমি সর্ব্বথায়,
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।

শুনে হাসি পায়
সত্য বটে একদিন, ধূলায় হইবে লীন,
আমিত্ব ক্ষুদ্রত্ব সহ ধূলিময় কায় ;
সত্যবটে হেন দিন আসিবে ধরায় ;
উহাত মরণ নহে, উহাকে নরত্ব কহে,
ক্ষুদ্রনর এর পরে অনন্তে মিশায় ;
উহারে গণেনা কেউ মরণ সংজ্ঞায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসিপায়।”

এই কবিতাটির বিদ্রূপেও এরূপ গাম্ভীর্য্য আছে, যাহা ক্ষুদ্র এক প্লেটোর উপযুক্ত। পাঠকগণ কবিতাগুলি পড়িবার সময় সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে উহা একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া অশিক্ষিতা বালিকার লেখা। আশা করি পাঠকগণ শীঘ্র শ্রীমতী পঙ্কজিনীর কবিতার সহিত বিশেষরূপ পরিচিত হইবেন। এ প্রবন্ধে শুধু ভাবী পরিচয়ের মুখবন্ধ করা হইল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সমাজ-চিত্র।

কোন বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাকে একবার পূর্ব্ববাঙ্গালায় যাইতে হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি কলিকাতায় থাকি। হাতে কোন কাজ কর্ম্ম নাই; কাজ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত চেষ্টা, যত্ন বা স্ফূর্ত্তিও তখন আমাব ছিল না। মহানগরীর রাজপথে দিবারাত্রির অনেক অংশ কাটিয়া যাইত; আপন মনে লক্ষ্যহীন ভাবে এই অট্টালিকারাশির মধ্যে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এমন সময়ে একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী বন্ধু তাঁহার গ্রামে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহানগরীর লোক-কোলাহল, রাস্তাঘাটের সেই একঘেয়ে ভাব পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামের দূর-বিস্তৃত প্রান্তর, নীরব শীতল বৃক্ষের ছায়া, গ্রাম্য আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণ তখনই গ্রহণ করিলাম। তিনি যাত্রার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, তারিখ মনে নাই; এক শুক্রবারে রাত্রি দশটার গোয়ালন্দ মেলে আমাদের যাওয়া স্থির হইল। বন্ধু অনেক দিন পরে গৃহে যাইবেন, তাঁহার উৎসাহের অবধি নাই; আজ এক সপ্তাহ হইল তিনি বাজারেই বাসা বাঁধিয়াছেন; বেলা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি চারটী আহার করিয়া, কুরিয়ার ব্যাগ গলায় ঝুলাইয়া বাজারে বাহির হন, আর রাত্রি সাড়ে সাতটা, আটটার সময়ে ধূলিবিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাসায় ফিরিয়া আসেন; সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটা ঝাঁকা মুটে মাথার উপর বড়বাজার, চিনেবাজার, রাধাবাজার, চাঁদনী সাজাইয়া প্রবেশ করে। সেই সব দরকারী, অদরকারী, অদরকারী দ্রব্যজাত গোছাইয়া হিসাব মিলাইয়া বাক্স, ট্রঙ্ক বোঝাই করিতেই রাত্রি এগারটা হইয়া যায়।

কয়দিন হইতে ক্রমাগত কলিকাতা সহরের জিনিস কিনিয়া আজ শুক্রবার অপরাহ্ণে, বন্ধুবর জবাব দিলেন যে তাঁহার যাহা কিছু কিনিবার ছিল সকলই এক রকম ক্রয় করা হইয়াছে। ‘এক রকম’ শুনিয়া মনে হইল তিনি বুঝি আবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য এখনই পুনরায় ধর্ম্মতলার দিকে ছোটেন। যাহাহউক তিনি আর বাসার বাহির হইলেন না। সঙ্গে পাঁচ ছয়টা বড় বড় লগেজ, সুতরাং একটু সকাল সকাল ষ্টেসনে যাওয়াই স্থির হইল। জিনিস পত্র বোচকা বুচকী কতক গাড়ীর মধ্যে কতক গাড়ীর ছাদে চাপাইয়া আমরা দুই বন্ধু যাত্রা করিলাম।

সিয়ালদহ ষ্টেসন-প্রাঙ্গণে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই এক দল নীল ছোপ দেওয়া জামা ও পাগড়ীওয়ালা কুলী আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের সঙ্গে দর-দস্তুর করা আমার পোষাইয়া উঠিল না। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থায় বন্ধুবরকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ষ্টেসন গৃহে উপস্থিত হইলাম। গাড়ী ছাড়িবার তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব। আমি এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বন্ধুবর শেষ রাশীকৃত লগেজের গতি করিয়া, টিকিট কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন; পশ্চাতে সেই সপ্তরথীদল। তাহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিবার জন্য বন্ধুকে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তাহারা কি সহজে বিদায় হয়; ন্যায্য প্রাপ্যের ডবল পারিশ্রমিক আদায় করিয়াও বকৃসিসের আবদার ছাড়ে না! অনেক বাক্যব্যয় ও পয়সাব্যয় করিয়া আমরা দুই বন্ধুতে একটী ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। গাড়ীর মধ্যে আরও দুইজন আরোহী ইতিপূর্ব্বেই দুই বেঞ্চের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক জুড়িয়া বিছানা পাতিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট আছেন। আমাদের জিনিসপত্র সমস্তই লগেজ করা হইয়াছে, সঙ্গে সুধু একটা ঘটি ও গ্লাস, ছোট ছোট দুই খানি সতরঞ্চ এবং ততোধিক ছোট দুইটী Dick's edition এর বালিস। গাড়ী ছাড়িবার অধিক বিলম্ব ছিলনা; আমরা মনে করিলাম আজ রাত্রিটী একেবারে বসিয়া যাইতে হইবে না! যাঁহারা কখনও গোয়ালন্দ মেলে গিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন তৃতীয় ও মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে শুইয়া যাইবার সুবিধা অতি কম ভাগ্যবান জীবের অদৃষ্টেই ঘটে। আমরা আজ সেই ভাগ্যবান জীব।

গাড়ী ছাড়িবার পাঁচমিনিট বিলম্ব আছে; আমি বালিসটীর উপর হেলান দিয়া শয়নের আয়োজন করিতেছি; বন্ধুবর গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া ষ্টেসন দেখিতেছেন, এমন সময় কে একজন আসিয়া গাড়ীর দ্বার ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। বন্ধু বলিলেন, “এ গাড়ীতে স্থান নাই, অন্য গাড়ীতে যান না মশা'য়”! তদুত্তরে একটা

মোটা গম্ভীর আওয়াজ হইল, "ক্যান্, স্থান নাই ক্যান্; তামাম গারীডা ভারা লইছ নাকি?" আমি বুঝিলাম ব্যাপার গুরুতর; একবার মনে হইল উঠিয়া বসি এবং এই সংগ্রামে বন্ধুবরকে সাহায্য করি; পরক্ষণেই মনে হইল "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"; বাঙ্গালে বাঙ্গালে কথাটাই নিষ্পত্তি হউক। কিন্তু আমার গো-বেচারী বন্ধু পরাজিত হইলেন; পূর্ব্ববঙ্গের সে তেজ তাঁহার শরীর হইতে অনেক দিন বিদায় লইয়াছে, নতুবা সেখানে সেই প্ল্যাটফরমে একটা 'গজকচ্ছপের' ব্যাপার হইত। বন্ধুকে নরম দেখিয়া আগন্তুক গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন এবং একটা প্রকাণ্ড শরীর গাড়ীর দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম যে বিরাশি তোলার ওজনের অন্যূন সাড়ে চারি মণ একটী হস্তপদ বিশিষ্ট জীব চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-আলোকের প্রবেশপথ রোধ করিয়া ক্ষুদ্র মধ্যশ্রেণীর একটী কম্পার্টমেণ্ট জুড়িয়া দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। এই মানবশ্রেষ্ঠটী একেলা হইলেও তাঁহার সঙ্গে দশ জনের লগেজ, এবং তিনি সেগুলি ওজন করিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। ব্যাপার অতি গুরুতর; একবার মনে হইল গার্ড সাহেবকে ডাকাইয়া তাঁহার বাক্স পেটারাগুলিকে ব্রেকভ্যানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা যাউক এবং সেই 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' ব্যক্তিটি single টিকেটে যাইতে পারেন কিনা তাহারও একটা ব্যবস্থা করি; কিন্তু তখন বোধ হয় দুই মিনিটের অধিক সময় নাই; এই অল্প সময়ের মধ্যে বেচারীর অন্য গাড়ীতে যাওয়াও অসম্ভব এবং এতগুলি জিনিসপত্র লগেজ করাও ততোধিক অসম্ভব; কি করি অগত্যা সেই রাশীকৃত জিনিস এবং সেই প্রকাণ্ডকায় মানবটীকে লইয়া কষ্টেসৃষ্টে রাত্রিবাসই স্থির করিলাম।

আগন্তুক মহাশয় তাঁর জিনিসপত্র কতক বেঞ্চের নীচে কতক দুই বেঞ্চের মধ্যে রাখিয়া আমার বন্ধুটী যে বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন, সেই বেঞ্চে উপবেশন করিলেন; এবং আপন মনেই "বর গরম", "আর একটু খণেই গারী ফেল হইতাম" প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন! তাঁহার সেই সমস্ত শরীরব্যাপী উদর, দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণনির্ম্মিত কবচ এবং খাঁটী ময়মনসিংহ জেলার কথা শুনিয়াই বুঝিয়াছিলাম, হয় ইনি স্বয়ং পাটের মহাজন অথবা ততোধিক ভাগ্যবান, মহাজনের কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারী। কলিকাতা সহরে মহাজনটোলার ধনী মহাজন অপেক্ষা তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণেরই মানসম্ভ্রম, বাজারে খ্যাতি প্রতিপত্তি অধিক। শেষে কথায় বার্ত্তায় আমার শেষোক্ত ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। এখন কাজকর্ম্মের গোলযোগ নাই; তাই তিনি একবার দিনকয়েকের জন্য দেশে যাইতেছেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পাটের কর্ম্মচারী মহাশয় নিজের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তামাকু সেবন; ঢালা, সাজা, খাওয়া; আবার ঢালা, সাজা, খাওয়া। বেচারী সমস্ত রাত্রির মধ্যে নিজেও নিদ্রা গেলেন না, আমাদিগকেও নিদ্রা যাইতে দিলেন না। একে তামাকের গন্ধ, তাহার পর সেই শ্রুতিসুখকর হুঁকার শব্দ, অবিশ্রাম সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে যদিবা কখনও একটু সামান্য তন্দ্রা আসে, তখনই সেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বরে "মোশাই ঘুমালেন নাকি" প্রশ্ন হয়। তাঁহার সেই রাজাবাদসা মারা গল্পের এমন ধৈর্য্যশীল শ্রোতা বোধ হয় তাঁহার তাবেদার কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কেহ পান নাই; তাঁহার সমস্ত কথায় বিনা প্রতিবাদে সায় দিয়া যাইতে লাগিলাম; লোকটী আমার উপরে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এই প্রকারে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষে আমরা গোয়ালন্দ ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গাড়ী ত্যাগ করিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। গোয়ালন্দ নামটী যেমন পরিচিত, স্থানটী তেমন হইবার যো নাই; যে সর্ব্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর পদ্মানদী গোয়ালন্দের ক্রোড়বাহিনী, তাহার কাছে আর কাহারও দর্প, কাহারও অভিমান খাটে না। ইংরেজের সমস্ত কৌশল, সমস্ত বিজ্ঞান গোয়ালন্দের নীচে পদ্মার কাছে পরাজিত। ইংরাজী ১৮৬৯ অব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত পদ্মা সমভাবে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে; কত অর্থ যে ঐ রাক্ষসীর বিপুল উদরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। কোম্পানীর ক্ষতি সহ্য হয়; কিন্তু আমরা কত পরিবার জানি যাহারা এই পদ্মার কোপে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; জমাজমি অবশেষে বসত বাটী পর্য্যন্ত পদ্মার গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাণ্ড পরিবার লইয়া সত্য সত্যই পথের ফকির হইয়াছে; আবার কত জন বা অতুল বিভবের অধীশ্বরও হইয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত কথা গোয়ালন্দ অঞ্চলের লোকের প্রতি খাটে না, কারণ আজ এই সাতাস

আটাশ বৎসরের ইতিহাস আমরা যাহা জানি তাহাতে পদ্মার আক্রোশ গোয়ালন্দের দিকেই; অপর পারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চর হইতেছে। এখন যে স্থানকে গোয়ালন্দ বলে তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব গোয়ালন্দের কোন সম্পর্কই নাই; স্থান কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নামটী কিন্তু বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৯ অব্দে যেখানে গোয়ালন্দ ছিল তাহা এখন পদ্মার অপর পারে গ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। গোয়ালন্দের ইতিহাস লিখিবার জিনিস বটে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব সে জন্য নহে। ঘাটে ষ্টীমারে "সিটি" মারিতেছে।

আমরা দুই বন্ধু নারায়ণগঞ্জগামী despatch ষ্টীমারে তাড়াতাড়ি উঠিলাম। আমরা কলিকাতা হইতেই গন্তব্য স্থানের টিকিট লইয়াছিলাম, গোয়ালন্দে আর আমাদিগকে টিকিট করিতে হইল না। আমাদের সঙ্গী পাটের মহাজন অপর ষ্টীমারে গেলেন, তিনি সিরাজগঞ্জের দিকে যাইবেন। আমরা সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছুই লইলাম না, কারণ বেলা ১১টার সময়ে আমাদিগকে এই ষ্টীমার ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রকাণ্ড ষ্টীমার 'ক্রোকোডাইল' গোয়ালন্দ ছাড়িল। আমরা পদ্মার শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বন্ধুর নিকটেও এ দৃশ্য নূতন নহে, আমার নিকটেও নহে; আমি জীবনের দীর্ঘ একযুগ এই দূরপ্লাবী পদ্মার তীরে কাটাইয়াছি; আমার জীবনের মধুর শৈশব কাল এই খরস্রোতার তীরে কত আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছে; যৌবনের কত আশা আকাঙ্ক্ষা এই পদ্মার কল-তানের সহিত মিশাইয়া দিয়াছি। এই নদীর তীরে বসিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুন্দর মনোমোহন আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছি; সে দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন সুধু সেই স্বর্গ-স্বপ্নময় সময়ের কঠোর স্মৃতির দংশনে মর্ম্মপীড়া অনুভব করি।

[illegible] দিন তাঁহার জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা করি, তখন আমার জীবনের অতি শোচনীয় সময়; আমার সংসারবন্ধন তখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যেখানে সেখানে যেন তেন প্রক [illegible] দিন কয়টা কাটিয়া গেলেই আমি অব্যাহতি পাই। [illegible] সেই স্থির গম্ভীর শোভা অনুভব করিবার শক্তি [illegible] অপহৃত হইয়াছে; আমি তখন একটা প্রাণহীন আবছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এই স্থান হইতে আমাকে কিছু গোপন করিতে হইতেছে। আমরা কোন্ ষ্টীমার ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম তাহা পাঠকগণের নিকট বলিতে পারিতেছি না এবং যে গণ্ডগ্রামে আমাদের এই ভ্রমণের পরিসমাপ্তি নানা কারণে তাহার নাম বলা সঙ্গত মনে করিতেছি না। এই প্রস্তাব আদ্যন্ত পাঠ করিলেই আমার কথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ষ্টেসনে নামিয়াই দেখিলাম আমাদের জন্য একখানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত; বন্ধু পূর্ব্বেই বাড়ীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাই এই ক্ষুদ্র তরণী আমাদের জন্য ষ্টীমার ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া সেই নৌকায় উঠিলাম। নৌকার মাঝি বর্ষীয়ান ব্যক্তি কিন্তু দাঁড়ি সবে একজন, সেও মাঝির একাদশ বর্ষ বয়স্ক নাবালক পুত্র; এই দুই জনের উপরে নির্ভর করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র নৌকা তীরভূমি ত্যাগ করিল। মাঝি নৌকা চালনে এমনই কৃতকর্ম্মা এবং সেই নাবালক মাঝিপুত্র ক্ষেপণী নিক্ষেপে এমনই সিদ্ধহস্ত যে নৌকা নাচিতে নাচিতে পদ্মাবক্ষে চলিতে লাগিল। বন্ধু বলিলেন, "রামচরণ মাঝি দ্বিতীয় লোকটীও না লইয়া একেলা ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে এই ছোট নৌকায় পদ্মার পাড়ী জমাইতে পারে; আর তাহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন দুর্দ্দিন অনেক উপস্থিত হইয়াছে।" মাঝির মুখে তাহার adventure শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইল এবং তাহাকে অনুরোধ করায় সে তাহার নৌজীবনের আশ্চর্য্য কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া তাহার অতুল সাহস, বিপুল বীর্য্যের বিবরণ শুনিতে লাগিলাম; শুনিতে শুনিতে কখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, কখনও ইচ্ছা করিল সেই ধীবরসন্তানকে আলিঙ্গন করি। যাত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য কতবার সে ঘোর তুফানের সময় উত্তালতরঙ্গময় পদ্মাবক্ষে নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঝাঁপ দিয়াছে। একবার একটী বিধবার একমাত্র অবলম্বন একটী ছেলেকে মধ্য পদ্মা হইতে কিনারা পর্য্যন্ত আনিয়া তাহার মায়ের কোলে দিয়াছিল। ঘোর দুর্দ্দিনে যখন নদীর মধ্যে কোন নৌকা ডুবিয়া যাইত, তখন রামচরণ তাহার ঐ ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া একাকী নৌকা-ডুবি লোকদিগের উদ্ধারের জন্য যাইত। দরিদ্র

ধীবরের আত্মপ্রাণের মায়া বিসর্জ্জনের এ পবিত্র ইতিহাস কয়জন জানে, কয়জন রামচরণকে চিনে, কয়জন তাহার গুণের আদর করে? পূর্ব্ববঙ্গের এক ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীর ততোধিক নগণ্য কুটীরে বিকট দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া রামচরণের দেবদুর্লভ পবিত্রজীবন কাটিয়া গিয়াছে। আজ সে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে কি না সে সংবাদও আমি রাখি না। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে:—

"Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

পদ্মার বক্ষে নিরক্ষর দেবহৃদয় কত মাঝি আছে, কে জানে, কেই বা তাহার সন্ধান লয়, এবং কেবা তাহার পুরস্কার করে!

এই সময়ের মধ্যে আমাদের ডিঙ্গী নৌকা পদ্মা ছাড়িয়া একটা খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রামচরণ আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আপন কাজও করিতেছে। এই খালের ধারেই আমার বন্ধুর গৃহ। খাল দিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ যাইয়া আমরা ঘাটে পৌছিলাম। আমার বন্ধুর পিতা বেলা ১টা হইতে ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছেন; কখন আমরা আসিয়া পৌছিব তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু যে সময়ে সচরাচর রেলের লোক গ্রামের ঘাটে আসিয়া পৌছে, বৃদ্ধ সেই সময় হইতে ঘাটে বসিয়া আছেন। পুত্র-স্নেহের এমনই টান! দূরহইতে ঘাটের উপর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া বন্ধু ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "ঐ দেখুন, আমার বাবা ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন"। অতি বাল্যকালে পিতৃহীন আমি এ পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া বড়ই কাতর হইলাম; আমার প্রাণে একটা অভাব জাগিয়া উঠিল; হায়! হতভাগ্য আমি, পিতৃমাতৃহীন; জীবনের এ উপকূলে আর আমার জন্য বৃদ্ধ পিতা পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন না, গৃহপ্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা জননী আমার আর স্নেহকোমল বাহু প্রসারিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রাণান্ত আগ্রহে অপেক্ষা করিবেন না। এ হতভাগ্য জীবনে সে সুখের দিন আসিবে না। বন্ধুর পিতার উৎসুক দৃষ্টি দেখিয়া আমার পিতৃমাতৃহীন অবস্থা বড়ই প্রাণে বাজিল।

নৌকা তীরে লাগিবার আর অপেক্ষা সহিল না; তীর সংলগ্ন হইতে না হইতেই আমার বন্ধুটী নৌকা হইতে খালি পায় লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি গিয়া বৃদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন; বৃদ্ধ প্রাণসমপ্রিয় পুত্রকে একেবারে কোলের মধ্যে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আমি অবাক্ হইয়া এই শোক-তাপ-দুঃখ-যন্ত্রণাময় মর জগতে স্বর্গের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম; নৌকা হইতে যে বাহির হইব সে কথাও ভুলিয়া গেলাম। শেষে আমার বন্ধু যখন আমাকে ডাকিলেন তখন বিশেষ অপ্রস্তুত ভাবে আমি নৌকা হইতে তীরে উঠিলাম এবং বৃদ্ধকে সসম্ভ্রম নমস্কার করিলাম। বৃদ্ধ আমাকেও প্রাণের উচ্ছলিত আনন্দের বেগে আলিঙ্গন করিলেন এবং কত আদরের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাল্যকাল হইতে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আজ এই বৃদ্ধের আদরে আমার প্রাণের এক নিভৃত কোণে পিতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল।

বৃদ্ধের ডাকাডাকিতে বাড়ী হইতে ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার বন্ধুর খুল্লতাত আসিলেন। তাঁহার মুখেও তেমনি প্রসন্নতা; তিনিও আমাকে কত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। শেষে সকলে একসঙ্গে বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাড়ী ঘাটের অতি নিকটে।

ঘরের ছেলে প্রায় দেড়বৎসর পরে ঘরে আসিয়াছেন এবং সঙ্গে আমি এক মহাসম্মানিত অতিথি; বাড়ীতে যে একটা আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল সে কথা না বলিলেও চলে। আমার সম্বন্ধে বন্ধুবর তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মনে এমন একটা ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি এত কাল চেষ্টা করিয়াও আমার প্রকৃত মূল্য তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিলাম না। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের প্রাণ বড়ই ধর্ম্মপিপাসু; কেহ যদি দুইটা ধর্ম্মের কথা বলিল, বা দশটা দেহতত্ত্বের গান করিল, তাহা হইলে তাহার প্রসার প্রতিপত্তির আর অবধি থাকে [illegible] তাহার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এই রকমের [illegible] ফেলিয়া সর্ব্বদাই নিজেকে অপরাধী ম[illegible] বিশ্বাস-হীনতা ও দুর্ব্বলতার [illegible]

তিন দিন [illegible] গেল। চতুর্থ [illegible] বন্ধুর প্রতিবেশী ও [illegible] হদিন হইতে পূর্ব্ববঙ্গের মুখো[illegible] ব্রাহ্মণগণের বিবাহ সম্বন্ধে নানা

'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী

[১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফোটোগ্রাফ্ হইতে]

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

NALIN BEHARI MALLIK

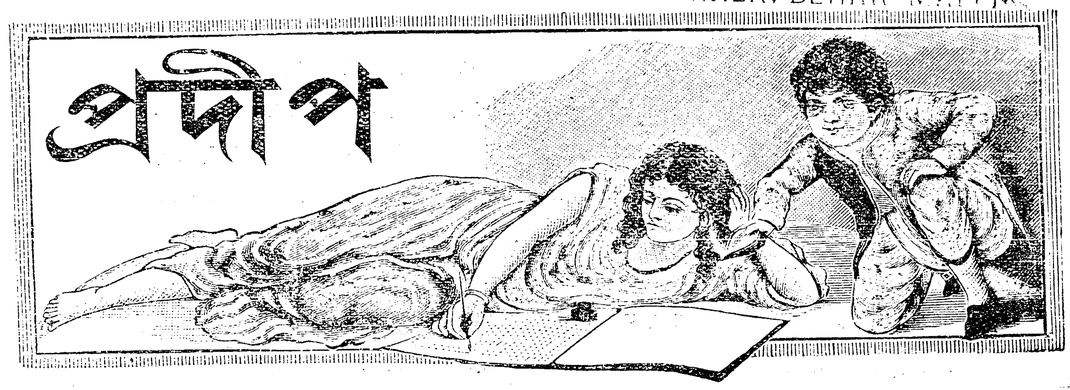

দ্বিতীয় ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩০৬। { অষ্টম সংখ্যা।

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সনের শ্রাবণ মাসে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺ শিবনাথ ঘোষ। ইঁহারা উচ্চবংশীয় কায়স্থ,—পদ্মনাভের সন্তান বলিয়া বিক্রমপুরে সুপরিচিত। রায় বাহাদুরেরা তিন ভাই ছিলেন। ইনিই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; অল্প বয়সেই অন্য দুই ভাই কালগ্রাসে পতিত হন।

ইঁহাদের আদি বাসস্থান যশোহর জেলায় ছিল। রায়-বাহাদুরের বৃদ্ধ পিতামহ ৺রামপ্রসাদ ঘোষ যশোহর পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরান্তর্গত কাঁটালিয়া গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন। কালসহকারে কাঁটালিয়া পদ্মার কুক্ষি-গত হইলে পিতামহ ৺প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ভরাকর গ্রামে আবাস-মণ্ডপ স্থাপন করেন। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। রায়বাহাদুর স্বরচিত "ভক্তির জয়" নামক গ্রন্থ ইঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন।

রায়বাহাদুরের পিতা বরিশালে পুলিশের দারোগা ছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ভরাকর গ্রামে তাঁহারই বাড়ীতে সে কালের ধরণের একটি 'মক্তব' (অর্থাৎ পারসী, আরবী শিক্ষার পাঠশালা বা চতুষ্পাঠী) ছিল। এই মক্তবে দুই জন মুন্সী—(দুই সহোদর) পর্য্যায় ক্রমে অধ্যাপনা করিতেন; একজনে ছয় মাস ও অপর জনে অন্য ছয় মাস পড়াইতেন। রায়বাহাদুরের পিতা নিজের ব্যয়ে ইঁহাদিগকে খাইতে দিতেন ও নিজের বাড়ীতে থাকিতে দিতেন।

বালক কালীপ্রসন্ন ঘোষের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন তিনি এই মক্তবে ভর্ত্তি হন। কিন্তু প্রথমেই তিনি পারসী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন নাই। ঐ মক্তবেই তিনি বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও ঐ পাঠশালা প্রধানতঃ আরবী ও পারসী শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি কচি শিশুদের মাথায় প্রথমেই নীরস নোক্তার বোঝা না চাপাইয়া, 'ক-য়ে করাত খ-য়ে খরগোস' প্রভৃতির সরস চিত্র অঙ্কিত করা উচিত, এই জ্ঞান ও সহৃদয়তা মুন্সীদ্বয়ের ছিল। সেই জন্যই ঐ শিশুদিগকে তাঁহারা প্রথমে বাঙ্গালা পড়াইতেন। কিন্তু এই কার্য্যের ভারটা তাঁহারা নিজেরা লইতেন না। সেই পাঠশালারই অপেক্ষাকৃত পরিণত-বয়স্ক ছাত্রদের উপরে এই ভার ন্যস্ত হইত। এখন যেমন অনেকে যুগপৎ সংস্কৃত ভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় "অনার" পরীক্ষা দিয়া কেবল সংস্কৃতে "অনার" পাশ করিলে সেটা গোপন করেন,—পাছে লোকে ইংরেজী-অনভিজ্ঞ কচ্ছ-উপকচ্ছ-পরিশূন্য রেফাক্রান্ত

DIFFERENT CONTRAST.

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মনে করেন, এই ভয়ে; —তখনো সেইরূপ বাঙ্গালা অধ্যাপনা দ্বারা মুন্সীদের আর্‌বী পারসীর জ্ঞানসমুদ্রের মাহাত্ম্য কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলা শেখানর ভারটা তাঁহারা ছাত্রদের উপরে দিতেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" বা তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা"র জন্ম হয় নাই; অথবা হইয়া থাকিলেও পল্লীগ্রামের লোকদের সহিত ঐ সকল বহির তখনো পরিচয় হয় নাই। সুতরাং সেই বাঙ্গলার Illustrated Penny Encyclopœdia 'শিশুবোধক' নামক অজর অমর অনাদি স্বয়ম্ভূ গ্রন্থ—যাহাতে ক খ গ ঘ হইতে আরম্ভ করিয়া চাণক্য মুনির রাজনীতি ও সমাজনীতি ঘটিত সংস্কৃত শ্লোক, মায় বাঙ্গলার নিউটন্ সেই শুভঙ্করের মাস মাহিনা, বৎসর মাহিনা, মণকষা, দধিকষা প্রভৃতির আর্য্যা, "স্বধর্ম্ম-পরিপালিকা" "সাবিত্রীসমা" পত্নী মালতী-মঞ্জরীর কাছে পত্র লিখিবার প্রণালী, সান্দীপনি মুনির পাঠশালার বিবরণ, দাতাকর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি বিশ্ব-সংসারের সকলই আছে—সেই গ্রন্থই প্রথম শিক্ষার্থীর একমাত্র অবলম্বন ছিল। বালক কালীপ্রসন্নও এই গ্রন্থ হাতে ও তালপত্র বগলে করিয়া মক্তবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পঞ্চম বর্ষের আগে "হাতে খড়ি"হওয়ার নিয়ম না থাকাতে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইতে পারে নাই। আর "হাতে খড়ি"র আগে কাগজে লেখা অসঙ্গত, অশাস্ত্রীয়, পাপজনক ও বিদ্যা সম্বন্ধে ভাবী অশুভসূচক; এইজন্য তিনি তখন "কাগজে উঠিতে" পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার এত সাধের "হাটু ভাঙ্গা দ ও কাঁধে-বাড়ী ধ" প্রভৃতির লিপি-নৈপুণ্য তুচ্ছ কদলী-পত্র ও তালপত্রেই বিকাশ পাইতে লাগিল।

ক্রমে পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ সংস্কার হইল। ইতি মধ্যে তিনি মক্তবে পড়িয়া সমগ্র শিশুবোধক ও ঘরে পড়িয়া রামায়ণ ও মহাভারত একরূপ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মুন্সীদ্বয়ের কাছে ফার্‌সী ও কাশীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন শাস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তি শৈশবে অসাধারণ ছিল। অল্প দিনেই তিনি কলাপ ব্যাকরণের চতুষ্টয় বৃত্তি, বহুবিধ সংস্কৃত শ্লোক ও "পন্দেনামার" ফার্‌সী বয়েৎ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই একটী মুন্সীর চরিত্র-ঘটিত কোন কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হওয়াতে রায়বাহাদুরের পিতা তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন ও মক্তব্ উঠিয়া যায়।

এই স্থানে রায়বাহাদুরের কাছে মকতবের নীতি-শিক্ষা ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা লিখিতেছি। রায়বাহাদুর বলেন যে "যদিও মুন্সীযুগল আমার শিক্ষা-গুরু ও হয়ত এখন স্বর্গস্থ তথাপি সত্যের অনুরোধে এ কথা বলা অন্যায় হইবে না যে তাঁহারা যে কঠোর শাসন দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জঘন্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন, তাহা কখনো ভুলিতে পারিব না।" প্রত্যহ ছেলেকে আপনাপন বাড়ী হইতে অভিভাবকের অজ্ঞাত সারে, চাউল ডাইল, চিনি, লবণ, মরিচ, হলুদ, তামাক, তরকারী প্রভৃতি নেকড়ায় বাঁধিয়া আনিয়া মক্তবে পৌঁছিয়াই সর্ব্বাগ্রে সেই সব খুলিয়া মুন্সীকে দেখাইতে হইত; ইহা ছাড়া যেদিন যাহার বাড়ীতে যে নূতন জিনিষের আমদানী হইত—(যথা নূতন গাছে ফল, কুটুম্ব বাড়ী হইতে আগত মিঠাই ইত্যাদি)—তাহারই কিয়দংশ—অনেক স্থলেই সিংহের অংশ—মুন্সীর কাছে গোপনে গোপনে রপ্তানী করিতে হইত। যে বালকের 'মর্য্যাল করেজ্' এ সম্বন্ধে কিছু দুর্ব্বল থাকিত, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে সেই কারণে শাসন না করিয়া, পরোক্ষভাবে তাহার লেখা পড়ার ভুল-চুক্—ছুতা নাতা—ধরিয়া প্রায় সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত তৈলাক্ত লিক্‌লিকায়মান যমদণ্ড সদৃশ—এক বেত্রখণ্ড দ্বারা শাসন করা হইত। প্রথমে সেই বালককে মুন্সী বলিতেন, * * তোর পশ্চাদ্ভাগ খোল্।" বালক যদি আসন্ন বিপদ্ মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া, বস্ত্র সংবরণ বা নিতম্ব কণ্ডুয়নচ্ছলে আদেশ পালনে বিলম্ব করিত, অমনি সেই বেত্রদণ্ড সবলে তাহার পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইত। বালক সেই আহত স্থানটা ন্যুব্জাকারে বিন্যস্ত করিয়া ধনুর ন্যায় চক্রাকৃতি হইত ও কাতরকণ্ঠে সজলচক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে "জি নেহি" 'জি নেহি' বলিত। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বেত্রদণ্ড দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া বালকদেহের কুব্জপার্শ্বে পতিত হইত, অমনি সে বিপরীত দিকে বক্র হইত। তখন তাহার উভয় পার্শ্বে উপর্য্যুপরি পর্য্যায়ক্রমে বেত্র-বর্ষণ হইত ও সেই ছোক্‌রা আমাদের বিজ্ঞান-ক্লাসের নৃত্যমানা পুত্তলিকার ন্যায় কেবল উল্লম্ফন অবরোহণ করিত, এবং ফেনায়িত মুখে কেবল "জী না" "জী না" বলিত।

রায়বাহাদুর বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতার অন্নে প্রতিপালিত ও বেতনে পরিপুষ্ট বলিয়াই হৌক্ বা লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন বলিয়াই হৌক্, মুন্সীরা কখন তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি উত্তোলনও করেন নাই।

ইহার পর রায়বাহাদুরের পিতা তাঁহাকে বরিশালে লইয়া যান। সেইখানে তাঁহাদের পরিবারের কয়েকটী ছেলে ইংরেজী পড়িত। একটী এ-বি-সি বর্জ্জিত পাড়া গেঁয়ে বালককে সম্মুখে পাইয়া, তাহাদের যেন একটা শিকার মিলিল। মানুষ চিরদিনই 'বাহবা' পাইতে ব্যগ্র। অশিক্ষিত সমাজে এই বাহবা সামান্য একটী পুষ্টে-চাপড় ও সেই সঙ্গে "সাবাশ" "বহুত আচ্ছা" বুলি পাইলেই ষোল কলায় পূর্ণ হয়, আর শিক্ষিত সমাজে 'মীটিং' করিয়া করতালি দিয়া "ভোট্ অভ্ থ্যাংস্" না দিলে বাহবার বাহার হয় না; এইমাত্র প্রভেদ। ইংরেজী অনভিজ্ঞ সদ্য-পল্লীগ্রামাগত বালক কালীপ্রসন্নকে পাইয়াও বরিশালের বাসার সেই ছাত্রদের একটু বাহবা লইবার সাধ হইয়া থাকিবে। এই সাধ হইতে অথবা ইংরেজী শিক্ষার প্রাথমিক মদিরার উত্তেজনায়—বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকিবে; হয়ত ঘরের কপাটে ও পুস্তকের মলাটে তাহারা কেবল ইংরেজীই লিখিয়া রাখিত, অচিরজাত গাভী-বৎসের ন্যায় সর্ব্বদা ইংরেজী-ক্ষেত্রে উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইত। যাহা হউক্ তাহাদের এই গর্ব্বোদ্ধত ইংরেজীগত জীবন দেখিয়া বালক কালীপ্রসন্নের মনে ঈর্ষ্যা ও আপনার প্রতি ধিক্কার হইল। তাহাদের ইংরেজী বোল-চাল্ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল; তিনি ইংরেজী শিখিবার অনুমতি ও সুযোগ পাইবার জন্য পিতার নিকটে জেদ্ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তখনি তাঁহার এই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইংরেজী অভিজ্ঞ লোকই কালে এ দেশের 'চিনি এবং রুটী' উপভোগ করিবে, তদিতর লোকের ভাগ্যে মূলাটা-কলাটা আছে—এই পর্য্যন্ত। তিনি পিতার অনুমতিক্রমে বরিশালের ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই ঘটনায় আমরা তাঁহার যেমন জ্ঞান-লিপ্সার পরিচয় পাইলাম, সেইরূপ সুদূরদর্শিনী বুদ্ধিরও পরিচয় পাইলাম।

এই সময়ে বরিশালে গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয় নাই, রোমান কাথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট পাদরীদের স্থাপিত দুইটী বে-সরকারী স্কুল ছিল। এই প্রসঙ্গে রায়বাহাদুর বলিলেন "পাদ্‌রীরাই আমাদের দেশে সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যাও সেই সঙ্গে অবিদ্যা আনিয়াছেন।" *

দশ বৎসর বয়সে তিনি বরিশাল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা কলীজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন্, কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়াতে তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা ছাড়িয়া দেন নাই, অথবা আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করেন নাই, কিম্বা বাড়ী হইতে পলাইয়া খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি করেন নাই। তিনি ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স পনর বৎসর। এই তরুণ বয়সে সে কালের দিনে ঢাকা হইতে কলিকাতা যাওয়া যৎসামান্য ব্যাপার ছিল না। তখন এখনকার মত রেল্ ষ্টীমার ছিল না; সেই সুন্দরবন দিয়া—যেখানে ডেঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর, উভয়ত্র ডাকাত ছিল—সকলকে কলিকাতায় যাইতে হইত। কলিকাতা গমনোদ্যত পুত্রকে মা যাবতীয় পিষ্টক পরমান্ন না খাওয়াইতে পারিলে আপনাকে অভাগিনী মনে করিতেন; ভগ্নী স্বামীর বাড়ী হইতে আসিয়া ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, মায়ে ঝিয়ে একত্র হইয়া হাতে কত তাগা-তাবিজ বাঁধিয়া দিতেন, 'মঙ্গিল্-আশান'কে পূজা মানিতেন, 'নিরাকুলী' দেবীকে দুই বিড়া পানের প্রলোভন দেখাইতেন; আর পত্নী, তিনি তো তন্ন তন্ন করিয়া, স্বামীর কাণের পোকা বাহির করিয়া, যাহা কিছু পোতা ধন, লগ্নী টাকা আছে, তাহার অনুসন্ধান লইতেন! তাহার পরে সেই প্রবাসগমনোন্মুখ হতভাগ্যের

* পরে যে সময়ে বরিশালে গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয়, সেই সময়েও রায় বাহাদুর বরিশালে ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা লিখিতেছি। বনমালী মিত্র ও কালীচরণ চাটার্জি নামক দুই ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া আসিলেন। ইঁহাদিগকে লোকে 'বিদ্যার জাহাজ' বলিত; ইহাদের চাল চলনে জাহাজের কথা মনে না হইলেও ময়ূরপঙ্খী নৌকার কথা মনে পড়িত। ইহারা পথ দিয়া চলিলে লোকে ভয়ে ও বিস্ময়ে দূর হইতে মুখের পানে তাকাইয়া থাকিত। ইহাদের একজনে ছাত্রদিগকে গাণিতিক মতে সাজা দিতেন; যথা বলিতেন, "Be a perpendicular on the bench" অথবা "Make a right-angle triangled with your legs" ছাত্রদিগকে 'গাধার টুপি' (একটী কাগজ নির্ম্মিত টুপীতে Ass's Cap কথা লিখিত) পরানও একটী অন্যতম শাস্তি ছিল।

জন্য একটা কান্নার রোল পড়িয়া যাইত। এখন লোকে জাপানে বা আমেরিকায়, টেরাডেল্ ফিউগো বা গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে, যাইতে চাহিলেও তাহার আত্মীয়বর্গের মনে বোধ হয় এত বিষাদ হয় না, বা তাহারা এত প্রমাদ গণেনা; এত ক্রন্দনের আয়োজন বা তাগা তাবিজের প্রয়োজন হয় না। এ হেন সময়ে চাকুরীর চেষ্টায় নহে, (রায়বাহাদুরদের অবস্থা পূর্ব্বাপরই ভাল) জ্ঞানোপার্জ্জন মানসে, ঢাকা হইতে কলিকাতা যাওয়া যে-সে লোকের কর্ম্ম নহে, হৃদয়-গহ্বরে প্রবল জ্বালা না থাকিলে বা বুকের পাটার জোর নিতান্ত বেশী না থাকিলে এরূপ কর্ম্ম সাজে না।

কলিকাতা গিয়া তিনি কোন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন না; নিজের মনের মত বই বাছিয়া বাছিয়া কিনিয়া ঘরে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি রোজ সতের ঘণ্টা পড়িতেন। তাঁহার অধ্যয়ন-প্রণালী অতিসুন্দর। সাধক ভক্ত যে চোখে আপনার ইষ্টদেবতাকে দেখেন, তিনিও নিজের মনোনীত গ্রন্থখানিকে সেই চোকে দেখিয়া থাকেন। বইখানা ছোট একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে রাখিয়া প্রথমে ভক্তিভরে তৎসম্মুখে প্রণাম করেন। পরে তাহা উজ্জ্বল দীপালোক সাহায্যে এই আসনের উপরেই রাখিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। বই খানা একবার শেষ হইলে, তাহাই উপর্য্যুপরি আরো তিন চারি বার কখন কখন তার চেয়েও বেশীবার পড়িয়া থাকেন। প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার পড়িবার সময়ে পুস্তকের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্যারাগ্রাফ বা পংক্তির ধারে অতি সূক্ষ্মাগ্র পেন্সিল্ দ্বারা চিহ্ন করেন। পরে তৃতীয় বা চতুর্থ বার অধ্যয়ন করিয়া সেই চিহ্নগুলি অতি যত্নে মুছিয়া ফেলেন। তিনি বলেন "বই কদর্য্য করা আমি ভালবাসি না।"

যে কাষ্ঠাসনের কথা বলিলাম, ভিজিটরগণ উহা রায় বাহাদুরের ঢাকার বাসায় ('বান্ধব-কুটীরে') তাঁহারই সম্মুখে সর্ব্বদা দেখিয়া থাকিবেন। ঐটীকে দেবী বীণাপাণির আসন বলিলে বলা যায়।

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বীর ন্যায় এইরূপ সংযম ও কঠোর শ্রম সহকারে দীর্ঘকাল কলিকাতায় থাকিয়া দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-পিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলে, দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ছোট আদালতের হেডক্লার্ক রূপে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় থাকিতেই তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা অভ্যাস করেন ও দুই একটী বক্তৃতায় বেশ প্রশংসা লাভ করেন। ঢাকায় আসিয়া নানা উপলক্ষে অনেকগুলি ইংরেজী বক্তৃতা দিলেন, চারি দিকে প্রশংসা হইতে লাগিল। এই সময়ে ঢাকার প্রায় প্রত্যেক সার্ব্বজনিক ব্যাপারে তিনি ও স্বর্গীয় দীননাথ সেন রাও সাহেব অগ্রণী ছিলেন।

ক্রমে তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতার স্রোতে ভাঁটা পড়িল; তিনি বুঝিতে পারিলেন ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়া বিদ্যালয়ের যুবকগণের চটপট করতালি লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইংরেজী আমাদের প্রাণের ভাষা নহে, আটপৌরে ভাষা নহে, উহা রসনার ভাষা, পোষাকী ভাষা। কার্লাইল্ ও গ্লাডষ্টোনের মত লোক যে ভাষার সেবা করিতেছেন, সেই ভাষার সেবা দ্বারা তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন; দুরাশাও বটে। জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবনের সংস্কারচেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। এই মনে বুঝিয়া তিনি বঙ্গভাষার দিকে তাকাইলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কয়েকদিন বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার সেবা করিয়া লইলেন। অতুল উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ ও বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া আয়ত্ত করিলেন। এইবার বঙ্গভাষার সেবা আরম্ভ করিলেন। মায়ের প্রকৃতি ও রুচি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার পূর্ব্বেই জানা ছিল; তাহার সাহায্যে মেয়েকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল।

তাঁহার প্রথম পুস্তকের নাম "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব"। তৎকালীন 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছিল যে, মাইকেল যেমন বাঙ্গালা পদ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিও বাঁচিয়া থাকিলে বাঙ্গালা গদ্যে সেইরূপ নূতন যুগ আনয়ন করিবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিয়ৎকাল পরে মিল্ প্রণীত Subjection of Women নামক গ্রন্থ বাহির হয়। উভয় প্রতিভারই মতে ও বাদ-বিচারে এত সাদৃশ্য আছে যে, রায়বাহাদুরের বই (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াও,) পরে বাহির হইলে তাঁহাকে কিছু গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত। বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতির অনন্যতন্ত্রতা লইয়া যেরূপ কয়েক দিন তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এখানেও সেই রূপ তর্ক বিতর্ক হইবার সম্ভাবনা ছিল।

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

DIFFERENT CONTRAST.

কবিতা লিখিয়া স্বর্ণকুমারী দেবী যে অবশেষে শিশু-পাঠ্য "গল্প-স্বল্প" লিখিয়াছেন, তাহাই বা এই সঙ্গে পাপমনে উদয় হইল কেন? ইহার জন্য কি বঙ্গীয় পাঠকগণ দায়ী নহেন?

রায়বাহাদুরের রচিত পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্গীত-মঞ্জরী নামক পুস্তকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত আছে; সে গুলি ভাবের ছটায় ও ভাষার ঘটায় যেমন গম্ভীর তেমনই কোমল; 'উজ্জ্বলে মধুরে' অপূর্ব্ব সম্মিলন।

বঙ্কিম বাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'লোক-রহস্য' নামক গ্রন্থে যেরূপ কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক কৌতুক-জনক প্রবন্ধ আছে, ইঁহার রচিত 'নিভৃত-চিন্তায়' 'ষট্‌কারক' প্রভৃতি কতকগুলি সেই ধরণের প্রবন্ধ আছে। ফলতঃ বঙ্কিমবাবুর পূর্ণ-ব্রহ্মাবতার শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলে"র মূর্ত্তি, রায় বাহাদুরের 'হরিদাসে'র পার্শ্বে "স্ত্রীনদীবৎ" দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' বা 'উর্ব্বশী'র পার্শ্বে 'বঙ্গ-নবদম্পতি'র মূর্ত্তি, বড়ই কৌতুকজনক ও মনোহর। এই সঙ্গে চন্দ্রনাথ বাবুর 'পশুপতি-সংবাদ'ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "ভাই হাতে তালি" ও "শুক-সারী সংবাদ"ও উল্লেখযোগ্য। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে ইচ্ছা করিলেই পেচকের ন্যায় গম্ভীর-ভাঁকাল ও বিদূষকের ন্যায় অস্থির-বাচাল সাজিতে পারেন, এই সব লোকের জীবনী তাহার প্রমাণ।

রায়বাহাদুর দেখিতে কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ও উজ্জ্বল-বিস্ফারিত-নেত্র। পরলোকগত বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, অর্দ্ধমৃত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবিত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মস্তকের গঠন যে ধরণের, রায়বাহাদুরেরও সেই ধরণের; বঙ্কিম বাবু —— বাবুর ধরণের নহে। মস্তিষ্কতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এ কটু ভাবিতে বা আমোদ করিতে পারেন।

সদালাপী, মিষ্টভাষী, এই বয়সেও স্মরণ-ান্ পুস্তকের মধ্যে কোন্ বিষয় আছে, মারীর কোন্ থাকে আছে, এ সব নিরক্ষর ভৃত্যকে বলিয়া দেন। ন (Psychic Science) রিতেছিলাম। আজ কয়েক বৎসর হইল ব্রিষ্টলের নিগূঢ়-মনোবিজ্ঞান সভায় (Psychical Society) সভাপতি ক্রোক্‌স সাহেব এক বক্তৃতা দেন; সেই বক্তৃতার পর অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিলেন; অবশেষে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন "আমার অমুক ঘরে অমুক ভাঙ্গাবাক্সে ৩ খানা কি ৪ খানা বইর নীচে গাঢ় নীল রঙের কাগজে বাঁধান একখান বই আছে, তাহা নিয়ে আয়।" বলা বাহুল্য ঐ সভার প্রকাশিত মাসিক পত্রটীর যে সংখ্যায় সভাপতির পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতাটী প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই বই আসিয়া হাজির হইল। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে বই পড়িয়াছেন, তাহার অনেক স্থান তিনি অদ্যাপি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে রায় বাহাদুর অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে তিনি অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন ও তিনি এতৎ সম্বন্ধীয় কোন কোন বিলাতী মাসিক পত্রের গ্রাহক।

তিনি বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ দর্শন, নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থই পড়িয়া থাকেন। যখনই ইঁহার কাছে গিয়াছি, তখনি ইঁহাকে গ্রন্থরাশিতে পরিবেষ্টিত দেখিয়াছি; ইঁহার লাইব্রেরীতে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বহুসংখ্যক বই আছে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৭।৮ খানা বই ইঁহার হস্তে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই বই গুলি সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই তিনি মস্তকের গুরুভার লঘু ও জীবনের সার পূর্ণ মনে করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ ছিল "থিওডোর পার্কারের জীবন চরিত"। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার আগেই অপহৃত বা বিনষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম সন্তান বলিয়া উহার জন্য তিনি এখনো আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক্ জয়দেবপুরের বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর আজকাল কালীপ্রসন্ন বাবুকে রাজ-কার্য্যের কড়া ক্রান্তির হিসাব ও মাম্‌লা মোকদ্দমার তদ্বিরে তত বেশী না ডাকিয়া সাহিত্য-সেবার জন্য যথেষ্ট অবসর দিয়াছেন। আশা করি তিনি তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি সমাপ্ত করিয়া জননী বঙ্গভাষার চরণে কয়েকখানা নূতন অলঙ্কার উৎসর্গ করিতে পারিবেন। ঈশ্বরের নিকট আমরা ইঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। বঙ্কিম বাবুর

মৃত্যুর পরে বঙ্গ-সাহিত্যের মহারথিগণের মধ্যে ইনিই বোধ হয় এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৃদ্ধ "জ্ঞানানন্দ সরস্বতী"র লেখা দেখিতে সকলেই উৎসুক আছি।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ইত্যাদির কথোপকথন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

আশ্বিন মাসের শুক্লচতুর্দ্দশী তিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্যামপুকুর নামক পল্লিতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি—গলায় ক্যান্‌সার, চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। চুপ্ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ২২এ অক্টোবর ১৮৮৫ সাল। শ্যামপুকুরস্থিত একটি দ্বিতল গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর উপবিষ্ট। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে ও চারিদিকে সমাসীন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬—৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন—ভগবান্ রামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন। রাত্রি প্রায় সাতটা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারি দিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক। ঘরে অনেক লোক; অনেকে মহাপুরুষদর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন তিনি কি বলেন—দেখিবেন তিনি কি করেন।

(নির্লিপ্ত-সংসারী)

ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সে ধন্য। সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দুমোণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্চে—মাথায় বোঝা, তবুও সে বর দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাক্‌লে হয় না।

"যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্ব্বদা ডুব মারে কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

(নির্লিপ্ত হবার উপায়)

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাক্‌তে গেলে কিছু

সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জ্জনে থাকা দরকার; তা একবছর হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে হয়, সর্ব্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্যে প্রার্থনা কর্‌তে হয়। আর মনে মনে বল্‌তে হয়, আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব। হায়! কেমন করে তাঁরে পাব।" ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আঠা লাগে না।

"সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখম তুল্‌তে হয়—মাখম তুলে যদি জলে রাখ তাহলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, 'মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত্। তাঁর মতন নির্লিপ্ত ভাবে আমরা সংসার কর্‌বো। আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বল্লেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্দ্ধপদ করে কত তপস্যা করে—ছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ করে তবে গিয়ে সংসার কর্‌তে হয়। দইকে নির্জ্জনে পাত্‌তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি কর্‌লে দই বসে না।

"জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর নাম বিদেহ। বিদেহ—কিনা দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই। জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন। এক খানা জ্ঞান, এক খানা কর্ম্ম।

(সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞান)

"যদি বল সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী এ দুয়ের তফাত আছে কি না? তাহার উত্তর এই, যে দুইই এক জিনিষ। তবে সংসারী জ্ঞানীরও ভয় আছে—কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্‌তে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে যত সিয়ানই হওনা কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

"মাখম তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ তা'হলে মাখম নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ তা হ'লে সন্দেহ হয়।

"খই যখন ভাজা হয় দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্‌টপ করে লাফিয়ে পড়ে। সে গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে সেও বেশ খই তবে অত ফুলের মত হয় না। একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান লাভ করেন তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতন দাগশূন্য হয়। জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাক্‌লে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হতে পারে। জনক রাজার সভায় একটী ভৈরবী এসেছিল। জনক রাজা স্ত্রীলোক দেখে হেঁটমুখ হয়ে চোখ নিচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, হে জনক তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়—পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তার স্ত্রী পুরুষ বলে ভেদ বুদ্ধি থাকে না। যাই হোক্ যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাক্‌তে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কর্ম্ম, লোক সংগ্রহার্থ)

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক নারদাদি। লোক শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায় একটী পাখী বস্‌লে ডুবে যায়। কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায় তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। ষ্টীম্ বোট আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়। নারদাদি আচার্য্য এই বাহাদুরি কাঠের মত—এই ষ্টীম্ বোটের মত।

কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুছে বসে, পাছে কেউ টের পায়, আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে কেটে একটু একটু সকলকে দেয়—আর আপনিও খায়।

নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান লাভের পরও ভক্তি নিয়েছিলেন।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুজে যায় আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়ে মানুষ। তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুক্‌তে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুক্‌তে পায় না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে—তাঁকে জান্‌বার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন কর্‌তে বেরিয়েছিল, পুরীর কোনও পথ সে জান্‌তো না—দক্ষিণদিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিছ্‌ল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা কর্‌ত। তারা বলে দিল 'এ পথে নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন কর্‌লে। না জান্‌লেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলেতো গিছ্‌ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার আবার নিরাকার। এক জন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন কর্‌তে গিছল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হ'ল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? হাতে দণ্ড ছিল; সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এধার থেকে ওধার দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লে যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। পুনর্ব্বার দণ্ড এধার থেকে ওধার নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌ল। তখন সন্ন্যাসী বুঝল, যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার। কিন্তু এটা ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হল তো এত নানারূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করিয়াছেন, তিনি সাকার; তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না কর্‌তে পার্‌লে এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

"একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ কর্‌তে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয় তো বল্‌লে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়'। আর একজন হয় ত বল্‌লে, 'আমার হলদে রঙে ছোপান চাই'। অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার হল্‌দে রঙ।' নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়'। এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হত। এক জন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেমন হে তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে বল্‌লে ভাই তুমি যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও। (সকলের হাস্য)

"একজন মাঠে গিছ্‌ল। দেখ্‌লে গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর এক জনকে বল্‌লে, ভাই অমুক গাছে আমি একটি লাল জানোয়ার দেখে এলুম। সে লোকটি বললে, আমিও দেখে এসেছি। তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্। আর এক জন বললে, না না সে সবুজ হতে যাবে কেন সে যে হল্‌দে। এইরূপ আরও কেউ কেউ বল্‌লে সেগুলি নীল কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছ তলায় গিয়া দেখে একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্‌লে আমি এই গাছ তলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বল্‌ছো সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল আরও সব কত কি হয়। আবার কখন দেখি কোনও রঙ নাই।

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে সেই জান্‌তে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ (the Absolute)। যে গাছতলায় থাকে

সে-ই জানে যে বহুরূপীর নানারঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্যলোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কূলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তি (Personal God) হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন।

ডাক্তার।—জ্ঞানসূর্য্য উঠলে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপটুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন তিনিই নাই। তিনি আর তাঁর 'আমি' খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (the Absolute), তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মনবুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (the unknown and the unknowable)।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—তাই বলে ভক্তিচন্দ্র, জ্ঞান সূর্য্য। শুনেছি খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে এত ঠাণ্ডা যে জলজমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না, সেখানে গিয়ে আট্‌কে যায়।

ডাক্তার।—ভক্তিপথে মানুষ আট্‌কে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—হাঁ তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেননা সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার কর্‌তে চাও—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচার যদি কর্‌তে চাও তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞান-সূর্য্যে বরফ গলে যাবে—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল।

(কাঁচা 'আমি' ও পাকা 'আমি', ভক্তের 'আমি')।

জ্ঞান বিচারের পর সমাধি হলে আমি টামি কিছুই থাকে না, কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে ফিরে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

"গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বরষা নাই। কিম্বা কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। আবার নাড়ী ভুড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ (তুমি তুমি) করে; তখন গরুর নিস্তার হয়।

"যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর তুমি কর্ত্তা, আমি দাস, তুমি প্রভু, তখন নিস্তার। তখনই মুক্তি।

ডাক্তার।—কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যাস্ তবে থাক্ * * 'দাস আমি' হয়ে। (সকলের হাস্য)।

সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে, দাস আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোক শিক্ষার জন্য রেখে দিছলেন।

"দাস 'আমি' বিদ্যার 'আমি' ভক্তের 'আমি' এরই নাম 'পাকা আমি'।

"কাঁচা আমি কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে; আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে—এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধর্‌তে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিসপত্র কেড়ে নেয়, তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তার পর পুলিসে দেয়। বলে, কি! জাননা কার চুরি করেছ!

(বালকের আমি)

ঈশ্বর লাভ হলে, পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। বালকের 'আমি' ও পাকা 'আমি'। বালক কোনও গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি কর্‌লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। আবার রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাত্‌লে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইলো। মার কাছে ছুটছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্চে, অনেকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয়ত কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবায় করে বেড়াচ্চে। যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড় খানি; কার কাপড় রে?'

সে বলে আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েচে। যদি বল, লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড় খানি দাওনা; সে বলে, 'না আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না আমি দোবো না।' তার পর ভুলিয়ে একটু পুতুল কি একটি বাঁশি যদি হাতে দাও তাহলে পাঁচ টাকা দামের কাপড় খানা তোমায় দিয়ে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক-দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু বাপমার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চলে গেল তখন নতুন খেলুড়ে হল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরানো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোলআনা জানে যে এ আমার ঠিক্ দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তা একপাতে বসে ভাত খাবে।

* * *

আবার "বুড়োর আমি" আছে। (ডাক্তারের হাস্য) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা, যদি কারুর উপর আকোচ হয় তো সহজে যায় না। হয়ত যত দিন বাঁচে ততদিন যায় না। তারপর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, এই সব 'বুড়োর আমি' কাঁচা 'আমি'।

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ।—৪।৫ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে অমুক যায়গায় বেশ একটি সাধু আছে দেখ্‌তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর করে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে আমি এত বড়লোক আমি যাবো?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বর লাভ, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়)

তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

পুরাণে আছে রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কামক্রোধাদিরিপু এরা তো যাবে না—এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায় তবে ভক্তির তমঃ আন। 'কি! আমি হরিনাম দুর্গানাম করেছি আমি উদ্ধার হব না। আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?' তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে—যদি অহঙ্কার কর্‌তে হয় তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার।—ইন্দ্রিয় সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চখের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু এক বারে বন্ধ করিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে আর ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু কর্‌তে পারে না।

"নারদ প্রহ্লাদ এই সব নিত্য সিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চ'লছে সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়্‌তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে সে কখনও খানায় পড়ে না।

ডাক্তার।—কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। মহাপুরুষদের বালক-স্বভাব! ঈশ্বরের কাছে তাঁরা সর্ব্বদাই বালক। তাঁদের অহংকার থাকে না; তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি—বাপের শক্তি। নিজের কিছুই নয়।

(বিচার-পথ ও আনন্দ-পথ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার।—আগে ঘোড়ার চক্ষে ঠুলি না দিলে ঘোড়া কি এগুতে চায়। রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ।—তুমি যা বলছো ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্ত-শুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই তবে জ্ঞান হবে। আবার ভক্তি পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি

তাঁর নাম গুণগান করতে ভাল লাগে তাহ'লে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে ক'রতে হয় না। রিপু বশ আপনা আপনি হয়ে যায়।

"যদি কাহারও পুত্রশোক হয় সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে পারে—না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে। সে কি লোকের সাম্‌নে অহং ক'রে বেড়াতে পারে—না সুখ সম্ভোগ করতে পারে। বাতুলে পোকা যদি একবার আলো দেখিতে পায় তা হ'লে সে কি আর অন্ধকারে থাকে।

ডাক্তার।—তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার!

শ্রীরামকৃষ্ণ।—না গো, ভক্ত কিন্তু বাতুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায় সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না—এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন)

"বিচার-পথে—জ্ঞানযোগের পথেও—তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা—ধারণ হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাওয়াতে দরদর করে রক্ত পড়ছে অথচ বল্‌ছি কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবে তো?

(বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, শিক্ষা-প্রণালী)

অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা, অনেক তফাৎ।

আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে তারা চাল তত বুঝে না। কিন্তু যারা না খেলে উপর চাল ব'লে দেয় তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক্ ঠিক্ হয়। সংসারী লোক মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলচে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু লোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল বলে দিতে পারে।

ডাক্তার।—(ভক্তদিগের প্রতি)। বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ'ত না। Faraday communed with nature প্রকৃতিকে ফ্যারাডে সাহেব নিজে দর্শন ক'রতো—তাই অত Scientific truth discover ক'রতে পেরে ছিল। বই পড়ে বিদ্যা হ'লে অত হ'ত না। Mathematical formulæ only throw the brain into confusion—original enquiryর পথে বড় বিঘ্ন দেয়।

(ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ।—(ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম মা আমায় দেখিয়ে দাও যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, আরও কত কি তা কি বল্‌বো। আহা কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়।

এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে
জেগে আছি।
এখন যোগ-নিদ্রা তোরে পেয়ে মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥"

"আমি তো বই টই কিছুই পড়ি নি, কিন্তু দেখ মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।"

* * *

—o—

বঙ্গভাষায় বৈদেশিক পারিভাষিক শব্দ।

প্রথম সংখ্যা (২য় বর্ষ) প্রদীপে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় 'বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক' শব্দ সম্বন্ধে এক সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে একটু বিশেষ আলোচনা হওয়া

আবশ্যক মনে মধ্যাহ্ন কালে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। গ মনে
যাহা সব চিন্তা করিয়া থামিয়া গেল। কিন্তু থামিে পস্থিত
করিলাম। যে বিষয় লই একটা বজ্রপাত হইল। লাচনা
করিতেছেন তাহাতে মাদৃশ ন দৌড়িয়া আসিয়া কাছ একান্ত
অনাবশ্যক, তাহা আমার জ্ঞান অী ন িতীয় পুত্র বজ্র ভাগের
সহিত লিপ্ত থাকা নিবন্ধন এ সম্বন্ধে ক্কিম বাবু কা আমা-
দিগকে শুনিতে হয় এবং অনেক অসুবিধা ীর দিকে ধ করিতে
হয়; এজন্য এসম্বন্ধে যা একটু আলোচনা হয় সে ম। মাদের
মঙ্গল! তাই বলিতেছি যে আমার এই মত উপস্থাপন
উপদেশ লাভের জন্য, দানের জন্য নয়। তয

বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টির সম্বন্ধে অনেক লোকের অনেক মত দেখা যায়; কেহ কেহ বাঙ্গলাকে নিভাঁজ সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিয়া তুলিতে চান, কেহ বা তাহা হইতে ইহাকে সম্পূর্ণ আলাহিদা করিয়া তুলিতে চান, কেহবা মাঝামাঝি রকম রাখিতে চান। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুই দলেরই মত ভ্রান্ত। বঙ্গভাষা সংস্কৃতভাষার নন্দিনী, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতেই ইহার ভাগ্যক্রমে যবনী পালিকা দ্বারা পালিতা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যবনী মাতার স্তন্যদুগ্ধে ইহার দেহের অনেক পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তবে একথা বলিতে পারা যায় বটে, যে যবনীপুষ্ট দেহাংশ উরগক্ষতা অঙ্গুলীর ন্যায় ত্যক্ত হইলেও বঙ্গভাষা সংস্কৃত বলেই বাঁচিতে পারে; সত্যবটে, কিন্তু তাহা কেবল কাগজ পত্রে বাঁচা মাত্র, কিন্তু তিনি কখনও চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ! তাঁহাকে পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিনীর ন্যায় শয্যাশায়িনীই থাকিতে হইবে; কাগজ কলম দোয়াত ফেলিয়া তিনি লেখ্যপত্র লেখনী মস্যাধারের ভার সহনে অক্ষম হইবেন; আইন আদালততো করিতেই পারিবেন না; সে সব প্রাড়্‌বিবাক্ ধর্ম্মাধিকরণ, নগরপাল, কোট্যপাল, প্রভৃতি দ্বারা সহজে কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে না! তাই বলিতেছিলাম যে বঙ্গভাষা কেবল সংস্কৃতানুসারিণীই যে হইবে এমন কোন কথা নাই, আর জীবিতা ভাষা অর্থাৎ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা প্রচলন রহিয়াছে সে ভাষার সম্পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন অথবা অসম্ভব। ব্যবসা বাণিজ্য, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কারণ বশতঃ যে সমস্ত বিভিন্নজাতীয় ভাষাবাদী জাতির সংঘর্ষে আসিতে হয় সে সমস্ত জাতির ভাষার কিছু কিছু জাতীয় ভাষায় না মিশিয়া থাকিতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই এ সব হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যোগেশবাবুও সংস্কৃত ভাষায় গ্রীক ভাষার ও রোমান ভাষার জ্যোতিষিক শব্দাদির অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। খুঁজিলে এরূপ আরও কিছু কিছু যে না পাওয়া যায় তাহা নহে। ইংরাজসংস্পর্শে আসিয়াও আমাদের বাঙ্গলাভাষা অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ ভাষার বড় কম শব্দ স্বাঙ্গীভূত করিয়া লন নাই। সার্ট, কোট, প্যাণ্ট, ষ্টকিং হইতে, টেবল, চেয়ার, গেলাস, প্লেট, ইত্যাদি ম্লেচ্ছশব্দগণ হিন্দুর বাসগৃহ, দেহ, ও রন্ধন গৃহে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু কই বাঙ্গলা ভাষার হিন্দু পণ্ডিতগণ তো বাঙ্গলা ভাষার হাঁড়ি ফেলা, মস্তক মুণ্ডন ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করেন নাই?

এইরূপে পুষ্টিলাভ করা ভাষার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। যখন যে ভাষাভাষী জাতির প্রাধান্য, তখন সেই ভাষার শব্দ আবশ্যকতা নিবন্ধনই অন্য ভাষায় প্রবেশ করে। তারপর ব্যবসা বাণিজ্য নিবন্ধনও ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সুবিধাজনক ভাষার প্রচলন হইয়া যায়। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যেও ঐ সত্য অনুসারে বাণিজ্যবিষয়ক অনেক শব্দ ইংরেজি হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। ইংরাজি ভাষাতেও বাঙ্গালা, হিন্দি, আরবী, ফারসি, ফরাসি, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষার শব্দ অল্প বিস্তর পরিমাণে রহিয়াছে। এরূপ গ্রহণে ভাষার দীনতা কিছু প্রকাশ পায়না বা তাহা ভাষার পক্ষে অপমানজনকও কিছু হয় না, বরং তাহাতে ভাষার ঔদার্য্য বৃদ্ধি ও প্রসার হয়। দেখুন ইংরাজি ভাষাতেও ডাক্তারি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিষয়ে অধিকাংশ শব্দই প্রাচীন ভাষা গ্রীক্ বা লাটিন হইতে গৃহীত! তাহাতে ইংরাজির অপমান হইয়াছে কি? তবে বলিতে পারা যায় বটে যে ঐ নিয়ম অনুসারে বাঙ্গালার শব্দও সংস্কৃত হইতে লওয়া কর্ত্তব্য; তাহা সত্য কিন্তু সে সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ভালই বলিয়াছেন; যদি এমন উপায় থাকিত যে ভবিষ্যতের পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলনাও এই ভাবেই হইয়া যাইবে, ইংরাজী পুস্তকাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, তাহা হইলে বরং সেরূপ হইতে পারিত; সংস্কৃতে যদি পদার্থবিদ্যা আলোচনার উচ্চগ্রন্থ ও পরীক্ষাদির উপযোগী দেশীয় যন্ত্রাদি থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষায়

TORN PAGES

রচিত পারিভাষিক শব্দ সাহায্যে পদার্থবিদ্যা পাঠে কোন আপত্তি হইত না, কিন্তু যখন তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের বিবেচনা হয় যে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা না লিখিয়া প্রকৃত উচ্চারণ সম্বলিত আসল ইংরাজি নাম ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। বালকগণও অব্জনক, উদ্জনক, জলজনক্, অব্জ, জলজান, উদ্জান, ইত্যাদি অসংখ্য নামের পরিবর্ত্তে এক হাইড্রোজেন শিখিয়াই রক্ষা পাইত, আর ভবিষ্যতেও কলেজ আদিতে গিয়া তথাকার নামগুলি নূতন বলিয়া বোধ হইত না। অবশ্য পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধেই এই কথা বলিতেছি। উদ্ভিদ্ বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমি ঐ প্রস্তাব করি। ইংরাজি নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণগুলি দিলে সব দিকেই যেন সুবিধা মনে করি। কেহ হাইদ্রোজেন, কেহ হাইড্রোজেন কেহবা তদ্রূপ অন্য একটি, কেহ অক্সিজেন, কেহ অক্সিজেন, এরূপ না করিয়া ঠিক অবিকল উচ্চারণ অনুসারে বঙ্গভাষায় শব্দগুলি লিখিয়া,বন্ধনী মধ্যে বরং বাঙ্গলা প্রতিশব্দগুলি দিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়। বালকগণ ইংরাজি শব্দই পারিভাষিকরূপে অভ্যাস করিবে, বাঙ্গলা শব্দগুলি দ্বারা অর্থবোধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে তাহাদের বর্ত্তমানে শিক্ষার সুবিধা ও ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা হইবে।

ইংরাজি নাম কটমট বলিয়া যাঁহাদের আপত্তি তাঁহাদিগকে বলিতে চাই যে আমাদের মুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণের সূত্রসমূহের কতকগুলি, দর্শনাদি শাস্ত্রের ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অনেক শব্দ ও পরিভাষাও কম নহে। আর নূতন নূতন একটু কটমটে লাগিলেও পরে তাহা সহিয়া যাইবে। এই ইংরাজি শব্দ ব্যবহারে ভাষা দীনা বা দীনতরা না হইয়া পুষ্টা বা পুষ্টতরা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি এবং ইহাতে ভাষার অবমান কিছুই নাই। জ্যোতিষাদি বিদ্যার এখনও চর্চ্চা আছে, ও গ্রন্থাদি আছে সুতরাং তদ্বিদ্যাবিষয়ক শব্দের জন্য আমাদের ইংরাজির আশ্রয় লইতে হইবে না; যিনি হিন্দু-জ্যোতিষ শিখিয়া পরে ইংরাজি জ্যোতিষ পড়িবেন তাঁহার ইংরাজি পরিভাষা বুঝিতে কোন কষ্টও হইবে না; তবে জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি ও তাহাদের অংশ বিশেষাদি যদি ইংরাজি হয় তবে তাহাদের ইংরাজি পরিভাষাই তাঁহাদের ব্যবহার করিতে হইবে। দর্শনাদি গ্রন্থ সম্বন্ধেও এইরূপ।

অ সারত্যাগী সাধু লোক বিষয়ে অন্য অনেক বস্তুর নাম দের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খে নাম যদি বিশেষ প্রচলিত দিতে পারে। রা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা ক্তার।—(ভক্তদিগের মিটিও থাবা ও অভ্যাস রাখা আবশ্য (পরমহংসদেবের ক্তার উদ্ভিদের দেশীয় নাম জানেন না, communeর প্রশংসার কথা নহে। ইংরাজি নাম শিক্ষা নিজে দর্শনগুলি দেশে পাওয়া যায় তাহার দেশীয় নাম শিক্ষা er অবশ্য কর্ত্তব্য ও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে তাহাদের গুণাগুণেরও অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাহাহউক সে কথা বর্ত্তম the আলোচ্য নহে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। সম্পাদক মহাশয় এ সব বিষয়ের আলোচনায় স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন; অতএব অদ্য এখানেই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। যদি পারি সময়ান্তরে এ বিষয়ের অন্যান্য আলোচনা করা যাইবে। তবে মোটের উপর কথা এই যে, দেশে অপ্রচলিত বিদ্যার পুস্তকাদি প্রণয়নকালে পারিভাষিক শব্দ নূতন গঠন না করিয়া অথবা নূতন গঠন করিলেও আদিম ভাষার (বর্ত্তমান ইংরাজি) পারিভাষিক শব্দের প্রাধান্য রক্ষা করিলেই সুবিধা হয়, তাহাতে ভাষার পুষ্টি ভিন্ন ক্ষীণতা হয় না; ভাষা স্বীয় আবশ্যক মত সর্ব্বদাই ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দসম্পত্তি আকর্ষণ করিতেছে ও আপনার করিয়া লইতেছে। সে বিষয়ের দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

অতএব যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহার প্রচলন না হইয়া এইরূপ নিয়ম হইলে বোধ হয়, অনেক সুবিধা হইতে পারে। সুধীগণের অভিমত কিরূপ জানিতে পারিলে সুখী হইব।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(২)

বঙ্কিম বাবুর বারুইপুরে অবস্থানকালে একটী দুর্ঘটনা হয়। তাহা অগ্রে লিপিবদ্ধ করিয়া অন্য বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর কার্য্যতৎপরতা ও পরহিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদিন মধ্যাহ্ন কালে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যেই থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটা বজ্রপাত হইল। তাহার ৪।৫ মিনিট পর একটী লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারীতে সংবাদ দিল, "রাজকুমার বাবুর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ুঃ হইয়াছে।" শুনিবা মাত্র বঙ্কিম বাবু কাছারির সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমার বাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। (এই রাজকুমার বাবু বারুইপুরের জমীদার রাজকুমার চৌধুরী। তাঁহার বাটী ফৌজদারী নূতন কাছারির ৫।৭রশি তফাতে)। আমরা বজ্রাহত বাটীতে গিয়া দেখিলাম যে বজ্রটী গৃহসংস্কারে ব্যবহৃত একটী বাঁশের উপরেই নিপতিত হয়। বাঁশটী বজ্রাঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে, বিদ্যুদাগ্নি আহত বাঁশটীকে পরিত্যাগ করিয়া সংলগ্ন দ্বিতল বাটীর উপরের ছাদের আলিশা আশ্রয় করিয়া তাহা হইতে কিছু দূরে আসিয়া ঘরের দেউল অবলম্বনে নীচের তলার একটী ঘরে নামিয়া আসে। নামিবার সময় দেউলের বালিথাম চুণথাম অঙ্গুলি প্রমাণ পরিসরে উপর হইতে বরাবর সোজা খসিয়া পড়িয়াছে। নীচের ঘরে তিনটী লোক একটী মাদুরে দেয়াল ঠেসিয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল; সেই বেচারাই তখন মৃত্যুমুখে পড়ে। ইহার বয়ক্রম অনুমান ২১ বৎসর হইবে। দ্বিতীয় বজ্রাহতটী রাজকুমার বাবুর সম্পর্কে ভাগিনেয়। এই যুবাটী তখন সেই মাদুরের উপরে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছিল। তৃতীয় বজ্রাহতটী বাবুর তৃতীয় পুত্র। ইনি তখন অনুমান ষোল বৎসর বয়স্কের ন্যূন হইবেন। ইনি সচেতন অবস্থায় এদিক ওদিক করিতেছিলেন। ইঁহার অঙ্গের উরুদেশে একটী ছড় দেখিলাম, ইনি তখনও তাহার জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। ছড়টী উরু দেশের ঊর্দ্ধ স্থান হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত নামিয়াছে। রাজকুমার বাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বকীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থানে মুখাবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমার বাবু সে দিন প্রাতের টেণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। মৃত পুত্রটীর মাতা, পুত্রাঙ্গে কোন বজ্রচিহ্ন না দেখিয়া হয় ত মনে করিতেছিলেন পুত্রটী শুদ্ধ অচেতন মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। মৃতের অঙ্গে বস্তুতঃ কোন চিহ্ন ছিল না। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কোন স্থান দগ্ধ হয় নাই। কোমরের ঘুনসীটী যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে, ঘুনসীতে চাবিটীও যেমন ছিল তেমনি আছে। বঙ্কিম বাবু চাবিটী গলিয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেছিলেন। বজ্রপাতকালে আহতের মস্তক পতন-চিহ্নিত স্থান হইতে এক বিগতের কিছু বেশী দূরস্থ ছিল। আমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরি সাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিম বাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য, অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া রাজকুমার বাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। এ দিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবাটীর চৈতন্যোদয় জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম বাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার মহোদয়গণের কোন চেষ্টা সফল হয় নাই। বজ্রটী বোধ হয় আহতের মস্তিষ্ক দেশের সন্নিধানে আসিয়া আন্দোলনেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত করিয়াছিল। ডাক্তারেরা অন্ততঃ এই মন্তব্যে তখন উপনীত হন।

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমি আমার নূতন কার্য্যে বারাসাতে চলিয়া গেলে

বঙ্কিম বাবু কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বারুইপুরে অবস্থিত ছিলেন। তখন আমি যখনই যখনই বাটীতে আসিতাম, বারুইপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন;—আদালতের কার্য্যের সময়েও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে বঙ্কিম বাবু একবার আলিপুর হইতে জয়নগর অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিষ্ণুপুরের ডাক বাঙ্গলায় এক রাত্রি অবস্থিতি করেন। পর দিন প্রাতে তিনি আমাদের বাটী আসিয়া আমার সঙ্গে তদুপলক্ষে দেখা করেন। আমি তখন মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান। মিউনিসিপালিটী হইতে দুটী দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যু-ঘটনার বিবরণ আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু এতদঞ্চলে প্রেরিত হন।

আমার সঙ্গে দেখা করিবার পরই বঙ্কিম বাবু বাইসহাটা গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যান। তাহার পূর্ব্বদিন কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী সেই গ্রামে গিয়া, যাহারা যথার্থই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত এবং অনাহারে বা কদর্য্য দ্রব্যাদির আহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে অনুসন্ধান-স্থল হইতে কৌশলে অনুপস্থিত করিয়া দিল; এবং যাহারা পুষ্টদেহ ও তৈলাক্ত-কলেবর,—যাহাদের গায়ে দুর্ভিক্ষের বাতাস কিছুমাত্র লাগে নাই, পুলিশ কেবল তাহাদিগকে অনুসন্ধান-স্থলে উপস্থিত রাখিল। ইহারাই পুলিশ-শিক্ষিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর কাছে দুর্ভিক্ষের মায়া কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,"মশাই, আমরা এবার খেতে না পেয়ে মরি, সরকার বাহাদুর এ সময় আমাদিগকে অন্ন দিয়া প্রাণে বাঁচান।" বঙ্কিম বাবু বাইসহাটা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট তাঁহার অনুসন্ধানের ফল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। বঙ্কিম বাবু সত্য সত্যই পুলিশের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই যে লোকটী তথায় দুর্ভিক্ষে মৃত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, পুলিশের কৌশলে তাহাকে "রোগে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত" বলিয়া অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল। বঙ্কিম বাবু তৎপরে বাইসহাটা হইতে ফিরিবার পথে জয়নগর-সন্নিহিত হাটপাড়া গ্রামের মৃত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি অবশ্যই দুর্ভিক্ষে "অনাহার-প্রযুক্ত মৃত" বলিয়া প্রমাণিত হইল। পুলিশের কোন কৌশলজাল এখানে বিস্তারিত হয় নাই। যদি পুলিশ-রিপোর্টে এই মৃত্যু বিবরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে পুলিশের কোন কৌশলজাল বিস্তার করিবার কারণ ছিল না, অথবা স্থানটী জয়নগর-বাসীদের অত্যন্ত সন্নিহিত বলিয়া পুলিশ এখানে কোন চাতুরী করিবার অবসর পায় নাই বা সাহস করে নাই। বঙ্কিম বাবুর মুখে বাইসহাটার দুর্ভিক্ষ-বিবরণ শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। তাহা আমাদের সংগৃহীত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিম বাবু আলিপুরে ফিরিয়া গেলে আমি পুলিশের চাতুরী অবগত হইলাম। এরূপ চাতুরী অবলম্বন করাতে পুলিশের অন্য স্বার্থ ছিল না। উপর হাকিমদের ভয়েই তাহাদের এই চাতুরী অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সাহেব-হাকিমদের কর্ণে দুর্ভিক্ষ-জনিত কষ্টের কথা বড়ই তিক্ত লাগে। থানার পুলিশ-রিপোর্টে একবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা থাকাতে পুলিশের বড় সাহেব থানার দারগার উপর বড়ই চটিয়া উঠেন। তাহাতে দারগাটী, মানসিক নৈতিক সাহসের অসদ্ভাবে, খুব সতর্ক হইয়া যান। যখন ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বঙ্কিম বাবুকে এ অঞ্চলে পাঠাইলেন, তখন তাহাদের সহসা আশঙ্কা জন্মিল। যদি কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রমাণিত হয়, আর যদি তাহারা তৎ সম্বাদ পূর্ব্বাহ্ণে উপরে না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উপর হাকিমদের সমস্ত তম্বি পড়িবারই কথা। দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিলেও পুলিশের দোষ, না দিলেও তাহাদের দোষ। সেই জন্য শেষে দুর্ভিক্ষ প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের উপর পাছে কোন দোষ পড়ে, তজ্জন্য পুলিশকে এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ স্থলে পুলিশের অবস্থা "ন যযৌ ন তস্থৌ", এগুলেও দোষ, পেছুলেও দোষ।

বাইসহাটারও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিম বাবু সে দিন মধ্যাহ্নে এখানকার সব রেজিষ্ট্রার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুরের বাসায় স্নান আহারাদি করেন। আমি বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস—

বঙ্কিম বাবুর স্বগ্রামে—কাঁটাল পাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথা বার্ত্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিম বাবু বাল্যকালে কমলাপতি বাবুর নিকট ইংরাজি পড়িতেন। আমার সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর সেই খানেই, তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। আমি পূর্ব্বে নবজীবন পত্রিকায় "বৈষ্ণব-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতাম। "এখন আর কোন প্রবন্ধ লিখি না কেন" জিজ্ঞাসিলে আমি তদুত্তরে আমার শারীরিক অস্বাস্থ্যের বিষয় বলিলাম। "লিখিতে গেলে আমার বহুমূত্রের পীড়া বাড়ে।" তাহাতে তিনি 'এরূপ স্থলে না লেখাই ভাল' বলিলেন। "শীঘ্র পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন"—এরূপ কথাও হইল। তিনি চিরকালই সাহেবদের গালাগালির বড়ই ভয় করিতেন এবং সর্ব্বদাই বলিতেন যে কোন উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবার উপযুক্ত আয় হইলে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কথাটা এই, তিনি বহুদিন হইতে অনেক সাহেবকে কাজ শিখাইয়া এক প্রকার মানুষ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গেলেন। এখন যে সমস্ত তরুণবয়স্ক কার্য্যানভিজ্ঞ সাহেবেরা তাঁহার উপর হাকিম হইয়া আসিতেছে তাহারা আবার উল্টে তাঁহাকে কাজ শিখাইতে ও সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্যায়রূপে ধমক দিতে চায় ও তাহাতে শ্লাঘা জ্ঞান করে। এরূপ দুর্ব্ব্যবহার এখন তাঁহার ক্রমে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রামাণিক সূত্রে অবগত হইয়াছি, একবার নাকি ২৪ পরগণার কোন উদ্ধত মাজিষ্ট্রেট বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার নিজ এজলাসের মধ্যেই কর্কশ ভাষায় "বঙ্কিম্" "বঙ্কিম্" বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিবার উদ্যোগ করিল। তাহাতে বঙ্কিম্ বাবু নাকি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "you should see, I am no longer "Bankim" now. I now represent Her Majesty's law and justice. You know I can at once order your arrest and pass sufficient punishment for insulting Her Majesty's court of justice." ইহাতে সাহেবটী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। এইরূপে বঙ্কিম বাবু পদের গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন স্থির করিয়াছিলেন।

এই ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় বঙ্কিম বাবু আরও আমাকে বলিয়াছিলেন যে "তিনি ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর শুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, আহার সম্বন্ধে এরূপ ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হন।" তিনি চিত্ত-শুদ্ধির জন্য দেহশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং দেহ-শুদ্ধির জন্য সাত্বিক আহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেন। অনেক ইংরাজি শিক্ষিতের নিকট হিন্দুর এই খাদ্যতত্ত্ব দুর্ভেদ্য সমস্যা হইয়া আছে। একদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও লেখকের সম্মুখে এ বিষয়ের ঘোর প্রতিবাদ করেন; তিনি এই মতকে ঘোর ("materialism") জড়বাদ বলিয়া মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ-পরমহংস-শিষ্য বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীও এ মতের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্রে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। খাদ্য-তত্ত্বের জ্ঞান না হইলে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার সত্য সত্যই বিড়ম্বনা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সংঘটন কালের ২।১ বৎসর পূর্ব্বে ইণ্টরন্যাযন্যাল এগ্‌জিবিষ্যন্ ক্ষেত্রে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমার সহসা সাক্ষাৎ হয়। সে সময় তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমি তখন কার্য্যগতিকে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ নবজীবন সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিম বাবুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ করেন। বঙ্কিম বাবু কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন আমি কোন প্রকার যোগাভ্যাস করি। তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই অক্ষয় বাবু তৎপ্রেরিত হইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা হইতে, আমার কোন গুরুজনের বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে ও তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ, ইহা আমি অক্ষয় বাবুর দ্বারা বঙ্কিম বাবুকে বলিয়া পাঠাইলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমাদের ও রেজেষ্টরী আফিসের বাটীতে সেই দেখা। সেই দেখার সময় আমি বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটীতে

গিয়া দেখা করিতে প্রতিশ্রুত হই। তদনুসারে যখন প্রথম দেখা করি, তখন বঙ্কিম বাবু পেন্সন লইয়া কলেজষ্ট্রীটের প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিস্থ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় মধ্যে মধ্যে কয়েকবার বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রথম সাক্ষাতে তিনি আমাকে কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতে অনুরোধ করেন। আমি তাহা অধ্যয়ন করিবার পর সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বস্তুতঃ তাহা পাঠ করিবার সময় বঙ্কিম বাবু যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণপরম্পরা অবলম্বন করিয়া মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ও মৌলিক অংশ নির্দ্দেশিত করেন, তাহাতে আমি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচারশক্তি দেখিয়া সত্য সত্যই অবাক্ হই। কিন্তু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-চরিত্র-স্থলে দাঁড় করাইবার চেষ্টায় বঙ্কিম বাবু অতি অল্পই সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের যে অনুচিত ধারণা ছিল তাহা তিনি অনেকটা অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু লোকে যে এখন শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবুর আদর্শ-চরিত্র-জ্ঞানে স্ব স্ব গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাসনা করিতে যাইবে ইহা বঙ্কিম বাবুর ওরূপ চেষ্টাদ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তাদৃশ চেষ্টাদ্বারা শুদ্ধমাত্র কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক দোষ সাধারণের চিত্তবৃত্তি হইতে অপসারিত হইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের উপাসনার ভাব অভিনব-ভাবে অন্তরে উদ্দীপিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বঙ্কিম বাবুর একজন কৃষ্ণোপাসনাতে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হইয়া চৈতন্য প্রভুর ন্যায় স্বয়ং বৈরাগ্যব্রত গ্রহণানন্তর সাঙ্গোপাঙ্গে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া লোক মাতাইবার প্রয়োজন ছিল। এরূপ বৈরাগ্য-ব্রতের অনুব্রতী হইয়া চেষ্টাপর হইতে পারিলে এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী উৎসাহী প্রচারক দল স্বকীয় আদর্শে সংগঠিত করিয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহার অভিলাষ কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইবার আশা থাকিত। খৃষ্টজগতে যেমন খৃষ্টোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, ভারতে এক্ষণে তাদৃশ সর্ব্বব্যাপী কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হইবার আশা স্বভাবতঃই খুব অল্প। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবেরও এপক্ষের চেষ্টা এপর্য্যন্ত এক প্রকার ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা ঠিক করিয়া বলিবার কেহই আমরা অধিকারী নহি। ভগবানের সঙ্গে মানুষের উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ। শুদ্ধ নীতির আদর্শ সাধারণ মানুষের মনঃপূত হইবার নহে। এ সংসারে তা বড় তা বড় প্রচুর নীতির আদর্শ আছে। তাহারা কখনও কাহারও লক্ষ্যস্থলে আইসে না। সাধারণ মানুষে একজন উপাসকের আদর্শ চান—একজন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎ-ভক্তি, না ছিল ভগবৎ-প্রেম, না ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা ও প্রশস্ততা। বঙ্কিম বাবু তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রের এ অভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' পুস্তকের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি করিবেন কাকে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করাতে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি আরও দূরস্থিত ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে যখন আমার এ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হয় তখন তিনি উপরি-উক্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বা ভক্ত জীবনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিষ্ণুপুরাণাদি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া কোথাও কিছুই পান নাই। আমি বলিলাম, "বৈষ্ণব পূর্ব্বাচার্য্যগণও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এ অভাবটী বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জের টানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে পরিণত করিয়া একটী সম্পূর্ণ আদর্শস্থানীয় করিতে কতকটা সফল হইয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের, প্রতিভার, বুদ্ধিমত্তার, তত্ত্বজ্ঞানের, নৈতিক অনুভূতি ও নিষ্ঠার অবতার, তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তির অবতার ও ভক্তের আদর্শস্থল। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বৈরাগ্যের সম্পূর্ণ অভাব, শ্রীগৌরাঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির আস্থা বিশ্বাসের, নির্ভর ও আনুগত্যের পূর্ণ অসদ্ভাব, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। বৈষ্ণব পূর্ব্বাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের একীকরণে একটী পূর্ণ আদর্শ চরিত্র চিত্র করিয়াছেন। তাঁহাদের শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে তাহা কুলায় নাই, শুদ্ধ গৌরাঙ্গেও তাহা কুলায় নাই। যেমন তাঁহাদের রাধা ও কৃষ্ণ লইয়া একটী সত্তাসৃষ্টি, তেমনি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়া একটি সত্তার স্ফূর্ত্তি।"

নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একদিন বঙ্কিম বাবুকে কৃষ্ণচরিত্রে বৈরাগ্যের অভাবের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যহীন জীবন কিরূপে লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবে? এ কথায় বঙ্কিম বাবু প্রায় নিরুত্তর হন। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্থাপক মাত্রেই বৈরাগী। বুদ্ধদেব ও চৈতন্য প্রভু বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল। ঈশা, মহম্মদ, নানকও বৈরাগ্যের বড় সামান্য দৃষ্টান্ত স্থল নহেন। ভারতের সমস্ত ধর্ম্মসংস্থাপকেরাই সন্ন্যাসী। একা বুদ্ধদেব ব্যতীত ইঁহারা সকলেই ভক্তবিশ্বাসী। বুদ্ধচরিত্রে ভক্তিবিশ্বাসের অভাব কেবল মাত্র এক বৈরাগ্য দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে। এই সকল কথাবার্ত্তার সময় বঙ্কিম বাবু কখনও অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহা তাঁহার গভীর সত্যনিষ্ঠার পরিচয় সন্দেহ নাই।

একদিন আমি কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবুকে বলিলাম যে আপনি কৃষ্ণচরিত্রকে দুরবগাহ কলঙ্করাশির আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য অবশ্যই আপনি বর্ত্তমানের বিশেষতঃ ভবিষ্যতের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার চেষ্টা প্রথম ও সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী নহে। আপনার পূর্ব্বে স্বামীজী শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী এবিষয়ে প্রথম চেষ্টাপর হন। তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের দল হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় একবার কৃষ্ণচরিত্র উদ্ধারের চেষ্টা হয়। তিনি এ বিষয়ের কোন সংবাদ অবগত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমিই তাঁহার প্রথম সংবাদদাতা।

এতদ্দ্বারা এবং আরও নানাবিষয়িণী কথা দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্যের—বিশেষতঃ ধর্ম্ম সাহিত্যের—কোন ধারই ধারিতেন না এবং কোন সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন ধর্ম্মনেতা ও বঙ্গ-সাহিত্যপোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব। তিনিই কেবল তাঁহার সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাস্তবিক সামুয়েল জন্‌সন স্থানীয় ছিলেন। যদি তিনি বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যের রীতিমত তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বড়ই মঙ্গলের হইত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের শকটাবলীকে সুপথ দেখাইয়া উন্নতির পথে পরিচালনা করিতে অধিকতর সামর্থ্যবান হইতেন সন্দেহ নাই।

বঙ্কিম বাবু পুত্র-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কন্যা দৌহিত্র লইয়াই তাঁহার সংসার। দৌহিত্রদিগের সঙ্গে তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রটীকে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে ও তৎসঙ্গে গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন তাহাদের সঙ্গে খুব বন্ধুভাবে মেশামিশি না করিলে তাহারা অন্যত্র বন্ধু অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইবে। অন্য সঙ্গে নষ্ট বা বিকৃত হইবার বাধা কি?' একদিন তাঁহার যুবক দৌহিত্রটীকে ডাকিয়া আমাকে তাহার গান-বাদ্য শুনাইলেন।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

অপরিচিত।

১

সেই উপবন!— স্বহস্তে রোপিত
অশোক-বকুল-শ্রেণী,
যূথিকা-স্তবক, মাধবী-বিতান,
অপরাজিতার বেণী।
সেই আলবালে জল ছল ছলে,
ডালে সেই সারীশুক;
শিরীষের শিরে সেই পিক কুহু,—
"কে গো তুমি আগন্তুক?"

২

সমীর নিঃস্বনে সেই মৃগমৃগী
চমকি চৌদিকে ছোটে;
অশ্বত্থের আড়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সেই চারুচাঁদ ওঠে।
সেই শীর্ণ পথ আঁধারে আলোকে
দীর্ঘ সরীসৃপ-গতি।
সেই পাষাণ আসনে কে নীলবসনা?
"কে তুমি উদ্‌ভ্রান্তমতি?"

৩

সেই মূর্ত্তি যেন গরবে গৌরবে
সৌন্দর্য্য-প্লাবনে মাখা!
মেঘ-আবরণে শারদ চন্দ্রমা
নাহি যেন যায় ঢাকা।

কামনার মূর্ত্তি, কল্পনার স্ফূর্ত্তি,
বিধাতার সৃষ্টিসার,
দিবসের দীপ্তি, নিশীথের তৃপ্তি,
জয়লক্ষ্মী অলকার!

৪

সেই মৃদু বায়ে লুটিছে অঞ্চল,
দুলিছে কর্ণিকাদুল,
কাঁপিছে বেশর, নাচিছে কুণ্ডল,
উড়িছে চাঁচর চুল।
সেই শুভ্র হাসি জোছনার রাশি,
সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ স্থির;
আত্ম-প্রতিষ্ঠিতা মহিমা-মণ্ডিতা
প্রিয়কন্যা পৃথিবীর!

৫

"হে শ্রান্ত পথিক, এস গৃহে মম,
আজি হে অতিথি তুমি।"
নধর লতিকা উঠিল হিল্লোলি
নব বসন্তেরে চুমি।
অগাধ যমুনা উঠিল কল্লোলি
পেয়ে বরষার ধারা।
অপার সাগর পূর্ণিমা-কিরণে
কূলে কূলে আত্মহারা।

৬

"কহ, হে বিদেশী, কোথা গৃহ তব,
কে তোমার গৃহে আছে?"
বসন্ত বোধনে উদাস মলয়
কাঁদিল প্রাণের কাছে!
নাই, ওগো, নাই, কেহ মোর নাই,
পিকবধূ সাড়া দিল—
ওই দূর গানে কত মনে হয়,
একদিন বুঝি ছিল!

৭

"সত্য কি, পথিক, বড় দুখী তুমি,
বহুদিন গৃহহীন?"
মুখেতে পড়িল জোছনার আলো,
নয়নে নয়ন-লীন।
সেই কৃষ্ণতার উজ্জ্বল নয়ন
করুণায় ছল ছল,
প্রভাত নলিনে হিমকণা যেন
ঝর ঝর টল টল।

৮

—"হে গৃহস্বামিনী, তুমি সুভাষিণী,
ষোড়শী, কুমারী বটে।"
বিস্মিতা বালিকা, "তুমি কি জ্যোতিষী!
এস দীপ-সন্নিকটে।"
"জন্ম মাতৃহীনা, পিতা চিররুগ্ন,
ছিল ভগ্নী মনোমত—
এমনি সৌরভে, এমনি গৌরবে,
দশবর্ষ তিনি গত।"

৯

সেই দ্বার এই, সে অলিন্দা এই,
মাধবী মালতী ঢাকা;
এই সেই গৃহ, সেই চিত্রচয়,
প্রিয়ার স্বকরে আঁকা।
সেই কাব্যরাশি, প্রেম উপহার,
সেই বীণা বাঁশী মম—
"দেখি হাত দুটি," তেমনি কোমল,
শিরীষ কুসুম সম!

১০

নাসায় পশিছে সে সুরভিশ্বাস,
করে থর থর কর!
তেমনি সমুখে আরক্ত কপোল,
সুরক্তিম ওষ্ঠাধর!
তেমনি চিকুর গায়ে এসে পড়ে,
কুন্তল স্পর্শিছে মুখে,
অধরের কোলে তেমনি হাসিটি
লুটিছে সোহাগে সুখে।

১১

"তোল মুখখানি"—কি গ্রীবা-ভঙ্গিমা!
মানসে হংসিনী হেন।
কি আঁখি-মহিমা! তমসার কূলে
বিহ্বলা হরিণী যেন।

স্ফুরিত অধর কিবা থর থর
অশ্রুত অপূর্ব্ব গান!
রূপের আড়ালে, মেঘ-অন্তরালে
কি মহান দীপ্ত প্রাণ!

১২

"কি দেখিলে কহ।" তেমনি সকল
সেইরূপ—সেই মন—
হিমাদ্রি শিখরে বসিয়া বসিয়া
সেই চির-বিলোকন!
অতল সাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া
সেই চির অন্বেষণ!
আশা নিরাশার নির্ম্মম পেষণে
সেই স্বপ্ন-আহরণ!

১৩

"সুভাষ, না না না, হে শুভদর্শনা,
আজিকে বিদায় লই।
ক্ষীণদৃষ্টি আমি, বিকৃত মস্তিষ্ক
কভু বা উন্মাদ হই।
বৃথা আণ্ডসারে নাহি প্রয়োজন,
দীপে প্রয়োজন নাই—
হাহা, নিজগৃহে প্রেতসম আসি
প্রেতসম ফিরে যাই!"

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

—:*:—

একাকী।

একাকী আসিয়াছিলে,
একাকী চলিয়া গেলে,
অন্ধকার হ'তে এসে,—
চ'লে গেলে অন্ধকারে।
খেলিয়া দিনের বেলা,
কত মনোমত খেলা
সন্ধ্যা নাহি হ'তে হ'তে
কোন্ স্থানে গেলে স'রে!
ছিলে তুমি কোন্ দেশে?
কেন বা হেথায় এসে,
সকলের সনে মিশে
হাসিয়া কাঁদিয়া গেলে?
আঁধার না হ'তে হ'তে
ইচ্ছা ছিল যদি যেতে,
হাসিতে কাঁদিতে শুধু,
কেন তবে হেথা এলে?

কভু কাঁদা কভু হাসা,
কভু তৃপ্তি, কভু তৃষা,
কভু দুঃখ, কভু সুখ,
এই কি জীবন হায়?
তা হ'লে থাকিতে বেলা
সাঙ্গ করি ধূলো খেলা,
হেথা হ'তে পলাইয়া
এড়ি'য়েছ মহাদায়।

কিন্তু আঁধারের দেশে,
জানি না যে কিবা বসে;
সেখানেও যদি থাকে
সুখ দুঃখ হাহাকার;—
তা হ'লে নাহিক ভুল,
দুই দেশ প্রায় তুল;—
এখানে আলোক, আর
সেথা শুধু অন্ধকার!

আমিও তোমারি পারা,
ছাড়িয়া আঁধার কারা,
আলোকের দেশে এসে,
করিতেছি নানা খেলা;
কভু উঠি, কভু পড়ি,
কভু ভাঙ্গি, কভু গড়ি,
আমিও আঁধারে যাব
ফুরাইবে যবে বেলা।

কিন্তু কভু কাঁদা হাসা,
কভু তৃপ্তি, কভু তৃষা,
কভু উঠা, কভু পড়া
এ সব চাহিনা আর।
যেন এই অভিনয়,
তথা না করিতে হয়,
না উঠে প্রাণেতে যেন
এদেশের হাহাকার।

একাকী এসেছি হেথা,
একাকী যাইব সেথা,
নাহি তথা পিতামাতা,
নাহি মিত্র, নাহি দারা।
কোথা প্রাণ জুড়াইবে ?
কেবা অশ্রু মুছে দিবে ?
কে তথা তাপিত প্রাণে
ঢালিবে শান্তির ধারা ?

তাই ভাবি মনে মনে,
প্রাণপণে সযতনে,
এখানের কর্ম্ম হেথা,
করিয়া যাইব শেষ।
যেন বাকী থেকে কিছু,
যায় নাকো পিছু পিছু,
অন্ধকার মাঝে মোরে
দিতে নিদারুণ ক্লেশ।

বিরাট আঁধার তথা,
তুলিয়া বিশাল মাথা,
স্তিমিতনয়নে সদা
করিতেছে মহা ধ্যান।
আমি র'ব তার কোলে,
ধ্যানমগ্ন কুতূহলে ;
ভুলে যাব হেথাকার
ঘোর বিষাদের গান।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

তাম্রাকের পাইপ।

(ডিকেন্সের Pickwick Papers অবলম্বনে লিখিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোয়ানগরীর অনতিদূরে, কোন খৃষ্টান-পল্লীতে, দিসুজা নামক এক ক্ষুদ্রকায় ফিরিঙ্গী যুবকের একটী ক্ষুদ্র স্কুল ছিল। সেই ক্ষুদ্র পাঠগৃহ, একটী ক্ষুদ্র গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গলির অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। দিসুজা প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত, কয়েকটী ক্ষুদ্র বালককে, তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক অধ্যাপনা করাইতেন এবং অবসর সময়ে, সেই গির্জ্জার কেরাণীর কার্য্যও করিতেন। তিনি অতি নিরীহ ভাল মানুষ ও ভীরুস্বভাব ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ নাসিকা ঊর্দ্ধদিকে বক্র, এবং নাতিদীর্ঘপদদ্বয় এরূপ পাশাপাশি উল্টাভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল, যে দুই জঙ্ঘা সতত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিত। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় এরূপ ভাবে গঠিত ছিল যে, যখন তিনি একটী ছাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, অন্য একটী ছাত্র ভাবিত যে শিক্ষক মহাশয় তাহারি দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি ভাবিতেন, যে তাঁহাদের পাদরির ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত, তাঁহাদের গির্জ্জার ন্যায় সু-উচ্চ প্রাসাদ, তাঁহার মত বিচক্ষণ শিক্ষক এবং তাঁহার স্কুলের মত সুপরিচালিত বিদ্যালয়, ধরাধামে দুর্ল্লভ। একবার—তাঁহার জীবনের মধ্যে একবারমাত্র, তিনি একজন প্রধান ধর্ম্মযাজক (বিশপ)—কে দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন, ধর্ম্মযাজক মহাশয় পরিদর্শনার্থ, তাঁহার স্কুল গৃহে প্রবেশ করিলেন—তাঁহার সহিত কি কথা কহিলেন—"ভয় কি !" বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, ধীরে ধীরে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন—সেই মহৎ ঘটনায় দিসুজার হৃদয়ে এরূপ সম্মাননাবিমিশ্রিত ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল, যে তিনি ঊর্দ্ধচক্ষু হইয়া, কম্পিতকলেবরে জঙ্ঘাদ্বয় ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী, মহা আনন্দ-কোলাহলে, তাঁহাকে "গুরু মহাশয়, গুরু মহাশয়" করিয়া তাঁহার শয়ন গৃহে রাখিয়া আইসে।

দিসুজার জীবনের ইহা একটী প্রধান ঘটনা। এই ঘটনায় তাঁহার জীবন-যমুনায় একবার মাত্র উজান স্রোত

বহিয়াছিল। অথবা উপমা ক্ষুদ্র হইল—তাঁহার জীবন-প্রশান্ত সাগরে একবার মহোর্ম্মিসঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর একদা বাসন্তী বৈকালে, অন্যমনস্কভাবে তিনি কোন অনাবিষ্ট বালকের প্রতি শাস্তিবিধান-পরতন্ত্র হইয়া, তাহার শ্লেটে, এক বিশাল গরিষ্ঠ গুণগীয় গুণীতকের সুবৃহৎ প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে করিতে সহসা তাঁহার চক্ষু পথিপার্শ্বস্থ, সৌধ-বাতায়ন বর্ত্তিনী, এক লাবণ্যবতী ললনার উপর পতিত হইল। এই কুমারী, জোনাথন্ গণথ্রোপ নামক এক মহাসমৃদ্ধিশালী চর্ম্মব্যবসায়ীর একমাত্র দুহিতা। কি আশ্চর্য্য ! দিসুজা মেরায়ার মুখখানি গির্জ্জায় বা অন্যস্থানে কত বার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে খঞ্জন আঁখিতো কখন এমন সুবঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিসমন্বিত অনুভূত হয় নাই। সে নয়নতারকা ত কখন এমন সুন্দর রশ্মি বিকীর্ণ করে নাই। তাহার গণ্ডস্থল ত কখন এমন রক্তকমলাভারঞ্জিত দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং দিসুজা তথা হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না। সুতরাং মেরায়া সুন্দরী, একজন যুবক কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার মস্তক গবাক্ষ হইতে অপসৃত করিয়া জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং দিসুজা তৎক্ষণাৎ সেই অনাবিষ্ট ক্ষুদ্রপ্রাণ মানবককে, উপর্য্যুপরি কীল ও চপেটাঘাত প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ধরাশায়ী করিলেন। এই সকল কার্য্যপরম্পরা সম্পূর্ণ স্বভাবানুবর্ত্তিনী—সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই দিন হইতে, সেই অতি দরিদ্র ভীরুস্বভাব গ্রাম্য শিক্ষক দিসুজা, বামনের চন্দ্রস্পৃহার ন্যায়, সেই কুবেরতুল্য ধনশালী জোনাথনের একমাত্র দুহিতা ও ভাবী উত্তরাধিকারিণীর পাণি ও হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিতে লাগিল। সেই প্রৌঢ় বিপত্নীক জোনাথন গণথ্রোপ মহা উগ্রস্বভাব, অমিত বলের আধার। তিনি একবার মাত্র লেখনী চালনা করিলে, সমগ্র গ্রামকে ক্রয় করিতে কিছুমাত্র অর্থকৃচ্ছ্র অনুভব করিতেন না। তাঁহার রাশি রাশি অর্থ, গোয়া নগরীর প্রধান ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তাঁহার অগণ্য স্বর্ণমুদ্রা ও রত্নরাজি, অন্তঃপুরমধ্যস্থ হর্ম্ম্যতলে, লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ হইয়া, প্রোথিত আছে বলিয়া, গ্রামবাসীদিগের মধ্যে, বহুকাল হইতে প্রবাদ ছিল। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সমূহকে, অগণিত স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রে ভোজন করাইয়া, তাঁহার অর্থশালিত্বের পরিচয় দান করিতেন। তিনি বারম্বার বন্ধুবান্ধবদিগের সমক্ষে বলিতেন যে তাঁহার স্নেহের পুতলি, সোণার প্রতিমা মেরায়া, মনোমত স্বামিরত্ন লাভ করিলে, এই অসীম সম্পদের একমাত্র উত্তারাধিকারিণী হইবেন। তাই বলি যে দিসুজার এত বড় অসমসাহসিকতা যে সেই কুবেরনন্দিনীর প্রতি তাহার নয়ন ধাবিত হয় ! ইহা অতীব আশ্চর্য্যের কথা !! কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণয়দেব কিউপিড্ অন্ধ বলিয়া প্রবাদ আছে এবং পাশ্চাত্য বংশসম্ভূত দিসুজারও একটী চক্ষু তদ্ভাবাপন্ন ছিল—সুতরাং কিউপিডের গুণ যে তাহাতে কতক পরিমাণে বর্ত্তিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সুতরাং বস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় মেরায়ার রূপবহ্নি সেই দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকের হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল।

বস্তুতঃ জোনাথন্ যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতেন যে সেই দরিদ্র খঞ্জ যুবক, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা দুহিতা মেরায়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে, তাহার স্কুলগৃহ সমূলে উৎপাটিত করিয়া, আরব্যোপসাগরের অতলজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার শিক্ষক-নাম পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য লুপ্ত করিয়া দিতেন। কিম্বা তদ্রূপ কোন ভীষণ ঘটনার অবতারণা করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেন। কারণ তিনি তাঁহার ইউরোপীয় গৌরবে কখন কোন অতি সামান্যমাত্র অসম্মান অনুভব করিলে, অতি ভীষণ উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তাঁহার তাৎকালিক সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিলে দিসুজা থর থর কম্পিত কলেবরে হতজ্ঞান হইয়া পড়িতেন এবং আসন্ন বিপদে তাঁহার ছাত্রগণের কেশগুলি সজারুর কণ্টকের ন্যায় সরলরেখাবৎ হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু, যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, স্কুলের অবসানে, ছাত্রগণ চলিয়া গেলে, দিসুজা সম্মুখস্থ গবাক্ষে উপবেশন করিয়া, কপটপাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মধ্যে মধ্যে অপাঙ্গ ভঙ্গিতে, জোনাথনের অট্টালিকার প্রতি ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। একদা তদবস্থ থাকিয়া দিসুজা দেখিলেন যে সেই অট্টালিকার দ্বিতলস্থ বাতায়নে, সেই কমল নয়ন তাঁহারই ন্যায় পুস্তক পাঠে অভিনিবিষ্ট রহিয়াছে। কি সুন্দর ! দিসুজার হৃদয়ব্যাটারিতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া

চলিতে লাগিল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া সেই পুস্তকাবনত বদনচন্দ্রমা আজন্ম সন্দর্শন করিলেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন মেরায়া মুখখানি উত্তোলন করিয়া স্বীয় নয়নরশ্মি দিসুজার প্রতি বিকীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। অনন্তর একদা জোনাথনের গৃহে অনবস্থিতিকালে, দিসুজা সাহসপূর্ব্বক মেরায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় হস্ত-চুম্বন করিলেন; আবার মেরায়াও এবার জানালা বন্ধ না করিয়া স্বীয় হস্ত চুম্বন করিলেন। তদ্দর্শনে দিসুজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"—এই ঘটনার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন।

মেরায়ার একটী কুমারী মাসীত ভগিনী ছিল, তাহার নাম আরাবেলা। আরাবেলা সতত হাস্যময়ী, কৌতুকপ্রিয়া যুবতী। সেই স্বাভাবিক ক্রোধপূর্ণ জোনাথন, প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন; তখন ভীরুস্বভাবা মেরায়া এবং হাস্যময়ী আরাবেলা ভিন্ন কেহই তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিতে পারিত না। বস্তুতঃ জোনাথন বৃদ্ধবয়সে সেই বালিকাদ্বয় কর্ত্তৃক এরূপ গাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে যখন তাহারা দুইজনে দুইদিকে বসিয়া, আধ করুণ আধ স্নেহপূর্ণ বচনে তাঁহার শ্রবণ-বিবরে বাক্যসুধা বর্ষণ করিত, তখন তাহাদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় থাকিত না,—এমন কি তাঁহার সেই গৃহপ্রোথিত লৌহসিন্দুকাবদ্ধ অমূল্য রত্নরাশির কিয়দংশ প্রার্থনা করিলেও তিনি তাহা দিতে স্বীকার করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদা কুমারী মেরায়া, আরাবেলার সহিত সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে গ্রামপার্শ্বস্থ প্রশস্ত ময়দানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ইদানীং দিসুজা প্রত্যহ দিবাবসানে, সেই স্থানে বায়ুসেবন করিতে আসিয়া, মেরায়ার অতুল রূপরাশির বিষয় চিন্তা করিতেন। কোন কোন দিন চিন্তা-সাগরে এত দূর নিমগ্ন হইতেন যে সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়া ধরিত্রীকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিলেও তাঁহার চমক ভাঙ্গিত না। অদ্য অদূরে সেই দিব্যাঙ্গনাসমতুল্যা কুমারীদ্বয়কে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ডের রক্তরাশি মস্তকে আরোহণ করিল, হৃদয়াঘাতের শব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি কতদিন ভাবিয়াছেন, যে যদি কখন একান্তে তাঁহার মনোহারিণীর সাক্ষাৎ পান, তাঁহার হৃদয়াবদ্ধ ভালবাসার উৎস খুলিয়া দিয়া তাঁহার প্রণয়িনীর চরণ ধৌত করিবেন। অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত; আজ তো এই নির্জ্জন বনস্থলীতে মেরায়া ও তাহার বাল্যসখী আরাবেলা ভিন্ন আর কেহই নাই। দিসুজা অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহই নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার চরণ চলেনা—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা (অথবা পদের খঞ্জতা) ভালবাসার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং কিছুদূরে থাকিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যখন তাহারা কোন পুষ্পচয়ন করিতে দাঁড়াইল, তিনিও অদূরে দাঁড়াইতে লাগিলেন—যখন তাহারা কোকিল বধূর কুহুস্বর শুনিয়া ঊর্দ্ধে বৃক্ষশাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তিনিও পঞ্চশর-বিদ্ধবৎ বিমনা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারা যখন দ্রুত চলিতে লাগিল, তিনিও চলনের গতিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; তাহারা ধীরে চলিলে, তিনি গতির খর্ব্বতা করিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ করিবে পর সদয়হৃদয় কিউপিড্ তাঁহার প্রতি অন্ধচক্ষে কৃপাদৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ একবার আরাবেলা পশ্চাতে চাহিয়া, মৃদুস্বরে মেরায়াকে কি বলিলেন—উভয়ে কয়েকটী কথাবার্ত্তা এবং কিঞ্চিৎ হাসি চাহনির আদান প্রদানের পর—আরাবেলা বক্রদৃষ্টিতে দিসুজার প্রতি চাহিয়া তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। আরাবেলার অঙ্গভঙ্গি ও হস্তচালনাদিতে এমন একটী কমনীয়তা, এমন একটী আকর্ষণী শক্তি ছিল, যে ভীরুস্বভাব দিসুজা ভীতচিত্ত হইলেও সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মৃদুমন্দ গতিতে কুমারীদ্বয়ের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার মুখ বারম্বার আরক্তিম আভা ধারণ করিল। সেই দুষ্টা ভগিনী কয়েক বার হাস্য দমন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। তখন দিসুজা মেরায়ার সম্মুখে সেই শষ্পরাজির উপর জানু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন যে, মেরায়া তাহাকে ভাবী স্বামী বলিয়া স্বীকার না করিলে, তিনি সে অবস্থান পরিবর্ত্তন করিবেন না। তদ্দর্শনে কুমারী মেরায়া ও দুষ্টা ভগিনী আরাবেলার হাস্যলহরী সেই সায়ংকালীন শীতল বায়ু বিদীর্ণ করিয়া অদূরস্থ গিরিপাদমূলে প্রতিধ্বনিত হইল;

সেই হাস্যধ্বনি, দিসুজার কর্ণরন্ধ্রে হিমালয়-শিখরবাসিনী গন্ধর্ব্বকন্যার অঙ্গুলি-তাড়িত-বীণাঝঙ্কার-বিমিশ্রিত স্বর্গীয় মঙ্গল-গীতির ন্যায় সুধা-বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি প্রেমগদ্‌গদ-হৃদয়ে অধিকতর আরক্তিমগণ্ড হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে সেই লাবণ্যবতী ললনাদ্বয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর মেরায়া সেই দরিদ্র শিক্ষককে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহার ভগিনীকে কাণে কাণে কি বলিলেন। তাহাতে আরাবেলা মেরায়ার ইচ্ছানুযায়ী (অথবা নিজ বুদ্ধিবলে) দিসুজাকে বলিলেন যে, কুমারী মেরায়া তাঁহার ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ সম্মানিত বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু বিবাহ তাঁহার পিতার সম্মতিসাপেক্ষ। তবে তিনি এইমাত্র বলিতে পারেন, যে দিসুজার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষরত্নকে স্বামীরূপে লাভ করিলে তিনি আপনাকে নারীকুলে ধন্যা বলিয়া মনে করিবেন, এবং তাঁহার পিতাও এরূপ দেবতুল্য জামাতা প্রাপ্ত হইলে আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই। যেহেতু আরাবেলা গম্ভীরভাবে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এবং যেহেতু মেরায়া গৃহপ্রত্যাগমন কালে, সেই কোকিলমুখরিত কৌমুদীস্নাত সন্ধ্যালোকে, দিসুজাকে সঙ্গে আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এবং যেহেতু বিদায়কালে দিসুজা তাঁহার ভাবী পত্নীর মুখ চুম্বনের বৃথা চেষ্টার সময়, মেরায়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন—সেই হেতু দিসুজা শয়নকালে আপনাকে আজ মহাসুখী ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া, সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি যেন জোনাথনের ক্রোধশান্তি করিতেছেন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে গিয়া তাঁহার গৃহপ্রোথিত লৌহসিন্দুক খুলিতেছেন।

তৎপর দিন দিসুজা দেখিলেন যে, জোনাথন অশ্বারোহণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই দুষ্টা ভগিনী আরাবেলা, বাতায়ন হইতে নানা প্রকার ইঙ্গিতাদি করিবার পর, একজন আয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার প্রভু সে দিবস রাত্রে বাটী ফিরিবেন না; মিস্ বাবারা তাঁহাকে ঠিক সন্ধ্যার সময় চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সে দিবস স্কুলের অধ্যাপনা কার্য্য কতদূর সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা দিসুজা বা তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, পাঠক মহাশয়ও সেইরূপ বুঝিতেছেন। কোন রূপে কার্য্য সারিয়া, ছাত্রগণকে বিদায় দিয়া, দিসুজা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছয়টা পর্য্যন্ত নিজের মনোমত করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পোষাক নির্ব্বাচন করিয়া লইতে যে তাঁহার এত বিলম্ব হইল তাহা নহে, কারণ দিসুজার সে বিষয়ে নির্ব্বাচন করিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু যেখানে যেটী যেরূপ করিয়া পরিলে (তাঁহার বিবেচনায়) অতি উত্তম দেখায়, সেই সুমহান্ কার্য্য তাঁহার পক্ষে ওয়েলিংটনের ওয়াটারলু-যুদ্ধজয়াপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসাপেক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চা-পায়ী সম্প্রদায় মধ্যে, কুমারী মেরায়া, কুমারী আরাবেলা, এবং কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাস্যমুখী চঞ্চলা বালিকা ছিল। অদ্য দিসুজা স্বচক্ষে দেখিলেন, যে জোনাথনের অপরিসীম অর্থশালিত্বের জনরব অতিশয়োক্তি নহে। সেই যথার্থ খাঁটি রৌপ্যের চা-পান-পাত্র, চিনির পাত্র প্রভৃতি টেবিলের উপরে সুশোভিত রহিয়াছে। যথার্থ রৌপ্যনির্ম্মিত চামচের সাহায্যে চা পান কর। স্বর্ণনির্ম্মিত ডিক্যাণ্টারে জবাকুসুমরূপিণী সুরাদেবী ঢলঢলায়মান। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দমিশ্রিতভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

সেই আনন্দপূর্ণ সম্প্রদায় মধ্যে কেবলমাত্র একজন তাঁহার চক্ষুশূল হইল!—মেরায়ার একটী মাসীত ভাই; আরাবেলার সহোদর, মেরায়াকে একবারে "একচেটে" করিয়া লইয়া, টেবিলের এক কোণে বসিয়াছিল। সংসারে এরূপ ভ্রাতৃ-স্নেহ বড় সুন্দর দৃশ্য—কিন্তু ইহাদের কিছু বাড়াবাড়ি—সুতরাং দিসুজা ভাবিল, মেরায়া তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই যদি এই মাসীত ভাইয়ের মত ভালবাসেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে, আত্মীয়বাৎসল্যের মাত্রা খুব অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে।

চা-পান শেষ হইলে সেই দুষ্টা ভগিনী 'কাণামাছি' খেলিবার প্রস্তাব করিল। দিসুজা স্বভাবতঃই অন্ধপ্রায় বলিয়া 'কাণামাছি' হইবার ভার তাহারি ভাগ্যে ঘটিল। যখন সে আরাবেলার ভ্রাতার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে লাগিল, তখনই মেরায়াকে নিশ্চয় নিকটে পাইবে জানিয়া দুইপার্শ্বে হস্ত-সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন দুষ্টা

ভগিনী ও ক্ষুদ্র বালিকাগণ তাহাকে বারংবার চিম্‌টি কাটিতে লাগিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল, তাহার সম্মুখে চেয়ার রাখিয়া দিতে লাগিল, এবং তদ্রূপ নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! মেরায়া সুন্দরী একটী বারও তাঁহার নিকটে আসিল না—তাহাকে ধরা দিল না। দিসুজা দিব্য করিয়া বলিতে পারে যে একবার সে একটী চুম্বনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল—তাহারই অব্যবহিত পরে মেরায়ার অর্দ্ধস্ফুট তিরস্কার-ধ্বনি, এবং তৎপশ্চাতে বালিকাগণের হাস্য-লহরী—ইহা অতীব অন্যায় কার্য্য! এই কার্য্যের ফলস্বরূপ দিসুজা কোন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিত, যদি তাহার চেষ্টা সহসা কোন ঘটনার দ্বারা প্রতিরোধ প্রাপ্ত না হইত।

যে ঘটনার দ্বারা তাহার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল তাহা এই। সকলে সহসা শুনিল যে একব্যক্তি বহির্দ্বারে ভীষণ করাঘাত করিতেছে এবং সেই শব্দ কর্ম্মকার-হস্ত-প্রক্ষিপ্ত গুরুভার লৌহহাতুড়ির ন্যায় প্রতীয়মান হওয়াতে জোনাথন গণথ্রোশের হঠাৎ প্রত্যাগমন-সূচিত হইল। তখন সেই সম্প্রদায় মধ্যে সহসা বিষম আশঙ্কার লক্ষণ দেখা দিল। এদিকে দ্বার খুলিতে বিলম্ব দেখিয়া ক্ষুধিত জোনাথনের হস্ত, কর্ম্মকারের হাতুড়ির অবস্থা অতিক্রম করিয়া ষ্টীম হ্যামারে পরিণত হইল। তখন বালিকাগণ মেরায়ার শয়নগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আরাবেলার ভ্রাতা ও দিসুজাকে, লুকাইবার অন্য কোন বিশিষ্টতর স্থানের অভাবে, বসিবার ঘরের পশ্চাদ্বর্ত্তী একটী কুঠারীতে রাখিয়া দেওয়া হইল। তখন মেরায়া ও আরাবেলা সকলকে লুক্কায়িত করিয়া এবং দ্রব্যাদি যথাসম্ভব যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া বহির্দ্বার খুলিবার অনুমতি দিল—তখন পর্য্যন্ত জোনাথন করাঘাতের বিরাম দেন নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে জোনাথন অত্যন্ত ক্ষুধিত হওয়াতে ভয়ঙ্কর রাগান্বিত হইয়া আসিয়াছিলেন। দিসুজা সভয়ে শুনিতে লাগিল যে বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কার দিতেছে, এবং যে কোন দাসদাসী নিকটে আসিতেছে, তাহাকেই ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। অবশেষে আহারীয় দ্রব্য টেবিলের উপর সুশোভিত হইলে, জোনাথনের জঠরাগ্নি নিমেষমধ্যে তাহা নিঃশেষ করিল; তখন তিনি কন্যাকে চুম্বন করিয়া, তাম্রকূট সেবনের পাইপ চাহিলেন।

প্রকৃতি দিসুজার জানুদ্বয় পরস্পর নিকট সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং দিসুজা যখন শুনিলেন যে জোনাথন তাঁহার পাইপ চাহিতেছেন, তখন সেই জানুদ্বয় পরস্পর এরূপ সংঘর্ষিত হইতে লাগিল যে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কারণ তিনি যে কক্ষে লুক্কায়িত ছিলেন, তাহারই দেওয়ালে সেই বৃহৎ রৌপ্যাচ্ছাদিত পাইপ ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলেন! তিনি গত পাঁচ বৎসর হইতে সেই পাইপ প্রত্যহ বৈকালে নিয়মিতরূপে জোনাথনের মুখে সুশোভিত দেখিয়া আসিতেছেন। হায়, হায়! সেই সর্ব্বনেশে পাইপ আজ তাঁহারি সম্মুখে দেওয়াল সুশোভিত করিয়া ঝুলিতেছে।

মহাদেব শূলপাণি মদনভস্মকালে যেরূপ বজ্রদৃষ্টিতে অনঙ্গের প্রতি চাহিয়াছিলেন, দিসুজা সেই রৌপ্য হ্যাণ্ডেল-যুক্ত পাইপের প্রতি তদ্রূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সে অমর পাইপপুঙ্গব স্বীয় সুগঠিত কলেবর যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া সেইরূপ ভাবেই ঝুলিতে লাগিল।

কন্যাদ্বয় পাইপান্বেষণে দুর্ দুর্ করিয়া একবার নীচে নামিয়া গেল, আবার দুম্ দুম্ করিয়া উপরে আসিয়া খুঁজিল। বস্তুতঃ, যে স্থানে পাইপ আছে তাহারা জানিত, সেই স্থান ভিন্ন, তাহারা প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। এ দিকে জোনাথন গুরুগম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার সেই কক্ষের কথা মনে পড়াতে স্বয়ং তথায় গমন করিলেন।

যখন জোনাথন অসুরের ন্যায় বাহির হইতে আকর্ষণ করিতেছেন, তখন দিসুজার ন্যায় অল্প-প্রাণ ব্যক্তির কি সাধ্য যে দ্বার ভিতর হইতে টানিয়া অধিকক্ষণ রাখিতে পারে! অবশেষে জোনাথন যেমন একবার সজোরে ধাক্কা দিল, অমনি সেই ক্ষীণপ্রাণ কবাট খুলিয়া, দ্বিখণ্ড হইয়া, দণ্ডায়মান দিসুজার আপাদমস্তক-থর থর-কম্পিত মূর্ত্তিকে, জোনাথনের নয়নপথের পথিক করিয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী-কুটিলচক্ষে জোনাথন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়া দিসুজার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার ক্ষুদ্র দেহ-যষ্টি কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিল, এবং ভৈরব গর্জ্জনে কহিল, "তুই এখানে কি জন্য আসিয়াছিস?"

দিসুজা কোন উত্তর দিতে পারিল না। সুতরাং জোনাথন, যেন তাহাকে কি করিবে তাহা মনে মনে স্থির

করিয়া লইবার জন্য, প্রায় দুই তিন মিনিট কাল, তাহাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

জোনাথন আবার গর্জ্জিল। "তোর এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? বোধ করি আমার কন্যার চেষ্টায় আসিয়াছিস?"

বাস্তবিক জোনাথন এই কথা ঘৃণামিশ্রিত ঠাট্টার সহিত বলিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ন্যায় খাঁটি ইউরোপীয়বংশসম্ভূত ব্যক্তির দুহিতার কর-স্পৃহা, এরূপ দরিদ্র অর্দ্ধখঞ্জ অর্দ্ধ-অন্ধ ফিরিঙ্গী যুবকের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি স্বপ্নেও কখন অনুমান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সেই দরিদ্র শিক্ষক বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি আপনার কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহাকে ভালবাসি," তখন জোনাথনের ঘৃণা ও ক্রোধ পূর্ণমাত্রা অতিক্রম করিয়া আর এক ডিগ্রী উপরে উত্থিত হইল।

"অরে, রে! ত্রিভঙ্গ অন্ধ পাষণ্ড, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখে এমন কথা বলিস্! আমি এখনি তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শোষণ করিব।"

জোনাথন ইহা বলিয়া, তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সহসা এক তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া সেই কক্ষ মধ্যে পতিত হইল। আরাবেলার ভ্রাতা লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, এই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বিনাপরাধে দণ্ডিত হইতে দেওয়া আমার উচিত নহে। যদিও ইনি নিজের স্কন্ধে দোষ লইয়া, স্বীয় উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন, তথাপি যদি কোন দোষ থাকে তাহা আমার। আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—আমি আপনার কন্যাকে ভালবাসি, আমিই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখানে আসিয়াছি। এ ব্যক্তির কোন দোষ নাই। ইনি কুমারীগণের বালিকা-সুলভচপলতাকর্ত্তৃক ক্রীড়াচ্ছলে এখানে আনীত হইয়াছেন মাত্র।"

এই কথা শুনিয়া জোনাথন চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত বিস্ফারিত করিলেন, কিন্তু তিনি, দিসুজা অপেক্ষা অধিক বিস্ফারিত করিতে পারিলেন না।

অবশেষে জোনাথন হাঁপ ছাড়িয়া কহিল,—"তুমি!"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি।"

"কেন, আমি তো তোমাকে আমার বাটীতে আসিতে অনেক দিন হইতে নিষেধ করিয়াছি।"

"করিয়াছিলেন, বৈ কি, নতুবা আমি এরূপ গুপ্তভাবে আসিব কেন?"

এই কথা শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা জোনাথন সেই নির্ভীক যুবককে ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সুন্দরী কন্যা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে স্বীয় বাহুলতার দ্বারা তাঁহার পিতার হস্তদ্বয় বেষ্টন করিলেন।

"মেরায়া, উঁহাকে বারণ করিও না। যদ্যপি উঁহার আঘাত করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, করুন। আমি সমস্ত পৃথিবীর রত্ন-রাশি পাইলেও উঁহার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিব না।"

এই তিরস্কার বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ জোনাথন একবার চক্ষুর্দ্বয় নামাইলেন, তাহার পর কন্যার চক্ষের প্রতি চাহিলেন। সে চক্ষুর্দ্বয় স্বাভাবিক বড়ই উজ্জ্বল, এবং যদিও এক্ষণে অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাহার মোহিনী শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বৃদ্ধ জোনাথন তাঁহার মস্তক ফিরাইলেন;—সেই বারিভারাবনত কোকনদতুল্য করুণা-পূর্ণ নয়ন দেখিয়া, পাছে তাঁহার রাগ পড়িয়া যায়। বুঝি সেই নয়নে বৃদ্ধ তাহার বহুকাল-পরলোকগতা বনিতার নয়নের কোন সৌসাদৃশ্য দেখিয়া থাকিবে। তাই মস্তক ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিল। কিন্তু তাঁহার চক্ষু সেই দুষ্টা আরাবেলার মুখের প্রতি পড়িল। আরাবেলার মুখভঙ্গি, তাহার ভ্রাতার জন্য কিঞ্চিৎ ভীত, দিসুজার অবস্থাদর্শনে কিঞ্চিৎ সস্মিত—বস্তুতঃ হাসি, ভয়, ও চাতুরীর বিমিশ্রণে সে মুখমণ্ডল এরূপ অভাবনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল যে, কি বৃদ্ধ, কি যুবক তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। আরাবেলা আদরে গলিয়া গিয়া, তাহার মাতৃস্বসৃপতির হস্তদ্বয়, নিজ হস্তযুগলে আবদ্ধ করিয়া, কাণে কাণে কি কথা কহিলেন—তখন জোনাথন গণথ্রোপ যতই কঠিনহৃদয় হউক না কেন, প্রথমে তাহার মুখে একটী হাস্যরেখা দেখা দিল, এবং পরক্ষণে এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরে অন্য বালিকাগণকে শয়নকক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনা হইল। তখন একটা মহা হাসি ও লজ্জার ধূম পড়িয়া গেল এবং যুবকযুবতী ও বালকবালিকাগণ

আনন্দ করিতে লাগিল। তখন জোনাথন তাহার পাইপ প্রাপ্ত হইয়া, বিশেষ আস্বাদ সহকারে তামাক টানিতে লাগিলেন। এবং বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহার বোধ হইল, যেন এমন সুখে, তিনি কখন সে পাইপে তাম্রকূট সেবন করেন নাই।

উপসংহার।

দিস্‌জা 'চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা' নামক মহাবাক্য স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া গেলেন এবং সৌভাগ্যবশে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ জোনাথনের প্রিয় সহচর মধ্যে পরিগণিত হইলেন—এবং ক্রমে জোনাথন তাহাকে পাইপ টানিতে শিখাইলেন। তখন তাঁহারা প্রায়ই উভয়ে, জোনাথনের অট্টালিকাপ্রাঙ্গণস্থ পুষ্পোদ্যানে, নির্ম্মল সন্ধ্যার চন্দ্রালোকে বসিয়া তামাকু সেবন ও পানাদি করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দিস্‌জা মেরায়ার প্রতি অনুরাগের তীব্রজ্বালা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন; এবং ভবিষ্যতে তাঁহার হৃদয়-দর্পণ হইতে সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-প্রতিবিম্ব একবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। কেন না, সেই গ্রাম্য গির্জ্জায়, আরাবেলার ভ্রাতার সহিত মেরায়ার শুভ উদ্বাহ সময়ে, তিনি পারিশ রেজিষ্টারিতে একজন প্রধান সাক্ষী বলিয়া সহি করিয়াছিলেন। সেই মহোৎসবে, হৃদয়ের সহিত যোগদান করিয়া, এরূপ অধিক মাত্রায় সুরাপান করিয়াছিলেন, যে সে দিন পাড়ার মেয়ে ছেলে কেহ পথে একাকী বাহির হইতে পারে নাই। রজনী যোগে তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে অবশেষে তাঁহাকে 'তুরুং ঠুকিয়া' রাখিতে হইয়াছিল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"হিসাব।"

আমি ছিনু এক দরিদ্র যুবক, ধনীর কুমারী তুমি,
তোমার আমার ছিলনা জগতে দাঁড়াবার সমভূমি।
ভালবাসা আসি ভাসাল আমারে করাইল কত ভুল,
চলিল হৃদয় করি অতিক্রম ধনগর্ব্ব জাতি কুল;
দাঁড়াল আসিয়া তোমার দুয়ারে অসংকোচ নিঃসংশয়,
সে নাহি জানিত প্রেমের লাগিয়া প্রেম কেহ নাহি লয়।
তুমি বুঝাইলে আমার হ'য়েছে হিসাবে দারুণ ভ্রম,
প্রাচীন প্রাচীর উল্লঙ্ঘিতে নাহি প্রণয়ের পরাক্রম।
কুসুমকাননে লতার মণ্ডপ চন্দ্রালোকে শোভা ধরে,
দুদণ্ড সেথায় বসি ঘরে যায়, কে সেথা বসতি করে?
কুসুমের মধু মধু বটে, নহে জীবনের অন্নপান,
নিতান্ত বিস্বাদ অমিশ্র লবণ করে অন্যে স্বাদ দান;
তুমি বুঝাইলে, প্রণয় তেমন দিতে শোভা দিতে স্বাদ,
শুদ্ধ প্রেম লাগি করা ভাল নয় এত বাদ বিসম্বাদ।
যত তৃষ্ণা ক্ষুধা আছে মানবের এক প্রেমে নাহি যায়,
কোথা রবে সুখ, স্বজনেরা যদি মুখ তুলে নাহি চায়?
নব পরিবার গঠনে উপায়, প্রেমতো উদ্দেশ্য নয়,
নূতন যৌবনে, কবিত্বে, স্বপনে একে আর মনে হয়;
যৌবন ফুরালে, কভু না ফুরাতে, মায়া মোহ ভেঙ্গে যায়,
বুভুক্ষু মানব কহে "এই ভুল না যদি হইত হায়।"
কত অঙ্ক কসি, ভাবিয়া, গণিয়া, হৃদয় করিয়া রোধ,
আমারে তাড়ালে লুব্ধ ভিক্ষু সম, তাড়ালে জন্মের শোধ।
কতবা করুণা, কত না গরব, অনুরাগ, ভয়, লাজ
তোমার আছিল; আমার প্রণয়ে আছিল না কোন ভাঁজ।
আমার শুকাল কুসুমকানন, ফুরাল সকল ক্ষুধা,
জীবনের স্বাদ কিসে ধুয়ে গেল, কর্ম্মের আনন্দসুধা।
সে দিন হইতে বিদেশে প্রবাসে করি আয়ুঃ অতিপাত,
ধনের আকর চরণের তলে, চলিতে চাহেনা হাত।
যত দূরে যাই, তোমার সংবাদ লয়ে থাকি চিরকাল,
তোমারে ধরিতে কে কত ফেলিয়া ছিঁড়িয়া এনেছে জাল;
যাহা চেয়ে ছিলে, আসিয়াছে কাছে, অন্নপান সমুদয়,
তবে কি লাগিয়া আশা নিরাশায় জীবন করিছ ক্ষয়?
এত বর্ষ যায়, তোমার চরণে লয়ে ধন কুলমান
কত কেহ আসে, কেন কাহারেও কর নাই পাণি দান?
জীবনের ভোজে লবণ নির্ম্মল লয়ে সুমধুর মধু
আসিনি কি তবে তাহাদের কেহ তোমারে করিতে বধূ?
এত দিনে তবে বুঝেছ কি মনে, আমি যা বুঝিছি আগে,
এ লবণ বিনা বিস্বাদ জীবন, কোন কাজে নাহি লাগে?
বুঝেছ কি মনে, এ নহে সুলভ অমাগুল না বিকায়,
যাহারে তাহারে যে সে বিলাইতে অধিকার নাহি পায়?
বুঝেছ, লবণ কারো গৃহে যদি থাকে শত মণ ভার
অতিরিক্ত পড়ি দৈনিক ব্যঞ্জন করে না বিস্বাদ তার?

বেশী ফুল ফোটে বাগানে তোমার তাহাতে কাহার ক্ষতি?
অতিশয় ধন পারে না বহিতে বিতরিতে ধনপতি?
বেশী প্রেম হ'লে তাতে নাহি ভয়, না থাকিলে বৃথা সব
সুখের লাগিয়া অন্য আয়োজন, ধন মান বৈভব।
ধন ল'য়ে যবে আসে ধনেশ্বর কুলীন কুলের মান
তাই অনাদরে কর প্রত্যাখ্যান জীবনের অন্নপান।
প্রেম চাহি সাথে লবণের মাপে, তাহাদের নাহি তাও,
আশ্চর্য্য ব্যাপার, সেথা তাহা চাও, সেথা যাহা নাহি পাও।
আমার আছিল অনেক প্রণয়, সামান্য ঐশ্বর্য্য মান,
তাই বা কেমনে? দুর দেশে যার সহস্র বাণিজ্য যান,
যার অধিকৃত নিভৃত খনিতে রয়েছে সহস্র মণি,
বহু ধনে যার উত্তরাধিকার, সে জন কি নহে ধনী?
প্রাণভরা প্রেমে আছিল সঞ্চিত অদম্য উৎসাহ বল;
স্থির লক্ষ্য যার তাহার জীবনে কৃতার্থতা অবিচল।
তোমারে পাইতে, তোমারে রাখিতে, বাড়াতে তোমার সুখ
এমন দুঃসাধ্য কি ছিল, যাহ'তে ফিরাতাম এই মুখ?
তুমি লক্ষ্মীরূপা [illegible]াইলে চরণ পরশ ভরে
ধরণী ফাটিয়া ছুটিয়া উঠিত ঐশ্বর্য্য দীনের ঘরে;
কুলীন না হই, আমা হ'তে হ'ত প্রতিষ্ঠিত মহাকুল,
আপনি ভুলিয়া হায়রে আমারে হিসাবে করালে ভুল।
গৌরবে গরবে কি লইয়া আজ তোমার সম্মুখে যাই?
শুভক্ষণ মোর বহিয়া গিয়াছে, যৌবনের বল নাই;
আছে কিনা আছে সে প্রেম উচ্ছ্বাস নাহি জানি সুনিশ্চয়,
এবে কি ফিরাবে প্রেম নাই বলে? আর নয় আর নয়।

জুন,—১৮৯২।

শ্রাবণে।

আজি ঘন মেঘে ঢাকা শ্রাবণ-গগন,
কোথায় লুকায়ে আছে মলিন তপন।
যেন আজি বসুমতী
ব্যথিত কাতর অতি,
যেন গো প্রকৃতি সতী
বিষাদ-মগন।
আজ মনে পড়ে তা'র সজল নয়ন!
মেঘ গরজন ঘন, দামিনী বিকাশ,
আজিকে পরাণে মোর জাগে কি হুতাশ!
কি যেন বেদনাভরে
উদাস আকুল স্বরে
অবিশ্রাম কেঁদে মরে
ব্যাকুল বাতাস।
মনে পড়ে আজি শুধু তা'র দীর্ঘশ্বাস!
ধীরে ধীরে দীর্ঘ দিবা হয় অবসান;
কেন আজ শোকাকুল আমার পরাণ!
এই যে দিগন্তগ্রাসী
নিবিড় নীরদ রাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি'
উদাসীন ম্লান,
একি শুধু তা'র অশ্রুভরা অভিমান!
আজি বাদলের ধারা ঝরে অবিরল,
আমার বিরহতপ্ত হৃদয় চঞ্চল!
কত সুখময় স্মৃতি,
কত বুকভরা প্রীতি,
কত প্রণয়ের গীতি
পুণ্য অশ্রু জল,
মনে প'ড়ে আজি মোর পরাণ বিকল।
মনে হয় আজ বিশ্ব নিতান্ত নির্জ্জন,
একা বসি' করিতেছি স্বপন সৃজন।
আজি মোর পড়ে মনে
কোন্ দিন এ জীবনে
আমাদের দুই জনে
প্রথম মিলন;
বাহিরে বিরামহীন বারি বরিষণ।
আজ ভরা বরষায় শুধু হয় মনে
কভু কি মিলন হবে হেন শুভক্ষণে!
এমনি বরষা ঘন
নিরজন এ ভুবন
এমনি আঁধার কোন
ক্ষুদ্র গৃহ কোণে
প্রাণে প্রাণে মিশে যাব আমরা দুজনে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনে তাঁহার পিতার প্রভাব।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল ভারতবর্ষের ইতিহাসপ্রণেতা মহামনা জেম্‌স মিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে লণ্ডন সহরে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম পুত্রের নামের ন্যায় দিক্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত না হো'ক, তাঁহার জীবন পুত্রের জীবন অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না, এবং এইরূপ পিতা না হইলে মিলের ন্যায় পুত্রও জন্মে না। মিলের পিতা কিরূপ আশ্চর্য্যপ্রকৃতির লোক ছিলেন, আর পুত্রের জীবন কিরূপ গঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মিল কোন উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; তিনি দরিদ্রের সন্তান। কিন্তু তাঁহার পিতার ন্যায় স্বাধীন-চেতা, প্রশস্তমনা, বিদ্যানুরাগী, পরোপকারী, স্বাবলম্বন-শীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ মানবকুলে অতি দুর্লভ। তিনি অন্তঃ[illegible] ব্যক্তিবিশেষের মত[illegible] মতের উপর দৃক্‌পাত করেন নাই। একদিকে ঘোর দারিদ্র্য, নিন্দা, নির্য্যাতন, আর অন্যদিকে অপরের মতের সমর্থন, এমন সকল স্থলে আপনার মতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সকল দুঃখ, দারিদ্র্য নিন্দা, নির্য্যাতন অকাতরে বহন করিয়াছেন। তিনি এই বিশাল জগতে একাকী ছিলেন। সকলের চিরসহায় জগৎপিতা বিধাতাকে জেম্‌স মিল দেখিতে পাইতেন না। তিনি বুদ্ধিবলে তর্কজাল বিস্তার করিয়া, বিশাল জগতের স্রষ্টাকে ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্‌, অনন্ত, দয়ার আধার এ জগতের স্রষ্টা কখনই হইতে পারেন না। এ জগত দয়াময় বিধাতার সাক্ষী দেয় না। জগতের এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত অশুভ, এত রোগ, এত শোক, একি দয়াময়ের দয়ার নিদর্শন। তা কখনই নহে। সৃষ্টির অন্তরালে কি মহাশক্তি আছে জানি না, এবং সে গভীর রহস্য ভেদ করা মানবের সাধ্য নহে; আর যদি কেহ থাকেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময় নহেন, এইরূপ তর্কজালে জেম্‌স মিল নিজেই ধরা পড়িলেন, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে, ধরিতে পারিলেন না। বিশ্বাসীর কর্ণে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বিধাতা নাই, কথাটা কি হৃদয়বিদারক! পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরবিশ্বাসী। তাহাইত স্বাভাবিক; নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং সাধারণতঃ লোকে তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে; জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে তাহারা এক প্রকার বঞ্চিত হয়। অতএব সকলে বুঝিতে পারেন, জেম্‌স মিলকে কিরূপ অবস্থায় জীবনধারণ করিতে হইয়াছে এমন ব্যক্তিকে কি কেহ অবিশ্বাসী নাস্তিক বলিয়া ঘৃ[illegible] করিতে পারেন! না স্বাধীনচেতা মহামনা পুরুষ বলিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা হয়। জেম্‌স মিলের বিশ্বাস তাঁহার ধর্ম্ম, এবং তিনি প্রাণপণে সেই ধর্ম্ম পালন করিতেন। মিলের পিতা কখন বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাহা তিনি অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং পুত্রকেও শৈশবাবধি এই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন। পুত্র তিন বৎসরের না হইতেই, তাঁহাকে গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অষ্টম বৎসরের মধ্যেই তিনি গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। আট বৎসরের বালক মিল প্রথমে লাটিন পড়িতে আরম্ভ [illegible]। জেম্‌স মিল পুত্রের [illegible] উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নিয়ত যত্নশীল ছিলেন। পুত্রকে পাঠ দিবার সময় তাহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে কখন বলিয়া দিতেন না। তাহাকে চেষ্টা করিয়া বুঝিতে বলিতেন, এবং অনেক চেষ্টা করিয়া না পারিলে বুঝাইয়া দিতেন। জেম্‌স মিল সর্ব্বদা পাঠ, চিন্তা ও অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন, কিন্তু শত কষ্টের মধ্যেও পুত্রের উপর নিয়ত চক্ষু রাখিতেন। শয়নে, ভ্রমণে, অধ্যয়নের সময় পর্য্যন্ত পুত্রকে পার্শ্বে রাখিতেন। আহারে বসিয়া পুত্রের সহিত নানাবিষয়ে কথা, শয্যায় শয়ন করিয়া জ্ঞানালোচনা, ভ্রমণে বাহির হইয়া পথে পুস্তক সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। এইরূপে নিয়ত পিতা পুত্রে গভীর তত্ত্বসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। মিলের পিতা পুস্তক লইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, পার্শ্বে পুত্র বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পিতাকে নানা প্রশ্ন করিতেছে। পিতা ধীরভাবে ব্যগ্রতার সহিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন! জেম্‌স মিল স্বয়ং মহা পণ্ডিত ছিলেন, দিবানিশি জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, মুহূর্ত্ত মাত্র অপব্যয় করিতেন না। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও পুত্রকে শিক্ষাদানে অক্লান্ত [illegible]লেন। মিলের উপর তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রাতা ভগিনীদিগের [illegible]ক্ষার

ভার ন্যস্ত ছিল। জেম্‌স মিল নিজে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতেন, সেই প্রকার বালক মিলকেও নিরন্তর পরিশ্রম করাইতেন। তিনি কখন বিদ্যালয়ের দ্বারে প্রবেশ করেন নাই। এই প্রকারে মিল চতুর্দ্দশ বৎসরাবধি পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং এই বয়সেই তাঁর পাঠ সমাপ্ত হইল। পিতার অবিশ্রান্ত প্রাণগত যত্ন এবং নিজের অসাধারণ প্রতিভাগুণে এই সুকুমার বয়সে তিনি গ্রীক, লাটিন ও মাতৃভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু কিশোর বয়সেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সে তিনি জ্ঞানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলেন। চিরজীবনের সাধনায় পরিণত বয়সে যে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে মানুষকে কতই না চেষ্টা করিতে হয়, কিরূপে সেই বালক সেই সুকুমার বয়সে এত জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিলেন, চিন্তা করিলে মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। আশ্চর্য্য পিতার অত্যাশ্চর্য্য সন্তান! এমন পিতা না হইলে এমন পুত্র কি কখন হয়? পিতা নিজের অগাধ জ্ঞান পুত্রের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, পুত্র তাহা গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন। কিন্তু এত জ্ঞান-রাশি সঞ্চয় করিয়াও মিলের প্রাণ শান্তিহারা হইল। পিতা দিবানিশি শিক্ষা দিয়াছেন, সস্নেহ ব্যবহার ত কখন করেন নাই, কখনও মধুর সম্বোধনে ডাকেন নাই, কখনও প্রাণ ভরিয়া আদর করেন নাই, বরং পাঠ বলিতে না পারিলে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কঠোর হইয়া শাস্তি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু পিতার মধুর মূর্ত্তি সুকোমল ব্যবহার মিলের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। কাজেই শৈশবাবধি পুস্তকরাশির চাপে বালকের প্রাণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

তাহার উপর আবার মিল কোন প্রকার ধর্ম্ম-শিক্ষা পান নাই। পিতা তাঁহাকে কখন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই, কখনও সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত মিশিতে দেন নাই। পিতা এবং পুস্তক এই দুই মিলের বাল্যের সঙ্গী ছিল। মিল পিতাকে ভক্তি এবং ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন না। এই সকল নানা কারণে বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মিলের হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে অগাধ জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়া—মিল অনুভব করিলেন—হৃদয় শ্মশান, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক; প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ হইল। কিছুতেই সুখ নাই—প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই—উৎসাহ নাই—চিত্তের বিরাম একেবারে হারাইলেন। কি দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতেছিল! এমন কোন বন্ধু ছিল না যাঁহার নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। একাকী নির্জ্জনে নির্ব্বাক্ হইয়া সকলই সহ্য করিলেন। অবশেষে এরূপ হইল যে মিল জীবনভার আর বহন করিতে পারেন না। তিনি কামনা করিতে লাগিলেন, হয় তাঁহার জীবন লীলা শেষ হউক, না হয় কোন নূতন ভাব আসিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক। যাহা হউক অচিরে তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। একদিন মিল টেনের জীবনী পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ করিতে করিতে টেনের পিতৃবিয়োগে মাতা ভগিনীর গভীর দুঃখ দুরবস্থার চিত্র দর্শন করিয়া মিলের হৃদয় বিগলিত হইল। কে জানে কিরূপে করুণায় তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, উচ্ছ্বসিত করুণা অশ্রুবিন্দুরূপে টপ টপ করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আহা মিল বাঁচিলেন। হৃদয়ের জ্বালা [illegible] জুড়াইল। বিষাদের মেঘ অনেক কাটিয়া গে[illegible]লেন প্রাণ একেবারে শুকাইয়া যায় নাই, বালুকা প্রস্তরের নিম্নে এখনও নির্ম্মল শীতল বারিধারা প্রবাহিত আছে, হয় ত বা কালে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার শুষ্ক প্রাণকে সঞ্জীবিত করিবে। আবার তাঁহার জীবন ফলে ফুলে শোভাসৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইবে। মিল অন্ধকারে গভীর কূপে শুষ্ক মরুভূমিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় মরিতেছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন; সেই ঘন নিবিড় অন্ধকারে আশার কিরণ দেখাইলেন। পরে আবার এক রমণীরত্নকে প্রেরণ করিয়া মিলের জীবনের উচ্চতর পরিণতি সাধিত করিলেন। এই অপূর্ব্ব রমণী কে? ইনি মিলের পত্নী। বারান্তরে এই অসাধারণ-মেধাবিনী রমণীর বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এতদিন মিল ভাবিতেন আত্মসুখই মানবজীবনের সকল কার্য্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য; এখন বুঝিলেন—সুখের অনুষ্ঠান করিলে সুখ সুদূরে পালাইয়া যায়, যে সুখ চায় সে সুখ পায় না। আর একটী মহাসত্য উপলব্ধি করিলেন যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরি

স্ফুটন ব্যতীত জীবনের পূর্ণবিকাশ কখন সম্ভব নয়। বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য গণিত বিজ্ঞান দর্শনের প্রয়োজন। সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণের জন্য কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার প্রয়োজন। মিল বাল্যাবধি সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। সঙ্গীতের মোহন রবে তাঁহার প্রাণ একেবারে বিগলিত হইত। কিন্তু কবিতার আদর তিনি করিতে জানিতেন না। এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠে তিনি মোহিত হইলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিলেন প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করাই অনন্ত সুখের আকর। জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিণতির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা মিলের পত্নীর দ্বারা বিধাতা পূর্ণ করিলেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

নাম-লেখা।

স্বপনে দেখিলাম যেন, এ ধরণীপুর
ছাড়িয়া গিয়াছি আমি বহু—বহুদূর
[illegible]দিকে ঘোর দারিদ্র্য, নিন্দা, নির্য্যা[illegible],
পরলোকে ; যেন কোনও [illegible]
আমারে বেদের মত প্রাচীন ভাষায়
কহিলেন,—"অনুসরি আইস পশ্চাতে।"
চলিলাম ;—কতক্ষণ গিয়া তাঁর সাথে
দেখিলাম, দুর্গ এক বিপুল আকার
সুগম্ভীর ; সভয়ে ছাড়িয়া সিংহদ্বার,
প্রথমেই পাইলাম প্রাণমনোরম
কুসুম-বাটীকা ; দেখি তার নিরুপম—
শোভা, চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তার পরে
ক্ষুদ্র কক্ষশ্রেণী,—তার ভিতরে ভিতরে
বহুবিধ গন্ধ ও চন্দন, নানা সাজ
বস্ত্র অলঙ্কার ;—নিতান্ত দুর্ল্লভ, রাজ—
আকাঙ্ক্ষিত, সে সমস্ত সুখদ্রব্য রাশি ;
—স্বর্গাদপি প্রিয় তাহা মানিবে বিলাসী।
তার পরে সংখ্যাতীত প্রকাণ্ড আকার
কক্ষাবলী। একটির পানে চাহি তার,
কহিলেন সে পুরুষ—"আছে কি স্মরণ,
নরজন্ম কতবার করেছ গ্রহণ
পৃথিবীতে ?"—আমি রহিলাম নিরুত্তর।
তিনি পুনঃ কহিলেন—"হে সুকৃতবর,
ইহা এক পুরস্কার ;—যাও, দেখ গিয়া
ঐ কক্ষে,—মহাকাল রেখেছে সঞ্চিয়া
তব জন্ম-জন্মান্তের জীবদেহ গুলি।
যাহারা এখানে আসে, আনে ফুল তুলি,
আনে গন্ধদ্রব্য, নানা বসনভূষণ,
আর যত মনোমত সুখোপকরণ,
সব দিয়া পরম যতনে, সেবা করে
সেই প্রিয় তনুগুলি।—যারা দেহ ধরে,
দেহ চেয়ে তাহাদের প্রিয়তর কিবা ?
তুমি যাও, স্বেচ্ছামত আজি সারাদিবা
পূর্ণ কর মন অভিলাষ।"—এত বলি
ধীরে ধীরে সে পুরুষ যাইলেন চলি।

আমি সভয় বিস্ময়ে পশিলাম গিয়া
সেই কক্ষে ;—কি আশ্চর্য্য, রয়েছে পড়িয়া
বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কত জন ;
কেহ শ্যাম, গৌর কেহ ; বিভিন্ন গঠন
[illegible] ; [illegible] যেন শান্তদেহে
সুখনিদ্রালীন ; প্রেম, ভক্তি আর স্নেহে
রঞ্জিত রয়েছে যেন বদনমণ্ডল
প্রত্যেকের। ভাবিলাম, ইহারা সকল
আমারি বিভিন্ন মূর্ত্তি! ধরি বহুক্ষণ
দাঁড়াইয়া রহিলাম নিশ্চল নয়ন
পুত্তলিকাবৎ।
ক্রমে পড়িল স্মরণে
মহাপুরুষের বাক্য। বিচারিয়া মনে
লোহিত চন্দন আর সুবর্ণের তুলি
আনিলাম সংগ্রহ করিয়া। দেহগুলি
তুলি তুলি একে একে, বক্ষে সবাকার
লিখিলাম এ জন্মের প্রেয়সীবালার
মধুনাম ;—প্রতি দেহ হল রোমাঞ্চিত ;
প্রতি চক্ষু হয়ে গেল অশ্রুবিগলিত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

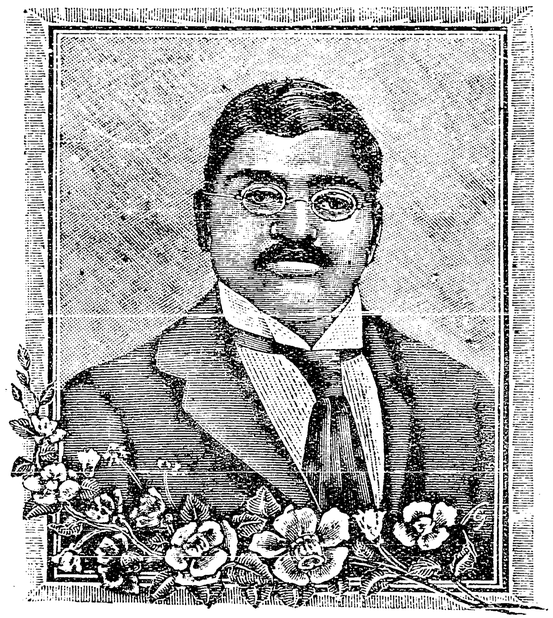

—০—

রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরঞ্জপ্যে ।

এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ট্রাইপস্ পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরঞ্জ্‌প্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যাঁহারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদিগকে র‍্যাঙ্গ্‌লর্ এবং যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাঁহাকে সীনিয়র র‍্যাঙ্গ্‌লর্ বলে। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিই প্রথমে সীনিয়র র‍্যাঙ্গ্‌লর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আর ৩ জন ভারতবাসী র‍্যাঙ্গ্‌লর হইয়াছিলেন ; যথা, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ষোড়শ র‍্যাঙ্গ্‌লর, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক দ্বাবিংশ র‍্যাঙ্গ্‌লর এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত কামা একবিংশ র‍্যাঙ্গ্‌লর হন।

সভ্য জগতে গণিতে কেম্ব্রিজের টাইপস্ পরীক্ষার মত কঠিন পরীক্ষা আর নাই। ইহাতে প্রথম স্থান লাভ করা অতি উচ্চ সম্মান। পূর্ব্বে এই পরীক্ষায় তিনটি পায়াযুক্ত কাষ্ঠাসন ব্যবহৃত হইত, এইজন্য ইহার নাম টাইপস্ হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে র‍্যাঙ্গ্‌লর বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে উপাধিলিপ্সু ছাত্রগণকে নিজ নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ প্রকাশ্য ভাবে wrangle করিতে, তর্ক বিতর্ক, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে, হইত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পরীক্ষা ৮ দিন ধরিয়া হয় ; প্রথমে চারি দিন, তাহার পর ১১ দিনের পর আবার চারিদিন। প্রথম চারি দিনের পরীক্ষায় যাঁহারা "সম্মান" (Honours) লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদিগকেই শেষ চারি দিনের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়।

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রত্নগিরি জেলার ডাপোলী গ্রামে এক মধ্যবিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার পিতামাতাকে অনেক ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইয়া ছিল। পুণার একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে তাঁহার পরিবার বড় ধর্ম্মপ্রবণ। রঘুনাথের আচরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বলেন যে তিনি অতি ধীর ও নম্র প্রকৃতি এবং একান্ত আড়ম্বর বিহীন। শুধু তাই নয় ; বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি "দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি" * ও ফর্গুসন কলেজের অধ্যাপক শ্রেণীভুক্ত হন এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিয়া যান যে তথায় পাঠ সমাপ্তির পর পুণায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ফর্গুসন কলেজে মাসিক সত্তর টাকার অনধিক বেতনে কুড়ি বৎসর অধ্যাপকের কার্য্য করিবেন। এইজন্য তাঁহার প্রতিভা অপেক্ষা তাঁহার আত্মোৎসর্গেরই অধিক প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১৫ বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ের "মারাঠা হাই স্কুল" হইতে রঘুনাথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাতে তিনি গুণানুসারে প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি পুনা ফর্গুসন কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানেও সকল পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বি, এস্ সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৫ সালে নিজ কলেজের ফেলো হন। তৎপরে ১৮৯৬ সালে ভারতগবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া কেম্ব্রিজে পড়িতে যান। তিনি তথায় সেণ্টজন্স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখানেও তিনি নিজ কলেজের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হন ও বৃত্তি পান, কেম্ব্রিজে তাঁহার শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ প্রথম হইতেই তাঁহাকে খুব ভাল ছাত্র মনে করিতেন। তিনি যে সীনিয়র র‍্যাঙ্গ্‌লর হইবেন, অনেকেই এইরূপ আশা করিতেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি, জে, পাদ্‌শাহ যখন এলাহাবাদে আসেন, তখন তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে রঘুনাথের কথা এবং তাঁহার সীনিয়র র‍্যাঙ্গ্‌লর হইবার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং পরঞ্জপ্যে যে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়।

---

* এই সমিতি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ফর্গুসন্ কলেজ ইহার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত। সভ্যগণ সকলেই ভারতবাসী। সাত জন সভ্য লইয়া প্রথমে সমিতি গঠিত হয়। শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা সুলভ করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার সভ্যগণকে সামান্য বেতনে অন্ততঃ কুড়ি বৎসর ফর্গুসন্ কলেজে কাজ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়। প্রথম সভ্যদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যদের মধ্যে অধ্যাপক গোখলের নাম সুপরিচিত।

TORN PAGES

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে রঘুনাথ যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন, পূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মত প্রতিজ্ঞাশালী ছাত্র ইচ্ছা করিলে সিবিলিয়ান হইতে পারিতেন; হইবার বয়সও ছিল। অপরাপর উচ্চপদ বা ধনাগমের উপায় তাঁহার পক্ষে দুর্লভ বা সাধ্যাতীত হইত না। কিন্তু তিনি সংসারের ধন ও পদ-গৌরব পায়ে ঠেলিয়া জ্ঞানান্বেষণে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি অধ্যাপক গোখলের একজন প্রিয় ছাত্র; আত্মোৎসর্গে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ গোখলে এবং ফর্গুসন কলেজের অপর অনেক অধ্যাপক অতি অল্প বেতনে কাজ করেন। আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে নিজ কলেজ বা স্কুলের প্রতি বিশেষ কিছু টান দেখা যায় না। ইংরাজ ছাত্রগণের চরিত্রের ইহা কিন্তু একটি প্রধান ভূষণ। লর্ড কর্জন্ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে হ্যারো স্কুলের ছাত্র ইহা ভুলেন নাই; বরং কৈশোরের সে কথা গৌরবের সহিত হৃদয়ে পোষণ করেন, এবং উপযুক্ত স্থলে ও সময়ে ঘোষণা করেন। এই গুণটি পরঞ্চপ্যে নিজ চরিত্রে উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। সকল ছাত্রেরই ইহা অনুকরণীয়।

রঘুনাথের জীবনে দুটি লক্ষ্য আছে; ফর্গুসন্ কলেজের উন্নতি ও গণিত চর্চ্চা। তিনি সম্ভবতঃ আরও এক বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষা এবং উচ্চতম গণিত শিক্ষা করিবেন। যাঁহারা উচ্চতম গণিতের চর্চ্চা রাখেন, তাঁহারা জানেন যে ইংরেজী ভাষায় গণিতের অনেক কঠিন বিষয়ের পুস্তক নাই বা অল্পই আছে। সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া শিখিতে হইলে প্রধানতঃ জর্ম্মান্ ও ফরাশিশ ভাষা শিখিতে হয়। রুশীয় ও ইতালীয় ভাষা জানিলেও ভাল হয়। এই জন্য রঘুনাথের পক্ষে ইংরাজী ব্যতীত অপর য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন।

পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল যুগে জ্ঞানলিপ্সুগণ তপস্বীর জীবন যাপন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতেও এই আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। সেই ঋষিজীবনপূত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া রঘুনাথ প্রতিভা ও আত্মোৎসর্গের মণিকাঞ্চন যোগ সংসাধন পূর্ব্বক নিজ জীবন সার্থক, পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল, মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত এবং স্বদেশবাসী জনগণের হৃদয় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি ধন্য! আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট এই পুণ্য-প্রতিভা-কিরণ-মণ্ডিত যুবকের দীর্ঘায়ুঃ ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশলা প্রার্থনা করি। ইতি ১৪ই আষাঢ়, ১৩০৬।

ঐতিহাসিকচিত্র ও বঙ্কিম বাবু।

যখন প্রথম মহারাষ্ট্র-ভূমিতে পদার্পণ করি, ঐতিহাসিকরস আমার হৃদয়ে আবেশ করিতে কিঞ্চিৎ কালহরণ করিয়াছিল। ছয় মাস কাল ভারতীয় ইংরাজ-সমাজের সামাজিকতার বন্ধনপাশে বিজড়িত থাকিয়া স্ব-সম-জাতির রসগ্রাহিতা কুণ্ঠিতধার হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যেমনই একদিন পুণার 'বুধবার-পেটে'র অমিশ্র মহারাষ্ট্র জনকল্লোলের মধ্যে কোন সংস্কৃত পুস্তকালয়ের সম্মুখে আমাদের রথাশ্ব উপনীত ও স্থিত হইল, আমার নিশ্চল স্থাবর চিত্তে জঙ্গম মহারাষ্ট্রীয়গণের ছবি প্রতিফলিত হইতে লাগিল, এবং তাহা ঐতিহাসিক বর্ণে সমুদ্ভাসিত হইল। প্রত্যেক রূঢ় মরাঠা বালকে শিবাজীর পার্শ্বদ সৈন্যের অঙ্কুর দেখিলাম, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চন্দনচর্চ্চিত ভালে পেশোয়ার সম্ভাবনা পড়িলাম। সেই এক অনুভূতি।

আর এক অনুভূতির নিত্য বিকাশস্থান কলিকাতার উত্তরভাগে, হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে। যখন মলয়জশীতলা সুজলা সরসীতটে, শুভ্র উত্তরীয় উড়াইয়া দলে দলে নবীন বঙ্গযুবককে বিচরণ করিতে দেখি, কুঞ্জবিতানে বসিয়া প্রেমের গান গাহিতে শুনি, তখন তাহাদের পশ্চাতে জাতীয় গৌরবের কোন্ তুঙ্গ দৃঢ় আশ্রয়ের ছায়া দেখিতে পাই? মনে করি তাহাদের পিতৃস্থানীয়ে দাঁড়াইয়া কাহারা?—অসার, কাপুরুষ, বাহুবলশূন্য, গৌরবশূন্য, দৈব ভয়ে ভীত, মানুষ ভয়ে ভীত গুটিকত মানবক! কেন ধারণা করিতে পারি না ইহাদের মধ্যে একটিও ক্ষত্রহৃদয় আছে? কেন অকস্মাৎ বঙ্গসীমান্তে ঋষাবির্ভাব কল্পনার সহিত ইহাদের পুরুষাপসদত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের হাস্যকর ও ঘৃণ্য কল্পনা মনে সমুদিত হয়? শুধু স্বজাতির ঐতিহাসিক স্মৃতির অভাবে।

বহুপূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু ইহাই অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন:—"সকলেরই বিশ্বাস বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

* * * * *

বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কাব্য, কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গলার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারি বই যে ছুড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শম্যান্, লেথ্‌ব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন; কিন্তু এসকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।

* * * * *

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয় বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

* * * * *

ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা এসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতি সদৃশ। বাস্তবিক একদিন, বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক, ঔপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল; যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্র যাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।

বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয় পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্রজাতি ছিল না।

সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেন বংশীয়েরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীন ভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোনকালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দর বন সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই। বাঙ্গালীর অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।"

যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে, যে পাঠানেরা কস্মিন্‌কালেও প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দু রাজগণের অধিকার সময় হইতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজগণ বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইঁহারাই দীন দুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইহারাই রাজস্ব আদায় করিত, এবং সর্ব্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিত। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্স রাজ্যের রাজার সহিত বরগুণ্ডি, আঁজু, প্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গলার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzeraine মানিত। কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল।

* * * *

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবন চরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের

সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

উদ্ধার চিহ্নসমন্বিত উল্লিখিত সমস্ত অংশ বঙ্কিম বাবুর বিবিধ প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল। তিনি শুধু আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কোন্ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন্ প্রণালীতে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ১৮৯২ খৃঃ অব্দে বলিতেছেন।—

"বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তার দর বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসর বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না, যে ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক, বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না ? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ আমিত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।"

সাত বৎসর পরে ভেরীনিনাদ সহ সসৈন্য সেনাপতি সমাগত হইয়াছেন—তিনি ঐতিহাসিক চিত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিত—আমাদের বন্ধুবর অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

একবার ইঁহার সহিত বর্ত্তমান লেখিকার একটি ছোট-খাট সম্পাদকীয় যুদ্ধ বাধিয়াছিল। বলাবাহুল্য সংগ্রামে যোগ্যতর যোদ্ধা অক্ষয় বাবু বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমার দুর্ব্বলহস্তে অস্ত্র ছিল শুধু বঙ্কিমভক্তি, তিনি আনিয়াছিলেন সত্যানুসন্ধান। "সেই সত্যের নির্ম্মম অনুজ্ঞায় যে পত্রিকা পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের অজস্র স্তুতিবাদ গাহিয়াও মনে হয় না যথেষ্ট হইল, তাহাতেই বঙ্কিমের অপবাদ রটনার স্থান দিতে হইয়াছিল।" *

সে সময়ে লেখিকার অন্ধ,অন্ধভক্তি সুধীর অক্ষয় বাবুকে যে পরিমাণ উষ্মতায় উত্তেজিত করিয়াছিল, ঐতিহাসিক চিত্রের সম্পাদকীয় নিবেদনে তিনি তাহার সংশোধন করিয়াছেন। স্বজাতির ইতিহাস না থাকার যে লজ্জা তাহা দূর করিবার জন্য যে প্রথম হৃৎস্পন্দন, তাহা বঙ্গদর্শন সম্পাদকের বক্ষে অনুভূত হইয়াছিল,—ইহা বঙ্গদর্শনের দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় না বঙ্কিম বাবুর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকৃত হইয়াছে। সূচনার একস্থলে দেখিতেছি ঃ—

"বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। * * * বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্য প্রাসাদের বড় সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। ঐতিহাসিক-চিত্র অদ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধ-বাতায়ন, রহস্যাবৃত হর্ম্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।"

শুধু সিংহদ্বারটা খুলিয়াই কি বঙ্কিম বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন ? আমার বিনীত বিশ্বাস এ কথায় তাঁহার প্রতি অল্প অবিচার হয়। অনেকগুলি মহলের চাবিও বঙ্কিম বাবুই প্রথমে খুলিয়া দেন—অন্ততঃ নির্দ্দেশ করিয়া দেন তাহা কোথায় পাওয়া যাইতে পারে,—সেই নির্দ্দেশ অক্ষয় বাবুর সেনানীগণের কেহ কেহ অনুসরণও করিয়াছেন দেখিতে পাইতেছি—ঐতিহাসিক মহল তাহার একটি। "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার," "বাঙ্গালার ইতিহাস," "বাঙ্গালার কলঙ্ক," "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা," "বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ" ও সপ্তপরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধাবলী তাহার সাক্ষী। ঐতিহাসিক-চিত্র সম্পাদক বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের ইতিহাস জন্য হৃৎস্পন্দনের যে কথাটার, উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কথাটা আরও দৃঢ় করিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া পাঠক পাঠিকার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, ও ঐতিহাসিক-চিত্রের নিজজন্মের নিমিত্ত বঙ্কিমের নিকট সাক্ষাৎভাবে ঋণীত্ব দাবী করিবার জন্য আজ আমার এই দুর্ব্বল লেখনী ধারণ। ইতিহাসের দ্বারে আজ বহু সেবক উপস্থিত, কিন্তু তাঁহাদের প্রথমে কে আহ্বান করিয়াছিল সে কথাটা যেন ভুলিয়া না যাই।

"ঐতিহাসিক-চিত্রে"র সেনাপতি ও সেনানীগণের সর্ব্বথা প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলস্বরূপ তিনটি লাভের সম্ভাবনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রথমতঃ সত্যোদ্ধার, দ্বিতীয়তঃ স্ব স্ব অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত বাঙ্গালীর স্বাধীন চেষ্টার পরিচর্চ্চা (এ দুইটী সূচনাকার তাঁহার প্রস্তাবনায় উল্লেখ করিয়াছেন), এবং শেষতঃ ও বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক গৌরব সমুদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে সুস্থ, সবল আত্ম-মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠাদান করা। ইতিহাসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এই শেষ কারণটীই বঙ্কিমের হৃদয়ে সমধিক আধিপত্য করিয়াছিল।

শ্রীসরলা দেবী।

* ভারতী, বৈশাখ ১৩০৪ সাল।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

KUNTALINE PRESS.

NALIN BEHARI MALLIK.

প্রদীপ

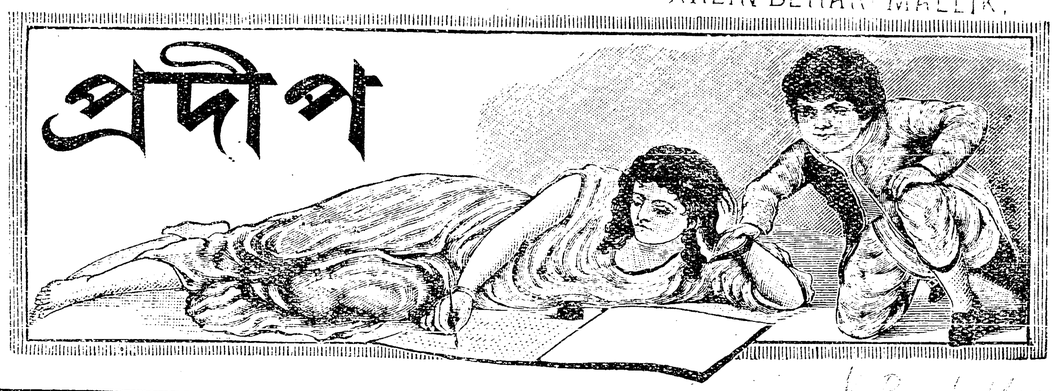

দ্বিতীয় ভাগ। } ভাদ্র, ১৩০৬। { নবম সংখ্যা।

তপোবন-চিত্র।

বশিষ্ঠদেবের আশ্রম।

বিশ্বামিত্রপত্নী সুব্রতা ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী দেবীর প্রবেশ।

সুব্রতা। আজ দেবি! লভিব বিদায়;
এতদিন ও চরণাশ্রয়ে
কি আনন্দে যাপিয়াছি দিন,
কত শান্তি লভিয়াছি প্রাণে,
শক্তি নাই করিতে প্রকাশ।
জনপদে ছিলাম যখন,
শুনিতাম কহিত সকলে,
তপোবন ভয়ঙ্কর স্থান;
গৃহহীন, পথহীন দেশ,
সমাচ্ছন্ন কণ্টকী লতায়,
তরুতলে বসে সেথা লোক
বাঁচে প্রাণ তিক্ত বন [illegible]
কুশাঙ্কুর বিঁধে স[illegible]
অনুদিন সে[illegible]
বিরাজি[illegible],
হ[illegible] বায়ু;
[illegible] করে জড়;
[illegible] গর্জ্জে বিষধর;
ঋষিগণ, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র প্রায়,
শুষ্কচিত্ত, স্নেহমায়াহীন।
ব্রত, তপ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ
এই মাত্র সে দেশের কথা,
দয়া, মায়া না বসে সেখানে।
কিন্তু দেবি! তব স্নেহগুণে
তপোবনে নিজ গৃহ হ'তে
লভিয়াছি শান্তি সমধিক।
হায় দেবি! ভোগ-মুগ্ধ নর
নাহি বুঝে মোহের ছলনে
তপোবন কি আনন্দধাম।
নাহি জানে অট্টালিকা হ'তে
তরুমূল কত সুশীতল।
নাহি জানে তিক্ত ফলমূল
তপোবনে কি অমৃতসম!
নাহি জানে তাপস জনের
ব্রত-শুষ্ক, রসহীন দেহে
কি মমতা বসে দ্রবময়ী!
পুণ্যাশ্রম নিরখিয়া, দেবি!
জন্ম মম হয়েছে সার্থক;
মাতা, সখী, ভগিনীর স্নেহ
একাধারে করিয়া প্রদান,

REPAIRED DOCUMENT

চরিতার্থা করেছেন মোরে,
কৃতজ্ঞতা কি জানাব পদে।
আমি এই পুণ্যাশ্রমে তব
নব জন্ম করিয়াছি লাভ,
চিরদিন স্মরিব সে কথা ;
ব্রত মম হইয়াছে শেষ,
আজ, দেবি ! যাব স্থানান্তরে।

অরুন্ধতী। সুব্রতে ! কল্যাণ তব করুন্ বিধাতা ;
নহে নীতি অতিথিরে করিতে নিষেধ,
যাও, যথা ইচ্ছা তব। কিন্তু তবু মন
চাহে, সাধুশীলে ! তব পূত সহবাসে
যাপন করিতে কাল ; আশ্রম আমার
তব সম অতিথির শুভ পদার্পণে
হয়েছিল পুণ্যময়। বনবাসী মোরা
ভাবিতাম জনপদ কলুষভীষণ ;
ভাবিতাম লোভ, মোহ, রিপুগণ সেথা
বিহরে উদ্দাম সদা। আছিল বিশ্বাস
প্রমাথী ইন্দ্রিয়দল সংসারকাননে
আক্রমে মানবে নিত্য, ব্যাঘ্র মৃগে যথা ;
অবিদ্যা, আসক্তি, ঘোর কুজ্ঝটিকা প্রায়,
আবরে নয়নযুগ ; জনসংঘর্ষণে
ভাবিতাম শান্তি, মৈত্রী অসম্ভব সেথা ;
কিন্তু তোমা হেরি এবে বুঝিনু নিশ্চয়
স্থানবদ্ধ নহে ধর্ম্ম। যে কুসুম হেথা
সৌরভে আনন্দময় করে বনস্থলী
বুঝিনু মনোজ্ঞ হেন ফুটে জনপদে।
যাও তুমি গৃহে পুনঃ, কর শান্তিময়
আপনার গৃহাশ্রম ; পতি, পুত্র প্রাণে
মন্দাকিনী ধারাসম, ঢালি স্নেহ ধারা
কর শুদ্ধ, কর স্নিগ্ধ ; চিত্ত পূত যার,
কি পার্থক্য তার কাছে গৃহে, তপোবনে ?

সুব্রতা। গৃহে দেবি ! ফিরিবনা আর ;
জীবনের বহু বর্ষ কাল
গৃহধর্ম্ম করেছি পালন,
সাধ এবে ঋষি-ব্রত লয়ে
জন্ম মম করিব সার্থক।

অরুন্ধতী। হ'ক ইষ্টসিদ্ধি তব। সুব্রতে ! কি তুমি
বানপ্রস্থাশ্রমে চাহ করিতে প্রবেশ ?
সধবা-লক্ষণ হেরি শরীরে তোমার,
কোথা তবে পতি তব ? জান নাকি তুমি
জীবিতভর্তৃকা যদি পতি আজ্ঞা বিনা
লয় বনচরব্রত, শাশ্বতী এ নীতি
হয় সে নিরয়ভাগী ? পতি সনে যদি
চাহ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম করিতে সাধন,
কেন তবে এ আশ্রম যাইবে ত্যজিয়া ?
সিদ্ধক্ষেত্র এ আশ্রম, সুধাসম নীরে,
অমৃত সমান ফলে, সুরভি কুসুমে
সুশোভিত সম্বৎসর ; সমিধ্, নীবার,
দর্ভ, সোম, তরুত্বক্ সুপ্রাপ্য হেথায় ;
লভ্য গোপ্রচরস্থান, অনার্দ্র, সরস,
কণ্টককঙ্করহীন। উত্তরে ইহার,
হের কিবা সুগম্ভীর বিরাট মূরতি,
অখণ্ড পুণ্যের রাশি ধরি যেন শিরে,
বিরাজিত গিরিরাজ। শুন কর্ণ পাতি,
অবিরাম কি মধুর কল কল স্বনে,
সঙ্গীতসুধায় সিক্ত করি বনভূমি,
বহেন অলকনন্দা। হেন পুণ্যাশ্রম
কি হেতু সুব্রতে ! তুমি চাহ ত্যজিবারে ?
সাধিতে তাপসধর্ম্ম বাঞ্ছা যদি তব
যাও তুমি নিজ গৃহে, পতি সনে পুনঃ
আসিও এ তপোবনে ; ব্রহ্মর্ষি আপনি
আদরে দোঁহারে স্থান দিবেন এখানে ;
যথাযোগ্য ব্যবহারে ঋষিগণ যত
তুষিবেন উভয়েরে ; আমিও, সুব্রতে !
ভগিনীর স্নেহে তোমা তুষিব আদরে,
পতিসেবা, পুত্রসেবা, শিষ্যসেবা করি,
আচরিয়া ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রতে, সদালাপে
সার্থক রমণীজন্ম করিব উভয়ে।

সুব্রত। অনুপম স্নেহে তব দেবি !
পরিপূর্ণ হৃদয় আমার ;
কি যে প্রাণ চাহে বলিবারে
ভাষা তার নাহি প্রকাশিতে।

জনপদে শুনিতাম শুধু
ব্রহ্মর্ষি গরিষ্ঠ নর কুলে ;
আজ এই তপোবনে আমি
বুঝিলাম, অবনীমাঝারে
নারীশ্রেষ্ঠা দেবী অরুন্ধতী।
হায় দেবি ! ললাটে আমার
হেন লিপি আছে কি লিখিত,
আসি তব পূত সহবাসে
চরিতার্থ করিব জীবন ?
হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
এতদিন যে রহস্য, দেবি !
রেখেছিনু করিয়া গোপন,
আজ এই বিদায় সময়ে
শক্তি নাই গুপ্ত রাখিবারে।
অযাচিত করুণায়, দেবি !
করেছেন কৃতার্থা আমারে
(অবনতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে)
কর জোড়ে পাদপদ্মে তব
মহর্ষির শ্রীচরণযুগে
করি তবে এই নিবেদন,
উভয়ের আশীর্ব্বাদে যেন
হৃদয়ের দেবতা আমার,
সুমতি, সুগতি করি লাভ,
হন্ দেবি ! পূর্ণমনোরথ।

অরুন্ধতী। উত্তিষ্ঠ সুব্রতে ! হেন সত্ত্বগুণময়ী
পত্নী যাঁর, ধরাতলে নহে সুদুর্লভ
মোক্ষপদলাভ তাঁর। চারিত্র্যে তোমার
পূরিবে বাসনা তব ; নহে শিষ্ট নীতি
অতিথির পরিচয় করিতে জিজ্ঞাসা,
কিন্তু ব্রতশীলে ! তব আচরণ হেরি
কৌতুকী মানস মম। কহ মোরে তুমি
বাধা যদি নাহি থাকে, কোথা তব গৃহ ?
কোন্ ভাগ্যবান্ তিনি পতি তিনি তব ?

সুব্রতা। প্রভু মম কান্যকুব্জপতি।

অরুন্ধতী। রাজঋষি বিশ্বামিত্র ? লীলাময় হরি !
অচিন্ত্য মহিমা তব। সুব্রতে ! ভগিনি !
এস করি আলিঙ্গন (আলিঙ্গন করিয়া)
এতদিন, সখি !
এ রহস্য কেন তুমি গুপ্ত রেখেছিলে ?
বুঝিতে কি মন মোর ? ধন্য রাজঋষি,
তপ, ব্রত, যজ্ঞ তাঁর হইবে সার্থক,
তোমা হেন পত্নী লভি। কি কহিব সখি !
কত যে বিরলে মোরা রাজর্ষির কথা
কহি দোঁহে পরস্পর ; করুণাঅশ্রুধারা
ব্রহ্মর্ষির আঁখি যুগে কত যে হেরেছি
রাজর্ষির ব্যবহারে, কহিব কেমনে।
কতদিন ধ্যান শেষে ইষ্টদেবে তাঁর
শুনিয়াছি, কহিছেন গদগদস্বরে ;—
"হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি, কৃপাময় হরি !
পতিতপাবন তুমি ; করুণা বিতরি
সখা মম বিশ্বামিত্রে জ্ঞান নেত্র তাঁর
কর তুমি উন্মীলিত ! জন্মজন্মান্তরে
সুকৃত আমার যদি থাকে কিছু প্রভো !
ফলে তার বিশ্বামিত্রে উদ্ধারহ তুমি।"
কি কব সুব্রতে তোমা, ব্রহ্মর্ষির হৃদে
নাহি অন্য চিন্তা আর ; দিবস, যামিনী
রাজর্ষির কথামাত্র কহেন সবারে,
সুধান বারতা তাঁর। নবচ্ছন্দগীত
রচিয়া আনন্দে কভু কহেন আমারে ;
"পূর্ণ মনস্কাম হয়ে রাজঋষি যবে
আসিবেন এ আশ্রমে, শিষ্যগণ মম
বিনোদন তরে তাঁর এ নব সঙ্গীত
আনন্দে করিবে গান ;" যজ্ঞীয় সম্ভার
চমস, সমিধ, দর্ভ, আজ্য, সোমরস
আনি কভু, সঙ্গোপনে কহেন আমারে ;—
"অনুষ্ঠিতে সোম যজ্ঞ আছে প্রিয়ে ! সাধ,
কর আয়োজন তুমি ; রাজর্ষি যখন
ব্রহ্মর্ষিত্ব করি লাভ আসিবেন হেথা
অধ্বর্য্যু স্বরূপে আমি বরিব তাঁহারে ;
রাখ তুমি রুরুচর্ম্ম, দণ্ড, কমণ্ডলু
ব্যবহার তরে তাঁর।" কি ক'ব ভগিনি !
কি ক'ব অধিক তোমা, নাহি ভেদ দোঁহে,

অন্তরে ব্রহ্মর্ষি এবে রাজঋষিময়।
লভি পরিচয় তব বুঝিনু এখন
নহে দূরে সেই দিন, রাজঋষি যবে
আসিবেন এ আশ্রমে; মিলনে দোঁহার
ধন্য হ'বে এ আশ্রম; ধন্য হ'ব মোরা
একাসনে হেরি দোঁহে; কি শুভ দর্শন
অশ্বত্থ মিলিত বটে, হরি, হর সনে!
এস সখি! মোর সনে, সদাচারে তব
ব্রহ্মর্ষি প্রসন্ন অতি জানি তোমা প্রতি।
চল তবে তাঁর কাছে; পরিচয়ে তব
কি আনন্দ আজি তিনি লভিবেন হৃদে।
কেন এ সরম সখি? এস যাই দোঁহে।

সুব্রত। ভগবতি! ক্ষমুন্ দাসীরে
ব্রহ্মর্ষির চরণযুগলে
আসিয়াছি লভিয়া বিদায়;
যদি কভু আশীর্ব্বাদে তাঁ'র
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় মম,
প্রভু সনে আসি পুনর্ব্বার
বন্দিব সে চরণ—নতুবা—
সেই চির বিদায় আমার।

অরুন্ধতী। সুব্রতে! কোথায় যাবে বলিবে কি মোরে?

সুব্রতা। যাব, যথা প্রাণেশ্বর মম।

অরুন্ধতী। বল সখি! পেয়েছ কি সন্ধান তাঁহার?

সুব্রতা। পাইয়াছি। শুনিয়াছি দেবি!
কি কহিব, পুষ্করের কূলে,
কি কহিব, ফেটে যায় বুক,
ক্ষমা, দেবি! করুন্ দাসীরে;—
কতযুগ গিয়াছে চলিয়া,
হেরি নাই সে রাজীবপদ,
শুনি নাই সে মধুর বাণী,
শুধু দেবি! উদ্দেশে তাঁহার
ভক্তি পুষ্প করিতেছি দান।
দরশনে পরশনে তাঁর
কিঙ্করীর নাহি মনে আশ;
এদাসীরে রাখিলে চরণে
তপোবিঘ্ন ঘটে যদি তাঁর,
পরিতৃপ্ত র'ব চিরদিন
পরিতৃপ্ত র'ব থাকি দূরে।
কিন্তু দেবি! ফেটে যায় বুক,
লোকমুখে করিয়া শ্রবণ
ব্রতভঙ্গ হইয়াছে তাঁর।
সাধ তাই, যাব তাঁর কাছে
পারি যদি ফিরাতে তাঁহায়।

অরন্ধতী। ব্রতভঙ্গ রাজর্ষির? হেন দৃঢ়চেতা,
তেজস্বী, পুরুষসিংহ, ব্রতভঙ্গ তাঁর?
অলীক এ কথা সখি! ক্ষণতরে যদি
মেঘাচ্ছন্ন হয় রবি কহিব কি তবে
তেজোহীন সহস্রাংশু? চিন্তা নাই তব,
যাও তুমি তাঁর কাছে; সতী পত্নী যার
অসাধ্য সে পুরুষের ডুবিতে নরকে।
অবলা আমরা, তবু বাহু আমাদের
কাতর কি পতিপদ সেবা করিবারে?
ক্ষীণ বক্ষস্থল, তবু পারি না কি সখি
পাতিতে আসনরূপে, পতিপদতল
রক্ষিতে কণ্টক হ'তে? পত্নী পতিব্রতা,
পতি ভ্রষ্টাচারী? সখি! অসম্ভব কথা!
নারীর কি অশ্রু নাই, হৃদয়ে শোণিত
পতির কলঙ্কলেখা ধৌত করিবারে?
কেমন সে নারী তবে? যাও সাধুশীলে!
যাও অবিলম্বে তুমি। প্রিয় শিষ্যা মম,
অভিজ্ঞা কানন পথে আত্রেয়ীরে আমি
প্রেরিব তোমার সঙ্গে; পথ দেখাইয়া
যাবে সে তোমার সঙ্গে। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম
বুকে যদি থাকি আমি, কহিনু তোমারে
পূরিবে বাসনা তব। পতিদেব মম
করিবেন শুভ তব আশীর্ব্বাদ দানে।

সুব্রতা। যাই দেবি! প্রণাম চরণে॥

উভয়ের প্রস্থান।

বৈদেশিকের মরাঠা-চরিত্র-চিত্রাঙ্কন।

কোন একজন এংগ্লো ইণ্ডিয়ান 'এহা' এই কল্পিত নাম ধারণপূর্ব্বক বোম্বে অঞ্চলের পরিচারকবর্গের চরিত্রচিত্র

অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পুস্তকের নাম "বাঙ্গলোর অন্তরালে" (Behind the Bungalow)। পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এই ছদ্মবেশী গ্রন্থকার কোন গৌরাঙ্গ মিলিটারী পুরুষ। সিবিল এবং মিলিটারী সকল বিভাগেই এমন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, যাঁহারা ভারতবাসীকে কিছুমাত্র সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন না; সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পাখা টানিতে টানিতে তন্দ্রাকর্ষণ বশতঃ পাখার রজ্জু একটু শিথিল হইলে যাহারা হতভাগ্য পাখাটানা কুলিকে সবুট পদাঘাতে বৈতরণী পারে পাঠাইতে সঙ্কুচিত হয় না, তাহারা যে চাকর বাকরকে কুকুর বিড়ালের মত জ্ঞান করিবে ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। নেটিভ ভৃত্যের প্রতি অবিচল অবজ্ঞা এবং বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অভাব মিঃ এহার পুস্তকের প্রতিপত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং ইহাতে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষপাতেরও অভাব নাই। অবশ্য এই বিদ্রূপকটাক্ষপাতের কোন কারণ সাহেব তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু এদেশী শিক্ষিত লোকেরা কংগ্রেস করে, নানারকম এজিটেসন করে, এমন কি কালাপানি পার হইয়া বিলাতে গিয়া পার্লেমেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করে ও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় এই সকল কারণে সাহেবের মনের গরম কিছুতে ভাষার আবরণে ঢাকা পড়ে নাই। তথাপি পুস্তক খানি পড়িয়া আমোদ পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে মহারাষ্ট্রীয় দেশীয় পরিচারকবর্গের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই মহারাষ্ট্র দেশে বসিয়া মরাঠা জাতির রহস্যময় চরিত্রে আচ্ছন্ন হইয়াই তাহা উপভোগ করিবার উপযুক্ত। মিঃ 'এহা' তাঁহার ভৃত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তার অভাব লক্ষিত হইলেও তাঁহার বর্ণনা সরস এবং চরিত্রাভিজ্ঞতার পরিচায়ক, তাই আমরা তাঁহার 'বাঙ্গলোর অন্তরাল' হইতে 'পণ্ডিত' ও 'নাপিতের' কাহিনী আমাদের পাঠকগণের জন্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

মিঃ এহা বলিতেছেন,—"কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নার মত পণ্ডিতের আগমনসূচক কাশির শব্দে প্রত্যূষে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদের একজামিন পাশ না করিলেই নয়, কাজেই পণ্ডিতের হাতে পড়া আমাদের পক্ষে বিষম অদৃষ্টের ফের। ঘোড়ার নাম ঘোড়া ভিন্ন গরু নহে, কিন্তু ঘোড়ার গরু নাম প্রাপ্তির নজীর এই পণ্ডিতে বর্ত্তমান। কারণ সাধারণতঃ লোকে তাহাকে মুন্সী বলিয়া ডাকে, অথচ পণ্ডিত মুন্সী নয়। মহম্মদের শিষ্যগণেরই কেবল মুন্সী খেতাব। এই মুন্সীরা উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেয়, কিন্তু কেবল মরাঠী ও গুজরাটী ভাষা শিক্ষা দেওয়া পণ্ডিতদিগের কাজ। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। যাহাতে তুমি 'ঘাইন' শব্দটা আয়ত্ত করিতে পার মুন্সী প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবে, কিম্বা 'বাগবাহারের' কুহকজালের মধ্যে সে তোমাকে পরিচালিত করিবে, কিন্তু কর্ত্তরি ও কর্ম্মণি প্রয়োগের প্রভেদ নির্দ্দেশ করা এবং পুরাণের বহুবিধ জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই পণ্ডিতের কাজ।

তিন শ্রেণীর পণ্ডিত আছে। কাহারো সহিত কাহারো মিল নাই। যদি এদেশের ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে শেখা তোমার অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে তোমাকে আমি প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিই। কিন্তু ইহারা ইংরাজী জানে না, সেই জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলে তোমাকে খুব খাটিতে হইবে। এই দলের পণ্ডিত আজকাল আর বড় একটা কেহ পছন্দ করে না বলিয়া ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

কিন্তু যদি তোমার একজামিন পাশ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের দ্বারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইবে। ইহারা বেশ ইংরাজী জানে, ইহাদের পোষাকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ইহারা আপনাদিগকে খুব উঁচু দরের লোক বলিয়া মনে করে, কিন্তু চেহারাখানি দেখিলেই ভক্তি চটিয়া যায়; যাহাহউক, ইহারা কাজের লোক, অন্য পণ্ডিতের সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই যে ইহারা নেটিভ পরীক্ষকদের বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র: কিন্তু এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের এক চিরপ্রচলিত বিশেষত্ব আছে; তুমি পাশ করিলে তাহাকে ভূরিপ্রমাণ মাসিক বৃত্তি এবং মোটা দক্ষিণা দিবে সে তোমাকে দিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লইবে। যদি তুমি এ বন্দোবস্তে সম্মত হও, তাহা হইলে আর কোন ল্যাঠা নাই, তুমি নিশ্চয় পাশ; এই প্রণালী অবলম্বন করিলে ফেল হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। একজামিন পাশ করাইবার পক্ষে এই পণ্ডিতদিগকে অনেকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অনেক নব্য যুব-

TORN PAGES.

কের কাছে আমি শুনিয়াছি যে তাঁহারা কেবল এই শ্রেণীর পণ্ডিত নিযুক্ত না করার দরুণই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত কেবল য়ুনিভারসিটীর সম্মান-লালসাপরতন্ত্র যুবকদলের মধ্যেই দেখা যায়। ইহারা মন্দ ইংরাজী জানে না, এবং ইংরাজদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা এই ভাষাজ্ঞানটাকে কিছু পরিপক্ক করিয়া তুলিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও অবশ্য ইহাদের আছে, কিন্তু এই শ্রেণীর পণ্ডিতের দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় কিনা তাহা আমি অবগত নহি।

বৃদ্ধ রঘুনাথরাও এই তিন শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ইংরাজী জানিত না, জানিবার ইচ্ছাও রাখিত না, ইংরাজী কথা এবং ইংরাজী চিন্তা উভয়ই তাহার আয়ত্তের বাহিরে ছিল। রঘুনাথ বিশুদ্ধ (undiluted) ব্রাহ্মণ। যে সকল সেকেলে এংগ্লোইণ্ডিয়ান কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিম্বা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই রঘুনাথ শিখাইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ধার্ম্মিক লোকের চরিত্র রঘুনাথের হৃদয়ের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধে গল্প করিত ও বলিত তাঁহারা দেবতা, মানুষ ছিলেন না। বার্দ্ধক্যে রঘুনাথের জীবন-স্রোতে ভাটা ধরিয়াছিল; কেহ তাহাকে চাকরী দিত না, বেচারা বড়ই গরীব ছিল। তাহার মুখখানা তোলোপারা, কানদুটি বীফ্-ষ্টীকের মত, তাহার চারিপাশে ও ভিতরে রাশি রাশি লোম; চেহারাখানা মোটেই দর্শনধারী নহে, কিন্তু সে চেহারা সংযত, অসন্তোষবিরহিত, সহিষ্ণু হিন্দু-চরিত্রজ্ঞাপক, সেই ভঙ্গীখানা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত যেন সে সর্ব্বপ্রকার নূতনত্বের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া এ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহার সদাপরিচালিত বুদ্ধিখানা সম্ভব এবং অসম্ভব সকল রকম বিষয়ের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু সার বিষয়ের প্রতি তাহার কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না, এমন কি জগতে যে কিছু সার পদার্থ আছে এ সম্বন্ধেই তাহার সন্দেহ ছিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যমিথ্যা, এ সকলকে সে দার্শনিক তত্ত্বের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিত। গোঁড়া-ব্রাহ্মণের যে সকল বিষয় বিশ্বাস করা দরকার সে সকল বিষয় তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে জানা ছিল। মোটামুটি ঘটনার উপর নির্ভর করিয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল না। অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাহার মন বিলক্ষণ নির্ব্বিকার ছিল, কারণ তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস ও তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে যে কোন একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার একথা কিছুতে তাহার মাথায় আসিত না। যদি তাহার পুত্র খৃষ্টিয়ান হইত তাহা হইলে সে তাহাকে গাছে লটকাইয়া চাবুক মারাও আরামজনক জ্ঞান করিত, কিন্তু তাহার নিকট খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও উপদেশ ব্যাখ্যা করিলে সে তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়া শতমুখে তাহার প্রশংসা করিত, খৃষ্টিয়ানের প্রতি তাহার শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না। এমন বিস্ময়কর বৃদ্ধ আর দেখি নাই। সে ঠিক তাহার উপাস্য দেবতার মত, পৃথিবীর এবং স্বর্গের কোন আদর্শেই গঠিত নহে। তোমরা কি মনে কর এই বৃদ্ধ আর তাহার দেবতা একই গাছের ফল নহে?

রঘুনাথের নাম করিতেই তাহার বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। এক এক দিন সে এখানে আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক কোয়ার্টার পরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং জুতা জোড়াটা দরজার কাছে ফেলিয়া সসম্মানে গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিত। অনন্তর হাঁফ ছাড়িয়া অনেকক্ষণ পরে একটা আকস্মিক বিপৎপাত ও তাহা হইতে অদ্ভুত আত্মরক্ষার গল্প ফাঁদিয়া বসিত। গল্প প্রায়ই এক রকম। সে যখন রাস্তা পার হইবে ঠিক সেই সময়টিতে এক ঘোড়াসমেত একখানা গাড়ী তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, ভয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সে আগে যাইবে কি পিছাইবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই, কিন্তু ঘোড়া দুটি যখন তাহার ঘাড়ে পা তুলিয়া দিবে ঠিক সেই সময়ে সে পাগলের মত রাস্তার একধারে ছুটিয়া গেল। সে প্রকাশ করিল তখনও তাহার কাল পূর্ণ হয় নাই; এই বলিয়া সে মনুষ্যের শুভাশুভ গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবের আলোচনা করিতে বসিত। তাহার পর সে আমার Grant Duff হইতে অনুবাদপূর্ণ Exercise এর খাতাখানি খুলিয়া ধীরে ধীরে গোঁয়াইয়া গোঁয়াইয়া তাহা পাঠ করিত। এই সময় পান ও সুপারি চর্ব্বণকার্য্যে তাহার মুখ অভিনিযুক্ত থাকায় তাহার সেই

গোঁয়ানি শব্দ অগত্যা নাসারন্ধ্রপথেই নির্গত হইত। পড়িতে পড়িতে সে পেন্সিল দিয়া ভ্রমসংশোধন করিত, কিন্তু সেই সকল সংশোধনের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা সে আবশ্যক বোধ করিত না। শিক্ষাদান করাত তাহার উদ্দেশ্য নহে, সে শুধু জ্ঞানের আকর মাত্র, তোমার কিছু আবশ্যক হইলে এই আকর খনন করিয়া তোমার অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। মিঃ গ্রাণ্টডফ্ তাঁহার ইতিহাসের অনেক স্থলে খুটনাটি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই; হইতে পারে কোন বিষয়ে ইংরাজের নির্ব্বুদ্ধিতার উপর মরাঠা ধূর্ত্ততা জয়লাভ করিয়াছে। গ্রাণ্টডফের সেই অনুল্লিখিত প্রসঙ্গ লইয়া রঘুনাথ মরাঠা ইতিহাসের গল্প ফাঁদিয়া বসিত।

একসারসাইজ দেখা শেষ হইলেই তাহার অবশ্যম্ভাবী দরবার আরম্ভ হইত। কোন্ বিষয়ের দরবার তাহা আমার ঠিক মনে নাই। হয়ত তাহার পৈত্রিক জমীজমার স্বত্ব লইয়া কাহারো সহিত বিরোধ সম্বন্ধেই সে দরবার। যাহাই হউক সে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য দলিল বাহির করিলে তাহার একটা হরফও আমি চিনিয়া উঠিতে পারিতাম না; তাহাতে যে কোন অক্ষর কি কথা লেখা আছে তাহা বুঝে সাধ্য কার? লেখা দেখিয়া বোধ হইত লেখক দোয়াত হইতে কালি লইবার সময়টুকু ছাড়া আর একবারও কাগজ হইতে কলম তোলে নাই, এবং অধিকাংশ স্থলেই কোন কথার মাঝখানে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার লেখনীর গতি রোধ হইয়াছে। যাহা হউক, রঘুনাথ সেই তৈলাক্ত কাগজ খণ্ড আমার হস্ত হইতে লইয়া বলিত, "কেন, এ ত দিব্বি হস্তাক্ষর।" বলিয়াই সুর করিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিত, সে ভঙ্গির লেখা তাহার পাঠও অবিকল সেই ভঙ্গির, অর্থাৎ একদমে যত খানি পারিত পড়িত, নিশ্বাস না ফুরাইলে আর থামিত না, শেষে একটা কথার মাঝামাঝি থামিয়া শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক আবার পড়িতে সুরু করিত। অনন্তর আমি তাহার নিকট 'মুক্তামালা' পড়িতে আরম্ভ করিতাম, সে অনেক টীকাটিপ্পনী প্রয়োগে তাহা উজ্জ্বল করিয়া তুলিত।

বার্দ্ধক্যের কথা উঠিলে রঘুনাথ বলিত কাহারো কাহারো চুল কম বয়সেই পাকিয়া থাকে। আমাদের চুল খুব শীঘ্র পাকিবে, কারণ আমাদের মস্তিষ্ক পুরু নহে। এইরূপে সে চিকিৎসাতত্ত্ব, পথ্যাপথ্য, পরিপাকশক্তি, আহারের পর বিশ মিনিট কাল বাঁ পাশ ফিরিয়া 'কাত' হইয়া শোয়া, প্রভৃতি আকাশ পাতালের এত কথা পাড়িত, যাহা আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্রের স্বপ্নেরও অগোচর।

ক্রমে বেলা হইয়া পড়িত; আর বৃদ্ধের পক্ষে চেয়ারে বসিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তখন সে অগত্যা চেয়ারের উপর পাদুখানি তুলিয়া তাহাতে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিত, অবশেষে ব্রাহ্মণ তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইত। অবশ্য তাহার বাহ্যদৃষ্টি উন্মুক্ত থাকিত, কিন্তু তাহার মানস-নেত্র তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তখন আমার ব্যাকরণ ও বর্ণবিন্যাস লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতাম, এমন কি সে সময় আমি হাই তুলিলেও ভূত মহাশয়কে আমার মুখবিবরে প্রবেশে বাধা জন্মাইবার জন্য সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাসহযোগে তুড়ি দিতে বিরত থাকিত। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গে সে প্রকাশ করিত, বেলা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে অতএব আজ এই পর্য্যন্তই থাক, বাড়ী গিয়া তাহাকে আবার পৈতা বদল করিতে হইবে। বেচারা রঘুনাথ বোধকরি এতদিন মুতামুলাতীরে শ্মশানশয্যা আশ্রয় করিয়াছে।

পণ্ডিতের আখ্যায়িকা শেষ করিবার আগে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। পণ্ডিতের জন্য একখানি স্বতন্ত্র চেয়ার রাখা আবশ্যক। তাহার কাচের পায়া হইলেই অতি উত্তম হয়। তথাপি তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ভয় হইবার আশা নাই। কারণ, তাহার সাদা চাদরে সর্ব্বদাই এমন সকল রক্তশোষী কীট বিচরণ করিয়া বেড়ায়, যাহা সে দুটি অঙ্গুলী দ্বারা ধরিয়া মেঝের উপর নিক্ষেপ করে। সে কীটের বিনাশ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, কারণ সে মনে করে হয়ত তাহার কোন মৃত পিতৃপুরুষের আত্মা সেই দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক দেহিরূপে বিরাজ করিতেছে; তাই তৎকর্ত্তৃক বিরক্ত হইলে সে তাহাকে নির্ব্বাসিত করে, যেমন করিয়া আমরা ভিক্ষুক ব্যাটাদের বিতাড়িত করি।"

নাপিতের উপাখ্যানে মিঃ এহা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষে নিজে নিজের ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার প্রথা নাই। এখানকার ধর্ম্মসংস্কার ও লোকাচার মানিয়া চলা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকেই যদি নিজে নিজের নাপিতগিরি করে তাহা হইলে নাপিত বেচারাদের পেট ভরিবার উপায় কি? এই-

রূপ পরহিতচিন্তা হিন্দু সমাজের অস্থিমজ্জাগত; কিন্তু আমরা ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অভাব এবং তাহার প্রতিবিধান, স্বাধীন বাণিজ্য, প্রতিযোগিতা, মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, এই সকল লইয়া আমরা ব্যস্ত থাকি, বাজে অনুগ্রহ দেখাইবার আমাদের সময় কৈ? কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, সমাজনীতি বিকলাঙ্গ হয় নাই, এখানে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাই কোন বিষয়ই আপনার অদৃষ্টের হাত এড়াইয়া যাইতে পারে না।—এমনকি মানুষের দাড়ীও না। পরিচ্ছন্নতার সহিত এদেশে দেবত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, যত্র তত্র দেখা যায় তৈল ও ভস্ম দিয়া পাকান জটা পবিত্রতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। প্রাচীনকালে যখন সকলেই সাধু এবং বিজ্ঞোচিত কার্য্যের অনুরাগী ছিল, তখন দাড়ীর বিলোপের জন্য একজাতীয় লোকের উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। তবেই ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি নাপিত না হইয়াও প্রাচীন সভ্যতার 'প্রতিষ্ঠাতা' গণের জ্ঞানে উপেক্ষাপ্রকাশপূর্ব্বক নিজের দাড়ীর উপর ক্ষুর বসাইয়া নাপিতনন্দনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, সে কত বড় সমাজদ্রোহী পাষণ্ড! অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন নাপিতেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণেরা এমনকি পুণার গোঁড়াদেরও অনেকে নিজে নিজে ক্ষুর ধরিয়াছিল, কিন্তু কঠিন রোগে কঠিন চিকিৎসারই দরকার। নাপিতেরা ধর্ম্মঘট করিল বলিয়া প্রকৃতি ত আর সে ধর্ম্মঘটে যোগ দেন নাই, কাজেই দাড়ী পূর্ব্বের মত হুহু শব্দে বাড়িয়া সমাজের মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিল। এরকম সঙ্কটকালে কোন্ কাজটা বে-আইনি তাহা কে বলিবে? এতদ্ভিন্ন বৃটীশ শাসনে সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। একালে পঞ্চাশের নীচে এ রকম ব্রাহ্মণ একজনও আছে কিনা সন্দেহ, যাহার হৃদয়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব প্রবেশলাভ করে নাই। একালের য়ুনিভারসিটি ফেরতা যুবকের দল মধুচক্রবৎ সচ্ছিদ্র (Honey-combed), স্ত্রী কিম্বা মায়ের কাছেও তাহারা মনোভাব গোপন করিতে পারে না।

যাহাহউক নাপিতের কথাটা শেষ করা যাক। স্থানীয় লোকে ইহাদিগকে 'হজ্জম' বলে। যুগ যুগান্তর হইতে ইহারা এমনভাবে ক্ষুর চালাইয়া আসিতেছে, যে একাজটা ইহাদের নিকট সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে। নাপিতের একটা ছোট ছেলের হাতে তুমি এক টুকরা ভাঙ্গা টিন দেও, দেখিবে সেও তাহা লইয়া কামাইবার ভঙ্গিতে তাহার ছোট বোনটির মুখ আঁচড়াইতে থাকিবে। ভারতবর্ষে-প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, এই বিশেষত্ব বলে ধোপাকে ধোপা ও নাপিতকে নাপিত বলিয়া চিনিতে পারা যায়। ছিপছিপে গঠন, ফরসারঙ্গ, ধোয়া কাপড় আর রাঙ্গা, বাদামী ঢংএর খুব জমকালো পাড়্গী মাথায় দেখিয়াই তুমি চিনিতে পারিবে এ ব্যক্তি নাপিত। তাহার উপর কাণে সোণার বড় বড় মাকড়ী এবং কক্ষে 'ভাঁড়'—এই 'ভাঁড়' জিনিষটি চর্ম্মনির্ম্মিত এবং অনেকগুলি কক্ষ বিশিষ্ট। তাহা যথাক্রমে ক্ষুর, কাঁচি, সাবান, বুরুষ, চিরুণী, আয়না, সন্না, কানখুস্‌কি এবং আরো কত রকম অস্ত্রে পরিপূর্ণ। সে শুধু নাপিত নহে, অস্ত্র চিকিৎসকও বটে, এবং নাসাকর্ণের যন্ত্রনা নিবারণেও তাহার দক্ষতা আছে। যখন সে কোন হিন্দুমস্তকের খবর লইতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে শুধু তাহার দাড়ী ও মস্তকের কেশচ্ছেদনেই আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে না, সমস্ত মাথাটা চাঁচিয়া ছুলিয়া ফরসা করিয়া ফেলে, আর তাহার সুখবিমুগ্ধ খদ্দেরটি সগর্ব্বে প্রকাশ্যস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক এই অস্ত্রচালনার আনন্দ অনুভব করে।

কোন নাপিত সাহেবলোকের ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত হইলে স্বগণের মধ্যে তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়। এই কার্য্যে সে অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে 'টম' এই নাপিতজনাকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ খেতাবটি প্রাপ্ত হয়; (বোম্বে অঞ্চলের নাপিতের নিকট এ খেতাবটি বোধ করি বাঙ্গালার উপাধিলোলুপ জমীদারদিগের নিকট 'রায় বাহাদুর' খেতাবের ন্যায় মূল্যবান)। টম একখানি গেজেট-বিশেষ, সে না রাখে এমন খবর নাই। প্রথমে সে কিছু কাল নির্ব্বাক্ রহিবে, কিন্তু সে জন্য তোমার অধীর হইলে চলিবে না, একবার তোমার দাড়ীতে সাবানটা মাখাইয়া লইতে দাও, তাহার পর তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কর, "ওয়েল টম, আজকার খবর কি?"

টম—"খবর ত কিছু দেখচিনে সাহেব"। (একটু থামিয়া)—"কমিশনার সাহেব নাকি কাল আসচেন!"

"কাল? না, তিনি বিশ বাইশ দিনের মধ্যে আসবেন না।"

টম্—"হ্যাঁ, কালই আসচেন, কারুকে না জানিয়ে চুপিচুপি আসচেন।"

"কেন?"

টম্—"পরমেশ্বর জানেন।" (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে)—"নানাশেঠ তার ছেলেকে জেল হতে বাঁচাবার জন্যে মামলতদারকে পাঁচশো টাকা দিয়েছে; তা নিয়ে নানা শেঠের সঙ্গে তার ভাইয়ের কত ঝগড়া। তার ভাই শেষটা কমিশনর সাহেবকে চিঠি লিখেছে, 'সাহেব তুমি চুপি চাপি এসে তদন্ত কর'।"

"মামলতদার ঘুস খেয়েছে! সত্যি নাকি?"

টম্—"ঘুস না খায় কে? ফৌজদার দুশো খায়, ডেপুটী পাঁচশো খায়।"

"কি! ডেপুটী কালেক্টর ঘুস লয়?"

টম্—"পরমেশ্বর জানেন, কালা আদমীরা বড় বদ; সব কালাই সমান খারাব।"

"তুমি কি কালা আদমী নও, টম?"

এই কথায় টমের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল; "কর্ণেল সাহেবের মেমের ছেলে হয়েছে।"

"বেটা ছেলে না মেয়ে?"

টম্—"মেয়ে, সাহেব। কর্ণেল সাহেবের ভারি রাগ।"

"রাগ কেন?"

টম্—"সাহেব বলে 'আমি বেটা ছেলে চাই, হরদম মেয়েই আসে কেন?' বড্ড গোস্‌সা; বট্‌লারকে মেরে খুন!"

সত্যই টম আমাদিগকে আমোদে রাখে। আমাদের এই ক্ষুদ্র সহরটীতে পরস্পরের সুসংবাদ প্রচারের জন্য আমরা তাহার কাছে যে কত দূর ঋণী তা বলা যায় না। পণ্ডিতের মতই টম আমাদের দ্বারে হাজির হয়, কিন্তু পণ্ডিতের সঙ্গে তার তফাৎ বিস্তর, কাজেই আমরা তাহার আদর করি। যে একজামিনেশনের কালো মেঘ আমাদের মাথার উপর অষ্ট প্রহর ঘনাইয়া থাকে সে তাহার ছায়া নহে, তাহাতে একটুও ব্যাকরণ বা অভিধানের গন্ধ নাই। সকালে আসিয়া যদি সে তোমাকে শয্যায় নিদ্রাগত দেখে, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে সে কখনই খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিবে না। সে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত না করিয়াই অতি লঘুপদক্ষেপে তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে, তোমার মশারি তুলিবে এবং তাহার কর্ম্ম শেষ করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার আগমনের কোন চিহ্নই থাকিবে না। কিন্তু তাহার ক্ষৌর কার্য্যটা তোমার নিকট একটি মৃদু স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইবে, তোমার মনে হইবে যেন কোথা হইতে একটা বিড়াল আসিয়া তাহার সুকোমল উষ্ণ জিহ্বা দ্বারা তোমার কপোল এবং চিবুক লেহন করিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে খেলাচ্ছলে নখর দ্বারা দুই একটা আঁচড় দিয়াছে; আর সেই সময় কোথাকার একটা ঠাণ্ডা ব্যাং তোমার নাকের সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া ব্যাংএর হাসি হাসিয়া গিয়াছে, নাপিতের হাত এমনি ঠাণ্ডা নরম এবং চট্‌চটে। এই জন্যই তাহাকে আমার পচ্ছন্দ হয় না। আমার দাড়ীর ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে দেখিয়া টম্ আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে—তাহার দৃষ্টিটা অনেক অংশে স্বধর্ম্মবিরাগী ব্যক্তির প্রতি পাদরীপুঙ্গবের দৃষ্টির মত।"

আমরা সাহেবের অঙ্কিত চিত্র অবিকল প্রকাশ করিলাম। দোষগুণ সমালোচনার ভার পাঠক মহাশয়দিগের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

এলিজাবেথ বেরেট ব্রাউনিং।

সাহিত্যজগতে যে সকল ইংরেজ মহিলা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এলিজাবেথ বেরেট ব্রাউনিং তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইংলণ্ডে বিদুষী মহিলার অভাব নাই। মিসেস হিমেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট, জেন অষ্টেন, মেরি লেম্ব, মিস্ মিটফোর্ড, মিসেস স্যানিং, মিসেস উডস্ প্রভৃতি সকলেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। উপন্যাস রচনায় জর্জ্জ ইলিয়ট্ ও ব্রণ্টি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন কবিতা-রচনায় মিসেস হিমেন্স এবং মিসেস ব্রাউনিংও সেই স্থানের অধিকারিণী। আমরা অদ্য সংক্ষেপে এই প্রতিভাশালিনী রমণীর জীবনী ও কবিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বিবৃত করিব।

এলিজাবেথ বেরেট একজন ইংরেজ ভূম্যধিকারীর কন্যা। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কোন্

স্থানে ভূমিষ্ঠ হন তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই, তবে অনেকেই লণ্ডন নগর তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এলিজাবেথের পিতা লণ্ডনে বাস করিতেন। এলিজাবেথের জন্মের কিছুকাল পরে তিনি হোপ এণ্ড (Hope End) নামক স্থানে গমন করেন এবং সেইখানে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করেন। এলিজাবেথের অনেকগুলি ভ্রাতা ভগ্নী ছিল। এলিজাবেথ সকলের জ্যেষ্ঠা ছিলেন। বালিকা এলিজাবেথ তাঁহার ভ্রাতাভগিনীদের সহিত ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু শৈশবে তাঁহার অনেক সময় নির্জ্জনে অতিবাহিত হইত। বাগানে যখন সকলে একত্র সমবেত হইয়া ক্রীড়া করিত এলিজাবেথ সেই সময়ে উদ্যানের অপর পার্শ্বে যাইয়া পাতা, ফুল ও ফল লইয়া একাকী খেলা করিত। পক্ষান্তরে বালিকা বয়সেই অধ্যয়নের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি ৯ বৎসর বয়সেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১১ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তিনি "মারাথনের যুদ্ধ" (The Battle of Marathon) নামক ৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটী কাব্য রচনা করেন। এই কবিতা পাঠ করিয়া এলিজাবেথের পিতা এত সন্তুষ্ট হন যে তিনি উহা মুদ্রিত করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ বাল্যকালে গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। গ্রীক সাহিত্য ও কবিতায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রথম রচিত কবিতাগুলির অধিকাংশই গ্রীকদিগের পৌরাণিক কাহিনী উপলক্ষ করিয়া লিখিত। "Wine of Cyprus" নামক কবিতাটী তাঁহার এই সময়ের রচিত। গ্রীক সাহিত্যে তিনি কত দূর প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন এই কবিতাটীই তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এলিজাবেথের শৈশব বড় সুখময়! পিতামাতার আদর ও স্নেহ এবং ভ্রাতাভগিনীর ভালবাসা তাঁহার বাল্য জীবন মধুময় করিয়াছিল। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। ১৬ বৎসর বয়সে এলিজাবেথ মাতৃহীনা হন। তাঁহার জীবনে সুখের একটী প্রধান উপাদান অন্তর্হিত হয়। এলিজাবেথের পিতা তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নাই। তিনি তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ মমতা প্রাণাধিকা কন্যার উপর বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার আর একটী বিশেষ কারণও ছিল। বেরেটপত্নী অতিশয় রুগ্না ছিলেন। এলিজাবেথও জননীর ন্যায় স্বভাবতঃ রোগপ্রবণ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পনর বৎসর বয়সের সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন এবং এই কারণে তাঁহার কাশ রোগের সৃষ্টি হয়। এই ভীষণ ব্যাধি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন দুঃখ ও যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত এলিজাবেথ জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানই বেরেটের জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল। এলিজাবেথকে আজীবন পিতৃগৃহেই থাকিতে হইবে এবং তাহার বিবাহ হইবে না ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এজন্যই তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ না করিয়া কন্যার শুশ্রূষা ও সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। এলিজাবেথের জীবন আর একটী কবির জীবনের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এলিজাবেথ বেরেট অতি শৈশবেই নির্জ্জনে ক্রীড়া করিতে ও কবিতা রচনা করিতে ভালবাসিতেন। রোগশয্যায় পতিত হইয়া তাঁহার নির্জ্জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি হইল। কবিতারচনাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। পনর বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি নানা সাময়িকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "Essay on mind and other Poems" নামক কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে "Prometheus unbound and miscellaneous poems" নামক গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয়। ইহার মধ্যে "জীবন ও মৃত্যুর স্বপ্ন" (A Vision of Life and Death) নামক কবিতাটী বড় সুন্দর। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এথিনিয়াম (Athæneum) নামক সাময়িকপত্রে "অল্পবয়স্কা রাণী" (The Young Queen) এবং "ভিক্টোরিয়ার অশ্রু" (Victoria's Tears) নামক দুইটী ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত কবিতাটী অতীব হৃদয়গ্রাহী। বিষয়টী অতি সামান্য কিন্তু কল্পনার সাহায্যে কবি ইহা হইতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষয়টী এইঃ—

ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইয়াছে। উইলিয়মের শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করিবার জন্য

ভিক্টোরিয়াকে প্রজাবর্গ আহ্বান করিতেছে। সমস্ত ইংলণ্ডবাসী তাঁহার জয়ঘোষণা করিতেছে।

They decked her courtly halls ;
They reined her hundred steeds ;
They shouted at her palace gate,
"A noble Queen succeeds" !

কিন্তু ভিক্টোরিয়ার নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ।

"She saw no purples shine,
For tears had dimmed her eyes ;
She only knew her childhood's flowers
Were happier pageantries.

ইংলণ্ডের সিংহাসনের দায়িত্ব ও গৌরব স্মরণ করিয়া ভিক্টোরিয়ার হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হইল।

কবি গাহিয়াছেন—

"God save thee weeping Queen !
Thou shalt be well beloved !
The tyrant's sceptre cannot move,
As those pure tears have moved !
The nature in thine eyes we see,
That tyrants cannot own
The love that guards liberties !
Strange blessings on the nations,
Whose sovereign wept
Yea ! wept, to wear its crown !

কবিতার শেষ পংক্তি কয়টী আরও সুন্দর। আমরা বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে টর্কি (Torquay) নামক স্থানে লইয়া যান। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এলিজাবেথ জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার কবিতার উৎস শুষ্ক হয় নাই। এই সময়ে তিনি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক ও বিবাহ উপলক্ষে "The crowned and wedded Queen" নামক কবিতাটী রচিত হয়।

"নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্ত্তন" (Napoleon's Return) নামক কবিতাটীও এই সময়ে রচিত হয়। নেপোলিয়নের দেহ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে প্রথমতঃ সমাহিত হইলে পর পুনরায় তাহা উত্তোলিত করিয়া প্যারিস নগরে আনীত হয়। এই উপলক্ষে এই কবিতাটী রচিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আর এক খণ্ড কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে "Drama of Exile" "The Vision of Poets", "Lady Geraldine's Courtship", "The Lost Bower", "The dead Pan" ও "Raven" নামক কবিতাগুলি ছিল। এই সকলের মধ্যে "Drama of Exile" (নির্ব্বাসনের নাটক) নামক কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। 'আদম' ও 'ইভের' স্বর্গচ্যুতির ঘটনা লইয়া এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে অমর কবি মিল্টনের মহাকাব্যের অংশ বিশেষের ছায়া আছে। স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হওয়ার পর আদম ও ইভের কথোপকথন অতীব মর্ম্মস্পর্শী।

ঘটনাস্রোত এসংসারে কিরূপে প্রবাহিত হয় এবং মানবজীবনকে পরিচালিত করে তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এলিজাবেথ বেরেট যে বিবাহ করিবেন তাহার একেবারেই সম্ভাবনা ছিল না। ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া কেবল বাগ্দেবীর সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে এলিজাবেথ বেরেটের জীবন নাটকে একটী নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হয়। বেরেটের কবিতা পাঠ করিতে যাঁহারা ভালবাসিতেন তাঁহাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংও (Robert Browning) একজন। এলিজাবেথের নিকট তিনি সময় সময় সাহিত্য ও কবিতা বিষয়ক চিঠীপত্রাদি লিখিতেন। রবার্ট ব্রাউনিং ও লর্ড টেনিসন উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। কেহ কেহ রবার্ট ব্রাউনিংকে টেনিসন অপেক্ষাও উচ্চ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। কবি মহিলাদিগের মধ্যে এলিজাবেথ বেরেট শীর্ষস্থানীয়া। এই কবিযুগলের হৃদয় ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। মণির সহিত কাঞ্চনের যোগ হইলে বড় সুন্দর দেখায়। সোণায় সোহাগা মিশাইলেও বড় মনোহর হয়। এই কবিযুগলের প্রণয় ও পরিণয় কাহিনী ততোধিক মনোহর। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কবিতা এলিজাবেথ বেরেটের নিকট ভাল লাগিত। ধীরে ধীরে উভয়ের হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়ের হৃদয় প্রেমের গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়। এলিজাবেথ বেরেট জানিতেন না যে ৩৮ বৎসর বয়সে

TORN PAGES

পদার্পণ করিয়া তিনি দাম্পত্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেন। তিনি জানিতেন না প্রৌঢ় বয়সে ব্রাউনিং আসিয়া তাঁহার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিবেন। কবি এলিজাবেথ গাহিয়াছেন।

"I lived with Visions for my Company,
Instead of men and women, years ago,
And found them gentle mates, nor thought to know
A sweeter music than they played to me.
Then thou didst come .....to be
Beloved, what they seemed."
"A heavy heart, beloved, have I borne
From year to year until I saw thy face
And sorrow after sorrow took the place
Of all those natural joys."

প্রেম এ সংসারকে মধুময় করিয়া তুলে। জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে প্রেম মানুষের প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দেয়। এলিজাবেথ বেরেট প্রেমের মোহিনী শক্তিতে রোগ শোক ভুলিয়া গেলেন। পৃথিবী তাঁহার চক্ষে নূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবিতেন মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবে। কিন্তু মৃত্যু আসিল না। পক্ষান্তরে প্রেম তাঁহার হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিল। এ পৃথিবীতেই তাহার জন্য ভালবাসার স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত হইল। এলিজাবেথ সেই মোহময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। "Sonnets from the Portuguese" নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি তাঁহার এই সময়ের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। আর রবার্ট ব্রাউনিং? পাঠকগণ তাঁহার রচিত "আর একটী কথা" ("One word more") নামক কবিতাটী পাঠ করিবেন। ব্রাউনিংয়ের জীবনে এলিজাবেথ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই সময়ের রচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

কবিদ্বয়ের প্রণয়-কাহিনী তাঁহাদের বন্ধুবর্গের নিকট মনোহর বোধ হইল। কিন্তু বেরেটের পিতা ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন! আমরা অদ্য সে কাহিনী বর্ণন করিব না। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে "মেরিল বোন" গির্জ্জায় তাঁহাদের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর দম্পতী প্যারিস হইয়া ইটালী গমন করেন। তথায় ফ্লোরেন্স নগরে "Casa Guidi Windows" নামক মনোহর প্রাসাদে এলিজাবেথের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। কবিযুগলের দাম্পত্য জীবনের কাহিনী স্বপ্নবৎ মনোহারিণী। আমরা এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। ফ্লোরেন্স নগরে অবস্থানকালে এলিজাবেথ বেরেট ব্রাউনিং "অরোরা লি" (Aurora Leigh) নামক সুদীর্ঘ কাব্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "Casa Guidi Windows" নামক আর একটী কাব্য রচনা করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য ইটালীতে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত লইয়া শেষোক্ত কাব্য রচিত হয়। এলিজাবেথ ইটালীকে বড় ভালবাসিতেন। ইটালী স্বাধীনতা লাভ করে ইহা তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার শেষ কবিতাগুলি ইটালীর এই সময়ের ইতিহাসের সহিত সংসৃষ্ট। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথ বেরেট ব্রাউনিং ফ্লোরেন্স নগরে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্সবাসীগণ কৃতজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ একটী মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ফলক Casa Guidi Windows নামক অট্টালিকায় গ্রথিত করেন। তাহাতে ইটালীয় ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি অঙ্কিত ছিল।

"Here wrote and died
Elizabeth Barret Browning
who in her woman's heart united
The wisdom of the sage and the eloquence
of the poet;
With her golden verse linking Italy to
England.
Grateful Florence placed this memorial.
A. D. 1861.

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

দেশী ও বিলাতী জিনিস।

যখনই কোন দ্রব্য কিনিতে যাই—তখনই দোকানীদের মধ্যে—এটা দেশী, ওটা বিলাতী, এটা আসল জিনিস, ওটা নকল মাত্র—কথা লইয়া মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। দেশী ও বিলাতী আলু, মটর প্রভৃতির ভিন্নতা সকলেই জানেন। আজকাল দেশী সাবান, বিস্কুট, তালা প্রভৃতির সঙ্গে বিলাতী দ্রব্যের তুলনা করিয়া দোকানদারেরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে বলিয়া থাকে—আপনি বিলাতী ছাড়িয়া দেশী কিনিবেন কেন? আমি কিন্তু দেশী আলু, মটর পছন্দ না করিলেও দেশী বিস্কুট, দিয়াশলাই, কাপড়, শালের পক্ষপাতী। কেননা, দেশীয় চাষারা ভারতবর্ষের জমিতে লাঙ্গল চষিয়া, রোদে পুড়িতে পুড়িতে জল সেচিয়া যে সব আলু মটর সিম সবজী বুনিতেছে, তুলিতেছে ও বাজারে চালান দিতেছে—তাহাকে সকলে বিলাতী ভাবিলেও বিলাতী নয়—দেশীই। তবে, হয়ত, ইউরোপীয়েরা প্রথম ঐ সব দ্রব্য এদেশে চলিত করে বলিয়া সাধারণ লোকে উহাকে বিলাত হ'তে প্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে; অথবা আমাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা না থাকায় কোন ভাল দ্রব্য দেখিলেই তাহার বিলাতী নাম দি। কিন্তু তালা, কাপড়, ছুরি, সুতা প্রভৃতির বিষয় অন্য প্রকার। যে সব দ্রব্য বিলাতে প্রস্তুত হ'য়ে এদেশে আমদানী হয় তাহা অবশ্যই বিলাতী; যেমন ছুঁচ, সুতা, কাগজ, কলম, শিশি, ওষুধ, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য ছোট বড় প্রায় সমস্ত জিনিসই বিলাত হ'তে আমদানী হয়, এবং এই সকল দ্রব্যের দেশী ও বিলাতী প্রস্তুতের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিহিত আছে। ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশে যে আমদানী হয় তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু দেশের তয়েরী জিনিসের অপেক্ষা বিদেশজাত দ্রব্যের যে অধিক সম্মান ও কাট্‌তি দেখা যায়—এই মহা আক্ষেপের বিষয়।

সকল সভ্য দেশেরই দস্তুর এই যে, তাহারা নিজেদের আবশ্যকের অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্য সকল বিদেশে পাঠাইয়া দেয় ও উহা অতি সস্তা দামে বেচিয়া খরিদ্দার বাড়াইবার চেষ্টা পায়। এই কারণেই আজকাল আমাদের দেশে জাপানী ও সুইডিস দিয়াশলাই, জর্ম্মন ছুঁচ ও চিনি, মার্কিন কল প্রভৃতি অনেক প্রত্যহ দরকারী জিনিস এদেশে ইংরেজপ্রস্তুত দ্রব্য হইতেও সস্তায় বিক্রীত হইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য ক্রমে দেশী ও বিলাতী সমস্ত দ্রব্যের কাট্‌তি এদেশ থেকে উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষের বাজার নিজেদের হস্তগত করে। আর এ সব বিষয়ে আমাদের চোক না খুলিলে সময়ে তাদের সে উদ্দেশ্য যে সফল হতে পারে ইহাও অসম্ভব নয়। কারণ, সকল শিক্ষিত জাতিরাই স্বদেশীয় দ্রব্যকে অধিকতর উন্নত অথচ সুলভ প্রস্তুত করিয়া বিদেশজাত জিনিসকে নিজেদের বাজার থেকে তাড়াইয়া দেয়। স্বদেশ ও স্বদেশীর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকার দরুণ ক্রেতারা সহজে বিদেশী দ্রব্য কিনিতে চায় না। বিশেষ তাহারা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ভিন্ন দেশের আনদানী দ্রব্য অপেক্ষা তাদের স্বদেশের প্রস্তুত দ্রব্যই ভাল ও সস্তা—তখন তাদের দেশভক্তি ও স্বদেশীদের প্রতি ভালবাসা ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। এইরূপে প্রতি দেশ ও প্রতি জাতির কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে; তার সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীরাও পরিশ্রমী ও সম্পত্তিশালী হইয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশে সকলই উল্টা দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন দোকানে পা দিবা মাত্র—দোকানী সগর্ব্বে বলিয়া থাকে—মশায় দেখুন, এ আসল বিলাতী, ইহাতে বর্মিংহামের ছাপ বা ম্যাঞ্চেষ্টারের মার্কা আছে—না হয় সুইড কি মার্কিন নাম আছে, ইহা কখনই নেটিভ নয়—এ বড় সরেস জিনিস—দেশী লোকের সাধ্য কি যে এমন জিনিস বানায়! এরূপ উক্তি আমাকে বড়ই বিষণ্ণ করিয়া তুলে। অজ্ঞ দোকানী না বুঝিয়া কেবল লাভের আশায় ওরকম বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ প্রতি বাক্যেই এতদূর স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবমাননা প্রকাশ পায়, যে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মর্ম্মে আঘাত লাগে। আমার স্বদেশীয় লোকে যদি বিদেশীয় দ্রব্যের চেয়েও ভাল জিনিস তয়ের করিয়া বাজারে চলিত করিতে পারেন—ভারতবর্ষেও ইউরোপের ন্যায় সকল জিনিসই প্রস্তুত করিবার উপায় ও সুবিধা আছে, অথচ উহা সস্তায় হতে পারে—ইহা লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলে আমাদিগকে আর দেশী দ্রব্যের প্রতি এত অনাদর ও অশ্রদ্ধার কথা শুনিতে হবে না।

বোম্বায়ের সাড়ী, মুর্শিদাবাদের তসর গরদ, ঢাকায় মসলিন ও কাশ্মীরের শাল যে বিলাতী ঐ সব আমদানী কাপড়ের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা ক্রেতামাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু বহুদিন পরাধীন থাকিয়া আমরা এতদূর মনুষ্যত্ব ও ভাল মন্দ বিচারের শক্তি হারাইয়াছি যে দেশী দ্রব্য ভাল পাইলেও আমরা তার প্রকৃত আদর করি না। নামডাক জাঁকজমকের প্রতি আমাদের বেশী নজর। এই বিষয়ে আমার একটি গল্প মনে পড়িতেছে—

ঘটনাটি অমূলক নহে—সত্য। কোন একজন ভদ্রলোক তাঁর চাকরকে এক কৌটা দাঁতের মাজন কিনিতে আট আনা পয়সা দিলেন। তাঁর গৃহিণী বড় মিতব্যয়ী—মাজনের জন্য মিথ্যা আট আনা নষ্ট না করিয়া এক পয়সার খড়ি গুঁড়াইয়া তাহাতে কর্পূর মিশাইয়া বাবুর কাছে পাঠালেন। কর্ত্তার তাহা মনে ধরিল না, তিনি চাকরকে বকিতে লাগিলেন। সে বেচারী কি করিবে—উহা মাতাঠাকুরাণী দিয়াছেন। সে তাঁহারই কাছে উহা লইয়া গিয়া হাজির করিল ও বাবুর অসন্তোষের কথা জানাইল। কর্ত্রীঠাকুরাণী চতুরা—গল্পে ছাড়িবেন না। তিনি আট আনি রাখিয়া বাক্স থেকে এক পাউডারের কৌটা বাহির করিলেন, তাহাতে মাজন পূরিয়া এসেন্সের গন্ধ লাগালেন। তারপর কাগজে মুড়িয়া সুতা দিয়া বাঁধিলেন। আধ ঘণ্টা পরে চাকর উহা লইয়া গিয়া বাবুকে দিল। ডাক্তারখানার বিলাতী টুথপাউডার ভাবিয়া তিনি এবার সন্তুষ্ট হইলেন। এখানে বলা বাহুল্য অধিকাংশ টুথপাউডারই ঐ উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজকাল পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত ষ্টুয়ার্ট ট্যানারী কোম্পানীর জুতাখানায় (আমার বোধ হয় দেশীয় লোকের সহানুভূতি অভাবেই তিনি উহার ইংরাজী নাম দিতে বাধ্য হয়েছিলেন) নানা প্রকার জুতা ও বুট প্রস্তুত হইতেছে, উহা বিলাতের আমদানী জুতা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, বরং কিছু সস্তা। অথচ আমাদের ধনী সন্তানেরা ডসনের তয়েরী বুট কিনিয়া সাহেবের বাড়ীর জুতা বলিয়া আস্ফালন করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ লোকের বছরে এক জোড়া জুতা, ৪ জোড়া কাপড় কি এক থান লংক্লথ হলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু দেশীয় জিনিসপত্রের খরচ ও দেশীয় কারিকরদের উৎসাহ দিতে হলে ধনী লোকদের সহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক। দেশের যত রাজারাজড়া, জজ, উকীল, জমীদারেরা এক জোট হয়ে যদি এরূপ মনস্থ করেন যে তাঁহারা প্রাণান্তেও দেশী ছাড়িয়া বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না—বোম্বায়ের লংক্লথ, কি কাণপুরের টুইলক্লথ, কি ফরাসডাঙ্গার ধুতি ফেলিয়া ম্যানচেষ্টারের কাপড় লইবেন না, চীৎপুরের তালা অগ্রাহ্য করিয়া সেফিল্ডের লক কিনিবেন না—দেশের রেসমী কাপড় ছাড়িয়া বিলাতের সিল্ক কিনিবেন না—তাহলে আশা হয় ক্রমে সকল জিনিসই দেশে তয়ের হবে, দেশীয় কারিকর মিস্ত্রীগণের অধিকতর উন্নতি হবে—দেশের টাকা দেশেই রহিয়া যাবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউরোপে, বিশেষ ইংলণ্ডে সকলই আমাদের হতে বিভিন্ন। আমাদের যেমন আত্মাভিমান নাই বলিলেই হয়, তাদের কিন্তু এই আত্মমর্য্যাদা অত্যন্ত প্রবল; তাদের নিজের প্রস্তুত কোন দ্রব্য যে অন্যান্য দেশজাত দ্রব্য হতে হীন হবে, তাহা তারা সহ্য করিতে পারে না। বিলাতের জমি অত্যন্ত অনুর্ব্বর বলিয়া পূর্ব্বে আলু মটর প্রভৃতি কৃষিজাত অনেক দ্রব্য সেখানে বিদেশ থেকে আমদানী হত, ও ঐ সব জিনিস বিলাতী সামগ্রী অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল কিন্তু ইংরেজেরা যেমন পরস্পরের মধ্যে স্বজাতির অপমান সহিতে পারে না, সেইরূপ স্বদেশজাত দ্রব্যের নিন্দা শুনিতে চায় না। তাহারা প্রাণপণে খাটিয়া জমিতে উৎকৃষ্ট সার দিয়া এখন খুব সরেস তরিতরকারী ও ফল ইত্যাদি জন্মাইয়া থাকে। এখন ইংলণ্ডের কপি, কড়াইশুঁটি, আপেল, পেয়ার প্রভৃতি ইউরোপের সর্ব্বত্র অতি আদরে গৃহীত হয়। সে দেশের কোন দোকানে গেলে দোকানী আগ্রহের সঙ্গে স্বদেশী জিনিসগুলিকে আগে দেখায় ও সগর্ব্বে বলে—এইটা ইংলিস মেক, সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট, ইহার সঙ্গে কোন জিনিসের তুলনা হতে পারে না, যদি ভাল জিনিস চান ত এই টা লউন। বিদেশের জিনিস আপনার মনের মত হবে না, ও দুদিনে ভেঙ্গে যাবে বা ছিঁড়ে যাবে—ইত্যাদি। ইহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের সাধারণ মনের ভাব কত ভিন্ন। একটী কত উচ্চ, অন্যটি কত অবনত। এই ত গেল সামান্য দোকানদারের কথা; দুই দেশের বড় লোকদের মনেরও ঐরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়।

বিলাতে বড় বড় লোকেরা মিলিয়া এমন দুই তিনটি সম্প্রদায় করিয়াছিল, যাহা দ্বারা স্বদেশজাত শিল্পের রক্ষা ও বিদেশজাত শিল্পের অধিক আমদানী বন্ধ হয়। লর্ড ডিউক প্রভৃতির পুত্রকন্যার বিবাহের সময় যে যে দামী আসবাব পোষাক ও গহনার দরকার হয়, তাহা প্রায় সমস্তই ইংরেজ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেকে শুনিয়া

থাকিবেন প্রিন্সেস লুইসের (যুবরাজের বড় মেয়ে) বিবাহের সময় আমাদের যুবরাণী (প্রিন্সেস অব ওয়েলস্) সমস্ত কাপড় গহনা আসবাব ইত্যাদি সকল দ্রব্যই ইংরেজ কারিগর নির্ম্মিত কিনিয়াছিলেন; একটি জিনিসের জন্যও বিদেশে ফরমাস দেন নাই। ইংলণ্ড তাঁহার জন্মস্থান না হলেও এই ইংরেজ সম্মান রক্ষার জন্য বিলাতের লোকেরা তাঁকে প্রাণ খুলিয়া শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিল।

কিন্তু বলিতে কষ্ট হয়, আমাদের দেশায় ধনীরা সকল কাজকর্ম্ম উপলক্ষেই বিলাত হইতে অথবা বিলাতী দোকান থেকে দ্রব্যাদি আনাইয়া থাকেন। বড় মানুষদের বাড়ী সাজাইবার জন্য বিলাতী আসবাবের প্রয়োজন হয়—রাজকুমারদের বিবাহের সময় সাহেবের বাড়ী থেকে জুয়েলারী (জড়োয়া গহনা) আসে। আবার আজকাল শুনিতে পাই কলিকাতার হ্যামিল্টনের দোকান থেকে ইয়ারিং, নেক্‌লেস্ প্রভৃতি না হলে ধনী গৃহিণীদের মন উঠে না। বলা বেশির ভাগ, বিলাতী কারিগরেরা ভারতীয় স্যাকরা জহুরী প্রভৃতিকে এখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই। আজকালকার দেশীয় অলঙ্কারের কাছে ইয়ারিং ছাড়া অধিকাংশ বিলাতী গহনাই নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক মহিলা অতি পরিষ্কার সোণার চেন হার ও বেলোয়ারী ছাড়িয়া বিলাতী কদাকার নেকলেস ও ব্রেসলেট পরিয়া অধিক সন্তুষ্ট হন ও নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাবেন। ইহার কারণ, দেশী জিনিস মাত্রেই আমাদের অনাদর ও অশ্রদ্ধা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমরা বহুদিন পরাধীন থাকিয়া মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদা একেবারেই হারাইয়াছি। আমরা দিন দিন এক অসার, অগভীর, অচিন্তাশীল জাতিতে পরিণত হইতেছি। জাঁকজমক দেখিলে আমরা মাতিয়া উঠি, আড়ম্বর দেখিলে আমাদের তাক্ লাগিয়া যায়, সেই কারণেই দেশী কারিগরদের নির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের মনে ধরে না।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

বুঝিবে যেমন যার মন।

১

আমি কোন পূর্ব্ব জন্ম হ'তে
এনেছি কি অপরাধ বয়ে ?
আমি কি এসেছি এ জগতে
কারামুক্ত চোরখত লয়ে ?
আমারে যে চলিতে হইবে
সচকিত উৎকণ্ঠিত হয়ে ?

২

মাঝে মাঝে জানাইতে হবে
কোথা থাকি কি যে করি কাজ ?
স্থানান্তরে যেতে হলে পরে
সন্দিহান বান্ধবসমাজ
জানিয়া জানাইবে অনুমতি
তবেই পরিব পান্থসাজ ?

৩

এ সকল কিছু না করিব
কারেও করি না আমি ডর,
জন্মিয়াছি পবিত্র স্বাধীন
চলে যাব সত্যে করি ভর,
তবে নাকি মানব দুর্ব্বল
শ্রান্তি ভ্রান্তি তাই সহচর।

৪

গিরিপথ উঠিতে উঠিতে
আমি কভু বিশ্রামের তরে,
কিম্বা যবে কুজ্ঝটিকা আসে,
সম্মুখেতে দৃষ্টি নাহি সরে,
আলোকের প্রতীক্ষায় বসি,
নিরানন্দ আলস্যের ভরে
গাহি কভু অর্থহীন গান
হাসি আনি আপন অধরে,
ভাবিনাকো সে কালে আমায়
কোন জন কি যে মনে করে।

৫

আমূল হৃদয়খানি মোর
দেখে নিলে লাজ নাহি পাই,
ব্যস্ত নহি লুকাতে আমায়,
জানাতেও চেষ্টা কভু নাই,
আপনার লক্ষ্য পানে চেয়ে
আপনার পথে চলে যাই।

৬

কাল ছিনু উত্তরের পথে
পূরবে চলিনু কেন আজ
সে দিনের অশ্রুভরা চোখে
অশ্রু কেন করেনা বিরাজ
পথে পথে বলে যেতে হবে?
সে কথায় সকলেরই কাজ?

৭

আমিতো আসিনি' এ জগতে
মানবের লইতে বিচার
আপনার প্রতি আচরণ
বুঝায়ে বলিতে অনিবার
বুঝিবে যেমন যার মন
বেশী বোঝে সাধ্য আছে কার?

জানুয়ারি, ১৮৯১।

উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যাকথন।

ডেভিড তাঁহার একটী স্তোত্রে বলিয়াছেন,—"আমি তাড়াতাড়ি বশতঃ বলিয়া বসিয়াছি যে, সকল লোকই মিথ্যাবাদী।" উহা পড়িয়া একজন স্কটলণ্ডবাসী উত্তর করিয়াছিল—"বাস্তবিক, ডেভিড তুমি যদি এই প্রদেশে বাস করিতে তবে তাড়াতাড়ি কেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়াই এই কথা বলিতে পারিতে।" এই উত্তরটী সকল দেশের প্রতিই প্রযুজ্য। প্রত্যেক ব্যক্তি এক দিবসে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কত মিথ্যাকথা বলে, তাহা খেয়াল করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু সর্ব্বদা সেগুলি দেখিতে ও শুনিতে পাই বলিয়া আমরা তাহা চিন্তা করি না। অজ্ঞতাবশতঃ কোন একটা ঘটনাকে যে অসত্যভাবে বর্ণনা করা হয়, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না; কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহাকে মিথ্যাকথন বলা যায় না। লোকে বিনা উদ্দেশ্যে, নির্দ্দোষচিত্তে, সরলভাবে সত্যের যে অতিরঞ্জিত চিত্র প্রকাশ করে, আমরা তাহার কথাই বলিতেছি; এটী যেন মনুষ্য সমাজের একটী বদ্ধমূল অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন একজন চীনদেশবাসী তাহার সম্রাটকে চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া ব্যাখ্যা করে, তখন সে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনৃত বলিতেছে, তাহা নয়। তাহার দেশে সম্রাটকে উল্লেখ করিবার যে সামাজিক রীতি আছে, সে সেই রীতির অনুসরণ করিতেছে মাত্র। ইংরেজদিগের পত্র লিখিবার প্রণালীতেও এই উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যাভাষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ যাহার নিকট পত্র লিখিতেছে, তাহাকে হয়ত সে কখনও দেখে নাই। অথবা দেখিয়া থাকিলেও হয়ত তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করে; তথাপি পত্র লিখিবার কালে 'আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য' বলিয়া তাহার নাম সহি করিতে হইতেছে। বাস্তবিক ইহা দেখা যায় যে, দুই বন্ধু যখন বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের পরস্পরের প্রতি সম্বোধনগুলি অধিক মাত্রায় ভদ্রতাসূচক হইতেছে। যখন ভুলু এবং জগার পরস্পর মনোবাদ হয়, তখন ভুলু 'ভোলানাথ' ও জগা 'জগদীশ' নামে অভিহিত হইতে থাকে। এইরূপ যখন দুই বন্ধু পরস্পরকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া 'মহাশয়' সম্বোধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা ইতিমধ্যেই গোপনে আদালতের আশ্রয় গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছে।

যে সকল ঘটনার স্মৃতি মনোমধ্যে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত নাই, অসতর্কভাবে আমরা সেগুলি সর্ব্বদা যেরূপ অতিরঞ্জিত করিয়া থাকি, তাহাতেই আমাদের এই উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যাকথনের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কতক লোক আছেন যাঁহারা মনুষ্যের এই বিস্মৃতিপ্রবণতার সাহায্যে সমাজে যথেষ্ট যশোপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এক একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে সুন্দর সুন্দর গল্প ফাঁদিয়া বসেন, এবং মূল বিষয়টী ঠিক রাখিয়া তাহাতে স্বকপোলকল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনানিচয় সন্নিবেশিত করিয়া এবং স্বীয় প্রতিভার আলোকে তাহার এক এক অংশ উদ্ভাসিত করিয়া কেন্দ্রস্থিত সেই সত্যটীকে বিশেষরূপ চিত্তাকর্ষক

করিয়া তোলেন। গল্পটীর মাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা এক আধটুক্ কল্পনার সাহায্য লন বলিয়া কে তাঁহাদের সহিত ঝগড়া করিতে যায়? অবশ্য ঘটনার যাথার্থ্য অত্যন্ত প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যথার্থ ঘটনার ত অভাব নাই, এবং প্রায়ই তাহারা রসনার বিশেষ তৃপ্তিকর হয় না। সমাজে বাস করিতে হইলে সুনিপুণ পাচকের আবশ্যক; যেন সাধারণ ব্যঞ্জনগুলিকে মশলাদির সাহায্যে সে এরূপ সুন্দররূপে পাক করিয়া দিতে পারে যে, তদ্দ্বারা নয়ন, রসনা ও চিত্তের আনন্দ এবং তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু বেশী নৈপুণ্য দেখাইতে যাওয়াও আবার অনুচিত। অনেক পাচক আছে, যাহারা ব্যঞ্জনে কতকগুলি আস্ত মশলা ছড়াইয়া রাখে; তাহাতে হয় এই যে খাইতে বসিয়া আমরা কেবল সেই মশলাগুলিই দেখিতে পাই। এহেন পাচকসদৃশ এক শ্রেণীর গল্পী আছে, তাহাদের গল্পে চিত্ত-বিনোদনার্থ যে মিথ্যা কথার অবতারণা হয়, আমরা কেবল সেই মিথ্যা কথাগুলিই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। এরূপ গল্পে নীচমনা ব্যক্তিগণই কেবল হাসিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গল্পীকে জনসমাজে মূর্খ বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ, যখন কেহ কেবলমাত্র লোক হাসাইবার নিমিত্ত কোন স্পষ্ট মিথ্যা কথার অবতারণা করে, তখন আমরা বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারি না। কারণ উহা ইতর লোকের কার্য্য। যে প্রকৃত গল্পী হয়, সে কখন শ্রোতৃবর্গপ্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে না। সে সুচতুর শিল্পীর ন্যায় সুন্দর ও সহজভাবে গল্পটী বলিয়া যায়, এবং কেহ তাহার নামে স্পষ্ট মিথ্যা কথা আবিষ্কারের অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে না। তাহাকে আমরা দেশ, কাল, পাত্র পরিবর্ত্তন করিতে দেই। হয়ত সে একবার তাহার খুড়ার সম্বন্ধে গল্পটী বলিয়াছে; এখন যদি সে সেই গল্পটী আমাদের উপস্থিত আলাপের বিষয়ীভূত কোন ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করে, তবে আমরা তাহা সহজেই ক্ষমা করিয়া থাকি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, খুড়ার কথা বলিয়া যাহাদিগকে হাসাইয়াছে, এস্থলে যেন তাহারা উপস্থিত না থাকে। অতএব খুব বিচক্ষণ গল্পীকেও সাবধান হইতে হইবে। বাস্তবিক যে সকল কৌতুকাবহ ও রসিকতাপূর্ণ গল্প জনসাধারণে প্রচলিত আছে, সেগুলি সংখ্যায় অধিক নহে, প্রায় সকলেরই তাহা জানা আছে, এবং এইজন্য তাহারা সহজে হাস্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এরূপ একটী গল্প বলিয়া যখন কেহ সমগ্র সভামণ্ডপে হাস্যের তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া দেয়, একটী সাধারণ অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে স্বীয় প্রতিভা ও শিল্পনৈপুণ্যপ্রভাবে রসিকতা অথবা কল্পনাপরিশোভিত জ্যোতির্ম্ময় মণিতে পরিণত করিয়া তোলে,—তখন কি আমরা সেই কারুকরের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না?

এইরূপ মিথ্যাকথনের দ্বারা কথকের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয় না। কারণ সে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বলে না। তাহার আমোদজনক অতিরঞ্জনের দ্বারা আমাদের আনন্দ উৎপাদনের জন্যই সে ওরূপ বলিয়া থাকে। ইহাতে তাহার পরপ্রীতি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই প্রকাশ পায়। সে ত মিথ্যা ভিক্ষালিপি হস্তে লইয়া তোমার পকেটস্থ অর্থের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতেছে না,—অথবা নারদবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তুমি এবং তোমার বন্ধুর মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিতে সে ইচ্ছুক নহে, কিম্বা সাধারণ মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজের কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি তাহার মন নাই। যাহা সে ধরে, তাহাই সে আমাদের বিনোদনার্থ সুন্দর করিয়া তোলে। যদি ইহাতে বিরক্ত হও, তবে বালার্ককিরণ নদীতীরস্থ হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজিকে অভিনব উজ্জ্বলচ্ছটায় প্রোদ্ভাসিত করে বলিয়া সূর্য্যের উপরও বিরক্ত হইতে পার; অথবা বিশাল নগরীর ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যস্থ ক্ষুদ্রপথপার্শ্ববর্ত্তী আবর্জ্জনাময় কদর্য্য স্থানগুলি ঘনান্ধকারে আবৃত রাখিয়া, দর্শকের সম্মুখে একটী মনোহর চিত্র ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে, শশধর তাহার স্নিগ্ধনির্ম্মল রজতশুভ্র কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক, কেবল নগরীর সুদৃশ্য স্থানগুলি আলোকিত করে বলিয়া, চন্দ্রের উপরও বিরক্ত হইতে পার। বস্তুতঃ, সামাজিক কথোপকথন যদি কেবল সত্যবর্ণনেই নিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের সহবাসে কি সুখই পাইতাম! তাহা হইলে অভিধানপ্রণেতাগণই বোধ হয় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সহচর হইতেন!

আর একপ্রকার উদ্দেশ্যবিহীন অসত্যকথন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল সত্য ঘটনা আমাদের মনে আছে, সেগুলি সুকৌশলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়া

শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জনের ক্ষমতা যাহাদের নাই, কোন একটা বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিরাকরণের জন্য স্মৃতিশক্তির তাড়না না করিয়া, অতর্কিতভাবে এবং আন্দাজে কথা বলিতে তাহারা ভালবাসে। তুমি হয়ত এরূপ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে "মহাশয় বর্দ্ধমান গিয়াছেন বোধ হয়?" সে উত্তর করিবে "অবশ্যই; দশবারবার গিয়াছি।" সে যে ঠিক্ দশ কি দ্বাদশবার বর্দ্ধমান গিয়াছে, এরূপ ধারণা তোমার মনে হউক, ইহা অবশ্য তাহার অভিপ্রেত নহে, কারণ প্রকৃতপক্ষে সে হয়ত পাঁচ ছয় বারের অধিক বর্দ্ধমান যায় নাই। কোন একটী কথা ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে স্মৃতিশক্তির একটু পরিচালনা আবশ্যক। কথাটী যদি গুরুতর অথবা বিশেষ আবশ্যকীয় না হয় তবে উত্তরদাতা এই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চাহে না। আন্দাজে যাহা হয় একটা মোটামুটী উত্তর দিয়া বসে।

"তুমি অমুক নাটকে গিরিশ বাবুর অভিনয় দেখেছ?"

"দেখেছি বই কি?"

"চমৎকার হয়েছিল, নয়?"

"তা' আর ব'ল্‌তে।"

প্রকৃতপক্ষে হয়ত উত্তরদাতা অন্য এক বিখ্যাত অভিনেতাকে ঐ নাটকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু তিনি গিরিশ বাবুকে অন্য নাটকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, এজন্য বক্ষ্যমাণ নাটকটী সেই কিনা তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া স্মৃতিশক্তিকে তাড়না করিতে ইচ্ছুক না হইয়া তিনি উক্ত উত্তর প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন।

সরোজ বলিল "আমার মেয়ে আর তোমার মেয়েটী ঠিক্ এক বয়সী। এই গত আষাঢ়ে সে দশ বছরে পড়েছে।"

কমল অতর্কিতভাবে উত্তর করিল "তাইত! কি সুন্দর মেয়েটী তোমার!" বাস্তবিক কিন্তু কমলের মেয়ের বয়স বার বৎসর।

"দিব্য স্থানটী!" এক চিত্রকরের বন্ধু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। চিত্রকর হয়ত উত্তর করিল "তা বই কি! এখানে ব'সে ব'সে আমি সমস্ত স্থানটীর একটী চিত্র আঁকিয়াছি।"

বস্তুতঃ চিত্রকর ঐস্থানে বসিয়া বসিয়া হয়ত স্থানটীর একটী মোটামুটী নক্সা মাত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, পরে বাড়ী আসিয়া তদ্দৃষ্টে একটী সম্পূর্ণ চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। আধ ঘণ্টা বসিয়া একজন চিত্রবিদ্যানভিজ্ঞের নিকট কি প্রকারে উহা সম্ভব, তাহা কি তিনি বুঝাইতে যাইবেন? এইরূপে সময় নষ্ট না করিয়া, সম্পূর্ণ চিত্রটীই বাহিরে অঙ্কিত করা হইয়াছে, একথা বলায় কাহারওত কোন ক্ষতি হইতেছে না। ঈদৃশ মানসিকভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অতর্কিতভাবিগণ অসদিচ্ছাপ্রণোদিত না হইয়াও মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি প্রাণ গেলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁহারাই আবার অভ্যাস ও আলস্যবশতঃ এমন এক একটী কথা বলেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য হইতে অনেক দূরে। কথাটী যে মিথ্যা হইতেছে, বা তদ্দ্বারা যে শ্রোতার মনে তাঁহার সত্যবাদিতাসম্বন্ধে দ্বিধা জন্মিতেছে ইহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

আরও একপ্রকার অসত্যকথন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কেহ কোন বিষয়ের গুরুত্ব বা সত্যতা উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়া তোমার মনে তৎসম্বন্ধে একটী উজ্জ্বল ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টিত হয়, তখন প্রায়ই অনিচ্ছাসত্ত্বে বা অজ্ঞাতসারে সে অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হয়। এই দোষ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতিতে বেশী প্রবল। তাহারা হয়ত ভাবে যে পুরুষ জাতি অত্যন্ত জড়প্রকৃতি, সহজে কোন বিষয় ধারণা করিতে তাহারা সক্ষম নহে, অতএব তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বর্ণনাটীতে একটু বেশী মাত্রায় আবেগ প্রদান বা রং ফলান দরকার।

গৃহকর্ত্রী খুব তেজের সহিত বলিয়া বসিলেন "আমি জানি ইঁদুরে বাড়ীটা ভরিয়া গিয়াছে—চাকরগুলি সর্ব্বদা ইঁদুরের কথা বলিয়া আমার কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছে।" ব্যাপারটী এই:—ঝি একদিনে দুবার রান্নাঘরে ইঁদুর দেখিয়াছে। কিন্তু কর্ত্রী যদি ঠিক্ ঐ কথাটীই বলিতেন, তবে কি গৃহস্বামীর প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি, বর্ত্তুলবপু, এবং সংবাদপত্রনিবদ্ধ দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইত? কখনই না।

গৃহকর্ত্তা স্ত্রীকে কোন বন্ধুর বাটী নিমন্ত্রণে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। কর্ত্রী উত্তর করিলেন "নিমন্ত্রণে যাব বই কি? আমার পরিবার যদি একখানিও অলঙ্কার থাকে!"

শেষে কিন্তু নিমন্ত্রণে যাওয়া হয়, এবং পাঠক মনে করিবেন না যে তিনি একবারে নিরাভরণা হইয়া গিয়াছেন। ওরূপ না বলিলে তাঁহার অলঙ্কারের বাক্স পূর্ণ হইবে কি প্রকারে? এক ব্যক্তির সহিত আমাদের পরিচয় যতই গাঢ় হয়, ততই আমরা বুঝিতে পারি যে তাহার কথা হইতে শতকরা কতটা বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা সর্ব্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কথা বলিয়া থাকেন, এবং প্রকৃত ঘটনার সহিত উচ্চারিত বাক্যটীর যাহাতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হন। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকও মধ্যে মধ্যে অতিরঞ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ঈদৃশ এক ব্যক্তি অপর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি দিবারাত্রি কেবলই অতিরঞ্জিত করিয়া কথা কও।" বলা বাহুল্য যে এই কথাই অজ্ঞাতসারে তাঁহার অতিরঞ্জনের অভ্যাস প্রকটিত করিতেছে।

বস্তুতঃ, এরূপ উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যাকথন হইতে অতি সতর্ক ব্যক্তিও মুক্ত নহে। সমাজে ইহা চল হইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে যদিও কেহ এই অভ্যাস দূর করিতে পারে, তথাপি সেরূপ চেষ্টার কতদূর আবশ্যকতা আছে তাহা বিবেচ্য। কেহ এরূপ চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ একটী অনাবশ্যক ধর্ম্ম প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে সে তাহার সমস্ত জীবনটাকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবে।*

---

* একটি ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মালদহ।

সুমিষ্ট আম্রের জন্য মালদহ জেলার নাম সর্ব্বত্র বিশ্রুত। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হৃদয়ে ধারণ করায় মালদহ ঐতিহাসিক সমাজের আদরণীয়। মালদহ জেলার পুরাতন ও নূতন কয়েকটী কথা বলিবার চেষ্টা করিব, তবে কথাগুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা থাকিবে না।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতি প্রাচীন নগর। এখন উহার নাম পাণ্ডুয়া। উহা জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নবাগত সাঁওতালদিগের যত্নে উহার কিয়দংশ পরিষ্কৃত হইয়াছে। মুসলমানদের ভারতবিজয়ের পূর্ব্বে নবধর্ম্মোৎসাহী কতকগুলি মুসলমান প্রচারক ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালার সেন রাজগণের সভায় দর্শন দিয়াছিলেন। সেখ শুভোদয় নামক গ্রন্থের লেখানুসারে বোধ হয়, উঁহাদের কেহ কেহ পাণ্ডুয়ায় ভূমিসম্পত্তিলাভও করিয়াছিলেন। পাঠান রাজগণও মুসলমান সাধুদিগকে ভূমি দান করিতেন। পাণ্ডুয়ায় এইরূপ দুইজন ভূমিপ্রাপ্ত সাধুর সমাধি আছে। মোগল রাজত্বকালে এই সম্পত্তির সম্বন্ধে তদন্ত হয়। সম্পত্তির তৎকালীন অধিকারিগণ উহা যে সেন রাজগণের প্রদত্ত ইহা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল। এদেশের মুসলমানেরা পাণ্ডুয়াকে পবিত্র মনে করে। যে জমিদার ফকিরদের জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক তিনি অতিথি সেবা করিয়া থাকেন। পাণ্ডুয়ার জঙ্গলে কখন কখন সাঁওতালেরা প্রাচীন মুদ্রা ও প্রাচীনকালের নানাবস্তু পাইয়া থাকে। ভীরুতা প্রযুক্ত উহা লুকাইয়া ফেলে অথবা যাহাকে ভালবাসে তাহাকে দেখাইয়া থাকে।

পুরাণের নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে পুণ্ড্র নামক রাজপুত্র হইতে পুণ্ড্রদেশের নাম হইয়াছিল। পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। এদেশের পূর্ব্বে কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না। এদেশের পূর্ব্বনিবাসিগণও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল না। আর্য্যবিজয়ের সময় হইতে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতা এ রাজ্যে প্রবেশ করে। এ রাজ্যের আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার দীর্ঘকাল অনার্য্যসংস্রবহেতু দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। মনুর মতে পুণ্ড্রক্ষত্রিয়েরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। পুণ্ড্রক্ষত্রিয়েরা যে কোথায় গেল তাহা জানা যায় না। এখনকার পুণ্ড্র অর্থাৎ পুঁড়ো জাতিকে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। উহারা একটী মূল অনার্য্যজাতি। পুঁড়োজাতির প্রধান বাসস্থান মালদহ জেলা। রামায়ণে যে কোশকারদিগের দেশের উল্লেখ আছে মালদহ ও রাজসাহী সেই দেশ। সময়ের পরিবর্ত্তনে পুণ্ড্রজাতি আপনাদের বিশেষত্ব হারাইতে বসিয়াছে। না বুঝিয়া আপনাদিগকে হিন্দুয়ানীর অনুষ্ঠানজালে জড়িত করিতেছে।

গৌড় অতি প্রসিদ্ধ নগর। গৌড় প্রতিষ্ঠার সময় নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন উহা খৃষ্টাব্দের ৭৩০ অব্দ পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। কেহ কেহ

বলেন পাল রাজগণের রাজত্ব-কালে গৌড় জন্ম লাভ করে। তাঁহাদের কথার প্রমাণ কি তাহা জানি না। পাল রাজগণের রাজত্ব প্রথমে বিহারে ও সেন রাজগণের রাজত্ব প্রথমে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থাপিত হয়। পাল ও সেন রাজগণ, গৌড় অধিকার করিয়া আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিতে গৌরব মনে করিতেন। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পালবংশের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই গৌড় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুরনদী গঙ্গা গৌড়ের প্রান্তবাহিনী ছিলেন। গঙ্গা নদীর গতি মালদহ জেলায় বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে গৌড় নগরের অবস্থানও বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাল গৌড় ও মুসলমান গৌড় এক স্থানে ছিল না। যদি সাঁওতালেরা গৌড় পরিষ্কার না করিত তবে এত দিন গৌড় গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন থাকিত।

গৌড় মহামারীতে আক্রান্ত হইলে লোকে প্রাণভয়ে নানা দিকে পলাইয়া যায়। দীর্ঘ কাল লোকে মনে করিত গৌড়ের পথে ভূতবালকেরা কন্দুক ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, ভূত রমণীগণ বৃক্ষ শাখায় হিন্দোল ক্রীড়া করে এবং ভূত যুবকেরা অনবরত বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত থাকে। এখনও শুনা যায় লক্ষ লক্ষ সেনা, গৌড়ের ময়দানে রাত্রিকালে সমর ক্রীড়া করিয়া থাকে। গৌড়ের প্রোথিত ধন পাইয়া এ জেলার অনেক দুঃস্থ লোক অকস্মাৎ ধনী হইয়াছে। ধনের লোভে কতলোক গৌড়ের নানা স্থান খুঁদিয়া বিফলমনোরথও হইয়াছে। এইরূপ ধনার্থিদিগের উৎপাতে অনেক সুন্দর সুন্দর সমাধিস্থান নষ্ট হইয়াছে। সমাধিস্থাননিহিত মনুষ্যকঙ্কালগুলি সচরাচর দীর্ঘতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রকৃত মালদহ এখন পুরাতন মালদহ নামে অভিহিত। সদর ষ্টেসন ইংরেজবাজার এখন মালদহ নাম ধারণ করিতেছে। মালদহ নগর কোন্ সময়ে স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় না। সম্রাট্ ফিরোজতোগলক গৌড়ের পাঠান রাজাদের বিরুদ্ধে আসিয়া পাণ্ডুয়ার প্রতি অভিযান করেন। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করেন, তাহা ফিরোজপুর নাম ধারণ করে। উহা মালদহ নগরের উত্তরাংশ। বোধ হয় এই সময় হইতে মালদহের উৎপত্তি হয়। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডুয়ার নিকট কোন নদী ছিল না। রাজধানীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য মহানন্দা ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থানে একটী নগর স্থাপিত হয়, তাহাই এখনকার মালদহ। ধনবত্তাহেতু মালদহ নাম হইয়াছে। কোন কোন উৎকট ঐতিহাসিক, মালদহকে মলদ রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। রামায়ণোক্ত মলদ রাজ্য সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল। মালদহ প্রথমতঃ মুসলমান-প্রধান নগর ছিল। গৌড় মহামারীতে বিধ্বস্ত হইলে বহুসংখ্যক ধনশালী লোক, মালদহে আসিয়া বাস করে। বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় মালদহ বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ধর্ম্মান্দোলন নবদ্বীপে আরব্ধ হয় তাহা মালদহ নগরকে স্পর্শ করিয়াছিল। কথিত আছে, নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র মালদহে আগমন করেন। "সজল জলদজাল, তাঁহার মধুর সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া আকাশমার্গে স্তম্ভিত হইয়া অবস্থান করিয়াছিল।" মালদহের লোক এই ধর্ম্মবীরের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল। মালদহের লোক, পূর্ব্বে যে শাক্ত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন সে মালদহ নাই। বৎসর বৎসর মালদহের আয়তন ও অধিবাসী কমিয়া যাইতেছে। আর মালদহে সে বাণিজ্যকোলাহল শ্রুত হয় না। মালদহের প্রান্তবাহিনী মহানন্দা আর বাণিজ্যতরীতে সমাচ্ছন্ন থাকে না। ইহার সেই দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ অধিবাসিগণ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

শুনা যায় মালদহে বাইশটী বিদেশীয় জাতির বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরেজেরা অপরাপর ইয়ুরোপীয় জাতির ঈর্ষ্যায় পীড়িত হইয়া মালদহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহানন্দার পশ্চিম তীরে বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন। এখন ইহার নাম ইংলিশ বাজার বা ইংরেজবাজার। ইংরেজবাজার, মোকদমপুর, কুতুবপুর প্রভৃতি কয়েকটী বিভিন্ন লোকালয়ের সাধারণ নাম এখন মালদহ। মালদহ নগরে বিস্তর কালীস্থান আছে। ইংরেজ বাজারের দক্ষিণভাগে বুড়া কালীর মন্দির। বুড়াকালী এই সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুড়াকালীর মন্দির, জঙ্গলের মধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ কোম্পানীর রেসমের কুঠি স্থাপিত হইলে শ্রমজীবিগণ

দলে দলে আসিয়া কুঠির নিকটে বাস করিতে থাকে, তাহাতে ইংরেজবাজার সহরের উৎপত্তি হয়। রেসমের কুঠির রক্ষার জন্য নদীসন্নিহিত প্রাচীরের উপরিভাগে কতকগুলি কামান স্থাপিত হইয়াছিল, এখন তৎসমুদায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। রেসমের কুঠিতে এখন সরকারি আফিসগুলির কার্য্য হইতেছে।

বিদেশীয় পথিকের অবস্থান জন্য এখানে কোন পান্থশালা নাই। দোকানেও আশ্রয় মেলে না। এখানকার দেশীয় ও বিদেশীয়দিগের আতিথেয়তা নিতান্ত অল্প। যে সময় ছোটলাট সাহেব এই নগরে আগমন করেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থ বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হয়। উহা বৃথা কার্য্যে ব্যয় না করিয়া পান্থশালা নির্ম্মাণে ব্যয় করিলে লোকের বিস্তর উপকার সাধিত হয়। রথবাড়ী, পান্থশালা নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান।

ভিন্ন জেলা হইতে এ জেলায় আগমন নিতান্ত কষ্টকর। যাঁহারা কলিকাতা হইতে এখানে আসিতে চান, তাঁহাদিগকে বাষ্পীয় শকটে রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়া সুবৃহৎ গঙ্গা নদী পার হইতে হয়। গঙ্গা পার হইয়া গোযানে মালদহে আসিতে হয়। পথ ভাল নয়। গঙ্গা পার হওয়ার সময় বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। হাকিম ও আমলাবর্গ, পরমসুখে পার হইতে পারেন, কিন্তু অন্য ভদ্রলোকের সে সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ষাকালে কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে হয়। বৎসর বৎসর গুজরওয়ালারা বর্ষাকালে একখান অদ্ভুত ষ্টীমার রাজমহল হইতে মালদহে পাঠাইয়া থাকে, এ বৎসর তাহাও পাঠায় নাই। অদ্য ২১শে জুলাই গঙ্গাজলে চারিদিক্ ডুবিয়া গিয়াছে। উহারা ষ্টীমার যোগাইবার চুক্তিতে বৎসরে ৬০০ ছয় শত টাকা পাইয়া থাকে। জেলার কর্ত্তা এখন বাঙ্গালী, তিনি উহাদিগকে অপসারিত করিয়া যদি উপযুক্ততর লোকের হস্তে রাজমহলের গুজরের ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে লোকের কষ্ট দূর হইতে পারে। মালদহে গতাগতি যে নিতান্ত কষ্টকর, তাহা মহামান্য লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও এবার স্বীকার করিয়াছেন।

শিক্ষা বিষয়ে মালদহ নিতান্ত পশ্চাদ্‌গামী। এ জেলায় তিনটী মাত্র এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। ইংরেজী শিক্ষায় লোকের আগ্রহ জন্মে নাই। ইংরেজী না শিখিলে জীবনধারণ বৃথা হয় বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা ইহাদের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। এ জেলার লোক এখনও অভাবের তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া বিদেশে বাহির হইতে শিখে নাই।

এ জেলার উত্তরপূর্ব্ব অংশে কোচ ও পলিয় জাতির বাস। আকৃতিতে উহারা চীনদেশীয় লোকের সদৃশ। উহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল না, এখন হিন্দু হইয়াছে। কৃষিকার্য্য দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিগণ ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন।

সমুদায় জেলার মধ্যে একটীও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও গণনীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নাই। পূর্ব্বে এমন অবস্থা ছিল না। ভক্তিশতকপ্রণেতা রামচন্দ্র কবিভারতী, গৌড়ের নিকটবর্ত্তী বীরাবতীনগরনিবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মালদহ জেলা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী মাননীয় বোল্টন সাহেব সে দিন মালদহ জেলায় সংস্কৃত আলোচনার এতাদৃশ অভাব শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃতের ন্যায় আরবী ও পারসীর শিক্ষার্থ কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই।

মালদহ জেলার পূর্ব্বাংশের নাম বরেন্দ্র। দেশীয় লোকে উহাকে বড়িন্দা বলিয়া থাকে। কথিত আছে, শূরবংশীয় বরেন্দ্র নামক ব্যক্তির নামানুসারে বরেন্দ্র ভূমির নাম হইয়াছে। বরেন্দ্র ভূমি পূর্ব্বে ধনেজনে পরিপূর্ণ ছিল। বহুল বৃহৎ পুষ্করিণী ও ইষ্টকস্তূপ ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। বরেন্দ্রের ভূমি উর্ব্বরা। এখন উহা জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সুন্দর প্রদেশটী কেন নির্ম্মনুষ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায় না। অস্বাস্থ্যই কি ইহার একমাত্র কারণ? বরেন্দ্রের প্রান্ত দিয়া রাণাঘাট-কাটিহার রেলওয়ে নির্ম্মিত হওয়ার কথা হইতেছে। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে বরেন্দ্র ভূমির বিস্তর উপকার সাধিত হইবে।

মাধাইপুর ও মোড়গাঁ, বরেন্দ্রের অন্তর্গত দুইটী গ্রাম, এখন উহা ভগ্নদশায় পতিত। মাধাইপুরের কালী, এ জেলার হিন্দুগণের অত্যন্ত সম্মানের পাত্রী। কালীর প্রাচীন মন্দির পতিত হইয়াছে, একটী ক্ষুদ্র মন্দির তৎস্থলে

নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে কতকগুলি বৌদ্ধ দেব-দেবীরও মূর্ত্তি আছে। হিন্দু পুরোহিতগণ উহা আপনাদের দেব শ্রেণীতে প্রবেশিত করাইয়া লইয়াছেন। মোড়গাঁ বা মুকুট গ্রামে পূর্ব্বে অনেক শিল্পীর বাস ছিল। কথিত আছে এই গ্রামের শিল্পিগণের সাহায্যে গৌড়ের অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাধাইপুরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। এই নগর হইতে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন অনেক দূরবর্ত্তী ছিল না। এ দেশের প্রাচীন লোকেরা শুনিয়াছে যে, মাধাইপুরের নিকটেই সমুদ্র ছিল। এই কিংবদন্তীতে মাধাইপুর ও মোড়গাঁর বহু প্রাচীনত্ব সূচিত হইতেছে।

দেশের পশ্চিমাংশ, গঙ্গাগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। গঙ্গানদী, গৌড়ের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া কোন সময়ে প্রবাহিত হইত। গঙ্গার একটী শাখা তুলসী গঙ্গা, গৌড় নগরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইত। গঙ্গা-প্লাবন হইতে নগর রক্ষা করার জন্য নগরের চারি পার্শ্বে ও ভিতরে বহুসংখ্যক সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এমন কৌশল ছিল যে, বর্ষাকালে গঙ্গার জল দ্বারা গৌড়ের সঞ্চিত আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইতে পারিত। গৌড় হইতে গঙ্গার অপসরণ, গৌড়ের মহামারীর একমাত্র কারণ। মহামারী কোন্ প্রকৃতির ছিল,তাহা জানা যায় না। লোকে গল্প করে, আট নয় দিনের মধ্যেই অসংখ্য লোক মরিয়া যায়। পথে চলিতে চলিতে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। সুস্থব্যক্তি নিদ্রা গেলে উঠিত না। বাটীশুদ্ধ লোক মরিয়া পড়িয়া থাকিত। সাহসুজার সময় একবার গৌড়কে সজীব করার চেষ্টা হইয়াছিল। সাহসুজার পলায়নের পর সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। কৃষ্ণজীবন নামক কবি, সাসুজার এই পলায়ন ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন।

মালদহ জেলার পশ্চিমাংশ, বর্ষাকালে গঙ্গা-সলিলে প্লাবিত হইয়া যায়। এ অংশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। নাগর ধানুক চাই, এ অংশের প্রধান অধিবাসী। নাগর ধানুক চাই দ্রাবিড়ীয় অনার্য্যজাতির অন্তর্গত। ইহাদের ভাষা হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব্বে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের লোক, রাজমহল পর্য্যন্ত রেলপথে আসিয়া গঙ্গা উত্তরণপূর্ব্বক পুরাতন মালদহ পাণ্ডুয়া ও গাজোল দিয়া দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে গমনাগমন করিত। এই পথের পার্শ্বে প্রসিদ্ধ মহীপাল দীঘী অবস্থিত। এখন যদিও এই পথ জঙ্গল মধ্য দিয়া গিয়াছে, তথাপি কোন সময়ে এই জঙ্গলভূমি ধনজনে পরিপূর্ণ ছিল। এই প্রদেশটী পালরাজগণের সময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। গাজোল এই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে একটী থানা, হাঁসপাতাল ও ডাকঘর আছে। এখানকার কালীর পুরোহিত হাড়ীজাতি। গাজোলে খাটে শুইলে কালী অসন্তুষ্ট হন লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এই অপরাধে নাকি কাহারও কাহারও মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া, মৃত্যু ঘটাইয়াছিল।

পূর্ব্বে এ জেলায় বন্য জন্তুর বিস্তর উপদ্রব ছিল। এখন সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া জাতি জঙ্গল পরিষ্কার করায় পূর্ব্বের ন্যায় উপদ্রব নাই। গাজোল ও গোমস্তাপুর মৃগয়ার প্রশস্ত স্থান। শিকারের জন্য মধ্যে মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারিবর্গের আগমন হইয়া থাকে। স্বর্গীয় ডোমনচন্দ্র চৌধুরী, এ জেলার মধ্যে অদ্বিতীয় শিকারী ছিলেন। রাজরাজেশ্বরীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা, যখন মৃগয়ার্থ এ জেলায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন ডোমনবাবু, তাঁহার উপযুক্ত মৃগয়া-সঙ্গী হইয়াছিলেন।

গঙ্গা নদীর একটী শাখা, পুরাতন মালদহের সমীপে মহানন্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই শাখার নাম কালিন্দী। কালিন্দীর সম্মিলনে মহানন্দার জল অতি স্বাস্থ্যকর হইয়াছিল। মালদহ হইতে দার্জিলিংএর মধ্যে মালদহের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল না। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ইহার মনোহর জলবায়ুতে মুগ্ধ হইয়া এখানে আপনার কার্য্যালয় স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন। এখন কালিন্দীর মুখ বালুকাপূর্ণ হওয়ায়, মালদহের স্বাস্থ্যকারিতা লোপ পাইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের ঘৃত, ময়দা, ডালকলায়ও মালদহে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট কি একবার কালিন্দীর মুখ কাটাইবার চেষ্টা করিবেন না?

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

জাপান।

৬৬০খৃঃ পূঃ অব্দে পশ্চিম হইতে বর্ত্তমান জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষগণ জাপান আক্রমণ করে। কোথা হইতে তাহারা আসিয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই; তবে কোন গ্রীষ্মপ্রধান স্থান হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং গৃহ ও পোষাকাদিতে তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহের প্রায় চারিদিকই খোলা, পোষাকও নিতান্ত শিথিল। প্রথমতঃ তাহারা দক্ষিণপশ্চিমদিকস্থ আদিম-অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। সর্ব্বপ্রথম সম্রাট 'জিম্মো' জাপানের মধ্যভাগে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। জিম্মো হইতে আজ পর্য্যন্ত একই বংশ জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। জগতের ইতিহাসে কোথাও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। জিম্মো ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আদিমনিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া ক্রমে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। জাপানী যদিও শৌর্য্যবীর্য্য ও সভ্যতায় আদিমনিবাসী হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, তথাপি আইনো নামক জাতির সহিত বহু শতাব্দী যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। আচার, রীতিনীতি, পোষাক সকল বিষয়ে বিভিন্ন আইনো জাতি আজও জাপানে উত্তরদিকস্থ হোক্কাইদ নামক দ্বীপে বাস করিতেছে।

২০০খৃঃ অব্দে শক্রসহ যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সম্রাটের মৃত্যু হইলে সাম্রাজ্ঞী জিংগু কোরিয়ানদিগকে শক্রদের সাহায্যকারী ভাবিয়া কোরিয়া দেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কোরিয়াবাসী প্রতি বৎসর প্রচুর দ্রব্যাদি করস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হয়। কোরিয়ানেরা পরাজিত হইলেও তাহাদের দ্বারা জাপানী ভাষা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শিল্পাদি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় হইতেই চীন সাহিত্য, কারুকার্য্য, শিল্প, কনফিউসাচের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জাপানে চীনা অক্ষর প্রচলিত হইল। প্রাচীন সভ্য চীনদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্মও শিল্পাদির সংস্রবে আসিয়া জাপান অনেক উন্নতিলাভ করিল। জাপানীদের প্রাচীন ধর্ম্ম সিন্তো ধর্ম্ম নামেরই উপযুক্ত নহে; এখনও জাপানে সিন্তো ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। চীনদের সঙ্গে ইহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক খুব কমই ছিল; সবই কোরিয়ানদের মধ্য দিয়া। বৌদ্ধধর্ম্মও চীন হইতে কোরিয়া, তৎপর কোরিয়া হইতে জাপানে আসিয়াছে।

দশম শতাব্দীতে একজন মহিলা লেখিকা অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করেন! আজও তাঁহার গ্রন্থ সবিশেষ আদৃত ও তাঁহার নাম সর্ব্বজনপরিচিত। এই সময় 'ফুজিওয়ারা' মন্ত্রী-পরিবার অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সম্রাট্ নামে সিংহাসনারূঢ় ছিল; যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই এক ক্ষমতাপন্ন সম্রাট্ নিজের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন। তৎপর তাইরা ও মিনামত নামক দুই ক্ষমতাশালী পরিবার প্রাধান্যলাভের জন্য পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ 'কিওমরি তাইরা' প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সকল মিনামতদিগকে রাজকার্য্যচ্যুত করিল, এমন কি সম্রাট্ ও প্রজার উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। ১১৮৫ খৃঃ অঃ 'ইওরিতমো মিনামত' শক্তিসঞ্চয় করিয়া তাইরা-পরিবারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, অনেক নির্দ্দয়তার পরিচায়ক যুদ্ধ ঘটে, প্রায় সমস্ত তাইরা পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি ইয়াকোহামার নিকটস্থ কামাকুরাতে কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করতঃ নাম মাত্র সম্রাটের অস্তিত্ব রাখিলেন। ৩৬ বৎসর পর উক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল; ভৃত্য 'হোজো' প্রভুদের স্থান অধিকার করিল; ১৩৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত উক্ত পরিবারের হস্তে সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা ন্যস্ত রহিল। ইহাদের শাসন সময়ে একদল চীনবাসী জাপানদেশ আক্রমণ করিল, অনেক যুদ্ধ হইল, চীনদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া জাপানের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক দৈবশক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করিল। প্রবল ঝড়ে সমস্ত চীন-সৈন্য ধ্বংস হইয়া গেল; জাপান রক্ষা পাইল। ইহাদের শাসন সময়ে প্রজা পরম শান্তিতে বাস করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছে। এই সময়েই 'কামাকুরা'র প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেবের বর্ত্তমান প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। যোগাসনে উপবিষ্ট শান্তমূর্ত্তির উচ্চতা ৪৯ ফীট ৭ ইঞ্চ, পরিধি ৯৭ ফীট ২½ ইঞ্চ; চক্ষু দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ফীট; ইহা হইতেই প্রতিমূর্ত্তির বৃহত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য 'নারা' নামক স্থানে ইহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, তবে এরূপ প্রশান্ত মূর্ত্তি নহে। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজের মত না দিয়া ভাবুক বিদেশী ভ্রমণকারীদের মত নিম্নে দিতেছি; "The Dai-butsu or Great Buddha, stands alone among Japa-

nese works of art. No other gives such an impression of majesty, or so truly symbolises the central idea of Buddhism—the intellectual calm which comes of perfected knowledge and the subjugation of all passion."

"The Kamakura Buddha.....in whose face all that is grand and noble lies sleeping, the living representation of Nirvana."

১৩৩৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ 'গদাইগ' কতিপয় স্বদেশহিতৈষী লোকের সাহায্যে কামাকুরার হোজো পরিবার ধ্বংস করিয়া স্বকীয় ক্ষমতা অর্জ্জন করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই 'আসিকাগা' বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ পরিবারস্থ অন্য একজনকে সিংহাসনে স্থাপন করে। জাপানে আদিমকাল হইতে একই পরিবার সিংহাসনে অবস্থিত। কেহ সম্রাটকে পরাস্ত করিলেও তৎপদে অন্ততঃ রাজপরিবারস্থ এক বালককে সাক্ষীগোপাল রূপে সিংহাসনে স্থাপন করিতে হইয়াছে, নতুবা সাধারণ লোক কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেক না। কিয়ৎকাল দুই সম্রাটে যুদ্ধ বিগ্রহের পর বিবাদ মীমাংসা হইল, কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা আসিকাগ প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় চীন ও কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যাদি ভালরূপ চলিতেছিল। শত বৎসরের অধিক কাল শান্তি বিরাজ করে নাই। অত্যাচারে অরাজকতা উপস্থিত হইল, নানা স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল, ক্রমে শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা লোপ পাইতে লাগিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজার উৎপত্তি হইল; এই সময়েই feudal system বা সামন্ত প্রথার উৎপত্তি হইল। শিল্প বাণিজ্য ও জাতীয় সাহিত্যের যার পর নাই অধোগতি হইল। পঞ্চদশ শতাব্দী জাপানী ইতিহাসে dark age বা অন্ধকারের যুগ বলিয়া পরিচিত।

১৫৯০ খৃঃ অব্দে 'তাইওতমি' ক্ষুদ্র রাজাদের ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃ স্থাপন করতঃ নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বদেশশাসনে তৃপ্ত না হইয়া প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য কোরিয়াতে প্রেরণ করেন; কোরিয়া রাজপরিবার বন্দী হইল এবং সাহায্যকারী চীনসৈন্য পরাভূত হইল। কোরিয়ার সুশাসনের বন্দোবস্ত করিবার তাঁহার অবসর ছিল না; অনুপযুক্ত পুত্রের শাসনে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া সব ধ্বংস হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের অনুচর তকো গাওয়া নিজ শক্তিতে সর্ব্ব ক্ষমতা তাইওতমি পরিবারের হস্তচ্যুত করিল।

১৬০৩ খৃঃ অব্দে তকোগাওয়া ইয়েয়াচু নিজ হস্তে সর্ব্বক্ষমতা আনিয়া জেডো (বর্ত্তমান টোকিও) তে কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন করিল; কিওটোতে নামমাত্র সম্রাট্ সিংহাসনারূঢ় রহিলেন। ছলনা করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সম্রাটের নিকট হইতে নানা উপাধি প্রার্থনা করিত। এই সব অরাজকতার সময় পূর্ণ মাত্রায় feudal system প্রবর্ত্তিত হইল। এবং feudal chiefs দের সঙ্গে তকোগাওয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ রহিল। বর্ত্তমান সম্রাটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবেই দেশ শাসিত হইয়াছে ও সম্রাটগণ সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ছিলেন।

"অন্ধকার যুগের" পর হইতে পর্ত্তুগীজগণ জাপানে বাণিজ্য ব্যবসা করিতেছিল; তৎপর স্পেনিয়ার্ড ও ওলন্দাজগণ ইহাদের দেশে পদার্পণ করিয়া, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। "ইয়েয়াচু'র সময় প্রায় ২০ লক্ষ লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি স্পেনিয়ার্ড ও পর্ত্তুগীজদিগকে তাহাদের ধর্ম্মের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সকলে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে দেখিয়া এবং জাপানের এত লোক বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, বিদেশীয়দের প্রবেশ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। কেবল বাণিজ্যের জন্য নাগা সাকি বন্দরে ওলন্দাজ, স্পেনিয়ার্ড ও পর্ত্তুগীজদের প্রবেশের অনুমতি দেন। শ্যাম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যাদি চলিতেছিল কিন্তু ইয়েয়াচু জাপানীদের বিদেশে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। বিদেশের সর্ব্বচিহ্ন লোপ করিবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রায় ১০ লক্ষ লোককে সংহার করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখান। সেই সময় হইতেই জাপানীদের হৃদয়ে বিদেশীয়দের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হয়। অজ্ঞতাবশতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম লোপের জন্য যে জাপানে এত নরহত্যা হইয়াছিল, আজ সেই জাপানের অস্থিমজ্জা, আচার ব্যবহার পোষাক ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিদেশীভাব প্রকাশিত, সেই জাপানের রাজধানী টোকিওতেই অন্যূন ক্ষুদ্র বৃহৎ একশত গীর্জ্জা আছে। জানি না খ্রীষ্টান রাজ্ঞীর রাজধানী কলিকাতাতে কত গীর্জ্জা।

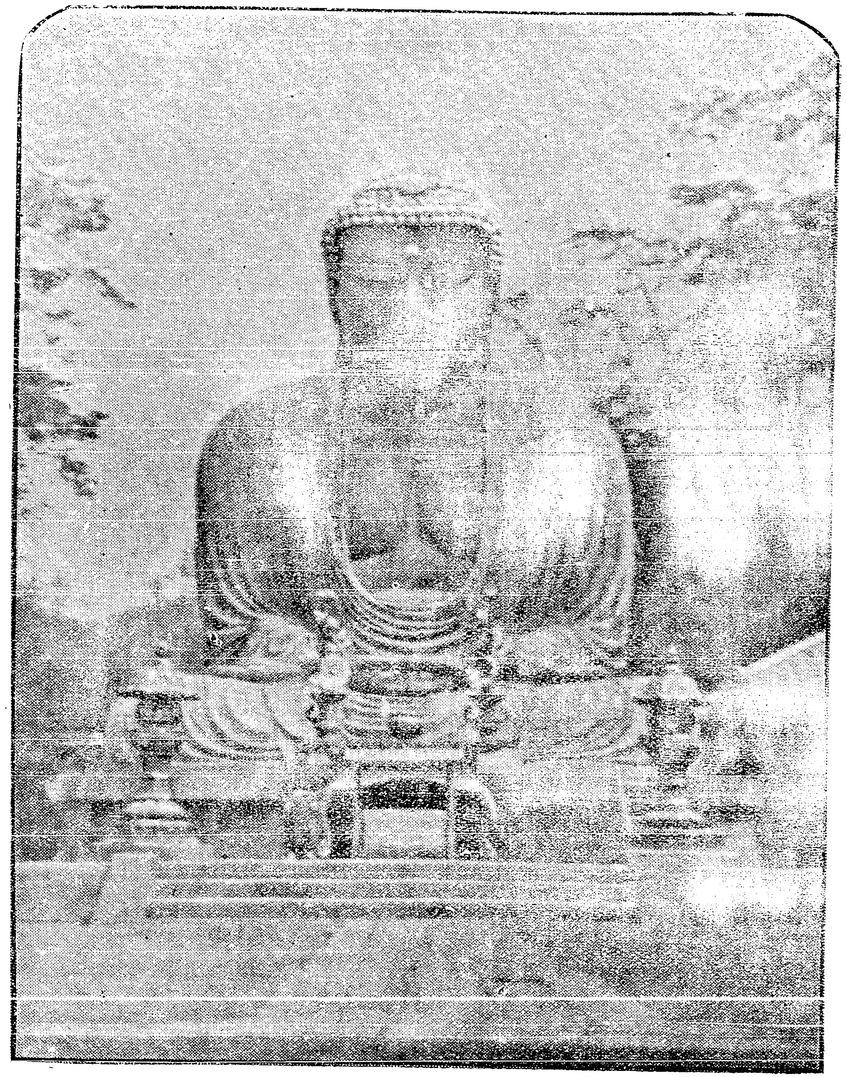

কামাকুরার বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি।

(৩০৫ পৃষ্ঠা দেখুন)

প্রায় সর্ব্ববিদেশিসম্পর্করহিত হইয়া, বিবাদ-বিসম্বাদ-যুদ্ধ-বিগ্রহাদি শূন্য হইয়া জাপান শান্তি ভোগ করিতেছিল, কিন্তু লোক ক্রমে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। এই সময়ে জাপানীরা সামুরায় (ক্ষত্রিয়), বণিক, কৃষক ও শিল্পী, এই চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল। জাতিভেদ দেখিয়া যেন কেহ বর্ত্তমান ভারতীয় জাতিভেদ মনে না করেন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত ছিল, তাহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে উন্নত হইতে পারিত। তবে শাসনকার্য্য সামুরায়দেরই একচেটিয়া ছিল, যতই উপযুক্ত হউক না কেন তাহাতে অন্য জাতির প্রবেশাধিকার বহু কষ্টসাধ্য ছিল। ঐ সময় সাহিত্য, গণিত ও ধর্ম্মের বেশ আলোচনা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিদ্বান লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। তকোগাওয়াদের উৎসাহে সাহিত্যাদির প্রচুর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লোকে বুঝিতে পারিল যে, তকোগাওয়াগণ কিওটোর সম্রাটের ভৃত্যমাত্র; স্থানে স্থানে তাহাদের বিপক্ষে লোক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সেনাপতি পেরীর অধীনে আমেরিকার দুই যুদ্ধ জাহাজ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। সাধারণ লোক বিদেশীয়দের অস্তিত্ব একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল এবং জাপান ভিন্ন ধর্ম্ম ও সভ্যতায় উন্নত দেশ আছে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। কেহ কেহ আমেরিকানদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে উদ্যত হইল, অন্য দল বন্ধুতা স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তকোগাওয়া কিছু করিতে না পারিয়া, সম্রাটের অভিমত জানিতে চাহিল, এবং তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে সম্রাটের ক্ষমতা স্বীকার করা হইল।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলণ্ড ও রুশিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইয়াকোহামা, নাগাসাকি, কোবি প্রভৃতি ৫টী বন্দরে বাণিজ্যার্থ বিদেশীয়দিগকে বাসের অনুমতি দেওয়া হইল। কিন্তু জাপানীরা নানা স্থানে বিদেশীয়ের উপর আজকালকার চীনবাসীদের ন্যায় অত্যাচার করিতে লাগিল। এইজন্য দুই এক স্থানে প্রচুর অর্থ দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা 'কমেই' নিজ ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, নানাস্থানে যুদ্ধাদিও উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হয় নাই। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে ১৬ বৎসর বয়সে যুবরাজ সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইঁহার পূর্ব্বেই ১২১ জন সম্রাট জাপানে রাজত্ব করিয়াছেন। তকোগাওয়া নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব ও অন্যায় ভাবিয়া তখনকার রাজধানী কিওটোতে গিয়া বর্ত্তমান সম্রাটের হস্তে সমস্ত শাসনভার অর্পণ করিল।

এই সময় তিনজন সামন্ত সম্রাটের প্রধান সাহায্যকারী ছিল, কাজে কাজেই তাহাদের অধীনস্থ 'সামুরায়' গণই উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তকোগাওয়া পরিবার ও তাহাদের অধীনস্থ সামুরায়গণ রাজকার্য্যে বঞ্চিত হইয়া যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিল। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে ভীষণ যুদ্ধ হইল, তকোগাওয়াগণ পরাস্ত হইয়া জেডো (বর্ত্তমান টোকিও)তে পলায়ন করিল। রাজসৈন্য পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া টোকিওতে উপস্থিত হইলে, তথায় সন্ধির প্রস্তাব হয় এবং তকোগাওয়াকে এক ক্ষুদ্র প্রদেশ দিয়া সব মীমাংসা করা হয়। তথাপি অন্য কতিপয় সামুরায় সর্দ্দার এই সব কার্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া, টোকিওতে দলবদ্ধ হইয়া রাজসৈন্যের প্রতিরোধ করিল। বর্ত্তমান উয়েন পার্কের নিকট যুদ্ধ হয়; সম্রাটের সৈন্য জয়লাভ করিল। উয়েন পার্কের পানোরামাতে ঐ যুদ্ধের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও উত্তরাংশে অনেক সামন্ত (feudal chiefs) বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ছয়মাস মধ্যে সম্রাটের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়া দেশে একপ্রকার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। রাজধানী কিওটো হইতে জেডোতে স্থানান্তরিত হইয়া টোকিও নামে অভিহিত হইল। ঐ সময় হইতে জাপানে নূতন 'মেইজি' (Meiji) শাল প্রচলিত হইয়াছে; জানুয়ারি হইতে বৎসর আরম্ভ হয়; এখন ৩২ মেইজি চলিতেছে। প্রথম সম্রাট জিম্মো হইতে যে শাল আরম্ভ হইয়াছিল, এখন তাহার ২২৫৯ সন; সুতরাং উহা খৃঃ ৬৬০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল।

মেইজি সংস্কারই জাপানকে জাপান করিয়াছে। এই সংস্কারযুগের প্রারম্ভে দিনের পর দিন গবর্ণমেণ্টের এত বিজ্ঞাপনাদি বাহির হইতে লাগিল যে সাধারণ লোকের পক্ষে তৎসমুদয়ের অনুসরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। অনেকেই এই সব সংস্কারের বিরোধী ছিল, ও নানা উপায়ে সংস্কারকদিগকে হত্যা করিতে লাগিল।

প্রবর্ত্তক মহাশয়ের সঙ্গে তুলনীয় মনে করিতেন না। এই কথাবার্ত্তার সময় প্রতাপবাবু সিকাগো মহামেলা উপলক্ষে আমেরিকায়। সেখানে প্রতাপ বাবুর বক্তৃতাদি সে দেশের, এ দেশের এবং অন্যান্য সভ্য দেশের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি প্রতাপ বাবুর লেখা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার কাছে প্রশংসা করিয়া বলিলেন "প্রতাপ বাবু গুছিয়া গাছিয়া বেশ ইংরাজি বলিতে ও লিখিতে পারেন এবং শেষে যাহা দাঁড় করান তাহা মন্দ হয় না, বরং ভালই হয়।" "As a leading power" নেতৃত্বশক্তি বিষয়ে তিনি প্রতাপ বাবুকে সম্পূর্ণ একটী "Failure" বা অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করেন। কেশব বাবুরও Leading power তাঁহার মতে খুব বেশী ছিল না। তিনি বলিলেন যে "অনেক সময় ও শ্রমব্যয়ে কেশব বাবু যে অনুগামী দল তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিতে না করিতে সেই অসংসক্ত দলটী বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার গঠন-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।" আমি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, কেশব বাবুর অনুবর্ত্তী প্রচারকদলে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাস্পদ ও সাধুচরিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মানুরাগ সমধিক প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রচার-চেষ্টা সমস্তই যে ব্যর্থ হইবে তাহা মনে হয় না। তাঁহারা এক দিন কেশব বাবুর নাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারেন। এ কথায় তিনি বলিলেন,—"কালীনাথ, তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে ও দল আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? উহার যে অবসাদ দশা এখন উপস্থিত হইয়াছে, সে দশার আর কখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায়ের "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "গৌর বাবু একজন সুপণ্ডিত লোক, শাস্ত্রাদিতে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এজন্য তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্র যেমন ঘটনাপূর্ণ হইয়াছে, তেমন যুক্তি দ্বারা তিনি সেই সমস্ত ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা ও শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের মৌলিকতা, প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু একদিন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সাধু ভাষায় শব্দ বিন্যাস করিতে করিতে সহসা এক আধটী প্রচলিত ইতর শব্দ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তন্মধ্যে ব্যবহার করিয়া ভাষার লালিত্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। দাদার লিখন-প্রণালী সমর্থন করিবার জন্য কবিবর বাবু রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করিয়াছিলেন।

সঞ্জীব বাবু (বঙ্কিম বাবুর মধ্যম ভ্রাতা) "জাল প্রতাপ চাঁদ" অভিধেয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা তিলকচন্দ্রের "প্রতাপচাঁদ" নামক একটী পুত্র ছিলেন। তিনি কোন কারণে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পিতার রাজত্বকালে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। তজ্জন্য তিলকচন্দ্র মহাতাপচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া রাজত্ব-রক্ষণ-ভার নাবালক মহাতাপচন্দ্রের জন্মদাতা গোপাল বাবুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। কিছু সময় পরে "প্রতাপচাঁদ" নামধারী কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমান রাজ-সম্পত্তির (claimant) উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন। এই পরিচয় দিবার পর নামধারীকে কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অবসর দেওয়া হইলনা। নাবালক রাজের অভিভাবক গোপাল বাবু বর্দ্ধমান এ ষ্টেটের বিপুল অর্থভাণ্ডার অকাতরে ও মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়া নামধারী দায়াদ ও তাহার পক্ষীয় লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া উড়াইয়া দেন। নামধারী কোথায়ও দাঁড়াইবার ভূমি পান নাই। সঞ্জীব বাবু এই ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া তাঁহার পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকাখানি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, "মেজদাদা জন-প্রবাদ বা জনশ্রুতির উপর অবিচারে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকার বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের ঐতিহাসিক মূল তিনি অতি অল্পই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমার খুব বাল্যকালে এই নামধারীর আখ্যান জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে শুনিতাম এবং সহানুভূতিতে কাঁদিয়া গণ্ডস্থল ভাসাইতাম।" আমি বলিলাম যে "দায়াদের যখন বহুতর ভূম্যধিকারী সহায় থাকিতে এবং খ্যাতনামা জনসাধারণহিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যক্তিগত অভিন্নত্বের (Identity) প্রমাণ সকল থাকিতে দেওয়ানি আদালতে যে তাঁহাকে মোকর্দ্দমা রুজু করিতেও রাজকীয় ও অন্যদীয় পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল, তখন নামধারীর প্রতি অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।"

ফরাসী সম্রাট নেপোলেয়োঁ বোনাপার্ট সম্বন্ধে আমি বঙ্কিম বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে বিষয়ে ("English prejudice") ইংরাজী কুসংস্কার পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছে। তিনি উক্ত মহাত্মার প্রতি 'নৃশংস' ভিন্ন কোমলতর আখ্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বোধ হয় সর ওয়াল্টর স্কট, বুরিণ, আলিসন প্রভৃতি শুদ্ধ বিপক্ষবৃন্দের জীবনচরিত ও ইতিবৃত্ত সমূহ পাঠ করিয়া, মনোমধ্যে এই ঘোর অমূলক কুসংস্কারকে বদ্ধমূল হইতে দিয়া থাকিবেন; লাকেশ, হাজলিট, আবট, কর্ণেল নেপিয়ার, স্লোন প্রভৃতি ঐতিহাসিক গণের গ্রন্থের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন নাই।

বঙ্কিম বাবু ইয়ুরোপীয় ও অপর বিদেশীয় লোকের মুখে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করা ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা মনে করিতেন। এ জন্য তিনি আনি বেসাণ্ট প্রভৃতির বক্তৃতাদির প্রতি কোনও অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। বরং তিনি শ্রদ্ধাপদ শশধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির প্রতি আকর্ষণ দেখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিম বাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এখন সিদ্ধযোগী পাওয়া যায় কিনা"? উত্তরে বলিলাম, "সিদ্ধযোগী অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাঁহাদের দর্শন-লাভ বা তাঁহাদের উপদেশ-লাভ ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্য পাত্রের সৌভাগ্য ও সুকৃতির অপেক্ষা করে।" "যোগ" সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপের নিষেধাজ্ঞা ছিল, তিনি তাহা জানিতেন। এ জন্য তৎ-সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। যদিও প্রথমে এই জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কালীনাথ! তুমি কোন প্রকার মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাস কর কিনা?" "আমি খুব বিশ্বাস করি" বলিলাম। আমি বলিলাম "যে আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন তিনি ময়মনসিংহের অন্তর্ব্বর্ত্তী মুক্তাগাছার একজন জমিদার। কামাখ্যা হইতে একটী ব্রাহ্মণ তনয় অনেক মন্ত্রাদি শিখিয়া আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমার বন্ধুটী তাঁহার কাছে তৎ-শিক্ষিত কোন মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় দেখিতে চান। তাহাতে ব্রাহ্মণ-তনয় একটী উদ্ভিদ্ লতার উপর তাঁহার শিক্ষিত মন্ত্রের শক্তি-প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্র-শক্তি-বলে, লতাটী যে দিকে ছিল, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুস্থির হইল।" আমার কথা শেষ হইবা মাত্র বঙ্কিম বাবু বলিয়া উঠিলেন যে "তিনি ঠিক ঐ মন্ত্রটী জানেন। সেই মন্ত্রটী কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিলেও মানুষের মন মন্ত্র-প্রয়োক্তার ইচ্ছার বশীভূত হয়। তিনি এই মন্ত্রটীর কোন বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না। তবে হাকিম বা সাহেব বশীভূত করিবার জন্য তিনি অনেক লোককে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। একবার মাত্র তিনি কোন হতভাগিনী স্ত্রীলোককে তাহার অননুরক্ত স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রটীর প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সেই হতভাগিনী সেই মন্ত্রটী তদীয় স্বামীর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অযথা অপব্যবহার করে।" মন্ত্রশক্তি-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মন্ত্রশক্তির ফলোপদায়িতা যেরূপে নষ্ট হয় আমি তাহার একটী ঘটনা বিবৃত করিলাম। ঘটনাটী আমি শ্রীমৎ অচলানন্দ তীর্থ-স্বামীর মুখেই শ্রবণ করি। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রম উত্তরপাড়ার সন্নিহিত কোৎরং গ্রাম, সেই আশ্রমখ্যাত নাম রামকুমার বাবাজী। বাবাজী তাঁহার অবশ্যই পদবী নহে। তবে 'বাবাজী' শব্দ লোকে তাহার 'পদবী' স্থানে প্রয়োগ করিত। স্বামীজী যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট বৃশ্চিকদংশন আরোগ্যের একটী মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রটী পাইবার জন্য স্বামীজী পূর্ব্ব হইতে বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পিতৃদেবের নিকট সে আগ্রহ কখনও প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার পিতৃদেব মন্ত্রোচ্চারণান্তে দষ্টস্থানে থু থু করিয়া তিন বার থুৎকার করিতেন। সেই অব্যর্থ মন্ত্র-শক্তি বলে, যাহারা আসিত সকলেই সকল সময় আরোগ্য লাভ করিত। দৈবযোগে একদিন স্বামীজীর মাতামহী বৃশ্চিকদষ্ট হন। সেই দংশনে বা হুলাঘাতে

মাতামহীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দংশন গোপনীয় স্থানে হওয়ায় স্বামীজীর পিতৃদেব আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দষ্ট স্থানে ফুৎকারের সহিত মন্ত্র প্রয়োগ করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বামীজীকে ডাকিয়া প্রয়োগের কৌশল সহিত মন্ত্র দীক্ষা দিলেন এবং স্বামীজীকে তাহা তাহার মাতামহীর দষ্টস্থানে যথাবিধানে প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। প্রয়োগ মাত্রই মাতামহীর অসহ্য যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া গেল। স্বামীজী তৎপরে শত শত লোককে সফুৎকার মন্ত্রবলে আরোগ্য করেন। একদিন মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পিতৃদত্ত সফুৎকার বৃশ্চিকদংশন আরোগ্যের মন্ত্রের সফলতার কথা বলেন। তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে কেহ বলিল যে হয় ত শুদ্ধ ফুৎকারে আরোগ্য হয়, মন্ত্র তন্ত্র কিছুই নহে। এই কথাতে স্বামীজী পরে তাঁহার মন্ত্র-সম্বন্ধে নিজের মূঢ় বিশ্বাসটী পরীক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তির দংষ্টস্থানে বিনা মন্ত্রোচ্চারণে কেবল শুদ্ধ ফুৎকার দিলেন, তাহাতে জ্বালা নিবারিত হইল না দেখিয়া সেবার তিনি যথারীতি সমন্ত্রোচ্চারণ ফুৎকার দিলেন; তাহাতেও কোন উপকার দর্শিল না। তারপর স্বামীজীর সে মন্ত্র চিরকালের তরে অসিদ্ধ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্র-প্রয়োগ কদাপি বিফল হয় নাই। এই ঘটনাটী দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে মন্ত্রটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানকৃত পরীক্ষাপেক্ষা মূঢ় বিশ্বাসের পক্ষপাতী।

এই কথার পর Magnetism 'Will power' ও গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। নিম্নে তাহার স্থূল মন্তব্য অভিব্যক্ত হইতেছে। আমাদের উভয়ের মতেই মন্তব্য গুলি স্থিরীকৃত হয়।

(ক) শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে রোগাদি আরোগ্য হয় ও হইতে পারে, কিন্তু সে শক্তি সকল সময়ে স্থায়ী নহে। তাহা প্রয়োগকর্ত্তার (Magnetiser এর) শরীর ও মনের বল ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার ফলোপদায়িতার জন্য নির্ভর করে। প্রয়োগকর্ত্তার প্রয়োগাধীন ব্যক্তি (subject) অপেক্ষা অধিকতর মহাজনভাবাপন্ন (More positive) হওয়া চাই। এবং এই ইচ্ছাশক্তি কোথাও কখনও (Absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ নহে। (বঙ্কিম বাবু বলিলেন তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি আছে। অতি অল্প স্থলেই তিনি তাহা প্রয়োগ করেন।) এই ইচ্ছাশক্তির সমধিক প্রয়োগ ও ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেহগত স্বাস্থ্য ও বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

(খ) গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রদাতার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে এবং তাঁহার আজ্ঞার উপর সমধিক নিষ্ঠা (implicit obedience) না থাকিলে কোথাও ফলোপদায়ী হয় না। মন্ত্রপ্রয়োগকালে মন্ত্রদাতাকে স্মরণ করিতে হয় এবং আপনার শক্তি-সাধ্যের অহঙ্কার বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রদাতার শক্তি সাধ্যের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। যথানিয়মে প্রযুক্ত মন্ত্র-শক্তি সকল স্থলেই (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ। ইহা কোথাও নিষ্ফল হয় না। ইহার যথেষ্ট ব্যবহারে শরীরের বলক্ষয় হয় না, ইচ্ছাশক্তিরও সাহায্য লইতে হয় না। প্রয়োগকালে যে মনের বল উপস্থিত হয়, তাহা আপনা হইতে অতি সহজে, শুদ্ধ মন্ত্রের বলে উপস্থিত হয়। এই মন্ত্র-শক্তি শুদ্ধ ভক্তির বলে ফলোপদায়ী হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তির স্থলে যেমন নিজের মনের বলই সহায়, গুরুদত্ত মন্ত্র-শক্তির স্থলে শুদ্ধ দৈববলই সম্বল। ইচ্ছাশক্তি কাহাকে কখনও প্রদান করা যায় না, কিন্তু মন্ত্রশক্তি গুরু-প্রণালী ক্রমে অনায়াসে উপযুক্ত পাত্রে সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইতে পারে।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে বঙ্কিম বাবু বলিলেন যে তাঁহার দুই জন মন্ত্রশিষ্য আছেন। তাহারা তাঁহার প্রণালী ক্রমে ইষ্টোপাসনা করিয়া থাকে। তিনি শিষ্যদ্বয়ের ভক্তিবিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণী মন্ত্রটী তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। এই শিষ্যদ্বয় বঙ্কিম বাবুরই উপাসনা প্রণালীর অনুগত। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং প্রচলিত গুরু প্রণালী ক্রমে ইষ্টোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের কৃত প্রণালী অবলম্বন করেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করিয়া যান, তাহাই বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগের অবলম্বন হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহোদয় যে সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে স্তোত্র, শ্লোক ও মন্ত্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপাসনাপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-

দিগের মধ্যে প্রচলিত করেন, বঙ্কিম বাবু সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্তোত্র ও শ্লোকাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের উপাসনাপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া নিজে তাহা অবলম্বন করেন এবং শিষ্যদ্বয় মধ্যে তাহা প্রচলিত করেন। সঙ্কল্পিত পরীক্ষান্তে এই শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার আকর্ষণী মন্ত্র শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কি না, এবং আমার সঙ্গে এই আলাপের পরে আর অধিক মন্ত্রশিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু এ কথার ৫।৬ মাস পরে তাঁহার জীবন-লীলা সম্বরণ করেন।

তিনি একদা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের উপাসনার সময় সম্যক্ মনঃস্থির করিতে সকল সময় সক্ষম হন না। কোন বিশেষ শব্দ বা লোকের কথা-বার্ত্তা বা বালকাদির ক্রন্দন বা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে তাঁহার চিত্তবৃত্তি অস্থির হইয়া উঠে। এমন কি উপাসনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাকে উপাসনায় ভঙ্গ দিয়া, ব্যাপারটা কি! তাহা উঠিয়া দেখিয়া সাময়িক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হয়। আমি বলিলাম যে পরিবারস্থ সকলের প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বা মায়া থাকাতে সর্ব্বদাই তাঁহাকে চঞ্চল করে এবং তাঁহার উপাসনায় বাধা জন্মায়। কে কোথায় পড়িয়া গেল, কে কোথা হইতে কোন্ ব্যথা পাইল, কোন্ দিক্ হইতে কোন্ আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল, এই সমস্ত মায়িক আশঙ্কা মনোমধ্যে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে এবং বিক্ষেপ জন্মায়। তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে স্নেহার্দ্রতা হইতে একটু কঠিন করিয়া না তুলিলে স্থির-চিত্তে তাঁহার উপাসনা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যে তাঁহার উপাসনার বাধা এ কথা তিনি অস্বীকার করিলেন না। মনের বশীকরণ-শক্তির অসদ্ভাবে যে অধিকাংশ উপাসকের বাধা হইয়া আছে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই চাঞ্চল্য নিবারণার্থ বহুতর সাধককে অষ্টাঙ্গ যোগাদি অভ্যাস করিতে হয়। অবশ্যই কোন প্রকার যোগের কথা আমি তাঁহাকে বিশ্বচরা এবং নিষেধ ছিল বলিয়া আমি তাঁহাকে বলিতে নেই; নদন তাঁহার চিত্তবৃত্তির অস্থিরতার আর একটী কারণ, তখন আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু পাছে সে কথা বলিলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে, তজ্জন্য তখন তাহা তাঁহাকে বলিতে বিরত ছিলাম। সে কারণটী—উপাসনা সম্বন্ধে গুরু প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিজকৃত প্রণালী, নিজের উপাসনার জন্য অবলম্বন করা। বঙ্কিম বাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজে উপাসনা করিতেন, সেই উপাসনার মূলে গুরুদীক্ষা বা গুরুভক্তির সাহায্য ছিল না, তাঁহার আজ্ঞা-জনিত নিষ্ঠার সদ্ভাব ছিল না। এই জন্য কাহারও আপনাকে আপনার গুরু-স্থানীয়রূপে বরণ করা বিধেয় হয় না। যে দৈব বা অদৃশ্য শক্তি (Providence) গুরু-প্রণালীর মূলে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার প্রাণ ও সহায় হইয়া আছেন, আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলে সে সাহায্য-প্রস্রবণ হইতে নিভিন্ন হইয়া পড়িতে হয়, সুতরাং সে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিম বাবুকে সেই সাহায্য-স্রোত হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। যাহা—সে শক্তি-শুদ্ধ Rationalism এর বোদ্ধ ভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহাই কেবল তাঁহার সহায় ছিল। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির পূর্ব্ববর্ণিত বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য।

বঙ্কিম বাবু যেরূপ স্বকীয় বা স্বকৃত উপাসনাপ্রণালীর অধীন হইয়াছিলেন, পূর্ব্বাচার্য্যগণের কেহই, নিশ্চয়ই, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান নাই। স্মার্ত্ত মহোদয় যখন ব্রাহ্মণগণের জন্য উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিজের গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন অনুবর্ত্তীদিগের জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্র প্রণয়ন করেন, তখন পুরী-গোস্বামী-প্রদত্ত দশাক্ষর মন্ত্র "ওঁ দুণ্ দুণ্ কথাটির উপর ও তাঁহার প্রদর্শিত কখন পাখী ডাকিয়া উঠিবে সেই স্বকৃত কৃষ্ণপ্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। নাই। এত বার এই গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখনো মনে ও শুয়া বলিতে পারিলাম।

উপ বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধা মহিলা করেণর জন্য; বালিকানববধূ ও বিবাহিতা বালিকা দম্পিন্যাগণ ইঁহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বলিয়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্রে নাই মহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর

বিসর্জ্জন করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। যিনি তাহা করেন, তিনি তাঁহার ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। আমরা বঙ্কিম বাবুকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভিন্ন কখনও অন্য কিছু ভাবি নাই। তাঁহার লেখায় কৃষ্ণাবতার স্বীকার ও ভক্তিতত্ত্বের কথা থাকিলেও তিনি পূর্ণমাত্রায় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন (Rationalist)। ব্রাহ্মচূড়ামণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রাহ্ম উপাসনাপদ্ধতি প্রস্তুত করেন, তখন তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক বৌদ্ধভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন?

বঙ্গীয় যুবকসমাজে মধ্যে সাহেবিয়ানার ঘোর প্রাদুর্ভাব হয়। অনেকেই আহারের সময় হাতে তুলিয়া খাওয়ার পরিবর্ত্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করেন, গৃহ মধ্যেও বস্ত্রব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পেণ্টুলেন সার্ট ব্যবহার করেন, এবং ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিবার পরিবর্ত্তে আহারের জন্য টেবল ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। অনেক যুবক এইরূপ বিলাতী সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খান। বঙ্কিম বাবুও এই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া তৃণের ন্যায় নীয়মান হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। এ সম্বন্ধে একদা তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি এক সময় কাঁটা চামচ ব্যবহার না করিয়া হাতে তুলিয়া খাওয়া বড়ই ঘৃণার বিষয় ও ঘোর অসভ্যতা মনে করিতেন। এরূপ অসভ্য ব্যবহার তাঁহার চক্ষে পড়িলে তাঁহার অন্তরে বড়ই ঘৃণার উদয় হইত। একদিন তিনি কাঁটা চামচ হস্তে একটী কৈ মাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইতেছিলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার পার্শ্বে গুরুদত্ত মন্ত্রশাস্ত্র দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "কি কথা হইল। নিম্নে তাহার স্থূল মস্তকর্ম্মভোগ!" এ কথায় আমাদের উভয়ের মতেই মন্তব্য গুলি স্থিরীকৃত প্রর্ব্ব হইতে

(ক) শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে রোগাদি আহইতে হয় ও হইতে পারে, কিন্তু সে শক্তি সকল সময়ে যয়ানা নহে। তাহা প্রয়োগকর্ত্তার (Magnetiser এর) শস্রাত ও মনের বল ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার ফলোপদায়িতার যার নির্ভর করে। প্রয়োগকর্ত্তার প্রয়োগাধীন ব্যক্তি (subje অপেক্ষা অধিকতর মহাজনভাবাপন্ন (More positiাধ্যায় হওয়া চাই। এবং এই ইচ্ছাশক্তি কোথাও ক তিনি একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটনার ঠিক ৭ দিন পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন অঙ্গীকার করিয়া যান। অঙ্গীকার মত মৃত্যুর ঠিক ৭ দিন পূর্ব্বে সন্ন্যাসী ঠাকুর যাদব বাবুর সঙ্গে আসিয়া দেখা করেন। যাদব বাবুর কোন পীড়া উপলক্ষে নাকি এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু আরও অনেক কথা বলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা।
ও
তাহার সংস্কার!

কলিকাতার সাধারণ সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানি না, কিন্তু সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সেকাল অর্থে এস্থলে আমি শুধু আমার শৈশব কাল গণ্য করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্য্যন্ত এ সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি। পিতৃদেবের বয়স এখন ৮৩ বৎসর, মাতাঠাকুরাণী ইঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। ইঁহাদের পিতামাতার আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার শিক্ষা ইঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারাই নিজেরাও মানুষ হইয়াছেন। অতএব উক্ত সেকাল এক শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্যা পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই জানিতেন। আমাদের দুরসম্বন্ধে এক আত্মীয়া ভগিনী, মাতার বয়স্যা, চমৎকার বিশুদ্ধ উদ্ধৃতা লিখিতেন। সংস্কৃতও তিনি কিছু কিছু শিখিয়া ব্রাহ্মণ-

সেই জন্য মেয়েমহলে শুধু নয়, পুরুষমণ্ডলেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহাদিগের পৌত্রী দৌহিত্রীদিগের মধ্যে বরঞ্চ লেখাপড়ার এরূপ আদর দেখি নাই, কাহাকে কাহাকেও বা মূর্খ দেখিয়াছি। বৃদ্ধাগণ প্রৌঢ়াগণ আমাদের বাড়ীতে যেরূপ বিদ্যানুশীলনের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবংশীয়া নবীনাগণ অন্যত্র গিয়া শিক্ষালাভের সে সুবিধা পান নাই।

আহার বিরাম পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা শক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু কাকিমার নিকট ইঁহার প্রভাত বর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনিয়াছি, নব্যবংশের প্রীতির জন্য তাহা সযত্নে স্মৃতিরুত্থিত করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না; প্রভাত পূর্ব্বদিগন্তের নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু প্রকাশ হ'তে পারছেন না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হ'য়ে রয়েছেন। আহা সারা নিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি, মরি! আহা প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গ বিহঙ্গীর কলরব নেই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হ'তে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না, সূর্য্যদেব অরুণ-রথে সমাসীন হয়ে উদয় হ'তে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে আসে। সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন, হয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা করে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অন্যোপায় না দেখে কৃষ্ণপক্ষীর (রামপক্ষী) স্মরণ করলেন, পক্ষী আগত হলে বল্লেন, "হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা করলে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই। হে অগতির গতি, ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর কা'র? অতএব দেবদানব নররাক্ষস সকলের প্রতি কৃপাবান্ হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর;—নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ পায়! পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান ক'রে, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাকলেন—কুক্কুহুকু অর্থাৎ উঠ হে উঠ,—কুক্কুহুকু! কুক্কুহুকু! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে। যতদূর স্মরণ হচ্ছে তাতে লজ্জিত বোধ না করে এই সুখের মিলনভঙ্গ-জনিত অপরাধে তিনি পক্ষীবরকে যে অভিশাপ প্রদান করলেন সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুটপক্ষী এখন হিন্দুর অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্য।"

আমি যে গল্পটি হুবহু আমার খুল্লতাতপত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সে এত ছেলেবেলার কথা যখন কাকিমার মুখ হইতে পীড়াপাড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম। সমস্ত কৌতূহল, সমস্ত প্রাণ তখন কুক্কুহু কথাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখন পাখী ডাকিয়া উঠিবে সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। তবে এত বার এই গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখনো মনে করিয়া বলিতে পারিলাম।

বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধা মহিলাগণের জন্য; বালিকানববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যাগণ ইঁহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্রে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর

কিছু না হউক, বালকবালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।

তখন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হয় নাই। বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী যে পুস্তক হইতে বর্ণ বোধ করাইতেন, তাহার নাম শিশুবোধক। পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি। অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবী বন্দনা, যামবর্ণনা, লিপিলিখন প্রণালী—এ সমস্তই এই একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তূপীকৃত। বন্দনা ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন দুর্ব্বোধ্য যে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা এক রকম শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে তালপাতে, তাহার পর কলাপাতে। বালির কাগজে কঞ্চী কলমের মক্স সর্ব্বশেষে।

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বই খানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধান খানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের "তত্ত্ববিদ্যা"র সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কিরকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল, খেলেনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত। বড় হইয়া সে কালের বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি;—মানভঞ্জন, প্রভাস মিলন, দূতী সংবাদ, কোকিল দূত, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদ চরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদা মঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লয়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনী-কুমার ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন এতগুলির মধ্যে একখানি কেবল নামকরণে সামাজিক;—কামিনী-কুমার কাব্যে লিখিত উপন্যাস। তখন পর্য্যন্ত গদ্যে উপন্যাস লিখিত হয় নাই। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের শৈশবে রামনারায়ণ তর্করত্ন গদ্যে সংস্কৃত নাটকাদি অনুবাদের পর, 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' "বহুবিবাহ নাটক" প্রভৃতি সামাজিক নাটক রচনা করেন। কালী সিংহের হুতোমপ্যাঁচার নক্সা, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসাবলী ইহারও পরে রচিত। অথচ সাহিত্যনামাবলীতে ইহার নাম কেন দেখিতে পাই না? 'কামিনী-কুমার' গদ্যে লিখিত উপন্যাস, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, বিদ্যাসুন্দরের ঠিক অনুকরণ নহে। পূর্ব্বে কাব্য লিখিতে হইলেই ভারতচন্দ্র রায় তাহার আদর্শ হইত। শুনিয়াছি মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাসবদত্তা লিখিবার সময় পণ করিয়া লিখিতে বসেন, যে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্য লিখিয়া ভারতচন্দ্রকেও হারাইবেন। কিন্তু পুস্তক বাহির হইলে, তখনকার সমজদারদের বিচারে তাঁহাকে ভগ্নচেতা হইতে হয়, ক্ষোভে সাধের বাসবদত্তা তিনি অগ্নিসমর্পণ করেন। দুই চারিখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই যাহা বাহিরে প্রচার হইয়াছিল, তাহাতেই মাত্র মদনমোহনের মহিমা আবদ্ধ থাকে।

কবিত্বে বা ঔপন্যাসিক রহস্যে কামিনী-কুমারের মূল্য অধিক, এরূপ বলিতে পারি না—তথাপি সাহিত্যসমাজে ইহার নাম রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসমাজের স্ত্রীপুরুষ লইয়া নায়কনায়িকা রচনার ইহা সর্ব্বাদি পুস্তক। যতদূর মনে পড়িতেছে, কামিনীকুমারের গল্পটি এইরূপ—প্রথমে নায়কনায়িকার জন্মবিবরণ, রূপবর্ণনা, পরে বয়ঃপ্রাপ্তে উভয়ের দর্শন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, মিলন-আশায় উভয়ের দেশভ্রমণে নির্গমন, স্থান বর্ণনা, কোন কোন স্থানে উভয়ের সন্দর্শনলাভ; কামিনী ছদ্মবেশী পুরুষ, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত, কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার সহিত রহস্যালাপে রত হওয়া, অবশেষে উভয়ের গৃহে প্রত্যাগমন, মিলন ও বিবাহ।

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে পরিমাণ সমাজসংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম্মসংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইঁহার দ্বারাই যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্য-বিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি। রামমোহন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু সমাজসংস্কারে যে পিতৃদেব বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বেথুনস্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই একটী মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু কন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্ম সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশে, এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকাল প্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশব বাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। অনেকে এই ঘটনাটিতে অসমসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মহর্ষি পিতৃদেব, যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় বান্ধব, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য অবাধে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে গৃহতাড়িত, শিষ্যরূপে সমাগত, শরণাগত সস্ত্রীক কেশব বাবুকে দেশাচার তুচ্ছ করিয়া পুত্রস্নেহে গৃহে গ্রহণ করিবেন, ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা?

যদি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তবে ইহার পরবর্ত্তী আর একটি কার্য্যে। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজ দাদা মহাশয় বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা—১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিত। প্রথমোক্ত সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়, এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৎসরান্তে, কিম্বা তাহারও পরে, ধর্ম্মের জন্য নহে—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজদাদামহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল। বঙ্গ-

মহিলার সাধারণ প্রচলিত একখানি মাত্র সাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি অনেক দিন অবধিই পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটী করেন নাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতা মহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন; দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই পোষাক ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজ বধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিল।

এখন হইতে স্ত্রীজাতির উন্নতি সংকল্পে বঙ্গসমাজে মেজদাদামহাশয়—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ আরম্ভ। এতদিন যে তিনি এ সম্বন্ধে নীরব, নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছিলেন এমন নহে, তবে এতদিন পিতার নেতৃত্বে পুত্র তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন, এখন স্বাধীন ও উপযুক্ত হইয়া পিতার বিশ্রামাবসরে নিজে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আশৈশব ইনি মহিলা-বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিতৃদেব অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যে সকল আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইঁহার পরামর্শে, ইঁহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্য্যে পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত উত্যক্ত করিতেন। আজন্ম যে উদ্দেশ্য ব্রতরূপে হৃদয়ে ধারণ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, নিজে সকর্ম্মা স্বাধীন হইয়া অদম্য অটল উৎসাহে তাহার উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন; পিতা অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বঙ্গের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে মেজদাদা মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন। তখন আমার বয়স ৭ বৎসর। তখন অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজ দাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ী শুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। এক জন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অদম্য ইচ্ছার স্রোতে দৈব পর্য্যন্ত গা ঢালিয়া দেয়—মানুষের কি কথা! দুই বৎসর পরে মেজ দাদা যখন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিলেন, তখন আর কেহ বধূকে পাল্‌কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সে দিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। বাড়ীতেও এ সময় ইহারা একরূপ এক ঘরে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসঙ্কোচে খাওয়া দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে মেজ দাদা আবার যখন বোম্বাই হইতে বাড়ী আসিলেন তখন বাঁধাবাঁধি অনেকটা শিথিল হইল। তখন সবে আমার বিবাহ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী, উন্নতি প্রবর্ত্তক। বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকেও জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, পিতার ত্যাজ্য পর্য্যন্ত হইয়াছেন। তিনি মেজদাদার সঙ্গে পূর্ণপ্রাণে মিশিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিলেন, এবং বাড়ীর আর সকলেরও মতামত অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানিনা বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম। বৎসরান্তে সকলে একত্রে ফিরিলাম।

ভাঙ্গনধরা তীর অনেক দূর পর্য্যন্ত খসিল। কলিকাতায় ফিরিয়া মেজদাদা আর নিজের ঘরে একঘরে নহেন, দলে পুষ্ট। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে বাড়ীর আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক, বাড়ীর ছেলে মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে মেজদাদা পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকাল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। বাড়ীর মেয়েদের ইংরাজি বাঙ্গালায় নিজে শিক্ষাদান করিতেন। এক্ষণে মেজদাদা মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গান বাজনা, লেখাপড়া সর্ব্ব রকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে কাঁচিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী করিয়া যাতায়াত ত আর লজ্জার বিষয়ই নহে, পাল্‌কীর চলন এক রকম উঠিয়াই গেল। আজ ৩৫ বৎসর মেজ দাদা মহাশয় ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্তে, তাঁহার যত্নে আমাদের অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কেবল আমাদের গৃহে কেন? তাঁহার দৃষ্টান্ত সমস্ত বঙ্গে আজ পরিব্যাপ্ত। এ দেশের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষেই এখন বাহিরে যাওয়া সেরূপ নূতন নহে, সেরূপ লজ্জাজনক নহে। বাহিরে যাইতে হইলে সুসভ্য পরিচ্ছদেরও আর ভাবনা নাই। এখন স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা বহুবিস্তৃত; যে কণ্টকাকীর্ণ পথ বহুযত্নে বহু পরিশ্রমে তিনি মুক্ত প্রসারিত করিয়াছেন, বঙ্গবালা মাত্রেরই নিকট তাহা এখন সহজ, সুগম। উন্নতিশীলদিগের কথা ছাড়িয়া,—অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যেও উন্নতির এই স্রোতোবেগ প্রবাহিত। এখন কন্যাকে দেখিতে আসিয়া বরপক্ষীয়গণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন—কন্যার লেখা পড়া কিরূপ। রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা, শ্বশুর শাশুড়ীর নিকটও কন্যাভাব, গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত; যাতায়াতে বোম্বাই ফ্যাসানে পরিচ্ছদ পরিধান এ সকল এখন হিন্দু সমাজনীতির অঙ্গীভূত। আর এ সকলের যিনি প্রবর্ত্তক ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক হস্তে উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে ভয় পাইয়াছে। স্ত্রীজাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটল সংকল্প ছিলেন, মহিলাদিগের মঙ্গল কল্পনায় ইনি এমনি আনন্দলাভ করিতেন যে, তাহাদের কার্য্য-সাধন জন্য তিনি কোন বাধাই বাধা জ্ঞান করেন নাই; কোন অপমানেই তাঁহাকে নত করিতে পারে নাই। আজকাল যাঁহারা সমাজে স্ত্রীকে লইয়া বহির্গত হন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই বহু পুরুষের মাঝে দু একটি মহিলাকে লইয়া গিয়া অন্যের অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট হইতে লজ্জা-বোধ করিবেন, কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা ইঁহাদের দলভুক্ত নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচিত করিতেও আপত্তি করিবেন। কিন্তু মেজদাদার সেণ্টিমেণ্ট, মেজদাদার যুক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার নিকট এ কথা পাড়িলে তিনি রাগিয়া বলিবেন, একরাশ পুরুষের সভায় কেন দু একটি মেয়ে লইয়া যাইব না? যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের নিকট স্ত্রীকে বাহির না করিলে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে কিসে? অভ্যাস পরিবর্ত্তন হইবে কেমন করিয়া? কেবল কথায় নহে, কার্য্যতঃ চিরদিন তিনি এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশে সভা-সমিতিতে বা 'পান সুপারী'তে তাঁহাকে একা নিমন্ত্রণ করিবার যো ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি কোথাও যাইবেন না, সকলেই জানিয়াছিল। মেজদাদার স্বভাবে

স্ত্রী-সম্মান এতই ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, কোন ভদ্র পুরুষে যে স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান দৃষ্টিতে চাহিতে পারে, ইহা তিনি অন্তরে ধারণা করিতে অক্ষম।

মেজদাদার কাছে যদি বল, বুদ্ধিতে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি বল পুরুষের ন্যায় তাহাদের উচ্চশিক্ষা অনাবশ্যক, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ, অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিবেন, মেয়েদের পক্ষ হইয়া তর্কপরায়ণ হইবেন। বাড়ীর মেয়েরা থিয়েটার বা মিউজিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহে—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পুরুষ মিলিতেছে না, মেজদাদা জানিতে পারিলেই অমনি শত অনিচ্ছা শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন। মেয়েদের কর্ত্তার নিকট যদি কোন আবেদন থাকে ত, মেজ দাদাই তাহাদের মুরুব্বি; বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানে মেজদাদার মত সহায়, বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই, তাঁহার উপর সকলেরি অসীম বিশ্বাস। বাস্তবিক পক্ষে মহিলাদিগের সর্ব্বতোভাবে এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নেতার উপযুক্ত, এমন উদার মহৎ অন্তঃকরণবাক্তি সংসারে কম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভ্রাতা মনে করিলে এ কথা আমি সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন আমি তাঁহার কার্য্য সমালোচনায় বিচারাসীন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে সম্মুখে রাখিয়া অপক্ষপাতীরূপে তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দান করিতেছি মাত্র।

সুখের বিষয় তাঁহার প্রাণপণ উদ্যম এখন সার্থক, আশৈশব জীবনের উদ্দেশ্য সফল, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মহিলোন্নতিতে বঙ্গদেশ আজ সর্ব্বপ্রধান।

এইখানে একটি কথা না বলিলে সত্যের অবমাননা ঘটে। যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এত দূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। *

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

* বিষয় প্রসঙ্গের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য আমরা এবার মাননীয়া লেখিকা মহোদয়ার তরুণ বয়সের একখানি প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিলাম। সময়ান্তরে ইঁহার বর্ত্তমান সময়ের একখানি প্রতিকৃতিও পাঠকবর্গকে উপহার দিবার বাসনা রহিল। প্রদীপ-কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রতিভা।

তুঙ্গ হিমাচল শৃঙ্গে, হিমানী রবিতে যথা,
সুষমা মিলন,
মহা ঋষি তপে মগ্ন; প্রশান্ত ললাটে ভায়
শান্তির কিরণ!

অজ্ঞতা কুয়াশা ঘোরে, প্রমত্ত বিদ্রোহ ধূমে
সমাচ্ছন্ন ভারত-শ্মশান;
গঙ্গা যমুনায় মিশি শোণিতের ধারা বহে;—
ভীমনাদে প্রলয় বিষাণ!

(২)

সে অশান্তি পাপ তাপ, জীব হাহাকার ধ্বনি
পরশে গগন!
বিশ্বে জাগে প্রতিধ্বনি, করুণা ব্যথিত ঋষি
সমাধি মগন!
মানস-নয়ন পটে সহসা ফুটিয়া উঠে
স্তব্ধচ্ছবি মহাপারাবার;—
প্রজা ক্ষোভে রাজ রোষে সংক্ষুব্ধ ভারতভূমি
নামি আসে প্রশান্তি উদার.

(৩)

সে তপস্যা সে শান্তির অমৃত-সিঞ্চিত সখে
প্রতিভা তোমার!
তব উদ্দীপনা পূর্ণ, উদার সঙ্গীতে আশা
ভারত মাতার!
বিচিত্র বীণায় তব জাতি হৃদয়ের তন্ত্রী
সহস্র নবীন রাগে বাজে;
মৃত-সঞ্জীবনী গানে জাগ্রত ধাইব মোরা
ধরণীর কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে!

(৪)

ক্ষুদ্র আমাদের মাঝে অজ্ঞাতে বিকাশ তব,
বিপুল মহান্!
আমাদের পরিমাপে, অনন্ত সুপরিমিত
বিঘত প্রমাণ!
তব রবি করে খরা, রস সার শূন্য চড়া
দীর্ণ দেহ, বিকট দশন;
সে যদি পিপাসা ছলে, পঙ্ক মাখি হাসে খেলে,
দাও তারে জুড়াতে জীবন!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

'গুর্জ্জর কাহিনী' লেখকের নিবেদন।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত 'প্রদীপ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
মহাশয়,

গত আষাঢ় মাসের 'প্রদীপে' মন্নিখিত 'গুর্জ্জর কাহিনী' নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, সাহিত্যের কোন প্রচ্ছন্ননামা সমালোচক 'প্রদীপে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে আষাঢ় মাসের সাহিত্যে সেই প্রবন্ধটির কিঞ্চিৎ দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন; সমালোচক যিনিই হউন, তাঁহার রুচি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। নিজের ছাগল লেজের দিকে কাটিবার অধিকার সকলেরই আছে, সুতরাং সকলেই স্ব স্ব বক্তব্য নিজের কাগজে লিখিয়া আপনার লেখনী কণ্ডুয়ন চরিতার্থ করিতে পারে, কিন্তু যখন দেখা যায় লেখক সাময়িক সাহিত্য-সমালোচনার একটা কাঠামো খাড়া করিয়া অন্যের অজ্ঞতা প্রকাশের মহদুদ্দেশ্যে নিজের অদূরদর্শিতা ব্যক্ত করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণকেও ভুল বুঝিতে দিতেছেন, তখন তাহার অবৈধ সমালোচনা নীরব আজ্ঞার সহিত উপেক্ষিত হইবার উপযুক্ত বোধ হয় না। 'গুর্জ্জর কাহিনী'র লেখকের অভিজ্ঞতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ভরসা করেন, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ লোকের একান্ত অসদ্ভাব না হইতেও পারে, তাই তাঁহাদের জ্ঞাতার্থ লেখকের পক্ষ হইতে দুই চারিটি কথা বলা অনাবশ্যক নহে, অতএব ভরসা করি অনুগ্রহ করিয়া 'প্রদীপে' এই পত্রের জন্য একটু স্থান দান করিবেন।

উক্ত সমালোচক লিখিতেছেন—"গুর্জ্জর কাহিনী" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় গুজরাটীদের যে সব কুৎসিৎ চরিত্র লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। লেখক পাঁচ ছয় মাস বরোদায় থাকিয়া তত্রত্য প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, সহসা তাহার উপর নির্ভর করিতে আমাদের ভরসা হয় না। এই অভিজ্ঞতা লেখকের পর্য্যবেক্ষণের ফল, না কোন শ্বেতাঙ্গের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার বঙ্গীয় পুনরাবৃত্তি? লেখক গুজরাটী সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু ইহা জানি, গুজরাটী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে গুজরাটবাসীর যথেষ্ট চেষ্টা বিদ্যমান। শ্রীযুত নারায়ণ হেমচন্দ্র নামধেয় একজন গুজরাটী আত্মত্যাগী স্বদেশী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,—তিনি গুজরাটী ভাষার পরিপুষ্টির জন্য অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদ প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। লেখক গুজরাটে ছিলেন, কিন্তু এ সব তথ্য জানেন না, দেখিতেছি। তাঁহার চোকের চশমা খানিতে বিদ্বেষের রঙ্গ কিছু ঘোরাল —স্বদেশী ভ্রমণকারীর রচনায় আমরা সহানুভূতি দেখিবার প্রত্যাশা করি। সহানুভূতির অভাব, জাতীয় চরিত্র নির্ণয়ের প্রধান প্রতিবন্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।"

গুজরাটবাসিগণের সহিত এই অযাচিত, স্বেচ্ছাকৃত সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তাঁহারা এই সমালোচকের নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ রহিবেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। লেখকের পাঁচ ছয় মাস বরোদা বাসের অভিজ্ঞতার উপর যদি সমালোচক নির্ভর করিতে ভরসা না পান, তবে সে অপরাধ লেখকের নহে, কারণ জোর করিয়া কাহারো মনে ভরসা জন্মান যায় না; লেখক গুর্জ্জর জাতির 'কুৎসিৎ চরিত্র লক্ষণ' যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সামান্য, লেখনী অপবিত্র হইবে এই ভয়ে অধিক কথা লিখিত হয় নাই, এবং 'গুর্জ্জর কাহিনী'তে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা লেখকের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত; একজন লোক গুজরাটে উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাহা লিখিয়াছে, কলিকাতার একটি গৃহ-কোণে আবদ্ধ থাকিয়া কোন অনভিজ্ঞ সমালোচকেরই তাহার উপর কলম চালাইবার অধিকার নাই, এবং আত্মসংযম-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এই প্রকার অনধিকার চর্চ্চা করিতে ভদ্রোচিত সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। চিত্রকর চিত্র অঙ্কিত করেন, কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত কোন কুৎসিৎ চিত্র দেখিয়া যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলেন, "অরে মূর্খ, তুই যখন এই চিত্র কন্দর্পোপম সুন্দর করিয়া আঁকিস্ নাই, তখন বুঝিলাম তোর রুচি অতি কুৎসিত।" তাহা হইলে কথাটা কি রকম শুনায়? গুজরাটী চরিত্রের অনুকূল সমালোচনা করিতে পারিলে লেখক সুখী হইতেন, কারণ গুজরাটী অন্যতম ভারতীয় জাতি, কিন্তু তাহাদের যে গুণ নাই, শুধু সহানুভূতির অনুরোধে তাহাদের চরিত্রে সেই গুণের

আরোপ করিবার অধিকার লেখকের কতটুকু আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অপরিবর্জ্জনীয় কারণের জন্য সমালোচক লেখকের 'চোকের চশমায় বিদ্বেষের রঙ্গ কিছু ঘোরাল' দেখিয়াছেন, ইহাতে অনুমান হয় তাঁহার নিজের চোখের চশমা খানি তেমন সাফ নহে, সেই জন্যই গুজরাটে বাস করিয়া গুর্জ্জরদিগের সংস্রবে আসিয়া লেখক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সমালোচক মহাশয় তাহা 'কোন শ্বেতাঙ্গের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার বঙ্গীয় পুনরাবৃত্তি' বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তাঁহার চশমাখানি সাফ থাকিলে যে বিষয়ের "সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিবার" তাঁহার সামর্থ্য নাই, তাহার বৃথা আলোচনায় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান নষ্ট করিতেন না, এবং গুজরাট থাকিয়াও লেখক 'শ্রীযুক্ত নারায়ণ হেমচন্দ্র নামধেয় একজন গুজরাটী আত্মত্যাগীর' আত্মোৎসর্গ ও 'বাঙ্গালা পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদ' সম্বন্ধীয় তথ্য জানেন না বলিয়া অসঙ্কোচে দৈববাণী করিতেন না। লেখকের নারায়ণ হেমচন্দ্র ও তাঁহার গুজরাটী অনুবাদ সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা নাই, এ কথার প্রমাণ সমালোচক মহাশয় কোথায় পাইবেন? নিশ্চয়ই 'গুর্জ্জর কাহিনী' পাঠ করিয়া তাঁহার এ দৈবজ্ঞান লাভ হয় নাই, কারণ 'গুর্জ্জর কাহিনী'র উপসংহারে বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ যে গুজরাটী লেখকের নাম উল্লেখ হইয়াছে তিনিই স্বয়ং শ্রীযুক্ত নারায়ণ হেমচন্দ্র, যদি বিশ্বাস না হয়, (না হইবারই কথা কারণ লেখকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে ভরসা হয় না) তাহা হইলে সমালোচক মহাশয় নারায়ণ হেমচন্দ্রের অনুবাদিত দুর্গেশনন্দিনী খুলিয়া দেখিতে পারেন, 'দুর্গশিরে পেচক মৃদু গম্ভীর নিনাদ করিতেছে' (দুর্গেশনন্দিনী, ৩১৩ পৃষ্ঠা) এই লাইনে তিনি পেচককে 'ভেক' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন কিনা। শ্রীযুক্ত নারায়ণ হেমচন্দ্রকে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায় লেখকের ছিল না বলিয়াই 'গুর্জ্জর কাহিনীতে' তাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বঙ্গীয়-বন্ধু এই সমালোচক মহাশয়ের তাঁহার প্রতি উৎকট সহানুভূতি প্রকাশের জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি প্রকাশ করিতে হইল। অবশ্য ভ্রম সকলেরই হয়, নারায়ণ হেমচন্দ্রও ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই 'পেচক'কে 'ভেক' করিয়াছেন, এ ভ্রমও না হয় আমরা গণনার মধ্যে না আনিলাম, কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মৃত্তিকায় শিব গড়িতে গিয়া যাহা গড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে বঙ্কিমবাবু কখন আমাদের সমালোচক মহাশয়ের ন্যায় গৌরবের সহিত সে কথার উল্লেখ করিতেন না। দেখা গেল সমালোচকের নারায়ণ হেমচন্দ্র সম্বন্ধীয় 'তথ্য' অতি পরিপাটি রকম জানা আছে।

"সহানুভূতির অভাব জাতীয় চরিত্র নির্ণয়ের প্রধান প্রতিবন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।" সমালোচকের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য তাহাতে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই, গুজরাটীদিগের প্রতি লেখকের কোন প্রকার বিদ্বেষ নাই কিম্বা বিদ্বেষ ঘটিবার কোন কারণও জন্মে নাই, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পাপাচরণ ও নীচতার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার মহত্ত্ব লেখকের নাই। কোন জাতির বা কোন সমাজের অধিকাংশ লোকের মহৎগুণ বা চরিত্রবল দেখিলে বিদেশী লোকের হৃদয় সহজেই তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং ইহা হইতে স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি, বন্ধুতা সকলই জন্মিয়া থাকে; সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে প্রকৃত যোগ্যতার আবশ্যক, সে যোগ্যতা কাহার আছে বা নাই তাহা যিনি জানেন না, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার অযাচিত উপদেশ দান কেবল ধৃষ্টতা ও জেঠামো প্রকাশ মাত্র। নিবেদন ইতি

বরোদা, গুজরাট,
১৪ই আগষ্ট, ১৮৯৯।

বিনীত
শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

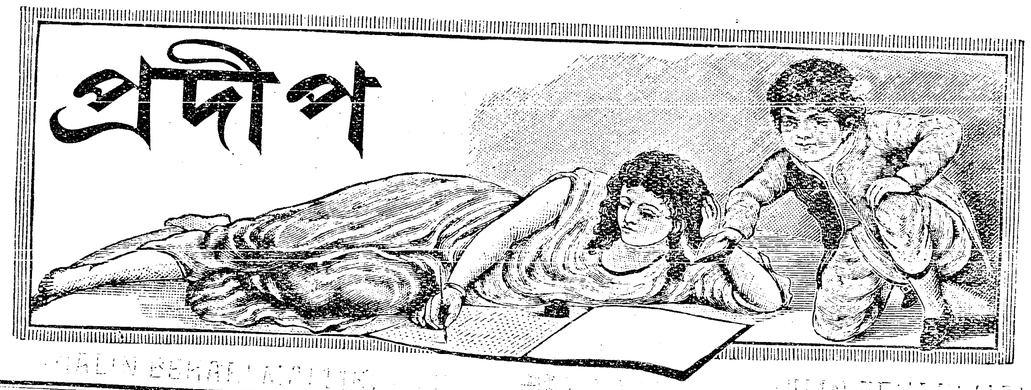

দ্বিতীয় ভাগ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৬। { ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

ভ্রষ্ট লগ্ন।

শয়ন-শিয়রে দীপটি নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে;
স্বপন-মাখানো আঁখিতে আকুল কেশে
জানালার ধারে নিভৃতে বসেছি এসে।
এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে ভোরের আলো
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধাল কাতরে "সে কোথায়, সে কোথায়!"
ব্যাকুল চরণে আমারি দুয়ারে নামি,—
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়
"নবীন পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি!"

গোধূলি-বেলায় তখনো জ্বালেনি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ্;
কনক-আরশি হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেন কালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণ-নয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় আকুল ঘামে-ভেজা ঘোড়াগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধাল কাতরে "সে কোথায়, সে কোথায়!"
ব্যাকুল চরণে আমারি দুয়ারে নামি,—
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়
"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি!"

ফাগুন-রজনী দীপটি জ্বলিছে ঘরে,
দখিনে বাতাস পড়িছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ারের পাশে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর-গেহ,
অগুরু-গন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচল খানি
দুর্ব্বা-শ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি শূন্য রাজপথপানে চাহি,
জানালার তলে বসেছি ধূলায় নামি,—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি!"

আচার্য্য ম্যাক্সমূলর।

ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলর ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রফেসর ম্যাক্সমুলর নামেই বিখ্যাত। ইংরাজী "প্রফেসর" শব্দের প্রচলিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ "অধ্যাপক" কথাটী ব্যবহার না করিয়া যে আমরা তাঁহাকে "আচার্য্য" আখ্যাতে অভিহিত করিলাম, তাহা শুধু নূতনত্ব দেখাইবার জন্য নয়। আমাদের দেশে আমরা প্রফেসর বলিতে যাহা বুঝি, ইংলণ্ডের প্রফেসরেরা ঠিক সেরূপ নন। এখানকার বড় বড় প্রফেসরেরা ও স্কুলের শিক্ষকেরা অনেকেই ধর্ম্মযাজক। অল্পদিন হইল রেভারেণ্ড ওয়েল্ডন সাহেব কলিকাতার বিষপ হইয়া গিয়াছেন; তৎপূর্ব্বে তিনি সুবিখ্যাত ইটন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের একজন আচার্য্য ছিলেন ও রেভারেণ্ড ওয়েল্ডন নামে অভিহিত হইতেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের কলেজ গুলির মাষ্টার বা প্রিন্সিপালেরা প্রায়ই এই শ্রেণীর লোক। ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলর চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড বা অন্য কোন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য নন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে আচার্য্য বলিতে যাহা বুঝাইত, তিনি ঠিক তাই। অক্সফোর্ডের এক প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত-উদ্যানসংলগ্ন চিরহরিৎ তরুরাজির মধ্যে অর্দ্ধ অদৃশ্য একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে আচার্য্য ম্যাক্সমুলরের অবস্থিতি। অবশ্য সেখানে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হোমাগ্নি হইতে সুগন্ধি ধূমরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হয় না এবং ঋষিকন্যাগণের সযত্ন-প্রতিপালিত হরিণশিশুও দেখি নাই; কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন চিরশান্তি এখানে বিরাজ করিতেছে। বহির্জ্জগৎ হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়া এই নির্জ্জনতার মধ্যে আচার্য্য ম্যাক্সমূলর শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। আজকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইলেও কোনও লেক্চার দেন না; তাঁহার অধ্যাপনা এখন কেবল কাগজে কলমে ও নানা দূরদেশ হইতে দর্শনাভিলাষাগত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপেই আবদ্ধ। কিন্তু আচার্য্য মূলর একদিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন যে প্রায়ই প্রিভিকাউন্সিল হইতে রাশি রাশি মোকদ্দমার নথি আসিয়া তাঁহার পাঠ ও চিন্তার বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু এটাতেও প্রাচীন ভারতের আচার্য্যগণের সহিত তাঁহার ঐক্য আছে; শুধু বনে বসিয়া পুঁথি পড়িয়া ও পুঁথি লিখিয়া নিস্তার পাইবার উপায় নাই; রাজাকে ন্যায়বিচারে উপদেশও দিতে হয়। ভারতবর্ষের হাইকোর্ট সমূহ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে যে সমুদায় পুনর্বিচারের আবেদন আসে, সে বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত জানার প্রয়োজন হইলেই আচার্য্য ম্যাক্সমূলারের নিকট তৎসমুদয় প্রেরিত হয়। আর, এক ধ্যানে এক মনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুসরণ করার নাম যদি তপস্যা হয়, তবে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের সমগ্রজীবন এক সুদীর্ঘ কঠোর তপস্যা। কৈশোরে জীবনের যে এক মহান্ উদ্দেশ্য তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, এই সুদীর্ঘ ষাট বৎসর শরীর মনের সকল শক্তি দিয়া তিনি সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য স্বদেশ, স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়াছেন; দেশ হইতে দেশান্তরে অপরিচিতের মধ্যে বাস করিয়াছেন, করিতেছেন। আজ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলরের নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সুপরিচিত। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে কেহ তাঁহাকে চিনিত না; কোনও সহায় বা বন্ধু ছিল না; আপনার পথ আপনাকে কাটিয়া লইতে হইয়াছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যে পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকরাশি দাঁড়াইয়াছিল, তিল তিল করিয়া নিজেকে তাহা সরাইয়া লইতে হইয়াছিল। ইহাকে যদি তপস্যা না বলা যায়, তবে আর কাহাকে তপস্যা বলিব, জানি না। কেমন করিয়া তিনি জীবনের এই ব্রতসাধন করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনার অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ইংরাজীতে যাহাকে man of one idea বলে, আচার্য্য মূলর সেই প্রকৃতির লোক। জীবনের প্রারম্ভে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজও এই বৃদ্ধ বয়সে সকল সুখ ও সম্মানে বেষ্টিত হইয়াও তাহা বক্ষে ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। দারিদ্র্য তাঁহাকে ভীত করিতে পারে নাই, সম্পদ তাঁহাকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। ধন, মান, গৌরব, প্রতিপত্তি সকলই হইয়াছে; বার্দ্ধক্য আসিয়া ক্রমে শরীরকে আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু তথাপিও বিশ্রাম নাই; অশ্রান্ত মনে সমান উৎসাহে আপন কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহার কাছে একদণ্ড বসিলে যুবাহৃদয়েও দ্বিগুণ উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। তিনি যে কি প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা সম্যক্ জানি না। আচার্য্য মূলর প্রায়ই বলেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি ইউরোপীয়গণের অবহেলা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। তিনি সারা জীবন নানা উপায়ে তাহাদিগকে প্রাচীন হিন্দুগণের বহু-দিনসঞ্চিত জ্ঞানরাশির প্রতি অধিকতর আস্থাবান্ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কতিপয় জর্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজ পণ্ডিত ভিন্ন কেহই সংস্কৃত সাহিত্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের সাধারণ লোক এরূপ সুন্দর, গভীর ও প্রাচীন সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ ও সন্দিগ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান কালে যে ইংলণ্ড, জর্ম্মানি ও ফ্রান্সে এই ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবলমাত্র কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অগাধ পরিশ্রমের ফল। আচার্য্য মূলর তাঁহাদের অগ্রণী।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর উত্তর জর্ম্মানির অন্তঃপাতী "ডেশা" নামক ক্ষুদ্র সহরে ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। তখনও জর্ম্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই; জর্ম্মানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু সে সময়েও জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাণ্ডিত্যের জন্য ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। আচার্য্য ম্যাক্সমূলরের মাতামহ জর্ম্মানির সাধারণ শিক্ষা-বিভাগে অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন; তিনি জগদ্বিখ্যাত কবি গেটের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আচার্য্য মূলারের পিতা উইলহেল্ম মূলর জর্ম্মানির একজন প্রসিদ্ধ ও প্রিয় কবি ছিলেন। কিন্তু তিনি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অতি অল্প বয়স হইতেই আচার্য্যমূলরকে নিজের জীবিকা ও শিক্ষার জন্য নিজের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। আচার্য্য মূলর মনে করেন উহাই তাঁহার উন্নতির কারণ। একবার কোনও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি কৌশলে আপনি জীবনে এমন উন্নতিলাভ করিয়াছেন!" তদুত্তরে আচার্য্য মূলর বলিলেন "আমার উন্নতির রহস্য দুটী কথায় ব্যক্ত করা যায়—সে দুটী দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম। আঠার বৎসর বয়সে যখন আমি স্কুল পরিত্যাগ করি, সেই দিন হইতে আমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী কয়টীর সাহায্যে আমার জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছি। ইহাই জর্ম্মানির অধিকাংশ লোকের উন্নতির হেতু।" দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ডিউকাল স্কুলে শিক্ষালাভ করেন; এখানে সঙ্গীত-বিদ্যায় অনুরাগ ও পারদর্শিতার জন্য তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি লাইপ্‌জিক্ সহরের নিকোলাই স্কুলে প্রেরিত হন ও অবশেষে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে লাইপ্‌জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন। লাইপ্‌জিক্ ইউরোপের একটী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ম্মান ও হাণ্ড তথায় অধ্যাপক ছিলেন। এইখানে অধ্যাপক হার্ম্মান ব্রকহৌসের অধীনে শিক্ষাসময়ে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয় হয়। ১৮৪৩ সালে তিনি Ph. D. উপাধি লাভ করেন এবং পরবৎসর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এখানেই তাঁহার জীবনের প্রিয় কার্য্যের সূত্রপাত ও সুবিধা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রষিয়া গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতে অনেকগুলি হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক ক্রয় করেন। বোধ হয় তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বার্লিনে আসেন। হিব্রু সংস্কৃত প্রভৃতি দুরূহ মৃতভাষা শিক্ষা বিদেশীয়দিগের পক্ষে কি কষ্টসাধ্য ও আরম্ভকালে কত অপ্রীতিকর তাহা কেবল ভুক্তভোগী যাঁরা, তাঁরাই জানেন। এখানে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত সংস্কৃত চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে বিখ্যাত ভাষাবিদ্ "বপ্" (Bopp) ও সেলিঙের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; তাঁহাদের নিকট ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশলাভ করেন। কিন্তু তিনি যে নিশ্চিন্তমনে ঈপ্সিতজ্ঞান-চর্চ্চায় সমুদয় সময় অর্পণ করিবেন, তাহার উপায় ছিল না; নিজের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অনেক সময় ব্যয় করিতে হইত। এই সময়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "অন্য লোকের জন্য হস্তলিখিত প্রাচ্য গ্রন্থসকল নকল করিয়া আমি যে কোনও প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছি"। তাঁহার ন্যায় শ্রমশীল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি আইন-ব্যবসায়, চিকিৎসা-শাস্ত্র অথবা অন্য

কোন অর্থকরী বিদ্যায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে স্বল্পকালেই অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন। রাজকার্য্য গ্রহণ করিলেও সত্বর উচ্চপদে আরোহণ করা দুষ্কর হইত না। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সকলের অলক্ষ্যে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। আজকাল তবু ইউরোপে সংস্কৃতের কিছু আদর হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বড় কেহ সংস্কৃতশিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একাকী সংগ্রাম করিয়া আচার্য্য মূলর আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আজ ম্যাক্সমূলরের নাম সভ্যজগতের সর্ব্বত্র সম্মানিত; কত রাজা ও রাজন্যগণ তাঁহার বন্ধুতালাভের প্রার্থী। তিনি একবার বলিয়াছিলেন,"জানিনা কেমন করিয়া এতগুলি রাজমুকুটধারী ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হইল। আমি তাঁহাদিগের বন্ধুতালাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ফিরি নাই; কিন্তু বাস্তবিক ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই জানিবার উপযুক্ত লোক।" রুশিয়ার মৃত সম্রাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জর্ম্মানির মৃত সম্রাট ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। জর্ম্মানির বর্ত্তমান সম্রাটের সঙ্গেও তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা আছে। এতদ্ভিন্ন সুইডেন নরওয়ে ও রুমানিয়ার রাজার সঙ্গেও তাঁহার আলাপ আছে। পৃথিবীর যে দেশে যত বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ আছে তিনি প্রায় তৎসমুদয়েরই সভ্য; এখানে সে গুলির নাম উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কারণ সে গুলির অধিকাংশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আচার্য্য মূলরের সব উপাধিগুলি লিখিতে গেলে একটী সুদীর্ঘ প্যারাগ্রাফ হয়। পৃথিবীর যেখানে যত পণ্ডিত ও বড়লোক আছেন, তাহার অনেকের সঙ্গেই আচার্য্য মূলরের বন্ধুতা আছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন বার্লিন সহরের লাইব্রেরীতে বসিয়া ভূতের মত খাটিতেছিলেন, তখন কেহ একবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিত না। এমন কি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সামান্য একজন নকলনবিসের ন্যায় অতি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া অন্য লোকের বই নকল করিয়া দিতে হইত। কিন্তু মহৎ যাহার লক্ষ্য, ঈশ্বর তাহার সহায়। ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে; আজ সৌভাগ্য-সূর্য্য তাঁহার জীবন-গগনে স্থির উজ্জ্বল জ্যোতি বিতরণ করিতেছে। অন্য যাত্রিগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে বীরপদে অগ্রসর হইতেছেন।

বার্লিন সহরে অবস্থিতিকালে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক, হিতোপদেশের জর্ম্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে প্রাচ্যভাষাবিৎ বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ইউজেন বার্ণো (Eugene Burnouf) পারিসের "কলেজ অব্ ফ্রান্সে" সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আচার্য্য মূলর ১৮৪৫ সালে বার্লিন ছাড়িয়া পারিসে আগমন করেন। এখানে বার্ণোর উপদেশ শ্রবণ কালে তাঁহার মনে যে সংকল্প জাগিয়াছিল তাহা হইতেই সভ্য জগতে আচার্য্য মূলরের নাম বিখ্যাত হইয়াছে; তাহার জন্য প্রত্যেক ভারত-সন্তান তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছেন—সেটী সমগ্র বেদের মুদ্রাঙ্কন। আচার্য্য মূলর যদি আর কোন পুস্তক না লিখিতেন, তবু শুধু ইহারই জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। কিরূপে তাঁহার মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হয় তাহা তিনি নিজেই এমন সুন্দর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, এ স্থলে তাহার অনুবাদ না করিয়া থাকা যায় না।

"১৮৪৫ সালে যখন পারিসে ইউজেন বার্ণোর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে-ছিলাম তখন সর্ব্বপ্রথমে ঋগ্বেদ ও তাহার সুদীর্ঘ ভাষ্য মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আমার চিন্তা আকৃষ্ট হয়। আজও যেন সে দৃশ্য আমার দৃষ্টির সমক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; অধ্যাপক বার্ণো তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও জলন্ত উৎসাহের সহিত পূর্ণবক্ষ নির্ঝরধারার ন্যায় অবিরল যে জ্ঞানধারা উদ্গীরণ করিতেছিলেন আর কখনও তেমনটী দেখি নাই। তাঁহাকে ঘিরিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ছাত্রগণ তাঁহার চারিদিকে বসিয়া আছেন; তাঁহাদের মুখে যেন উৎসাহ উছলিয়া উঠিতেছে। সে দৃশ্য কি কখনও ভুলিতে পারি? তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম প্রাচ্য সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছে; এখানে কেবলমাত্র পরলোকগত ডাক্তার গোওট্-কার ও এবট বাডেলি ও গোরেসিও, নেভ ও রথের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। শেষোক্ত তিনজন ঈশ্বরকৃপায় এখনও (সেই সময়ে) আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলাম; এবং যদিও ইতিপূর্ব্বেই হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কালিদাসের কাব্য, মহাকাব্যগুলি, ষড়্দর্শন ও উপনিষদ ব্যতীত বড় কিছু জানিতাম না। তখন আমি মনে করি-তাম যে উপনিষদের জ্ঞানময়ী বাণী ও অমৃতময় ছন্দ অপেক্ষা আর কিছুই

উৎকৃষ্টতর হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে বার্লিনে অবস্থানকালে সেলিঙের জন্য ইহার কোনও কোনও অংশ অনুবাদ করিয়াছিলাম ও রয়াল লাইব্রেরীস্থ হস্তলিখিত পুস্তক হইতে কতক ভাষ্য নকল করিয়া লইয়াছিলাম এবং এই দিকেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিব ভাবি-তেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে বার্ণো যখন বলিলেন যে বেদের প্রাচীনতম অংশ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনায় উপনিষদ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান, তখন আমি একবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। বার্ণো রোসেন প্রণীত ঋগ্বেদের প্রথমভাগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে যে সব সারসংগ্রহ করিয়াছিলাম ও তাঁহার নিকট যে সম্পূর্ণ হস্তলিখিত সায়ন ভাষ্য ছিল তাহা হইতে যে সমুদায় অংশ উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছিলাম, সেগুলি এখনও আমি যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছি। কিছু দিন পরে বার্ণো আমাকে তাঁহার হস্তলিপি পুস্তক-গুলি পড়িতে দিলেন ও তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া লই-বার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আরম্ভকালে বড় কষ্টকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল; কত সময় আমি নিরাশ হইয়া পড়ি-তাম। তাঁহার আশ্বাসবাণী ভিন্ন আমি কখনই দীর্ঘকাল অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতাম না। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি মূল-বেদ ও সায়নাচার্য্যের টীকার কোন কোন অংশ মুদ্রিত করার অতিরিক্ত বেশী কিছু আশা করিতে পারি নাই। মনে করিতাম তার বেশী আর কিছু প্রয়োজন নাই; কোলব্রুকও ঠিক এইরূপ মনে করিতেন। "হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র" শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধের উপসংহারভাগে কোলব্রুক লিখিয়াছেন যে "বেদ এত বৃহৎ যে তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ অসম্ভব; এবং তদ্দ্বারা না পাঠকের না অনুবাদকের শ্রম সফল হইবে। যে প্রাচীন ভাষায় ইহা লিখিত তাহা অতি জটিল ও দুরূহ। কিন্তু প্রাচ্যসাহিত্যবিদ্ পণ্ডিতগণ সময় সময় ইহা হইতে সাহায্য পাইতে পারেন।" কিন্তু অধ্যাপক বার্ণো ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিতেন বেদ প্রকাশ করিতে হইলে উহা সমগ্র মূল ও টীকার সহিত প্রকাশ করা প্রয়োজন ও তজ্জন্য ইউরোপে যত হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে, তাহা মিলাইয়া দেখা উচিত। দুই একটী উদ্ধৃত শ্লোকের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করা যাইতে পারে না; কারণ তাহাতে দুরূহ অংশগুলি প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।"

যাইশ বৎসরের দরিদ্র যুবক এই সুদুষ্কর কার্য্যসাধন-সংকল্প গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যের প্রতিবন্ধকগুলির বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন তাঁহার অসীমসাহস দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। বেদের কঠিন ভাষা; তাহাতে তিনি বিদেশীয়: অতি অল্পদিন মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন; বিশেষ কাহারও নিকট সাহায্য পাইবার আশা নাই। তৎপূর্ব্বে কেহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। অদ্ভুত প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ পণ্ডিত রোসেন বেদের প্রথমভাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অতি সামান্য অংশ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রতিবন্ধক এই যে কি ভারতবর্ষে কি ইউরোপে কোথায় একখানি সমগ্র বেদ পাওয়া গেল না। ইংলণ্ড জর্ম্মানি ফ্রান্সের পুস্তকাগার সমূহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংগ্রহ করা ভিন্ন সমগ্রবেদের উদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই। অগত্যা তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলেন; এই উদ্দেশ্যেই ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে আগমন করেন ও সেই সময় হইতে ইংলণ্ডেই স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন। এইরূপে অলক্ষ্যে বিধাতা তাঁহার জীবনপ্রবাহ স্বীয় অভিপ্রেত পথে প্রবাহিত করিতেছিলেন; বিবিধ ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া এই দরিদ্র সন্তানকে বাল্টিক সাগরের উপকূল হইতে টেমস্তীরে আনয়ন করিলেন। এই সামান্য ঘটনা হইতে জগতে যে কি মহাফল ফলিবে তাহা আমরা কেহই এখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহি।

ইংলণ্ডে আসিয়া আচার্য্য মূলর ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডনস্থিত পুস্তকাগারে ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বডলিয়ান লাইব্রেরীতে যে সমুদায় হস্তলিপি প্রাচীন গ্রন্থ পাইলেন তাহা মিলাইয়া শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ বেদ প্রণয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ই এত অধিক অনুমিত হইল, যে তাঁহার আশালতা ফলবতী করিবার কোনই উপায় দেখিতে পাইলেন না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে জর্ম্মান রাজদূত ব্যারন বুনসেনের সঙ্গে আচার্য্য মূলরের পরিচয় হয়। ইনি একজন অতি আশ্চর্য্য লোক; এক দিকে যেমন প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞান অপর দিকে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যোৎসাহ অতুলনীয়। ইঁহার প্রতি আচার্য্য মূলরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। ব্যারন বুনসেন নানা প্রকারে আচার্য্য মূলরকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ও তাঁহারই প্রযত্নে ও অনুরোধে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ বেদের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এত দিনে আচার্য্য মূলর আপনার পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত দেখিতে পাইলেন। এখন হইতে তিনি নিশ্চিন্তমনে বেদের মূল ও টীকা সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত হই-বার অবসর পাইলেন। কিন্তু প্রারম্ভেই বুঝিতে পারিলেন যে কাজ যত সহজ মনে করিয়াছিলেন তাহা নয়। অবলম্বিত কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার বীর হৃদয়ও দমিয়া

গেল। তিনি যে সুদুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা একটী ঘটনাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইতিপূর্ব্বে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ হিন্দুদিগের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র মুদ্রিত করিবার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া কলিকাতাস্থ রয়্যাল সোসাইটীকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। রয়্যাল সোসাইটী ভারতের বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বেদ প্রকাশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে সমগ্র বেদ প্রকাশ করা অসম্ভব; কোনখানে সমগ্র বেদ পাইবার উপায় নাই। ইহাতেই আচার্য্য মূলরের অসমসাহসিকতা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে যাহা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেন এই বিদেশীয় যুবক একাকী সেই কাজ সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিয়াই আচার্য্য মূলরও আকুল হইয়া পড়িলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ডাক্তার সেমুয়েল জনসনের ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন সাহিত্যজগতে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু আচার্য্য মূলরের বেদ প্রকাশ তাহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ব্যাপার। বেদের সর্ব্বশেষ ভাগের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, "ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এমন একটি দিন যায় নাই যখন আমার চিন্তা এই কার্য্যে ডুবিয়া ছিল না।" অন্যত্র বলিয়াছেন যে "বিশ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি ক্রীত দাসের ন্যায় খাটিয়া তবে এই কার্য্য সমাধা করি, এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ যাহা পাইয়াছিলাম তাহা ইণ্ডিয়া আফিসের দীনতম কেরাণীর বেতন অপেক্ষা অধিক নয়। তবু ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।" ১৮৪৯ সালে ঋগ্বেদের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতেই আচার্য্য মূলরের খ্যাতি চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িল। ১৮৫০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য্য মূলরকে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেন; এবং চারি বৎসর পরে তাঁহাকে ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। সেই বৎসরই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম্ এ উপাধি দান করেন; ১৮৫৬ সালে তিনি বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর কিউরেটার নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে চারিদিক হইতে পদযশ-গৌরব তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সেও আজ প্রায় ৫০ বৎসরের কথা; সেই সময় হইতে আচার্য্য মূলর যে সমুদায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন কেবলমাত্র তাহার নাম উল্লেখ করিতেও প্রবন্ধের আকার অতিমাত্র বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং কয়েকখানি পুস্তকের নাম করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে। বেদ প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই তিনি বেদের অনুবাদ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, ও কোন কোন অংশের অনুবাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই সংকল্প তাঁহার মনে বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি মনস্থ করিলেন যে তত্তৎভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া হিন্দু, পারসী, ইস্‌লাম ও চীন প্রভৃতি প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয়ের অনুবাদ করিবেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে বিশ বৎসরের মধ্যেই বিভিন্নদেশীয় প্রায় ৫০ খানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য মূলার স্বয়ংই বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অপর পুস্তকগুলি সমুদয়ই তিনি নিজে পড়িয়া সংশোধন করিয়াছেন। কেমন করিয়া যে তিনি এত কাজ করিবার সময় পান আমি ত তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অধ্যাপকতা ভিন্ন কেম্ব্রিজ, এডিনবরা, গ্লাসগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও সময়ে সময়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। এখন এই সমস্ত বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৮ সালে রবার্ট হিবার্টের দানপত্রের সর্ত্তানুসারে তাঁহার ট্রষ্টীগণ "ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটী বৃত্তি স্থাপন করেন, ও তাঁহারা আচার্য্য মূলরকেই প্রথম বক্তা মনোনীত করিয়া তাঁহাকে "ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য এতলোক আবেদন করেন যে, তাঁহাকে প্রত্যেক বক্তৃতা দুই বার করিয়া দিতে হইয়াছিল। ১৮৮৮ সালে লর্ড আডাম গিফোর্ড নামক একজন ধনী স্কচ্ ব্যারিষ্টার তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি হইতে "ধর্ম্মবিজ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। এখানেও আচার্য্য মূলর সর্ব্বপ্রথম বক্তা মনোনীত হন ও উপর্য্যুপরি চারি বৎসর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সে গুলিও এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন তিনি "প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ইতিহাস" নামে এক খানি সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এখন আচার্য্য মূলরের বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু এখনও তিনি সমান উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরও তিনি "রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও উক্তি" এবং "ষড়্‌দর্শনের ইতিহাস" নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের একটী গুরুতর অভাব পূর্ণ করিবে; ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোনও পুস্তক না থাকায় ভারতীয় দর্শনালোচনায় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

আচার্য্য মূলর কখনও ভারতবর্ষে যান নাই; কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার আন্তরিক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে; ভারত সম্বন্ধে এক আদর্শ ছবি তাঁহার হৃদয়ে আছে। হয়ত প্রকৃত ভারত দেখিলে সে আদর্শের প্রতি বিশ্বাস খর্ব্ব হইয়া যাইত। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে যে সমুদয় ভারতসন্তানের সহিত সাক্ষাতে ও পত্রাদিতে পরিচয় হইয়াছে, তিনি সযত্নে তাঁহাদের স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছেন। প্রথম যেদিন আমি আচার্য্য মূলরের বাড়ী যাই, সেদিন দেখিলাম যে তাঁহার পাঠগৃহে ঠিক তাঁহার আসনের সম্মুখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি রহিয়াছে। এমন স্বর্গীয় বন্ধুতা জগতে অতি বিরল; জীবনে যাঁহার সঙ্গে কখনও দেখা হয় নাই তাঁহার স্মৃতি এমন যত্নের সহিত রক্ষা করা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভারতবাসীকে যে তিনি কেমন প্রাণের সহিত ভালবাসেন তাহা তাঁহার নিকট এক মুহূর্ত্ত বসিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। আজ কাল আচার্য্য মূলর অসুস্থতা নিবন্ধন জর্ম্মানীর একটী সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছেন। সেখানে বসিয়া তিনি "আমার ভারতীয় বন্ধুগণ" নামে আর এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্রই তিনি তাঁহার বন্ধু শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ব্রাহ্মসমাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন "ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি নিরাশ হই নাই। ব্রাহ্মসমাজ ঠিক্ পথেই চলিয়াছে।" ইউরোপে ভারতের এমন অকৃত্রিম বন্ধু আর কয়জন আছেন তাহা জানি না।

সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা আচার্য্য মূলরের জীবনের প্রধান ব্রত হইলেও শুধু তাহাতেই তাঁহার উদার হৃদয় আবদ্ধ নয়। ভারতীয় ভাষাগুলি ছাড়া তিনি আরও চৌদ্দটী ভাষা জানেন। ভাষা বিজ্ঞান (philology) সম্বন্ধে তিনি বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এ বিষয়েও তিনি অনেক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে রয়াল একাডেমিতে এবিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্টের ক্রিটীক্ অব্ পিওর রীজন্ (Critique of Pure Reason) এর ইংরাজী অনুবাদ ভিন্ন "মনোবিজ্ঞান" সম্বন্ধে তিনি নিজেও একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার্য্যমূলর নিজে কবি না হইলেও কবিত্বরসাস্বাদনে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে। গ্রীক ও জর্ম্মান কবিগণ তাঁহার বিশেষ প্রিয়। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ও সকলজাতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি। সুদূর চীন, জাপান ও ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে তত্তদ্দেশীয় লোকের লিখিত পত্র প্রায়ই তাঁহার নিকট আসে। জানি না ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের অথবা সার্ব্বজনীন সহানুভূতির অধিক প্রশংসা করিব।

এই সুদীর্ঘজীবনব্যাপী তত্ত্বান্বেষণে তিনি যে কখনও ভ্রান্তমত পোষণ করেন নাই তাহা কেহই বলিতে পারেন না; চাহেনও না। তাঁর প্রত্যেকমতই যে সত্য তাহা বলিতেছি না; তিনিও তাহা বলেন না। পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ তাঁহার অনেক মত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই এই মহৎ জীবনের অদ্ভুত প্রতিভা, ঐকান্তিক জ্ঞান-পিপাসা ও অমানুষিক অধ্যবসায়ের একবাক্যে স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অতিমাত্র প্রশংসা করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে ইহার অনেক দোষ ত্রুটী আছে; স্থানে স্থানে তাহার কিছু কিছু উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে ইহার দোষ আলোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। ইউরোপের লোকের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য এত কম পরিচিত যে বর্ত্তমানকালে ইউরোপে ইহার দোষকীর্ত্তন না করিয়া

ইহার প্রকৃষ্টভাগ প্রদর্শন করা আবশ্যক। তিনি কখনও মনে করেন না যে সংস্কৃত কাব্য কি সংস্কৃতদর্শন জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি মনে করেন যে সংস্কৃত সাহিত্যকে বাদ দিলে আর্য্যজাতির চিন্তাবিকাশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষার জ্ঞানভিন্ন ভাষা-তত্ত্ববোধ একেবারেই অসম্ভব। সংস্কৃতভাষার আলোচনা হইতেই ভাষাবিজ্ঞানের উৎপত্তি।

এতক্ষণ আমরা পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর লইয়া ছিলাম। উপসংহারকালে মানুষ ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। মানুষটীর সঙ্গে আলাপ হইলে তাঁহার অমায়িকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এত যে বড় লোক, এত সম্মান, এত পদ-গৌরব ও কার্য্যবাহুল্য, কিন্তু যে কেহই হউন না কেন সকলের সঙ্গে কি অমায়িক ভাব, কি সৌজন্য! অতি বাল্যকালে যে একটী কথা শিখিয়াছিলাম "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্", তাহার প্রমাণ ইংলণ্ডে আসিয়া পাইয়াছি। এখানকার বড় লোকেদের সঙ্গে আলাপ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের বিনয়ের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। পরলোকগত ভক্তি-ভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্র ব্যতীত পূর্ব্বে এমন বিনয় আর কোথায়ও দেখি নাই। ইংলণ্ডবাসী অনেক যুবক যে বিকট অহঙ্কার লইয়া দেশে ফিরেন, সেটী তাঁহারা কোথায় লাভ করেন তাহা এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আচার্য্য মূলরের সঙ্গে যেমন প্রাণ খুলিয়া নির্ভয়ে নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছি আমার শিক্ষকদের কথা দূরে থাকুক, একটু অধিকবয়স্ক বন্ধু-দিগের সঙ্গেও তেমন ভাবে মিশিতে সাহস করি নাই। আচার্য্য মূলরের গম্ভীর প্রশান্ত মুখশ্রীতে যেন প্রফুল্লতা মাখান রহিয়াছে। আমাদের একটা ধারণা আছে যে সারাদিন পুস্তকের স্তূপের মধ্যে থাকিলে হৃদয়ের সরসতা নষ্ট হইয়া যায়। আচার্য্য মূলরকে দেখিলে সে কথায় আর বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মৃতভাষা ও পুরাতন চিন্তার আলোচনারূপ কঠিন ও অপ্রীতিকর কার্য্যে কি করিয়া মানুষকে উৎসাহিত করিতে হয় তাহা তিনি বেশ জানেন। সেই জন্যই তিনি বর্ত্তমানকালে প্রাচ্য সাহিত্য-বিদ্ পণ্ডিতগণের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আছেন। কোনও রূপ নিরাশাজনক প্রতিবন্ধক সম্মুখে পড়িলেই তাঁহারা আচার্য্য মূলরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের নিকট ধ্রুবতারার ন্যায় হইয়াছে। বিধাতা করুন তিনি সুদীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার জীবনের মঙ্গল জ্যোতিতে আমাদের পথ সহজ ও সুগম করুন। প্রত্যেক ভারতসন্তানকে তিনি যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

অণুবীক্ষণ।

অণুবীক্ষণ নামটি হইতেই যন্ত্রের কার্য্যকারিতা কতকটা বুঝিতে পারা যায়, এবং সকলেই জানেন যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখা যায়। যিনি অণুবীক্ষণ কখনও দেখেন নাই কিংবা ব্যবহার করেন নাই, প্রথমে দেখিবার সময় তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "কত বড় দেখায়?" এই কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত যদি বলা যায়, উপস্থিত যন্ত্রে এক শত কি দুই শত গুণ বড় দেখায়, তাহা হইলে তাঁহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি যন্ত্রের সমুদয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছেন। কোন কোন প্রষ্টা এক শত দুই শতে তৃপ্ত হন না; এক সহস্র দুই সহস্র বলিলে যেন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কতকটা পূর্ণ হয়।

আর একটি প্রশ্ন প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, "দাম কত?" যন্ত্রটি মূল্যবান্ হইলেই গুণবান্ হইবে, এইরূপ যুক্তি প্রশ্নকারকের মনে চলিতে থাকে। কিন্তু সে গুণটি কি, সেই গুণের নিমিত্ত অত মূল্য দেওয়া যায় কি না, ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহার কারণ, সাধারণ লোকের জ্ঞান এই যে, ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ দেখানই অণুবীক্ষণের একমাত্র কার্য্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অণুবীক্ষণের এত উপযোগিতা যে, দুই চারি কথায় তাহার উল্লেখ করা বৃথা। সূক্ষ্ম বস্তুকে স্থূল দেখান, অণুবীক্ষণের একমাত্র ক্ষমতা নহে। স্থূলী-করণ দ্বারা উহা আমাদের জ্ঞানপরিধি বিশাল করিয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল স্থূলীকরণ বলিলে প্রকৃত বিষয় উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ যদি অন্ধের দেখা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্ধের দর্শন আর চক্ষুষ্মানের দর্শনে যে প্রভেদ, কেবল

চক্ষু দিয়া দেখা আর অণুবীক্ষণ দিয়া দেখার মধ্যে প্রায় সেই প্রভেদ। কোন বস্তু দেখিবার সময়, সেটি বড় কি ছোট, আমরা ইহাই মাত্র দেখি না।

অণুবীক্ষণ প্রথম যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ইহার যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। বস্তুতঃ তখনকার আর এখনকার অবস্থায় তুলনাই হয় না। তখন ছিল ধনবানের ক্রীড়নক-বিশেষ, এখন হইয়াছে বৈজ্ঞানিকের চক্ষুবিশেষ। তখন ছিল চিত্তরঞ্জক, এখন হইয়াছে জ্ঞান-বর্দ্ধক। অবশ্য মানব-কৃত যন্ত্র অপেক্ষা মানবজ্ঞান গরী-য়ান্; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সমূহের নির্ম্মাণ-কৌশল, পারিপাট্য, উপযোগিতা প্রভৃতি স্মরণ করিলে, কোন্‌টি গুরু কোন্‌টি লঘু, তাহা স্থির করিতে এক এক সময়ে যেন সংশয় উপস্থিত হয়।

বড় দেখাইয়া অণুবীক্ষণ আমাদের মাংসময় চক্ষুর অতীত বস্তুর রূপ, অবয়ব, রচনা (structure) প্রত্যক্ষ করায়। ইহাতেই উহার বিপুল উপযোগিতা। ইহাতেই উহা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের প্রধান সহায় হইয়াছে। ইহাতেই উহা আমাদের লৌকিক কার্য্যেও নিত্য আব-শ্যক হইয়া পড়িতেছে। এখানে এরূপ দুই একটি উপ-যোগিতার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমে প্রাণরক্ষা, তারপর অন্য কথা। চিকিৎসকের হাতে আমাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চিকিৎসক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, অথচ তাঁহার অণুবীক্ষণ-প্রয়োগে তিনি উদাসীন,—এ কথা শশকের বিষাণ তুল্য হাস্যোৎপাদক। রোগ-নির্ণয়ের নিমিত্ত যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা একটি। সকল রোগের না হউক, কতকগুলি রোগনির্ণয় করিতে অণু-বীক্ষণ অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শ্লেষ্মা দেখিয়া বলা আব-শ্যক, রোগীর ক্ষয়কাশ হইয়াছে কি না; বমি দেখিয়া বলা আবশ্যক, রোগীর উদরে বিস্ফোট হইয়াছে কি না। এই-রূপ, বহুরোগবিনিশ্চয়ে অণুবীক্ষণ চিকিৎসকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ অণুবীক্ষণপ্রয়োগানভিজ্ঞ চিকিৎসকও যা, হস্তপদাদিহীন মানুষও তা। অধিক কথায় কাজ কি, আজ কালির মড়কের দিনে রোগীর রক্ত পরীক্ষার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এ বিষয়ে অণু-বীক্ষণের প্রমাণ একমাত্র বিশ্বাস্য প্রমাণে দাঁড়াইয়াছে। ২৭।২৮ বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গ ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। ম্যালেরিয়াবিষ, ম্যালেরিয়াবাষ্প প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞা একই রোগের নিদানের হইয়াছে। কিন্তু অন্ধকারে বৃথা ভ্রমণ না করিয়া অণুবীক্ষণের দীপ সঙ্গে লইলে এতদিন উহার নিদান অজ্ঞাত থাকিত না। যেরূপ শুনা যাইতেছে, জ্বর-রোগীর রক্ত অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ম্যালেরিয়া কিনা, তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়।

ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে বা সমাজশাসনে প্রাণবিসর্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। লোকটি নরহত্যাপরাধের নিমিত্ত প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে; বস্ত্রে শোণিত, কেশ পাওয়া গিয়াছে। অণুবীক্ষণ যথার্থ বলিয়া দিবে, সে রক্ত মানুষের কি না, সে কেশ হতব্যক্তির কি না।

কূটলেখন অর্থাৎ জাল দলিল দস্তাবেজ নিরূপণ করা ধর্ম্মাধিকরণে প্রায়ই আবশ্যক হয়। দলিল জাল হয়, দুই রকমে। পুরাতন লেখা চাঁচিয়া ধুইয়া সেই স্থানে নূতন লেখা, কিংবা পুরাতন লেখার মধ্যে নূতন লেখা যোগ করিয়া দুর্বৃত্তেরা ন্যায়বিচারে বিঘ্ন জন্মায়। কিন্তু অণুবীক্ষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ প্রকাশিত হয়। কাগজ, কালী, লেখক,—তিনই সাক্ষী হইয়া দাঁড়ায়। স্থূল দৃষ্টিতে হাতের টান ও কালী এক প্রকার দেখাইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিভিন্ন বোধ হয়।

লেখাপড়ায় জাল হয়, খাবার জিনিসে ভেল হয়। গমের ময়দা কিনিতে গিয়া চাউলের গুঁড়া কিনিতে হয়, যবের পালো কিনিতে গিয়া ময়দা কিনিতে হয়। বঞ্চনার স্রোত ক্রমশঃ যেন বাড়িতেছে। পশমী নামে কার্পাস সূতার কাপড় বিক্রয় হইতেছে। নিকৃষ্ট বস্তু চাক্‌চিক্যে উৎকৃষ্টের তুল্য হইতেছে। কিন্তু অণুবীক্ষণ চক্ষুর জ্যোতিঃ বাড়াইয়া দিয়া প্রতারণা ধরাইয়া দিতেছে। এমন কি, ভাল ইস্পাত কি মন্দ ইস্পাত, তাহাও বলিতে ক্ষান্ত হয় না।

বিজ্ঞানচর্চ্চায় অণুবীক্ষণের প্রয়োজন বলিতে গেলে পৃথক্ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন। অণুবীক্ষণ ব্যতীত জীববিদের এক দণ্ড চলে না। বাহ্যগঠন দেখিয়া আভ্যন্তর গঠন অনুমান করিতে পারা যায় না। অথচ আভ্যন্তর রচনা (structure) পরিদর্শন ব্যতীত জীবদেহের নির্ম্মাণ-জটিলতা, ক্রিয়াজটিলতা বুঝিতে পারা যায় না। চক্ষুর অগো-

চরে এক বিশাল জীবরাজ্য বিস্তীর্ণ ছিল। এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই অণুবীক্ষণকে পথ-প্রদর্শক করিতে হয়।

একগাছি চুল কত মোটা, তাহা পরিমাণ করিতে অণুবীক্ষণ চাই। প্রমাণ মাপকাঠি প্রমাণ আছে কিনা, তাহা খালি চোকে বলা দুষ্কর। এক টুক্‌রা অভ্র কত পুরু, তাহা অণুবীক্ষণেই বলিতে পারে। অভ্রে একটা রেখা দেখা যাইতেছে। সেই রেখাটি অভ্রের উপর পিঠে, কি নীচের পিঠে, কি ভিতরে,—ভিতরে হইলে কত ভিতরে —এ সকল প্রশ্নের উত্তর অণুবীক্ষণই জানে। রেখাটি উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে কি না, তাহাও অণুবীক্ষণ বলিয়া দিতে পারে। অমুক অমুক তারাদ্বয়ের অন্তরে এক আধ্ অনুকলার প্রভেদ আছে কিনা, তাহাও জানিতে গেলে এক প্রকার অণুবীক্ষণ চাই। বস্তুতঃ রাসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি এমন জড়বিদ্যাই নাই, যাহাতে অণুবীক্ষণ কোন না কোন কাজে আবশ্যক হয়।

অণুবীক্ষণ দ্বারা দূরবীক্ষণের কাজ করা যাইতে পারে। একটু নিজের প্রসঙ্গ করিতেছি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। সে বৎসর সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণ উপলক্ষে দেশে বিদেশে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। এ দেশের মধ্যবর্ত্তী, নৈঋত হইতে ঈশান কোণে অবস্থিত, স্থানবিশেষ হইতেই উক্ত সূর্য্যগ্রহণ পূর্ণ দেখিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থানের লোকেরাও গ্রহণকে অসাধারণ জ্ঞান করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছিল। কটকেও আমার বন্ধুবান্ধবগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে উক্ত গ্রহণ দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বেই বুঝিলাম, নিজের দেখা দূরে থাক্, গ্রহণের সময় তাঁহাদিগকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। শেষে তাহাই হইল। দুইটি দূরবীক্ষণ দিয়াও সকলের মনস্তুষ্ট করা অসাধ্য হইল। কাগজে সূর্য্যের প্রতিরূপ ফেলিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে সূক্ষ্ম বস্তুর ফটোগ্রাফ তুলিবার নিমিত্ত একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সজ্জিত ছিল। তাহা দেখিয়া অণুবীক্ষণ সহযোগে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ফটোগ্রাফ তুলিবার কল্পনা মনে হইল। এইরূপে কয়েকখানি ফটো তুলিয়াছিলাম। যাহা হউক, বলিতে গেলে অণুবীক্ষণ দ্বারা দূরবীক্ষণের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। একখানি কিরণ-সমাহারী দৃষ্টি-কাচ দ্বারা সূর্য্যমূর্ত্তি ক্ষুদ্র করিয়া ও সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে অণুবীক্ষণ দ্বারা বৃহৎ করিয়া ফটো তোলা হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনে, কৌতূহল উদ্দীপনে অণুবীক্ষণ অনেকের পরিচিত। মাছির ডানা, পিঁপড়ের ঠ্যাং হইতে যত কিছু ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র বস্তু আছে, তৎসমুদয় দেখিয়া বহু সময় আনন্দে অতিবাহিত করিতে পারা যায়। দেখা কিন্তু দুই প্রকার; চোখ মেলিয়া দেখা, আর চোখ বুজিয়া দেখা। অনেকে চোক বুজিয়া বেড়ান, চোখ বুজিয়া দেখেন। অণুবীক্ষণ পাইলেও তাঁহারা চোখ বুজিয়া দেখেন। চোখ বুজিয়া দেখিলে প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। চোখ মেলিয়া দেখা অভ্যাস করিতে হয়। চিত্রকর্ম্ম সেই অভ্যাসের মূলে। দৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ আঁকিতে গেলেই চোখ মেলিতে হয়, তখন আর চোখ বুজিয়া দেখা চলে না। এইরূপেই জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। কিন্তু চোখ বুজিয়া দেখিলেও অনেক ফল আছে। আর কিছু না হইলেও তাস-পাশা ও পরকুৎসাদির ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

এ নিমিত্ত বহুমূল্যের অণুবীক্ষণ আবশ্যক হয় না। বস্তুতঃ বহুমূল্যের যন্ত্র ক্রয় করিলেই যন্ত্রের সার্থকতা হয় না। মূল্যবান্, গুণবান্ যন্ত্র ব্যবহার করিতে সময় ও শিক্ষা আবশ্যক হয়। যে ভাল সূত্রধর, সে এক বাটালি দ্বারা বহু অস্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। তেমনই একটি সামান্য অণুবীক্ষণ দ্বারা বহুবিধ জ্ঞান অর্জ্জিত হইতে পারে। পরন্তু, মূল্যবান্ জটিল-নির্ম্মাণ যন্ত্র প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ফলদায়ক হয় না। যে বাজারের দাঁড়ি পাল্লারই সম্যক্ ব্যবহারে অক্ষম, তাহাকে রাসায়নিকের তুলাযন্ত্র দেখান কর্ত্তব্য নহে।

দুই শত আড়াই শত গুণ বড় দেখাইতে পারে, এমন একটি অণুবীক্ষণ পাইলে অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ যন্ত্র ক্রয় করিতে ৫০৲—৬০৲ টাকার অধিক ব্যয় করা অনাবশ্যক। যদি বড় দেখাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও ৬০৲—৭০৲ টাকায় এক প্রকার ব্যবহারোপযোগী অণুবীক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে। এরূপ যন্ত্র দ্বারা সাড়ে চারিশত গুণ বড় দেখাইবার সাধন থাকে।

কিন্তু একশত গুণ বড় দেখানর দুইটি অর্থ আছে

অণুবীক্ষণে দৃষ্ট বস্তু কেবল এক দিকে বড় দেখায় না। উহার দৈর্ঘ্য যেমন বাড়ে, প্রস্থও তেমনই বাড়ে। এক বর্গ ইঞ্চ বস্তু দশগুণ বড় দেখাইলে তাহার ক্ষেত্রফল একশত বর্গইঞ্চ হয়। কোন কোন প্রতারক ক্রেতাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এই প্রকারে একশত গুণ গণনা বিজ্ঞাপনে লিখিয়া থাকে। বড় দেখানর নিগূঢ় অর্থ ত্যাগ করিয়া স্থূল অর্থ ধরিলে সেরূপ যন্ত্রের বর্দ্ধিনী ক্ষমতা দশগুণ লেখা উচিত। বস্তুতঃ একদিকে যত গুণ বড় দেখায়, তাহা বলিয়া অণুবীক্ষণের স্থূলীকরণ ক্ষমতা ব্যক্ত হইয়া থাকে। তবেই, যে অণুবীক্ষণের বর্দ্ধিনী ক্ষমতা শত, তদ্দ্বারা দৃষ্টবস্তু শতগুণ শত বা দশসহস্র গুণ বৃহৎ দেখায়।

অণুবীক্ষণ ক্রয় ব্যয়সাধ্য বটে। কিন্তু বঙ্গদেশের অনেক পাঠাগারে বহুমূল্য গ্রন্থও রক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল পুস্তক ক্রয়ে পাঠাগারের সমুদয় আয় ব্যয়িত না করিয়া কিয়দংশ দ্বারা শিক্ষোপযোগী অণুবীক্ষণাদি ক্রয় করিলে উপকার হইতে পারে। যে সকল বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা অনুকূল, সে সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা অক্লেশে এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। আশা করি, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির তুমুল পরিবর্ত্তনে প্রত্যক্ষ-শিক্ষাক্রম প্রচলিত হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ভারতীয় মানমন্দির।

আজ কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র বি.এর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে; তাই অনেক লোক জ্যোতিষের দুইচারিটি কথা লিখিয়া থাকেন। পাঠকদিগের মধ্যে হয়ত কেহ সম্প্রতি বিজ্ঞান-শাখাতে বি.এ পাশ করিয়া থাকিবেন এবং আমি তাঁহাদের বহু কষ্টসাধ্য জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে "দুই চারিটী কথা" বলিয়া অবমাননা করাতে আমার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু কালের ভবিতব্যতা কে খণ্ডাইবে? যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন সে জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করাও উপহাস করা মাত্র। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ লকিয়ার (Lockyer) কেহ পার্কার (Parker), কেহবা প্রক্টর (Proctor) পড়িয়া, আবৃত্তি করিয়া ও তদনন্তর গুনরাবৃত্তি করিয়া মহাদম্ভে এক একজন জ্যোতির্ব্বিদঙ্করূপে উদ্গত হইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে (যথা 'প্রতিবাসী'তে) দুঃখের কান্না শুনিতে পাওয়া যায় যে লকিয়ার পড়িলে পার্কারের বিদ্যা পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ্যা এক একখানি গ্রন্থবিশেষ। যেমন মিল্টন পড়িলে টেনিসন শিখা যায় না, অথবা বেদব্যাস পড়িলে বাল্মীকি আয়ত্ত হয় না, তেমনই লকিয়ার পড়িয়া পার্কার কিরূপে আয়ত্ত করা যাইবে? এই বিষম সমস্যা কি কেবল ছাত্রদিগের মধ্যেই দেখা যায়? অথবা শিক্ষকদিগের মধ্যেও এই গ্রন্থাতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে? আমার যেন অনুমান হয় যে এই আতঙ্ক উভয়তঃই প্রকাশ পাইয়াছে। যে জ্যোতির্ব্বিদঙ্কুর আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন, সেই ব্যক্তিই কালে জ্যোতির্ব্বিদটবীরূপে পরবর্ত্তী ভাবী জ্যোতির্ব্বিদঙ্করদিগের জন্য বীজ বপন করিতে যাইতেছেন। ইহার প্রতীকার কোথায়?

বহুকালপূর্ব্বে ভারত-জ্যোতিষী ভাস্কর সুললিত-কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া গাহিয়াছিলেন—(গণিতাধ্যায়, ১১শ শ্লোক)—

বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষং
মুখ্যতা চাঙ্গমধ্যেঽস্য তেনোচ্যতে।
সংযুতোঽপীতরৈঃ কর্ণনাসাদিভি-
শ্চক্ষুষাঙ্গেন হীনো ন কিঞ্চিৎকরঃ॥

অর্থাৎ বেদের যতগুলি "অঙ্গ" আছে তন্মধ্যে জ্যোতিষ সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাকে "বেদচক্ষু" নামে অভিহিত করা হইয়াছে; কারণ কর্ণ নাসিকাদি বিদ্যমানেও চক্ষুহীন ব্যক্তি যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হয় সেরূপ জ্যোতির্ব্বিদ্যার অভাবে বেদশিক্ষা অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হইবে।

জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ জিনিশ। প্রত্যক্ষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে হইলে জ্যোতিষই একমাত্র অবলম্বন; একারণ ইহাকে বেদের চক্ষু বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষে রাখিয়া কেবলমাত্র জ্যোতিষের জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও চক্ষুই তাহার একমাত্র উপায়। দৃষ্টতঃ বা প্রত্যক্ষতঃ ভিন্ন জ্যোতিষের অন্য শিক্ষা নাই। এই একমাত্র জ্যোতিষ-শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল গ্রন্থমার্গে জ্যোতিষ শিক্ষা করেন তাঁহারা অন্ধের ন্যায় পথ হাতড়াইয়া চলেন, এবং যাঁহারা ঐরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেন তাঁহারা

এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখান মাত্র। যেমন পাক-প্রণালী পড়িয়া রন্ধনকার্য্যে দক্ষতালাভ করা যায় না, তেমনি জ্যোতিষের গ্রন্থ পড়িয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। আবার যেমন পাকপ্রণালী পড়িয়া রন্ধনকার্য্য শিক্ষা দেওয়া যায় না, তেমনি জ্যোতিষের গ্রন্থ পড়িয়াই জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই সহজ সত্যটুকু ধারণা করিতে না পারাতেই বঙ্গদেশে লকিয়ার ও পার্কারের দ্বন্দ্ব সুটিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব মিটাইবার একমাত্র উপায় মানমন্দির স্থাপন। লকিয়ার ও পার্কারে যদি কোন মতদ্বৈধ থাকে মানমন্দিরই তাহার মীমাংসাস্থল।

ভারতবর্ষে কোথায় কয়টী মানমন্দির আছে এবং তাহাতে কি কি কার্য্য হইতেছে তাহা পূর্ব্বকথিত বহু জ্যোতির্ব্বিদঙ্কুর ও জ্যোতির্ব্বিদটবীর অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা, এই ধারণাতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

প্রারম্ভেই বলা প্রয়োজন যে বাঙ্গালাদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার উপযোগী একটীও মানমন্দির নাই। আলিপুরে একটী Meteorological Observatory আছে। তাহাতে কেবল দৈনন্দিন বায়বীয় উৎপাতাদি পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছে। এই শেষোক্ত মানমন্দিরে সম্প্রতি কেবল পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিরই পর্য্যবেক্ষণ হইবে। পৃথিবীর চুম্বকশক্তি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের একটী দুরূহ সমস্যা, অতএব উক্ত মানমন্দির সাধারণ জ্যোতিষ শিক্ষার্থীর পক্ষে "অগম্য" স্থানরূপে পরিচিত হইবে।

ভারতবর্ষে একমাত্র মানমন্দির, যাহাতে জ্যোতিষের বিশেষরূপ চর্চ্চা হইয়া থাকে, এবং যাহার ফল জ্যোতির্ব্বিদ সমাজে গৃহীত ও গণনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান মান্দ্রাজে। এই মানমন্দির "মান্দ্রাজ সরকারী মানমন্দির" নামে বিখ্যাত। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ সময় বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। ইহা ১৭৯২ খৃঃ অব্দে গোল্ডিঙ্গহাম নামক একজন ইংরাজ জ্যোতিষী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার কার্য্যক্ষেত্র এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়া কোডাইকনল পাহাড়ে যাইবে স্থির হইয়াছে। ইহার সময়বিজ্ঞাপন বিভাগ মান্দ্রাজেই থাকিবে। কোডাইকনল মানমন্দিরের কার্য্যক্ষেত্র অনেক গুণ বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে একটী সমৃদ্ধিশালী মানমন্দিরে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১৮২৬খৃঃ অব্দে বোম্বাই সহরের অন্তর্গত কোলাবা দ্বীপে একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা এক্ষণে প্রধানতঃ পৃথিবীর চুম্বকশক্তি পর্য্যবেক্ষণেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ এবং কোলাবা উভয় মানমন্দিরেই আলিপুরের ন্যায় বায়বীয় উৎপাতাদি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন পুনা সরকারী বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে (Royal College of Sciences, Poona) একটী মানমন্দির আছে। তথাকার বিজ্ঞানাধ্যাপক নায়গমবালা ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ। এই মানমন্দিরের প্রধান কার্য্য সূর্য্যের তেজ বিকিরণ শক্তির দৈনন্দিন পর্য্যবেক্ষণ।

দেরাদুনে ভারতবর্ষীয় জরীপ বিভাগের একটী বৈজ্ঞানিক শাখাকার্য্যালয় (Office of the Trigonometrical Branch of the Survey of India) আছে। তাহার তত্ত্বাবধানে তথায় একটী মানমন্দিরের কার্য্য চলিয়া থাকে। ইহাতে "সূর্য্যের প্রতীকরণ" (Solar Photography) কার্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ এই মানমন্দিরে প্রতিদিন একাধিক "সৌর-প্রতীকরণ" বা সূর্য্যের ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই কার্য্য অনেকটা "চিনির বলদের" ন্যায় সম্পন্ন হয়। যে কাচে ফটোগ্রাফের Negative তোলা হয়; তাহা অবিকৃতাবস্থায়, মুদ্রিত না করিয়াই বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যেমন বলদ চিনি বহিয়া নিয়া যায় ও মহাজন লাভবান হয়, কিন্তু বলদের বোঝা বহাই সার হয়; তেমনি ভারতবর্ষে ফটো তোলা হইল আর বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজ তাহার রসসম্ভোগ করিল, ভারতবাসী তাহা দেখিয়া (অথবা আমার মতন বিকারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখকের লেখনীর মুখে শুনিয়া) কৃতার্থ হইল।

সিমলাপাহাড়ে সূর্য্যের তাপবিকিরণ পর্য্যবেক্ষণার্থ একটী অতিক্ষুদ্র মানমন্দির আছে। ইহাকে Actinometric Observatory কহে। ইহা অধ্যাপক নায়গমবালার মানমন্দিরের সম্পূর্ণ বিসদৃশ। অধ্যাপক নায়গমবালা সূর্য্যের কিরণ-বিশ্লেষণ (Spectroscope) দ্বারা তাহার তাপবিকিরণ ও তাহা হইতে সৌরদেহের উপাদান বিষয়ক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সিমলা মানমন্দিরে কেবল মাত্র একটী তাপ-বিকিরণ-যন্ত্র (Actinometer) দ্বারা সূর্য্যের দৈনন্দিন বিকিরণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

এই সকল মানমন্দির ভারতগবর্ণমেণ্টের স্থাপিত ও গবর্ণমেণ্ট দ্বারাই পরিচালিত। ভারতবর্ষের জনসাধারণ ইহাদের প্রতি অতিশয় উদাস-নেত্রে দেখিয়া থাকেন। ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও অধীনতা বা সখ্যতা-পাশে বদ্ধ নহে।

এই সকল মানমন্দির ভিন্ন আরও দুইটী বিখ্যাত মানমন্দির আছে, যথা—কাশী মানমন্দির ও জয়পুর মানমন্দির। এই উভয় মানমন্দির হিন্দু-প্রণালীতে গঠিত এবং জয়পুর-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়সিংহের স্থাপিত। প্রাচীনকালে কাশী জ্যোতিষানুশীলনের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদদিগের কার্য্যকুশলতার জন্য মহারাজা জয়সিংহ কাশী মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপন রাজধানী অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন না হয় এজন্য জয়পুরেও একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (আমি বিলাত-প্রবাস কালে লণ্ডনস্থ জুবিলী ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে জয়পুর মানমন্দিরের একটী ক্ষুদ্রাকার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে জয়পুরের মহারাজার জুবিলী দানের ফল বুঝি ঐ ক্ষুদ্র মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে।) এই উভয় মানমন্দির জয়পুরাধিষ্ঠাতা মহারাজা জয়সিংহের অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এ কারণ মনে হয় যে পাছে ব্যবহারে এমন কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয় ক্ষয় হইয়া যায় এই ভয়ে উভয় মানমন্দিরই অব্যবহৃত থাকিয়া ভারতীয় মানমন্দিরের চরম পরীক্ষা দিতেছে!

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বৈদেশিক স্মৃতি চর্চ্চা।

মহারাষ্ট্রদেশে এসে কি রকম ক'রে দিন কাটাচ্ছি আপনাদের মত আত্মীয় বন্ধুগণ তার একটা হিসাব চাইতে পারেন; ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমা ছেড়ে একেবারে পশ্চিম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেশ হ'তে যে কেবল ষোল সতের শো মাইল তফাতে আছি তাই নয়; জলবায়ু, গাছপালা পশুপক্ষী এদের মধ্যে তত তফাৎ নেই, যতটা তফাৎ এই দুই দেশের মানুষের আচার ব্যবহার আর রীতি নীতির মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ যখন গাছের দিকে চাই তখন যে আরব সাগরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি তা মনে হয় না; কাঁকে কাঁকে টিয়ে পাখী যখন আমাদের বাসার সম্মুখে বড় নিমগাছটায় এসে বসে, তখনও সে কথা মনে হয় না; কারণ এ গাছও আমাদের দেশে আছে এবং টিয়ে পাখীর ঝাঁকেরও সেখানে অভাব নেই, কিন্তু যেই আমাদের চাকরটার ষ্টিফেনের ব্লু ব্ল্যাক কালির মত ঘন কৃষ্ণ রঙ্গ, আর অর্দ্ধেক কামানো মাথায় নিবিড় টিকির গোচ্ছা দেখি, তখনই আমার এদেশে অবস্থানের কথা মনে পড়ে যায়। এমন রঙ্গ আর এমন টিকি আমাদের দেশে সহসা মেলে না বলেই এ রকম হয়, এই জাতীয় বৈচিত্র্যের অভাব নেই

কিন্তু যত রকম বৈচিত্র্যই এ দেশে বঙ্গমাতার আজন্ম-ক্রোড় পালিত এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালীটিকে অভিভূত করুক, এ দেশী মানুষের চরিত্রগত বৈচিত্র্য আমার কাছে সকল চেয়ে গুরুতর বলে বোধ হয়; ঠিক জানি নে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যখন ছিলাম, তখন এত বড় বড় শিক্ষিত আলোক-প্রাপ্ত মনুষ্যগণের সংস্রবে আসার অবসর ঘটে নি, নিজের কাজ, আর নিজের সাহিত্য ও চিন্তা নিয়েই বিভোর থাকতাম, কিন্তু এ যেন ছোট একটী নদীর কোল ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড সাগরের মধ্যে এসে পড়েছি, এক একটা মানুষের ঢেউ আস্‌চে আর বিশ হাত তফাতে গিয়ে পড়চি, চোখে মুখে নোনাজল প্রবেশ কর্‌চে এবং সে ধাক্কা না সামলাতেই আর একটা ঢেউ আস্‌চে; আমাদের বাঙ্গালী বন্ধুটি কিন্তু নির্ব্বিকার, সমুদ্র পারে গিয়ে তিনি মহাসাগরের ঢেউ সহ্য করে এসেছেন, অল্পে তাঁকে ব্যাকুল কর্‌তে পারে না, কিন্তু আমি বেচারা একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি। নিজের সেই দুর্দ্দশার কথা আজ একটু লিখবো, এ বিপদে যদি আপনাদের কিছু সহানুভূতি লাভ কর্‌তে পারি।

আমরা এখানে একজন দক্ষিণীব্রাহ্মণ (মরাঠা) ব্যারিষ্টারের সঙ্গে একত্র বাস কর্‌চি। ইনি এখানকার কোন উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত। অবশ্য আজ কাল আমাদের দেশে এমন ব্যারিষ্টারের অভাব নেই যারা "বালিকা নববধূর গহনা বিক্রয় এবং বৃদ্ধ পিতার বহু দুঃখ-সঞ্চিত

অর্থ অপহরণ করে' বিলাতে অনায়াসে নিশ্চিন্ত-মনে নিরুদ্বেগে শ্মশ্রুকর্ম্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোপনে পলায়ন করে, এবং শ্মশ্রুকর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরেই বেশ বদল করে' ঘাড়ের চুল ছেঁটে দুই রিক্ত পকেটে দুই হাত গুঁজে দিয়ে চুরুট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে অত্যন্ত চটুল-চঞ্চল ভাবে দেশে ফিরে আসে। এই কলে ছাঁটা ছোকরাটি যে উনবিংশ শতাব্দীর তীর্থস্থানে গিয়ে মহাসমুদ্রের ঢেউ খেয়ে এসেছে এমনটা কিছুতেই মনে হয় না। মনে হয়, কোন এক সখের নাট্যশালায় কিছু কাল অভিনয় করে' এল, সেখানকার বাঁকাসুর এখনো মুখে লেগে আছে, এবং সেখানকার অধিকারী মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সাজের বেশ খানি একে দান করেছেন—" আর পারিতোষিকের মধ্যে ব্যারিষ্টারীর সনদ খানা। আমাদের এই মরাঠা বন্ধুটি এ শ্রেণীর ব্যারিষ্টার নন, ইনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে Government of Indiaর scholarship নিয়ে বিলাতে যান, এবং উপযুক্ত লেখা পড়া শিখে ব্যারিষ্টার হয়ে যথাসময়ে দেশে ফিরে এসেছেন। হিন্দুধর্ম্মে এঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে, সাধু সন্ন্যাসীর উপর ভারি ভক্তি দেখ্‌তে পাই এবং চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করেও হিন্দুধর্ম্মের অনেক বিধি মেনে থাকেন। জানি না তাঁর অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত সহযোগিগণ এজন্যে তাঁর পরকাল সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করেন কিনা।

লোকটি সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং সরল ও মধুর প্রকৃতির। প্রতিদিন রাত্রে ইনি গীতা আবৃত্তি করেন। আমাদের দুজন বাঙ্গালীর সংস্রবে এসে ইনি অনেক দিন হতে মনে কচ্চেন কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিবেন। আমি তাঁকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানা বর্ণপরিচয় আনিয়ে দিয়েছি, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য অবলম্বন করেই তাঁর বঙ্গভাষা শিক্ষার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কোন একটা ছুটীর দিন প্রায়ই দেখা যায় যে ইনি 'প্রদীপ' কি আর কোন বাঙ্গলা বই খুলে মরাঠাসুলভ উচ্চারণের স্বাভাবিক খটমট বজায় রেখে পড়বার দুশ্চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনটে 'স' আর দুটো 'ব' এবং 'ষ' ও 'য়' এর উচ্চারণগত পার্থক্য বজায় রাখতে গিয়ে ইনি এ রকম গলদঘর্ম্ম হন যে সে রাত্রে আর তাঁর গীতা পাঠের উৎসাহ পর্য্যন্ত থাকে না। তাঁর বিশ্বাস তিনি আমাদের অনেক বাঙ্গালা কথা বোঝেন, কিন্তু শুধু বুঝেই সন্তুষ্ট থাকেন না, আমাদের কাছে তাহা ইংরাজীতে ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত করেন। এখানে যদি তাঁর এক আধটা ব্যাখ্যার উদাহরণ না দিই তা হলে আপনার কোন কোন বন্ধু হয়ত আমাদের এই মরাঠা বন্ধুটির অত্যুৎকট বঙ্গভাষানুরাগের কথা মিছে গল্প বলেই উড়িয়ে দেবেন।

কয়েক দিন হলো, বাঙ্গালী-মেয়ের পোষাক নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চল্‌ছিল, সে দিন আমরা নূতন 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র এক সংখ্যা পেয়েছি। আনন্দ-বাজারের পিঠে একটা তেলের বিজ্ঞাপন ছিল, কেশ রঞ্জন কি ঐ রকম একটা কবিরাজী তেল। বিজ্ঞাপনটি সচিত্র, এবং চিত্রখানা কিছু জাঁকালো, অর্থাৎ চিত্রে উক্ত তেল মাখায় দিয়ে কোন রূপসী বঙ্গযুবতী মেঘের মত কালো কুঞ্চিত অপর্য্যাপ্ত কেশে চিরুণী চালাচ্ছেন, আর তাঁর গায়ে আছে একটা হাতা ঢিলে ফুলকাটা সেমিজের উপর একখানা কোকিল পেড়ে কাপড়ের আঁচলা। আমাদের মধ্যে একজন সেই ছবিটে উক্ত মরাঠা বন্ধুটিকে দেখিয়ে বল্লেন, "আজকাল আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের পোষাক এই রকম"—তিনি বল্লেন—"এ যে পারসির মত দেখ্‌তে।"—বোধ হ'ল তিনি কিছু নিরাশ হয়েছেন; জানিনে পারসীর মেয়ের সঙ্গে বাঙ্গালীর মেয়ের তুলনা করতে গিয়ে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর তাঁর কিছু অভক্তি জন্মিয়ে গেল কিনা, কিন্তু তাঁর কোন রকম ভ্রান্তি হয়ে থাকলেও আমি তা দূর করবার কোন চেষ্টা কর্‌লাম না, কারণ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেলে অনেক পরিমাণে তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করে রাখ্‌তে হয়, আমার সে পরিমাণ উৎসাহ বা শক্তি নেই।

যাহোক, যখন আমাদের কথাবার্ত্তা এই ভাবে চল্‌ছিল, তখন আমাদের আড্ডায় তৃতীয় একজন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন, পারসীর মেয়ের সঙ্গে বঙ্গললনার তুলনা দেওয়ায় তাঁর আর্য্যরক্ত বোধকরি কিছু গরম হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বল্লেন "পারসী! বাঙ্গালীর মেয়ে ছাড়া এমন চুলের বাহার আর কারো নেই।" আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের এই মরাঠা ব্যারিষ্টার বন্ধুটি বাঙ্গলার বার আনা কথা বোঝেন এরূপ তাঁর বিশ্বাস, সুতরাং কথাটা তিনি তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় বুঝে বল্লেন—"what, your Bengali ladies do not go out of the kitchen ?"—শুনে আমরা ত আকাশ হ'তে পড়লাম, এযে গোপলা উড়ের যাত্রার—সেই journey of flying Gopal এর চেয়েও সরস তর্জ্জমা। যাহোক আমরা সহজেই বুঝতে পাল্লেম যে "বাঙ্গালীর মেয়ে ছাড়া এমন চুলের বাহার আর কারো নেই" এই কথাটির মধ্যে তিনি দুটোমাত্র শব্দ গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের যে অর্থ-বুঝেছেন তা হতে সমস্ত লাইনটের অর্থ আবিষ্কার করে ফেলেছেন, সেই শব্দ দুটি 'চুলের' ও 'বাহার', চুলের অর্থ তিনি করেছেন—'চুল'='চুলা'=hearth অর্থাৎ kitchen, আর 'বাহার'='বাহির'=outside, অতএব 'বাঙ্গালীর মেয়ে ছাড়া এমন চুলের বাহার আর কারো নেই' ইহার ইংরাজী 'Bengali ladies do not go out of the kitchen' এ ছাড়া আর কি হবে? কি সরল, শুদ্ধ নৌলিক অনুবাদ!—কিন্তু এজন্য তাঁকে দোষ দিইনে। বাঙ্গালা-ভাষাটাকে তিনি অনুগ্রহের চক্ষেই দেখে থাকেন, এমন কি আমি যদি তাঁকে বাঙ্গালা শিখিয়ে নিই তাহ'লে তিনি আমার বই পড়ে আমায় অনুগৃহীত করবেন এ আশাও দিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।—সে দিন আমি একজন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের কাছে গল্প শুন্‌ছিলাম, এঁরা নাকি ভাত খেতে অথবা রুটি খেতে (কারণ ভাত ও রুটি এ দুই দুবেলা যথারীতি খাওয়া হয়) বসে ডাল তরকারি সকল জিনিষের সঙ্গেই এক আধ চামচে দুধ খেয়ে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম 'মাছের সঙ্গেও', তিনি সোজা জবাব দিলেন, 'সকল জিনিষের সঙ্গেই।"—অদ্ভুত প্রথা! ভারতের পূর্ব্ব আর পশ্চিম প্রান্তের নিয়ম যে একরকম হবে এ আশা অবশ্য করা যায় না, কিন্তু ডাল তরকারি দিয়ে ভাত মেখে মধ্যে হতে একচামচে দুধ গলাধঃকরণ করা হলো, এমন সৃষ্টিছাড়া আচরণ ত না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না। আমিই যখন বিশ্বাস করিনে, তখন অন্যকে তা বিশ্বাস করবার জন্যে কি ক'রে অনুরোধ করি? কিন্তু এটা ঠিক কথা যে, যে ভদ্রলোকটির কাছে এ রকম দুগ্ধ পানের গল্প শোনা গিয়েছে, তিনি আমাদের এই ব্যারি-ষ্টার বন্ধুটির সঙ্গে একত্রে খেতে বসেছিলেন, এবং বাধ্য হয়ে ভদ্রতার খাতিরে তিনিও ডালের সঙ্গে দুধে চুমুক দিয়ে-ছিলেন। তাঁর কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখিনে। কিছু দীর্ঘকাল একত্র বাস সত্ত্বেও এ অভিজ্ঞতা আমার অদৃষ্টে কোন দিন লাভ হয় নি, কারণ বাস একত্র হলেও আমাদের আহারাদি স্বতন্ত্র। তবে যে দিন একত্র আহারাদির আয়োজন হয়, সে দিন কোন রকম প্রাদেশিক আর্য্যপ্রথা সেখানে কল্‌কে পায় না।

গুজরাটী ভাষাটা প্রায় সকল মরাঠাই এখানে অল্প বিস্তর জানে, জানা দরকার, কারণ ব্যবসা কাজেই যে শুধু গুজরাটীর একাধিপত্য তা নয়, রাস্তা ঘাটের নাম পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ গুজরাটীতে লেখা, আফিস আদালতের অধিকাংশ কাজই গুজরাটী ভাষায় হয়; অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গালা দেশটা ইংরেজের রাজ্য হয়েও যেমন ইংরাজী ভাষাটা আফিস আদালতে ষোল আনা রকম জুড়ে বস্‌তে পায় নি, এখানেও তেমনি মরাঠা রাজা হলেও গুজরাটী ভাষার প্রভাব লোপ হয় নি। কোন কোন খবরের কাগজের আবার সপ্তাহে দুটো ক'রে সংস্করণ—একটা মরাঠা আর একটা গুজরাটী, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটে ইংরেজীও থাকে, দ্বৈভাষী পত্রিকা! বাঙ্গালার সঙ্গে খানিক ইংরেজী থাক্‌লে বাঙ্গালাদেশেও আমরা এই রকম একখান পত্রিকা লাভ কর্‌তাম, কারণ শুন্‌তে পাওয়া যায় বঙ্গবাসীরও একটা হিন্দী সংস্করণ আছে। যাহোক দু ভাষার কাগজ বোম্বে অঞ্চলে বিস্তর। এই রকম 'আধ বাঙ্গালী পোণ খোট্টা' রকম কাগজ চালিয়ে বোধ করি সকলকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাতে ফল এই হয় যে, কেউ সন্তুষ্ট হয় না, এবং কোন ভাষাতেই কোন কথাটা খোলসা করে বলা হয় না। যাহোক গুজরাটীদের খবরের কাগজ আছে তা জানি, তাদের কূটবুদ্ধি এবং বক্র স্বভাবের গল্পও অনেক শুনেছি, কিন্তু একদিন একজনও অতি বেশী মাত্রায় শিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞান-বিশিষ্ট, প্রখর আলোক প্রাপ্ত এবং বিশ্ব সংসারের সকল খবর রাখে এ রকম গুজরাটীর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার এ আক্ষেপ ঘুচে গেছে। কয়েক দিন হল, আমাদের মরাঠা ব্যারিষ্টার বন্ধুর একটি গুজরাটী বন্ধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমাদের স্কন্ধে ভর করেছিলেন, এবং এই কয়েক ঘণ্টার কথাবার্ত্তাতেই আমাদের অনেক জ্ঞানদান করে গেছেন। লোকটি নাগর ব্রাহ্মণ, ব্যারিষ্টার, বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেতের কাছাকাছি। সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ড হ'তে ভাসতে ভাসতে

ভারতবর্ষে এসে লেগেছেন। অবশ্য এ তাঁর প্রথম যাত্রা নয়, ইংলিশ চ্যানেলের ঢেউ তিনি ইতিপূর্ব্বেও খেয়ে এসেছেন, কিন্তু এত বয়সে ভারতবর্ষের রৌদ্রপক্ক পরাধীন জরাক্রান্ত মাটিতে পা দিয়েও বিলাতের মাটির গরম আর বিলাতের জল হাওয়ার চাঞ্চল্য তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। নাগর ব্রাহ্মণেরা ভারি ফরসা,গড়ন বড় সুন্দর, এ লোকটিও অবশ্য তাঁদের জাতীয় বিশেষত্ব হতে বঞ্চিত নন। একদিন বেলা চারটের সময় বসে লিখচি, হঠাৎ দেখি একটা ফরাসী নেভিক্যাপ মাথায় দিয়ে পুরো সাহেবী বেশে এই ভদ্রলোক আমাদের ঘরে উপস্থিত হয়ে টুপি ছুঁয়ে সাহেবী কেতায় গুড্‌মর্ণিং কল্লেন, আমি ত ভাব দেখে অবাক্, প্রথমটা কিছু ঠাওর কর্‌তে না পেরে ভাবলাম, "ও বাবা, এ সাহেব আবার কোত্থেকে এসে হাজির হলো।" যাহোক আমাদের কোন বন্ধু আমাকে আমার ভ্রম সম্বন্ধে সজ্ঞান ক'রে দিলেন। তখন ভারি উৎসাহের সঙ্গে আমাদের আলাপ চল্‌তে লাগলো। দেশে আমার একটু লাজুক ব'লে অখ্যাতি ছিল, অর্থাৎ কোন নূতন লোকের সঙ্গে তড়বড় ক'রে কথা বল্‌তে আমি কিছু সঙ্কোচ বোধ কর্‌তাম, কিন্তু আমার সে রকম অবস্থাটা এখানকার পক্ষে বড় অনুকূল নয় দেখ্‌চি। গুজরাটী মশায়ের মুখ দিয়ে একেবারে খই ফুট্‌তে লাগলো। দেখে আমাদের মরাঠা ব্যারিষ্টার বন্ধু গুজরাটী ব্যারিষ্টারকে সতর্ক ক'রে বল্লেন, যে তিনি যেন সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা বলেন, এখানে একটা লেখক আছে, সে বড় ভয়ানক লোক, গুজরাটীদের বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছে। শুনে গুজরাটী মশায় চসমাখানা চোখে এঁটে, মাথার টুপিটা মাথাহতে খুলে ভাল করে প'রে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্লেন—"তুমি বুঝি? কিন্তু ইয়ংম্যান, আমি তোমাকে সাবধান কর্‌চি, খবরদার গুজরাটীদের নিন্দে করো না। গুজরাটীরা তোমাদের দানাপানি যোগাচ্ছে, তোমরা যে দুবেলা পেটটি পরিপূর্ণ রকম ভরিয়ে মনের সুখে ফুর্ত্তি করচো, সেখানাকি বাঙ্গলাদেশ দিচ্ছে, না গুজরাট দিচ্ছে?—এমনকি তোমাদের রাজা গায়কবাড়ের উদর পর্য্যন্ত পূর্ণ করতেও এই গুজরাট। নিন্দে করোনা, করোনা, সেটা ভারি নিমকহারামী"—ইত্যাদি।—খানাটা গুজরাট দিচ্ছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তোমরা যদি নিজে সাবধান না হও ত তোমাদের দোষের কথা বললে তোমরা চটবে কেন? অবশ্য তোমার সম্বন্ধে কোন কথা ক'বার কারো অধিকার নেই একথা তুমি বল্‌তে পার; কিন্তু মানুষের জীবনটা যে কথারই ইতিহাস। যদি প্রকৃতই তোমার কোন দোষ থাকে, আর সে দোষের কথা যদি আমি কাগজে লিখি তাহলে হয় ত তুমি আমাকে সিডিষনের মামলার ভয় দেখাবে। ব্যক্তিগত সিডিষনটা আজ কাল আইনের কলে জাতিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু যদি একথা সত্তি হয় যে তুমি সত্যই পাপের দিকে, কলঙ্কের দিকে, অবনতির দিকে নেমে যাচ্ছ তা হলে আইন তোমাকে কোন লেখকবিশেষের হাত হতে উদ্ধার কর্‌তে পারে, কিন্তু জাতীয় ইতিহাসের যে নীচের পৈঠায় তোমার স্থান—সেখানেহতে ত তোমাকে উপরে তুল্‌তে পারবে না; সেখানে আইন অক্ষম। অতএব আইনের সাহায্যে অস্থায়ী গোঁজামিল দেওয়ার চেয়ে সমূলে আপনাদের দোষ নষ্ট করবার চেষ্টাই ভাল।—যাহোক এতগুলা কথা সেই ক্ষুধার্ত্ত প্রবীণ ব্যারিষ্টারকে ব'লে আর অনর্থক তাঁর উষ্মা উত্তেজিত কল্লেম না। শুনা গেল তিনি এখন হিন্দু হয়েছেন, অর্থাৎ আগের মত নির্ব্বিকারভাবে আর যে সে মাংস ভক্ষণ করেন না, চতুষ্পদের মধ্যে একটু বাছ গোছ ক'রে চলেন। তাঁর ক্ষুধানলে আহুতি দেওয়ার জন্য গোটাকত মর্ত্তমান কলা আর কিঞ্চিৎ দুধরুটি এসে উপস্থিত হলো। তিনি রুটি ও দুধে টিফিন সেরে, রম্ভাকটি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। দেখা গেল সদ্য বিলাত হতে এসেও রম্ভার উপর তাঁর তেমন আগ্রহ নেই।

তারপর গল্প আরম্ভ হলো। আমার বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালী জাতটেই বচনের জাত, যত কিছু কাজ, দেশ উদ্ধার বলুন, সমাজ সংস্কার বলুন, আর ধর্ম্মোন্নতিই বলুন, সকল বিষয়েই আমরা বেশী কথা বলি কিন্তু কাজ করি কম. আমার বিশ্বাস যা তাই বল্‌চি। কিন্তু এই গুজরাটী ব্যারিষ্টার মশায়কে দেখে আমার বিশ্বাস কিছু খর্ব্ব হয়ে গিয়েছিল,—অন্ততঃ কিছু কালের জন্য বটে। ইনি গল্পের মনুমেণ্ট। পার্লেমেণ্টের মেম্বর হ'তে পার্‌লে তিনি কি অসাধারণ কাজ করেন, এবং হাউজ অব কমন্সের প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতার চোটে কি রকম করে সমস্ত কনজারবেটিব্ মেম্বরদের নাজেহাল করেন—নাকে মুখে দিয়ে ইংরাজীর ফণা উদ্গার করে তিনি তারই গল্প বল্‌তে লাগলেন, আমি শুনে একেবারে আধ খানা হয়ে গেলাম। যে জাতের মধ্যে এত বড় একটা লোক বর্ত্তমান আছে সে জাতটে যে খুব মস্ত, ভারি জীবন্ত তাতে আর সন্দেহ মাত্র থাকলোনা। গুজরাটীদের এতবড় প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাত বলে আমার বিশ্বাস ছিল না, কেবল ব্যারিষ্টার মহাশয়ের অনর্গল গম্ভীর বক্তৃতা শুনে একবার মাত্র আমার মনে হয়েছিল লোকটা যা বলছে তা কি সত্তিই ঠিক? শেষকালে দেখলাম অতিরিক্তি কথার জাঁক লোকটার একটা রোগ। ফ্রান্স, রুসিয়া আর জর্ম্মানীর মধ্যে দিন দিন বন্ধুতা কি রকম পেকে উঠ্‌ছে এবং তার উপর য়ুরোপের ভাবি শুভাশুভ কি পরিমাণে নির্ভর কর্‌চে, আগামী বৎসর ফরাসী একজিবিষান শেষ হলেই চারিদিকে কি রকমভাবে বারুদের ধুমো আর কামানের আওয়াজ জলস্থল সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তা নাজেহাল আমরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু লোকটা দেখি আর আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। গুজরাটী ব্যারিষ্টার মশায় সত্যই য়ুরোপীয় পলিটিকস সম্বন্ধে এমন সকল কথা বল্‌তে লাগলেন যে, সকল কথা একজন দৈবজ্ঞের মুখেও ভারি বিস্ময়কর শুনাত।

এই ব্যারিষ্টার প্রবরের বিশ্বাস পৃথিবীটার আগাগোড়া বদ্‌লোকে পরিপূর্ণ। অতএব কিছু পয়সা উপার্জ্জন করা দরকার হলে, তাদের সঙ্গে ব্যবহার কর্ত্তে নিজের চালচলন সেই রকম করা দরকার; বুদ্ধিমানের লক্ষণই এই। নতুবা আমরা কখন তাদের সঙ্গে সমান খুঁটে চল্‌তে পারবো না, আর শেষে আমাদের পস্তিয়ে মর্‌তে হবে। এইরকম বক্তৃতা শেষ করে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'কি বল ছোকরা, তুমিত দেখচি পঁচিশ ছাব্বিশ শীতের মানুষ (অনুবাদটা কিছু অতিরিক্ত ইংরাজী ভাবাপন্ন হয়ে পড়লো, পাঠক মহাশয় মার্জ্জনা করবেন, আমি নাচার)। এ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা কি রকম?' এ কথা শুনে ইয়ংম্যান সবিনয়ে বল্লে, "আজ্ঞে বয়স আমার তার চেয়েও বেশী হয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতাটা সে রকম পেকে উঠেনি। ব্যারিষ্টার সাহেব যা বল্লেন হিসেবী লোকের যদি সেই লক্ষণ হয় ত হোক। আমি মশায় এ দলে নই তা স্বীকার কর্ত্তেই হবে, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় এই পৃথিবীর পোনের আনা পোনেকুড়ি গোণ্ডা মানুষকেই scoundrel বলে মনে কর্‌তে পারি নে। হয়ত তা সত্তিও না। তা ছাড়া তাতে সুখও নেই, স্বস্তি আছে বলেও বোধ হয় না।" গুজরাটী মশায় আমার কথা শুনে আমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পেয়ে একটা খাট রকম দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কল্লেন।

চাঁদ উঠেছিল, শরৎকালের পূর্ণিমার চাঁদ, আমরা একটা খোলা বারান্দায় বসে শরৎ পূর্ণিমার চাঁদের অলো ভোগ করছিলাম। গুজরাটী মশায় পথের দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"এই সব ঘরবাড়ী পথঘাট কি অপরিষ্কার, নোংরা, বিলাতের ঘরবাড়ীর সঙ্গে তুলনাই হয় না। হো, হো, লণ্ডন কি মজার যায়গা, বাস করবার মত যায়গা, উপভোগের যায়গা।"—আমাদের মরাঠা ব্যারিষ্টার বন্ধু বল্লেন—"I say B-there is no good in comparing those things with these." একথা শুনে গুজরাটী মশায়ের গুপ্তস্মৃতি জেগে উঠ্‌লো, তিনি চেয়ার খানা সমুখের দিকে টেনে নিয়ে বল্লেন—"তাই বলছি গো, সে সকল যায়গার কথা মনে পড়লেই এই সব হতভাগা যায়গার ক্ষুদ্রতা আপনি নজরে পড়ে যায়।" ভিতর ভিতর ভারতমাতাকে দরিদ্রা বলে এঁরা ঘৃণার সঙ্গে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিছুতে তাঁকে ভালবাসতে পারেন না, এবং মনে করেন মায়ের এ দরিদ্রতাটা যেন তাঁরই একটা মস্ত অপরাধ, অথচ বাহিরে সাহেব মহলে এঁরা মস্ত প্যাট্রিয়ট সাজেন, আর সাহেবরা পেট্রিয়ট বল্লে আত্মপ্রসাদে এঁদের বুক ফুলে উঠে।—যাহোক এই রকমের গল্পে আমাদের রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কেটে গেল।

গুজরাটী ব্যারিষ্টারের কথা এই পর্য্যন্ত থাক। এবার একটি মরাঠা ভদ্রলোকের কথা বলি। ইনি আমাদের মারাঠাব্যারিষ্টার বন্ধুটির বাল্যসুহৃদ, সহপাঠী কিনা ঠিক জানি না। সম্প্রতি বোম্বে হতে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। শুধু বেড়ানই উদ্দেশ্য নয়, সে কথা পরে বলছি। ইনি মরাঠাব্রাহ্মণ। এঁকে শিক্ষিত মরাঠার আদর্শ বলে নেওয়া যায় কিনা তা ঠিক বুঝতে পারি নি, কারণ আমার বিশ্বাস মরাঠারা এত অতিরিক্ত বচনবাগীশ নয়। এঁর বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হতে পারে। চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই, কিন্তু ঐ টুকু মানুষটার মধ্যে যে এত জাহাজ

জাহাজ কথা বোঝাই থাকতে পারে তা না দেখলে কি করে বিশ্বাস হবে ?

যাহোক রাত্রে আমি আহারাদির পর টেবিলের ধারে বসে সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌চি, চন্দ্রালোকিত বারান্দায় মরাঠা ব্যারিষ্টার বন্ধুটি আমায় আহ্বান কল্লেন, সেখানে তখন পুরা মজলিস্ চলছিল, অগত্যা একখানা খালি চেয়ারে বসে আমি এই নবাগত লোকটির বাক্যস্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। শুনলাম ইনি বোম্বের কোন ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির এজেণ্ট, ব্যবসায় কার্য্যোপলক্ষেই এখানে আগমন।—আমাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার (গুজরাটী) মশায় শুধু পলিটিক্যাল ওয়ার্লডের খবর নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু এ ভদ্রলোকটির কাছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর পাওয়া যায়, বোম্বে সহর ত সামান্য কথা। ইনি তিনবার কলকাতায় গিয়েছেন, বল্লেন কল্‌কাতা মন্দ যায়গা নয়, তবে কল্‌কাতার একটা দোষ—দুরকম সময়, মান্দ্রাজ টাইম, আর কলকাতা টাইম। একবার নাকি কোন একজন ইংরাজী দৈনিক সম্পাদকের বাড়ী তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়ার কথা রাত্রি নটার সময়, কিন্তু তাঁর ঘড়ি ছিল মান্দ্রাজ টাইম এ বাঁধা; বেচারা খাওয়া দাওয়ার পর সেখানে গিয়ে উপস্থিত। সে রাত্রে হোষ্ট মশায়ের কাছে তাঁর অন্য কোন খাবার জুটেছিল কি না জান্‌তে পারিনি, তবে তাঁর কাছে নাকি বিলক্ষণ বকুনি খেয়েছিলেন। কথাটা তিনি যে রকম ভাবে মনে করে রেখেছেন তাতে সন্দেহ হয় হয়ত বা সেরাত্রিটা তাঁকে এই বকুনি মাত্র আহার করেই কাটাতে হয়েছিল। এই গল্প শেষ করে তিনি সহাস্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দেশে সন্দেশের বিরহে আমি কি রকম করে জীবন ধারণ করচি। আমি তাঁকে জানালাম যে আমি ব্রাহ্মণ নই, কথাটা তিনি বুঝলেন কিনা জানিনে, কিন্তু হাসলেন। তার পর বল্লেন কলকাতা গিয়ে তিনি কোন এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একটা দোকানে উপস্থিত হয়ে বড় উত্তম সন্দেশ খেয়েছিলেন। বল্লেন যে সে সন্দেশের নাম "সাঁচি, সাঁচ বা Something like that."—জিনিষটা যে কি আমি যখন কিছুতে তা আবিষ্কার কর্‌তে পারলেম না, তখন তিনি আমাকে তার আকার প্রকার বুঝিয়ে দিলেন। বুঝলাম জিনিষটি আর কিছু নয়, পেড়া কি বর্‌ফি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে তালের মত শুকনো চাঁচি দোকানে দোকানে সাজান থাকে, মরাঠা মশায় অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন ভেবে তাই গলাধঃকরণ করেছিলেন। কি বিপদ! এ জিনিষ যে কোন মানুষ কাঁচা খায় এবং খেয়ে তার প্রশংসা করে সে কথা আজ প্রথম শুন্‌লাম। প্রশংসাটা বোধ করি বিনয়ের বশবর্ত্তী হয়েই করেছিলেন। হয়ত এটা তাঁর বঙ্গভূমির প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতির নিদর্শন, কিন্তু এই শুক্‌নো চাঁচির স্বাদবৈচিত্রের কথা শুনে আমার একটা পুরানো গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটা বোধ করি আমাদের পাঠকের অনেকেই জানেন, তবু যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্যে সংক্ষেপে বলি। একবার ঢাকা জেলার কোন গ্রামে একটা বিবাহ উপস্থিত হয়েছিল। কন্যাকর্ত্তামশায় কলিকাতায় থাকতেন। বিবাহে তিনি বাড়ী যেতে পারেন নি। বরযাত্রী মশায়দের পরিতোষ করে ভোজনের জন্য কতক গুলা সন্দেশ, রসগোল্লা, মিঠাই ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে কতকগুলো বাতি পাঠিয়েছিলেন। তখন পল্লী অঞ্চলে বাতির চলন হয় নি, সুতরাং সেও কোন রকম মিষ্টান্ন ভেবে কন্যাযাত্রী মশায়েরা বরযাত্রীদের পাতে অন্যান্য মিষ্টান্নের সঙ্গে বাতিগুলো চাকা চাকা করে কেটে পরিবেশন করেছিলেন। বরযাত্রী মহাশয়দের অভিজ্ঞতাও ততোধিক। তাঁরা বাতির কোন স্বাদ না পেয়ে কিছু দুঃখিত হলেন, কিন্তু বাতির চাকা গুলা পড়ে থাকলো না; চিনি দিয়ে তাঁরা সে গুলো খেয়ে ফেল্লেন। এদিকে কন্যাকর্ত্তা যখন সন্দেশগুলি কেমন হয়েছে তা জান্‌তে চাইলেন, তখন বাড়ী হতে পত্র গেল, "অন্যান্য মিষ্টান্ন উত্তমই হইয়াছে, কেবল ঐ যে লম্বা লম্বা হাদা হাদা (সাদা) যার মদ্যি হুদো (সুতো) ভরা মিঠাই পাঠাইয়াছিলে তাহা মিষ্টতায় কিছু অল্প হইয়াছিল, কিন্তু চিনি দিয়া তাহার সে ত্রুটী নিবারণ করা হইয়াছে।"—বাগবাজারের রসগোল্লা আর ভীমে ময়রার কাঁচা গোল্লা থাক্‌তে মরাঠা মশায় কেন যে শুক্নো চাঁচির প্রশংসা কল্লেন, এ রহস্য আমি ভেদ কর্‌তে পারি নি।

কলকাতার কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পরিবারের প্রভাব এই মরাঠা মশায়ের জীবনের উপর বিস্তৃত হয়েছে ব'লে বোধ হয়। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্বন্ধে তিনি যে রকম ভাবে আলাপ কর্‌তে লাগলেন তা আমার মোটে ভাল লাগেনি। তিনি প্রতি কথায় প্রমাণ কর্‌তে লাগলেন এই পরিবারস্থ পুরুষ আর রমণীগণ তাঁকে তাদের বাড়ীরই একজন মনে করে, তাঁর কাছে তাঁদের গোপনীয় কিছু নেই, মেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁকে তাঁদের হৃদয় খুলে সকল কথা লেখেন, পত্র আস্‌চেই, আস্‌চেই। আমাদের ব্যারিষ্টার বন্ধু তাঁর কথায় খুব আমোদ পাচ্ছিলেন, কিন্তু কথাগুলা আমাদের কাছে ক্রমে এক ঘেয়ে হয়ে এসেছিল; শেষ কালে মরাঠা মশায় বল্লেন যে একবার কয়েকজন বাঙ্গালীর মেয়ের সঙ্গে তিনি আর তাঁর দুএকজন বন্ধু নৌচালনা করছিলেন, সে সময় একজন বন্ধু বলে উঠলেন, 'এরকম নৌচালনার সময় বিলেতে ত খুব গানটান চলে, আমরাই বা চুপকরে থাকি কেন, একটা গান হোক না'—আর কি—তাঁর এক বন্ধু এক আদিরস পূর্ণ সংস্কৃতগান আরম্ভ কল্লেন, এবং সকলে এমন কি বাঙ্গালী মেয়েরা পর্য্যন্ত সানন্দে সেই সঙ্গীত সুধা পান কর্‌তে লাগলেন। সে গানটি যে কি তা পর্য্যন্ত এই জীবন বীমার এজেণ্ট মশায় আমাদের কাছে উল্লেখ করে বাহাদুরী নিতে ছাড়লেন না। শুনে আমার ঠোঁটের গোড়াহতে কানের ডগা পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠ্‌লো। আমাদের শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী বন্ধুটিও বোধ করি তখন মনে মনে ভারি অশোয়াস্তি বোধ কচ্ছিলেন। অবশ্য মরাঠা মশায়ের এরকম অভিপ্রায় ছিল না যে বাঙ্গালীর মেয়েদের তিনি অবমাননা করেন, কিন্তু আমাদের মত দুজন নিরীহ অপরিচিত বাঙ্গালীর কাছে হাত মুখ নেড়ে কোন বাঙ্গালী মেয়েদের নৌকায় চড়িয়ে তাঁদের কি অশ্লীল গান শোনান হয়েছিল সে কথা জানাবার এত কি দরকার ছিল তা বুঝলাম না।

যাহোক লোকটা যে গল্পের জাহাজ তাতে আর সন্দেহ নেই। যে কদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, সে কদিন প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে আঠারো ঘণ্টা হিসেবে তিনি গল্প ক'রে কাটিয়েছেন। আমাদের অন্যতম বাঙ্গালী বন্ধুটি কবি। তাঁর কবিতা লেখা সে কয়দিন শিকেয় তোলা ছিল। সকালবেলাটিতে উঠে ভদ্রলোক কবিতার খাতাখানা খুলে বসেছে, আর এজেণ্ট মশায় কোথা হ'তে গল্প মুখে করে চার পেয়ালার কাছে হাজির। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত সে গল্পের জের চল্‌লো, ভদ্রলোকের—বিশেষতঃ লেখা পড়া জানা পদস্থ ভদ্রলোকের মুখে ষোল আনা অহমিকা পরিপূর্ণ কথাগুলা বড় কুৎসিৎ শুনায়, কিন্তু বক্তার কানে বোধ করি তা বাধছিল না। বোম্বে সোসাইটির গল্প, প্লেগের সঙ্গে জবের আদা কাঁচকলা সম্পর্কের গল্প, জর হয়ে তাঁর সকল কুকুরগুলো মরে যাওয়ার গল্প—এ সব গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কংগ্রেসের যত কিছু ঝঞ্ঝাটের কাজ সব নাকি প্রতি বৎসর তাঁর ঘাড়েই পড়ে থাকে, আর তিনি খেটে খেটে হয়রাণ। দশ বৎসর ধরে তিনি এই রকম খেটে আস্‌চেন। মরাঠা সাহিত্যের কথা তুলে বল্লেন যে তাঁদের সাহিত্যে আজ কাল আট দশ জন ভাল লেখক আছেন, গ্রন্থকার অনেক, অনেকে এক আধখানা পৌরাণিক নাটক রচনা করেই আপনাদিগকে মরাঠা সাহিত্যের স্তম্ভ বিবেচনা করেন। আমি বল্লেম—লেখক সংখ্যা বাড়লে আর সাহিত্যের প্রসার বিস্তৃতি লাভ কর্‌লে এ ভাবটা বড় থাক্‌বে না, আমাদের বাঙ্গালা দেশে এখন আর এ রকম ভাব নেই। এজেণ্ট মশায় আরো বল্লেন—মরাঠা সাহিত্যের জন্যে বড় বড় স্কলারেরা বড় একটা পরিশ্রম করেন না, ডাক্তার ভাণ্ডারকর মশায় কখন কিছু লেখেন কিন্তু তাঁর লেখার প্রথম চার পাঁচ লাইন পড়লেই জান্‌তে পারা যায় এ ভাণ্ডারকর ছাড়া আর কারো লেখা নয়, এতই সংস্কৃতবহুল ভাষা।

বোম্বে হাইকোর্টের জজ রাণাডে মশায়ের সঙ্গে শুনতে পাই এ ভদ্রলোকটির ভারি আত্মীয়তা, প্রত্যেক কথাতেই "our old man" এর কথা তোলেন। এমন কথা নেই যার সঙ্গে এই নিরীহ old man টি বিজড়িত না আছেন। আমাদের কোন বন্ধু বলছিলেন জষ্টিস্ রাণাডের ভারি একটা ক্ষমতা আছে, তিনি তাঁর নিকটের মানুষের হৃদয়ের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, এই ভদ্রলোকটিই তার দৃষ্টান্ত। এঁরা নাকি আগামী বর্ষের প্যারিস একজিবিশনে তাঁদের old man কে য়ুরোপে নেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু old man আজও রাজি হন নি, এঁরা নাকি চেষ্টার ত্রুটী করবেন না; শুনে আমাদের ব্যারিষ্টার বন্ধুটি বল্লেন 'যদি পার তবে বড় ভাল হয়।' বৃদ্ধ বয়সে এখন যে রাণাডে মশায় বিলাত যাবেন, তা আমাদের কিছুতে বিশ্বাস হয় না—old man টি ত আর ছেলে মানুষ নন।

এই রকম কত গল্প যে প্রতিদিন আরম্ভ হয়ে শেষ হতো এবং কখন কখন শেষ হবার আগেই তা হতে আরব্যোপন্যাসের মত নূতন নূতন শাখা পল্লব নির্গত হতো তা আমি লিখে শেষ করতে পারিনে, কাগজে আর স্থান নাই। পাঠকের ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। তবে যে এতক্ষণ এ সকল কথার আলোচনা করলেম তার কারণ এ দেশী দুই একটা লোকের চরিত্র বিদেশীর চোখে কি রমক দেখায় তাই দেখানোর জন্যে।

আর এক দিনের একটা কথা বলে আমার গল্প শেষ করি। সে দিন সেবারকার কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের কথা হচ্ছিল। আগন্তুক মরাঠা মশায় বল্লেন যে কংগ্রেসের সম্ভ্রান্ত ডেলিগেটদের বাছাই করে, কন্‌গ্রেসের অধিবেশনের শেষে ঠাকুর বাড়ীতে যে ইভনিং পার্টি দেওয়া হয়, তাতে তিনিও নিমন্ত্রিত ছিলেন। ব'লেই তিনি সেই সন্ধ্যায় গীত সমস্ত গানগুলি, 'বন্দে মাতরং' হতে আরম্ভ করে 'বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' এবং 'অয়ি ভুবন মনমোহিনী' প্রভৃতি সমস্ত গানগুলি আবৃত্তি কল্লেন, বাঙ্গালা গানের মরাঠা উচ্চারণ শুনতে যে কি অদ্ভুত তা না শুনে বুঝবার যো নেই। এ পর্য্যন্ত বেশ চলে এলো, শেষে পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রসঙ্গ ক্রমে বক্তা বল্লেন যে তাঁর ইংরাজী তার কাছে খুব উঁচু দরের বলে বোধ হয় না, তিনি বাঙ্গালায় কিছু লিখেছেন কি, কেমন লেখেন?—অবশ্য সেখানে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের যে ফল তা তাঁকে আমি বল্লেম, আরও তাঁকে জানালেম যে আমাদের একটি অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় সঙ্গীত তাঁরই রচনা, এমন কি 'বন্দে মাতরং' ছাড়া আর কোন জাতীয় সঙ্গীতই তার সমকক্ষ নয়। শুনে তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন, "গানটি কি—বলুন দেখি!" আমি বল্লেম:—

"গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।"

শুনেই তিনি আমার মুখ হতে কথাগুলো কেড়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন,

"হক্কা ভারতের জয়, হক্কা ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়?"

তাঁর বিসদৃশ স্বরে এই "হক্কা ভারতের জয়" শুনে বন্ধুগণ হেসে অস্থির হয়ে পড়লেন, এর মধ্যে গানটা যে কোন যায়গায় মরাঠা মশায় তা ঠাওর কর্ত্তে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, বোধ করি মনে মনে একটু রাগও কল্লেন, বল্লেন, "মশায় ও গানটার সঙ্গে আমাদের খুবই পরিচয় আছে, আমরা কলকাতা হতে বোম্বে আসবার সময় ঐ গানটা মরাঠা ভাষায় তর্জ্জমা পর্য্যন্ত করেছিলাম, আপনাকে সে তর্জ্জমা দেখাচ্ছি।" মরাঠা মশায় পেন্সিলে লেখা তর্জ্জমা বাক্স হতে বের করে আমায় দিলেন। সে তর্জ্জমাটা আমি এখানে প্রকাশ করচি, গানটার ঠিক কথায় কথায় অনুবাদ না হলেও এটা যে 'গাও ভারতের জয়ের' একটা 'স্বাধীন' অনুবাদ তা মরাঠাভাষা অনভিজ্ঞ পাঠকেরাও বুঝতে পারবেন, এবং বোধ করি একটু আমোদও পাবেন।

"মিড়নি সকড় গাউ ভারত বরষ সুযশ গান,
করুনি এক জীব ভাব চিত্ত হৃদয় প্রাণ;
কোন্ অসে ভারত ভুবন সময় ডুঁজে ঠিকান,
কোন্ সিন্ধু অদ্রি সিন্ধু হিমবতা সমান?
বহু ফলদা ভূমি জিলা অন্য নো পমান,
অন্যা ধন্যা পুণ্যা শত তটিনী হেমমণি রত্নখনি
হিন্দ ধন নিধান।

রূপযুতা সুগুণরতা ভারত কামিনী,
তুলনা নচ অন্য জয়া ইয়েত ত্রিভুবনি;
অচ্যিতি (?) পতি ঈশ্বর সা স্থাপুনে মণি,
শান্তা সীতামাতা দময়ন্তী সত্যবতী পুণ্যমতী
দেবী ত্রিজগীমান।

গৌতম, মনু, কৌশিক মুনি অনুসূয়া পতি,
অমর তপ সিদ্ধি বিনা ধন ন জানতি,
আদ্যকবি সুবশ জয় কাব্য ভারতি,
ঝালে গেলে সগড়ে চন্তমতি অতুলকৃতি
ভবভূতি কালিদাস বাণ।

পৌরাণিক যোধ ভীম ভীষ্ম কর্ণসেন,
শিব বাজী বীরমণি বিসরলা কসে?
আর্ত্তবন্ধু ভারত ভয় সিন্ধু সেতু সে
শরণা অবনা (?) যবনা অসিধারা অনলকরা পরিসথরা
দেতি সমরী প্রাণ।

কায়ভীতা সাহস রুচি মানসী ধরা,
ধর্ম্ম জিথেঁ জয়শি তিথেঁ ভগবতী গিরা;

মাতৃভূমি বদন উজড় বিক্রম করা;
থিন্না, ছিন্না, ভিন্না, অবড়ভুজা হিন্দ প্রজা তরি উজমা
ঐক্যবল নিদান।"

যা হোক, আজ ক দিন হলো 'কমলি ছোড়গিয়া,' বীমার এজেণ্ট মশায় বোম্বে ফিরে গেছেন। পূর্ব্বোক্ত গুজরাটী ব্যারিষ্টার আর এই শেষোক্ত মরাঠা বাক্যবাগীশ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী বন্ধুর ধারণাটা কি রকম এক দিন তাঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হেসে বল্লেন, গুজরাটী ব্যারিষ্টার মশায়ের বলবার বিষয় অতিরঞ্জিত করে বলবার খুব ক্ষমতা আছে, কিন্তু শেষোক্ত মরাঠা মহাশয়ের কথা অতিরঞ্জিত নয়, অধিকাংশই তৈয়ারি করা—invention, বলে বোধ হয়; শেষোক্ত ব্যক্তির বাহাদুরী নিশ্চয় বেশী।

শ্রীহট্ট।

সুমিষ্ট কমলালেবু, তেজপত্র, চুণা পাথর ও উৎকৃষ্ট মধুর জন্য শ্রীহট্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সতীর গ্রীবাদেশ পতিত হওয়ায় শ্রীহট্ট একটী পীঠস্থান বলিয়াও বিখ্যাত।

আমাদের দেশে ইতিহাস নাই। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে কত প্রাচীন নগরীর ঐতিহাসিক কাহিনী যে ভস্মাচ্ছাদিত রত্নরাশির ন্যায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শ্রীহট্ট তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন যশোহর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও ময়মনসিংহের স্থানবিশেষ অগাধ সলিল রাশিতে ঢাকা ছিল, যখন দুর্দ্দান্ত যবনসেনা বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া হিন্দু শৌর্য্যবীর্য্য পদদলিত করিয়া জয়োল্লাসে দেবমন্দির সকল লুণ্ঠন করিতেছিল, তখনও শ্রীহট্ট আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া উন্নত শিরে দণ্ডায়মান ছিল; তখনও শ্রীহট্টের গ্রামে গ্রামে দেবভাষা সংস্কৃতের আলোচনা হইত; বিজয়সিংহের ন্যায় উচ্চবংশজ হিন্দুযুবকেরা স্ব স্ব বাহুবলে রাজ্যাধিকার করিতেন; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া হিন্দুগৌরব-মহিমা চারি দিকে বিস্তার করিত; কত বীরপুরুষ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রসন্নচিত্তে অকালে রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিতেন; কত সুচতুর নাবিক নৌযুদ্ধে রণতরী চালাইয়া শ্রীহট্টের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন; কত শিল্পী * রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন; সীমা নাই। এখন তাহা অনন্ত কালগর্ভে বিলীন। তাহার কোন ইতিহাস বা যথাযথ বিবরণ নাই। এই সকল প্রাচীন পুণ্যকাহিনী স্বপ্নকথার ন্যায় লোকমুখে সচরাচর আলোচিত হইয়া থাকে। আমরা আজ তাহারই সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা বলিবার চেষ্টা করিব। কথা গুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর বা অপরবিধ কোন প্রকার শৃঙ্খলা না থাকা সম্ভব। দেশের সৌভাগ্যবশতঃ উপন্যাসপ্রিয় বঙ্গবাসী ইতিহাসচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন; শ্রীহট্ট সম্বন্ধে আমরা যে গুটি কয়েক কথা বলিতেছি, তাহার অংশবিশেষ জন-প্রবাদমূলক হইলেও এবং তৎ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্বদেশ-হিতৈষী পাঠকবর্গের নিকট তাহা নিতান্ত উপেক্ষিত হইবে না এরূপ আশা করি।

ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীহট্ট প্রাচীন নগর। জন্তিয়া বা জয়ন্তি, লাউড় ও গৌড় প্রভৃতি প্রদেশ বহুকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দু নৃপতিদিগের অধিকৃত ছিল, সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টে যত হিন্দু নৃপতি ছিলেন, তন্মধ্যে জয়ন্তি বা জন্তিয়া, লাউড় এবং † গৌড়েশ্বরই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। গৌরগোবিন্দ ও লাড় গোবিন্দ নামে দুই সহোদর ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত। লাড়গোবিন্দের অধিকৃত স্থান লাউড় এবং গৌর গোবিন্দের অধিকৃত স্থান গৌড় বলিয়া অভিহিত হয়। জন্তিয়ারাজ ক্ষত্রিয়, কিন্তু পর্ব্বতবাসী বলিয়া লাউড় ও গৌড়েশ্বর তাঁহার জল স্পর্শ করিতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে অনার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। জন্তিয়ারাজ অনার্য্যই হউন, আর ক্ষত্রিয়ই হউন, তিনি উল্লিখিত নৃপতিদ্বয়ের ন্যায় একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। এমন কি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভূত ক্ষমতাশালী ব্রিটিশসিংহের নিকটেও মস্তক অবনত করেন নাই। জন্তিয়া পর্ব্বতময় রাজ্য।

"পান, পানি, নারী
(ঋ) তিনই জন্ত্যা পুরী।"

---

* বিগত বর্ষের প্রদীপের 'লাল পণ্টন' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

† এ গৌড় পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের রাজধানী গৌড় নগর নহে।

শ্রীহট্টের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যে জল, পান এবং স্ত্রীলোক এই তিনই জন্তিয়া নগরে পরম সুন্দর বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ জন্তিয়ার জল অতি নির্ম্মল। এমন সুবিমল ও সুশীতল জল শ্রীহট্টের আর কোন প্রদেশে পাওয়া যায় না। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অতীব সুন্দরী। গাত্রের বর্ণ উজ্জ্বল তাম্রের ন্যায়, ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি আজানুলম্বিত; নাসিকা কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে তাহাদিগকে নিখুঁত সুন্দরী বলা যাইত। এখানে নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট পান পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের লোকেরা সাধারণতঃ তাম্বুল-প্রিয়। জন্তিয়ার লোকেরা এত অধিক পান খায় যে, বঙ্গদেশের লোকেরা তাহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। তাম্রকূটপত্ররঞ্জিতমুখো জন্তিয়ার প্রায় তাবৎ নরনারীকে দিবসের অধিকাংশ কাল কর্ত্তন করিতে দেখা যায়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, জন্তিয়াবাসী প্রায় সকলের নিকটেই এক একটী তাম্বুলাধার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে 'জয়ন্তীশ্বরী' নামে এক দেবীমূর্ত্তি জন্তিয়া রাজবাটীতে স্থাপিত ছিল। কথিত আছে, দেবীর নিকটে রাজ্যের মঙ্গলকামনায়, বৎসরে তিন বার করিয়া নরবলি দেওয়া হইত। জয়ন্তীশ্বরী পূজকের এমন আসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি দেবীর আদেশ বলিয়া যাহা প্রচার করিতেন, অম্লানবদনে নৃপতিকে তাহা সম্পাদন করিতে হইত। একদল লোক ছিল—তাহারা ছদ্মবেশে লাউড় ও গৌড়ে প্রবেশ করিয়া অসহায় নরনারী ও বালক বালিকাদিগকে জয়ন্তীশ্বরীর নিকট বলি দিবার জন্য হরণ করিয়া লইয়া যাইত। ইহারা এই উভয় প্রদেশে "খোজ্‌গর" নামে অভিহিত হইত। এখনও শ্রীহট্টের স্থান বিশেষে রোরুদ্যমান বালকবালিকাদিগকে শান্ত করিবার জন্য "খোজ্‌গরের" নাম করিয়া ভয় দেখান হয়। জন্তিয়া রাজ ব্রিটিশসিংহের নিকট পরাভূত হইলে, সেই নররক্তপিপাসু, লোলজিহ্বা, করালবদনী ভীষণদর্শনা জয়ন্তীশ্বরী শ্রীহট্ট সহরে একবার আনীত হইয়াছিল।

জন্তিয়ায় 'রূপনাথ' নামে একটী ভূগর্ভস্থিত তীর্থস্থান আছে। তথায় প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়া থাকে। ইহার অদ্ভুত বিবরণ সময়ান্তরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

গৌড়ের প্রধান নগর বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহর। গৌর গোবিন্দই এখানকার শেষ নৃপতি। বর্ত্তমানে "মনা রায়ের টিলা" * নামে যে সুরম্য স্থানে জজ সাহেব অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে গৌরগোবিন্দের সুবিস্তৃত প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। গৌরগোবিন্দের প্রাসাদ সম্বন্ধে একটী গল্প কথিত আছে। গৌরগোবিন্দের রাজত্বকালে একটী মুসলমানও ছিল না। গৌড়ে অহিন্দুর প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল চিকিৎসাব্যবসায়ী জনৈক চট্টগ্রামনিবাসী মুসলমান ফকীর হিন্দু রীতি-নীতি-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিবেন না, এই স্বীকারে শ্রীহট্টের বর্ত্তমান সেকঘাট নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তখন 'মনা রায়ের টিলা' বর্ত্তমানে যতটুকু উচ্চ আছে, তাহা হইতে সাতগুণ অধিক উচ্চ ছিল। দৈবাৎ একদিন এক শ্যেন পক্ষী একখণ্ড গো-মাংস মুখে লইয়া গৌরগোবিন্দের প্রাসাদোপরি নিক্ষেপ করে। তাহাতেই নাকি অকস্মাৎ ঐ গগনপ্রসারী উন্নতশৃঙ্গ টিলা (প্রাসাদসহ) মাটীতে বসিয়া গিয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোন স্থান হইতে এই মাংসখণ্ড আনীত হইয়া পতিত হইল, জানিবার জন্য চারিদিকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল, চট্টগ্রামনিবাসী সেই ফকীরের গৃহে শাহজলাল নামে এক দুর্দ্দান্ত হিন্দুবিদ্বেষী ফকীর সমাগত হইয়া এই কুৎসিৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে। গৌরগোবিন্দ ইহার প্রতীকার করিতে গিয়া—শাহজলালের হস্তে প্রাণ হারাইলেন, এবং সমস্ত গৌড় শাহজলালের তরবারী ও কোরাণের বলে অস্থির হইয়া উঠিল। শাহজলাল এক দর্‌গা স্থাপন করিল, বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে জোর করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল এবং অবশেষে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে গিয়া দেশের পদস্থ ব্যক্তিবর্গের হাতে প্রাণ হারাইল। শাহজলালের শিষ্যবর্গ তাহার স্বহস্ত-স্থাপিত দরগায় এখনও তাহার সমাধি, তাহার পালিত কুক্কুটের ডিম্বের আবরণ, স্বর্ণের কই ও মদ্দার মৎস্য এবং কেশযুক্ত শৈল মৎস্য দেখাইয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

* "টিলা" শব্দ Peak বা পর্ব্বতচূড়া অর্থে শ্রীহট্টে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

সত্য সকলের মর্য্যাদা লোপ করিয়া, তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত-স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রধান অন্তরায়, কাব্য-কলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আমদানী রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখায় স্থান পায় নাই।

জয়দেব সম্বন্ধে প্রবন্ধটি কাব্য-সমালোচনার আদর্শ। রসগ্রাহী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্ম্মস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন। "গীত গোবিন্দ" যে প্রকৃত গীত—তাহার ভাব-দরিদ্র, বিরল-চিত্র পদাবলী কাব্যাংশে তেমন উপাদেয় না হইলেও তাহাদের কোমলকান্ত শব্দ-বিন্যাস এবং বিচিত্র ঝঙ্কার যে গানের সর্ব্বথা উপযুক্ত ইহা দেখাইয়া সন্দিহান পাঠককে জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন, এবং অপরদিকে দেখাইয়াছেন বিলাসকলাবর্ণনাপটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় নাই—কবিসুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতি তাঁহার কাব্যকে উজ্জ্বল পবিত্র করে নাই।

প্রবন্ধান্তরে ঐরূপই সুন্দর যুক্তি ও ভাষায় লেখক বুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা প্রকৃতির মহান ও বিরাট রূপবর্ণনে কেন অকৃতকার্য্য, এবং ভবভূতিই বা কেন একটি "মেঘমন্দ্র সমাসে"—নিবিড় শব্দ-যোজনায় তাহাতে সিদ্ধ হস্ত।

চিত্র ও কাব্যে আর একটা নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিত কলার (Fine arts) আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিদ্যার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ পাইয়াছে। আজকাল আবার রবিবর্ম্মা—জাত্রে প্রভৃতির শিল্প-চাতুর্য্যে এই দীন দেশের পূর্ব্ব গৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি। এই পুস্তকে এবং অন্যত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদের নবীন প্রতিভার যথোচিত আদর করিয়াছেন।

"ভারতী"তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্য প্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাব-গৌরবে ও রচনা-সৌন্দর্য্যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গদ্য সকল কথা কহিতে জানে—সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় অলঙ্কারশূন্য—কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ন্যায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ—কোথাও বৃক্ষবাটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র—এবং কোথাও নক্ষত্র-নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। "বসুমতী"র লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক;—সুলেখকই নয়, অমন গদ্য লেখা বুঝি আর পড়ি নাই; তেমন শব্দ-লালিত্য, ভাবমাধুর্য্য অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ" ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।

বলেন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ দুইখানির একটি বিচিত্র আকর্ষণ—অপূর্ব্ব সম্মোহনী আছে।

ইহাদের মধ্যে যে কবিতাটিই পড়িবে তাহারই ভিতর শুনিতে পাইবে—এক নূতন কণ্ঠ—নূতন সুর। এরূপ কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। গদ্যে বলেন্দ্রনাথের সমীচীন প্রাধান্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহার মৌলিকতা পদ্যে—কবিতায়। এই সিদ্ধহস্ত গদ্য-লেখক, মূলে কবি। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের এক একটা কথা এক এক খানি চিত্র, তাহার অর্থই এই। গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্প বা অধিক পরিমাণে তাঁহার কলম দোরস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু পদ্যে একা প্রকৃতি নিজেই তাঁহার শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইহাদের কবিত্ব ও কল্পনা নিতান্ত অন্তরের। গোলাপ বা পদ্মের সৌন্দর্য্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল বা কামিনীর মৃদুসৌরভ আছে। যাহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগিবে, তাহাদের বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাদের মৃদুমদিরার ঘোর সহসা ছাড়ে না।

এই দুই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী "দিশে দিশে গীতে গন্ধে" মুঞ্জরিত। বিরহে—মিলনে, অন্তরে—বাহিরে, শয়নগৃহে—নদীবক্ষে, প্রেমের

সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-ঘন নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়-বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে—সকল বিলাস-কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—

"একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি"

কালিদাসের "ঋতুসংহারে"র সহিত "মাধবিকা" ও "শ্রাবণীর" কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু "ঋতুসংহারে" বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। তাহার অনেক কবিতার ভিতরই একই ভাব—একই বিষয়, কেবল ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু এই দুই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতারই প্রাধান্য আছে। তাহা ছাড়া "ঋতুসংহার" বাহ্যশোভা বর্ণনেই পরিপূর্ণ। এই দুই পুস্তকের কবিতা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অন্তরের। ইহাদের ভিতর একটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় জাগ্রত।

ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুন্দর ও পরিপাটী। প্রথম কবিতাপুস্তকে এমন পাকা হাত প্রায়ই দেখা যায় না। স্বচ্ছ সরল ভাষার অন্তরে কল্পনার স্বর্ণ-রেণু চিক্ চিক্ করিতেছে।

প্রতিভার আর একটী মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয় সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক, এবং প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের স্বভাব-গত ধর্ম্ম।

সাহিত্যে এমন অনুরাগ এমন অপূর্ব্ব ক্ষমতার অকাল অবসানে বাঙ্গালা ভাষার, বিশেষতঃ অভিনব ও উপচীয়মান বাঙ্গালা গদ্যের যে সুমহান ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথকে হারাইয়া শুধু যে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নয়—বঙ্গদেশ একটি অকপট দেশ-বৎসল পুত্ররত্ন হারাইয়াছে। 'আর্য্য-সমাজ' ও 'ব্রাহ্ম-সমাজে'র মিলন চেষ্টার উপলক্ষে তিনি পঞ্জাববাসীদের যেরূপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কালে তাহা এই দুই জাতিকে একটি সুদৃঢ় প্রেম বন্ধনে মিলিত করিত। কিন্তু সে আশা সূচনাতেই বিনষ্ট হইল।

এখানেও কিন্তু আমাদের ক্ষোভের শেষ নয়। এই সাহিত্য-কুশলী স্বজাতিবৎসল দেশহিতৈষীর চরিত্র যে কি উদার—কি অনির্ব্বচনীয়-মধুরতা-পূর্ণ ছিল, তাঁহার সহিত যিনিই আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য উপভোগ করিয়াছেন তিনিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এমন বিনয় কোথাও দেখি নাই। এমন লোক নাই যিনি বলেন্দ্রনাথের মুখে কোন অপ্রিয় কথা শুনিয়াছেন বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা বলিতে পারেন। গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি—বন্ধুজনে অনাবিল স্নেহ—এবং সর্ব্বজনে প্রীতি ও বিনয় তাঁহার নিঃস্বার্থপর চরিত্রে জাজ্বল্যমান ছিল। কিন্তু হায়, সেই উজ্জ্বল প্রতিভা—সেই গভীর দেশানুরাগ—সেই দেবোপম সুন্দর চরিত্র অনবসান যৌবনে সেই প্রিয়দর্শন পুরুষোচিত সৌম্য সুন্দর দেহের সহিত চিতার অগ্নিরাশির মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে। দুরদৃষ্ট আমরা।

বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা।

[পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ প্রদীপে তাঁহার একটি লেখা দিবেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার অবসর ছিল না। নিজের বিষয়কার্য্য তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহা সত্ত্বেও পঞ্জাবী আর্য্য সমাজের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মিলন সাধনের জন্য তিনি দিনরাত সচিন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য মনে লইয়া তিনি গত বৎসর মাঘ মাসের শেষে পঞ্জাবে যাত্রা করেন। পথকষ্টে অনিয়ম ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাভাবিক দুর্ব্বল দেহে কঠিন রোগের সূত্রপাত হয় কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে যে কথা দিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। কিছু দিনের জন্য রোগযন্ত্রণার উপশম হইবামাত্র শিলাইদহ পল্লীভবনে বসিয়া তিনি প্রতিশ্রুত প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লেখা কেবল আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, শেষ করিতে পারেন নাই। নিষ্ঠুর পীড়ার আক্রমণে দ্বিতীয়বার শয্যাগত হইয়া তিনি তাঁহার পৃথিবীর সমুদয় কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তরুণবয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কল্পিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্তলেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহদাশয়কে 'প্রদীপ' সম্পাদকের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিলাম।

'প্রদীপের' জন্য তিনি যথাক্রমে তিনটি প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনটিই অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধটি রবিবর্ম্মার চিত্রকলা সম্বন্ধে। যতটুকু লিখিয়াছেন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবি বর্ম্মা।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সাধনার পৃষ্ঠায় রবিবর্ম্মার সহিত আমাদের যখন প্রথম পরিচয় সাধিত হয়, তখন কলিকাতার বাজারে তাঁহার চিত্রাবলীর আমদানি হয় নাই; এবং বোম্বাইপ্রবাসী ভিন্ন সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার নাম পর্য্যন্তও অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং সে সময়ে নামতঃ তাঁহার সহিত পরিচয় সাধন হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার গুণগ্রহণ করিবার অবসর আমাদের সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে জুটে নাই, এবং সাধনার সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদের কল্পনা বোধ করি তদানীন্তন আর্ট ষ্টুডিয়োকে লঙ্ঘন করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইবারও অবসর পায় নাই। এক্ষণে এই কয় বৎসরের মধ্যে রবিবর্ম্মার চিত্রাবলীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এমন কি, সুদূর পল্লীগ্রামের মেটে ঘরের দেয়ালেও দাক্ষিণাত্যের রূপসীগণ এলোচুলে কুঞ্চিত কুন্তলে স্মিতহাস্যে মালানিবদ্ধ কবরী বেষ্টনে গোলাপী ও বাসন্তী রঙের শার্টিকা ও বিচিত্ররঞ্জিত চোলিকায় মনোহারিণী মূর্ত্তিতে শোভা পাইয়া থাকেন।

কিন্তু তাই বলিয়া এখনও সূক্ষ্ম বিচারের সময় আসে নাই। টেক্‌নিকের ওস্তাদী প্রথম হইতেই আশা করা যায় না—এবং শিল্পকলার এ সকল খুঁটিনাটি দোষগুণ আমাদের মত অনিপুণ দর্শকেরদের চক্ষে সহসা ধরাও দেয় না। রবিবর্ম্মার কোন কোন চিত্রে অবশ্য এমন ত্রুটিও আছে যাহা স্বল্পজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিপথেও নিপতিত হয়—কিন্তু ভাবের প্রাবল্যে এ সকল দোষ অনেকটা যেন ঢাকা পড়িয়া যায়, অন্ততঃ আমাদের এতৎপ্রতি কোনরূপ অতিমাত্র ঝোঁক দিতে ইচ্ছা হয় না এবং সম্প্রতি তাহার তাদৃশ আবশ্যকতাও দেখা যায় না। আমাদের সুন্দরীদের যে একটি মনোহর শ্রী তাঁহার তুলিকাস্পর্শে বিকশিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে যে মুখের ভাব, যে অপাঙ্গের দৃষ্টি, যে দাঁড়াইবার ভঙ্গী, যে বাহুবিক্ষেপ, যে অলঙ্কারমণ্ডন, সকলই সম্পূর্ণ দেশী—এবং আমরা প্রতিদিন যাহা দেখি তাহারই মধ্যকার সৌন্দর্য্যটুকু দিয়া উদ্ভাসিত।

রবিবর্ম্মার রূপসীরা আমাদের ঘরের লোক। কেশবিন্যাসে, অঙ্গরাগলেপনে, প্রসাধনে, পথে ঘাটে গৃহে নানাবিধ নিত্যকর্ম্মে ইহাদের সহিত আমাদের নিয়ত দেখাশুনা। কখনও পরিহাসপরায়ণা, কখনও অশ্রুপরিপ্লুতা, কখনও শুশ্রূষারতা, কখনও উৎসবপ্রমত্তা, কোথাও বিরহবিধুরা, কোথাও নীলাম্বরীসমাবৃতা অভিসারিকা, কোথাও কান্তসমাগতা লীলাময়ী মনোহারিণী; কোনখানে একান্ত তরুণী নববধূ, কোনখানে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এত রূপে এত ভাবে যেখানে পরিচয় সেখানে যে একটী আরাম এবং সান্ত্বনা, প্রীতি এবং আত্মীয়তা অনুভব করা যায় তাহা ত আর বাহিরে আশা করা যায় না। বাহিরে যেখানে রূপ নেত্রমাত্র ঝলসিয়া দেয় কিম্বা বড় জোরে মনের মধ্যে একটা ঝাপট দিয়া যায়, এখানে সেস্থলে একটি কল্যাণী শ্রী সমস্ত হৃদয়মন যেন আচ্ছন্ন করিয়া তুলে। এবং হৃদয়ে হৃদয়ে যে বেদনার তড়িৎসঞ্চার স্ফুরিত হইতে থাকে তাহাতে সকল অসম্পূর্ণতা ঘুচিয়া যায়।

রবিবর্ম্মার চিত্রকলার মূল উৎস আমাদের হৃদয়ে। হয় পৌরাণিক বিষয়—রাধাকৃষ্ণ, নলদময়ন্তী, শকুন্তলা, সুভদ্রার্জ্জুন, তপোভঙ্গ; নয় আধুনিক দাক্ষিণাত্যের গোপবালা, তন্বঙ্গী, ব্রাহ্মণ বিধবা, শুচিস্নাতা পূজায়োজনরতা; সেকালে একালে আমাদের অন্তরের সহিত সকল গুলিরই একটি নিরবচ্ছিন্নতা আছে। কিন্তু রবিবর্ম্মার সেকালের চিত্রগুলি যে সকল স্থলেই যথার্থ পৌরাণিক তাহা বলা যায় না—বরঞ্চ আধুনিকেরই সেখানে কিছু

প্রভাব দৃষ্ট হয়। বিরহিণী যেখানে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একান্তমনে ধ্যান করিতেছেন সেখানে তাঁহার পার্শ্বের আলিসাটি হয়ত নিতান্তই আধুনিক স্থাপত্যানুযায়ী ইতালীয় কলসসজ্জিত। সেকাল তাহাতে সহসা মনে আসে না। তবে দাক্ষিণাত্যের রূপসীদের বেশভূষা, তাঁহাদের শাটী ও চেলী, মালা ও কবরী, মুসলমান প্রভাববর্জ্জিত ভাব ও ভঙ্গীতে সেকাল নাকি অনেক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে সেই জন্য চতুষ্পার্শ্বের আধুনিকতা কতক ঢাকিয়া যায়, এবং তাহাতেই সাধারণ দর্শকের চক্ষে রবিবর্ম্মার এ সকল ত্রুটি বড় সহজে ধরা দেয় না।

আসল কথা, রূপসীগণই এখানে যেন ত্রুটিগুলি সারিয়া লয়েন। তাঁহাদের আঁখিকোণপ্রান্ত হইতে যেন পুরাতন উজ্জয়িনীর সমস্ত কুবলয়নেত্র অতীতের গবাক্ষপথ-মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি প্রেরণা করিতেছে। যেমন আজিকার এই বাসন্তী চন্দ্রালোকে সেই পুরাতন মধু মাসের তাবৎ চন্দ্রিকা নিশার সুখদুঃখ জাগিয়া উঠে, আজিকার রাখাল বালকের বংশীধ্বনিতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই পুরাতন বৃন্দাবনের রাখালবালকগণের স্ফুরদধরণিঃসৃত ফুৎকারটুকু সঞ্জীবিত হইয়া রহে, রবিবর্ম্মার রূপসীগণের মুখে সেইরূপ নির্ব্বাপিত অতীতের অতীন্দ্রিয় রূপলাবণ্যের একটি করুণ মোহাবেশ যেন একান্ত সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে সেকাল একালের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান চক্ষে পড়ে না। অথবা কর্ম্মক্লিষ্ট একালের মাঝে সেকালের শান্তিটুকুই সমধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়।

[আর একটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, লাহোরের বর্ণনা। তাহার কয়েকছত্র মাত্র লেখা আছে।] ঃ—

পঞ্জাবের আতপ্ত আকাশপটে লাহোর সহরটি যেন আরব্যোপন্যাসের প্রাচীন খলিফাদিগের একটি অতি পুরাতন পরিত্যক্ত রাজধানী। হারুন্-অল্-রসিদ্-শাসিত বোগ্দাদের সে নিত্যোৎসবময় পুরাতন সমারোহ এখানে এখন দুর্লভ—রাজপথে ছদ্মবেশে খলিফারাও ভ্রমণ করেন না এবং নিত্য নিশীথে নূতন নূতন উপন্যাসসুলভ ঘটনাও সংঘটিত হয় না—কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে মিনারে, তোরণে প্রাচীরে, গৃহদ্বারে অলিন্দে, বাটির সম্মুখের বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে গবাক্ষে, ইহার আঁকা বাঁকা অপ্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য গলিপথে এবং এই সকল পথের বিচিত্রবেশী জনতায় ও হয় গজ উষ্ট্র গো গর্দ্দভ মেষ মহিষ একারথরণিত গতিবিধিতে সেই খালিফী বোগ্দাদের কাহিনী মনে পড়ে, এবং নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ও অবাধ প্রচুর সূর্য্যকিরণে মনে যেন আরব্যমরীচিকার ছায়া ঘনাইয়া আসে।

পঞ্জাবে বসন্ত সমাগম মহা সমারোহের ব্যাপার। বসন্ত সেখানে বরবেশে মহোল্লাসে পুষ্পক রথে চড়িয়া আগমন করে। বেগবান পবন তাহার বাহন, সূর্য্য তাহার রথচক্র, এবং তাহার রৌদ্রোজ্জ্বল বসনপ্রান্তে শুভ্রবিকশিত নাস্পাতির ফুল এবং তাহার রেণুপাটল দোধূয়মান উত্তরচ্ছদে নেবুমঞ্জরীর সৌরভ।

[ইহা ছাড়া লেখক লাহোর চিত্রের যে সূচনাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

স্বচ্ছ আকাশ, দীপ্ত সূর্য্যালোক, মৃদু উত্তাপ, আলসভাব, ধূলারঙের মেষ ও বৃহৎকায় ছাগপাল, মহিষ ও গোরুর পাল, আরোহীসহ উটের দল, স্ত্রীলোক বোঝাই গোরুর গাড়ি, স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ ইজার ঘাগরা অঙ্গরাখা ওড়না, ঘুড়ি উড়াইবার উৎসাহ, আঁকাবাঁকা গলি, উটের গাড়ি, এক্কা, গুড়গুড়ি হাতে রাখাল, রাস্তার ধারে চরকাকাটার ধূম, গলির ভিতরে কোমরে কাপড় জড়াইয়া মধ্যাহ্নে মেয়েদের সুতাকাটা, পথের ধারে পাঠশালা, মেঠায়ের দোকান, কড়া প্রসাদ, রাত্রে ফকিরের গান, ভারবাহীগাধা, পথে নাপিত কামাইতেছে, গেরুয়া বসন সাধু, পথের ধারে ছাতের নীচে ইঁদারা, ঘোড়ার পিঠে স্ত্রীপুরুষ আরোহী, মেয়েদের ঘটিহাতে স্নানান্তে ফুল ফেলা ও মন্দিরে গতিবিধি, পথে বিবাহের বরযাত্রা, অশ্বারোহী বর ও বাদ্যভাণ্ড। পঞ্জাবী ভোজ, দস্তরের উপর, থালার উপরে বাটি বসানো, রুটি পোলাও দধি।

রবিবর্ম্মার চিত্রশিল্প ও লাহোরের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে যে প্রবন্ধটি তিনি প্রদীপের জন্য লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহাকেই কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণ করিয়া শিবসুন্দর নাম দিয়া পরে প্রকাশ করা গেল।

এই স্থলে লেখকের তরুণ বয়সে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

বিজ্ঞতা।

পরাণ আঁধার করে' দাঁড়ায়ে কে তুমি ?
সরে যাও কোরোনাকো চিত্ত মরুভূমি !
এখনো ফুটিছে ফুল শুষ্ক হৃদিপরে,
এখনো রয়েছে আশা, ছেড়ে দাও মোরে !
চাহিনা সুবিধা-স্বর্গ বিজ্ঞতা তোমার,
আমার হৃদয় যেন থাকে গো আমার !
রয়েছে দিনের আলো চলে যাই সোজা,
কাজ কি প্রদীপ হাতে গলি পথ খোঁজা !

শিবসুন্দর।

আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই একটি বিশেষ শুভভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপবর্ণনায় এই জন্য আমরা কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহার কল্যাণী মূর্ত্তিখানিই আমাদের অন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রূপের দাহিকা শক্তি নিতান্ত প্রবল না হয়। লক্ষ্মী আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার চরণের অরুণরাগস্পর্শে আমাদের গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাঁহার সকরুণ শুভদৃষ্টিতে আমাদের মনের সমস্ত তমঃ পলকে কাটিয়া যায়—যেমন রূপ তেমনি গুণ ; এবং রূপ এখানে গুণের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ সুতরাং এই লক্ষ্মীরূপিণী সুন্দরীর শুভপ্রভাব আমাদের জীবনে নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার সকলই শুভ এবং এই শুভ ভাবেই তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমাদের এই শুভ ভাবনাটুকু বাহিরের দৃষ্টিতে সহসা ধরা না পড়িতে পারে, কারণ, বাহিরে হয়ত সৌন্দর্য্যের একটি হিল্লোলস্পন্দন মাত্র অনুভব হয়, কিন্তু যাহাদের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ তাহারা সেই শুভটুকুই যেন অধিক করিয়া দেখে, ইহাই বিশেষ রূপে উপলব্ধি করে। সুন্দরীর চারু চরণ-তল ধরা স্পর্শ করে কি না করে—তাহার প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে যেন লক্ষ্মীঠাকুরাণীর শুভ পাদপাতস্পন্দন অনুভব হয় ; তন্বঙ্গীর মনোহর অবলীলাগতি পশ্চাতে যেন কমলালয়ার কমলকুঞ্জের সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া যায়—কোনরূপ ত্রুটি ঘটিলে তাহা যে কেবলই অশোভন তাহা নহে, তাহা অশুভ, তাহাতে অলক্ষ্মী প্রশ্রয় পায় ; আমাদের গৃহলক্ষ্মীর কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে সংসারের সর্ব্ববিধ কাজেকর্ম্মে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানে নিয়ত একটি লক্ষ্মী শ্রী প্রকাশ পায়, আমাদের নিকট যাহা বিশেষরূপে শুভ এবং শুভ বলিয়াই একান্ত কমনীয়।

এই শুভ ভাবের প্রভাব এইখানেই শেষ নহে। কোথায় সীমন্তের সিন্দূর রেখা, কোথায় চরণের অলক্তকরাগ, কোথায় চিরন্তন কেশধূপরচনা, কোথায় তন্বঙ্গে চন্দন-পঙ্কলেপন, প্রকোষ্ঠে বলয়কঙ্কণ, গ্রীবাদেশে হারযষ্টি, এমন কি, শাড়ীর রক্তবর্ণ পাড়টি অবধি আমাদের অন্তরে প্রধানতঃ যেন একটি শুভ সূচিত করে। প্রসাধন কলার এই শুভসূচিতা আমাদের নব্যশিক্ষিত অন্তরে প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কিন্তু হৃদয়ের যোগে সৌন্দর্য্য যে শুভ হইয়া উঠে, যেখানে কেবল মাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ছিল সেখানে অন্তরের একটি মনোহর পরিতোষ ভাব সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অনেক বড় করিয়া দেয় এ কথা আমরা বিস্মৃত না হই। কেবল প্রসাধন বলিয়া নহে, আমাদের যে কোন কাজে—কি গৃহসজ্জা, কি উৎসবকলা, কি শঙ্খধ্বনি, কি মঙ্গলঘট স্থাপন, কি অন্য কোন কিছু—হৃদয় যেখানে আপন ব্যাপকতা সঞ্চার করিয়াছে সেইখানেই সুন্দর শুভ হইয়া উঠিয়াছে, সেই খানেই শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অন্য দেশের সহিত আমাদের এই ভাবে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। রমণী যে দেশে আছেন সেখানেই যে অলঙ্কারমণ্ডন ও বেশবিন্যাস-পরিপাট্যের ব্যবস্থা না থাকিয়া যায় না সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং এই বেশভূষা প্রসাধনের মধ্যে কোথাও সচেতনভাবে কোথাও বা অজ্ঞাতসারে মনোহরণের একটি বিশেষরূপ চেষ্টা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই মনোহরণ বোধ করি আর কোনও দেশে আমাদের দেশের মত স্বামীর শুভকামনা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য নিষ্ঠার মধ্যে পুষ্ট হইয়া তাহার বণিক্ভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। আমাদের গৃহিণীগণের অলঙ্কারমণ্ডন একটি অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে—তাহাতে প্রিয়জনের কল্যাণ হয় এবং পরিবারের লক্ষ্মী-শ্রী অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই শুভ কামনায় ইহার ভিতরকার অনেক নিদারুণ দৈন্য ও মলিন হীনতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—বরঞ্চ ইহাতে সৌভাগ্যবতীদের একটু গৌরবের বিষয় হইয়াছে। এবং এই কারণেই প্রিয়বিয়োগে আমাদের গৃহিণীরা একেবারে নিরাভরণা হয়েন—স্বামীর কল্যাণের সহিত যে প্রসাধনের একান্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তদভাবে তাহাতে আর প্রয়োজন কি? বাহিরের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট অন্তরের শুভ-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে একই নিষ্ফল।

শুভকর্ম্মের দিন আমাদের গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট কেবল-মাত্র বহিঃশোভাসম্পাদক নহে কিন্তু তাহা চূতপল্লব-রমণীয় হইয়া উৎসব ব্যাপারে আমাদের একটি মঙ্গল ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সেই কারণে তাহা আমাদের মানসচক্ষে য়ুরোপের বহুমূল্য গৃহসজ্জা অপেক্ষা সুন্দর। তাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর না হইতে পারে কিন্তু তাহা গৃহকর্ত্তার আন্তরিক কল্যাণ ভাবের বাহ্য-প্রতিমাস্বরূপ (symbol)। এই কারণে তাহা আমাদের চক্ষু আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বেই এক মুহূর্ত্তে অন্তঃকরণের সুগভীর সুস্নিগ্ধ প্রসন্নতা আকর্ষণ করিয়া আনে। বিদেশীর কাছে ইহা নিরর্থক কিন্তু শিশু-কাল হইতে যাহারা প্রত্যেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই মঙ্গল-ঘটের প্রত্যক্ষ ভাষা বুঝিয়া আসিয়াছে তাহাদের নিকট ইহা একান্ত অন্তরতররূপে রমণীয়।

আমাদের ভাষায় যেমন শুভ এবং শোভা শব্দের একই ধাতু তেমনি ভারতবর্ষীয়ের মনের মধ্যেও মঙ্গল এবং সুন্দর একত্র মিশিয়া আছে। এরূপ মিশ্রণ আর কোথাও নাই। এই মিশ্রণপ্রভাবে আমরা সৌন্দর্য্যকে চোখ দিয়া না দেখিয়া হৃদয় দিয়া দেখি, ধর্ম্মচক্ষু দিয়া উপলব্ধি করি। সেই জন্য পাত পাড়িয়া মাটির খুরী সাজাইয়া মাটিতে বসিয়া ধনী দরিদ্র আহূত অনাহূত সকলে মিলিয়া আহার করার মধ্যে কিছুই অসুন্দর দেখি না। আমাদের চক্ষে বিচ্ছিন্ন কদলীপত্র ও সুলভ মৃৎপাত্র অশোভন নহে কিন্তু যদি দীনতম অতিথি গৃহস্বামীর অনাদর কল্পনা করিয়া বিমুখ হইয়া যায় তবে তাহাই অশোভন, কারণ তাহা অশুভ, কারণ তাহা যজ্ঞ-সমবেত জনসংঘের বিপুল হৃদয়গত অখণ্ড সদ্ভাববন্ধনের বিচ্ছেদজনক সুতরাং কুশ্রী।

বরণ আমাদের একটি সনাতন অনুষ্ঠান। যাহাকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যাহার শুভকামনা করি তাহাকে বরণ করিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। ঋগ্বেদের সময় সদস্য বরণ সকল উৎসবের একটি প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। সেই বরণক্রিয়া অদ্য আমাদের দেশে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া আমাদের গৃহের মধ্যে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতেছে। বিবাহ হউক্, অন্নপ্রাশন হউক্, ব্রতব্রত হউক্ কখন বধূ, কখনো জামাতা, কখনো স্বামী, কখনো পুত্র কখনো অতিথি বা ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া লইতে হয় এমন কি নিতান্ত পক্ষে গোষ্ঠের গোরু অথবা ঢেঁকিশালের ঢেঁকিকে বরণ না করিয়া শুভকর্ম্ম সমাধা হয় না। জীব ও জড় আত্ম ও পর সকলের মধ্যে এই অক্ষুণ্ণ সদ্ভাবের উত্তাপহীন সৌম্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য-বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কেবল ঝাড় লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় হয় না।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই শুভসুন্দর ভাব যে বৌদ্ধ পালিমন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই প্রবন্ধের উপ-সংহারে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি উদ্ঘোষিত করুক্ ঃ—

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা "হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো "বিগচ্ছন্তু।

সর্ব্বজীব সুখী হৌক্, অবৈর হৌক্, অবধ্য হৌক্, অহিংসিত হউক—সুখী আত্মা হইয়া কালহরণ করুক্। সর্ব্বজীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হৌক্। সর্ব্বজীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হৌক্!

সাহিত্যে ভাণ।

জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ সরলতা ও আন্ত-রিকতার একান্ত প্রয়োজন। সরলতা ও আন্তরিকতা হীন জীবন যেমন সমাজের অপকারক, সরলতা ও আন্তরিকতা হীন সাহিত্যও তেমনই সাহিত্যের অপকারক। জীবনকে উন্নত করিতে হইলে যেমন সত্যের আশ্রয় লইতে হয়, সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলেও তেমনই সত্যাশ্রয় আব-

শ্যক করে। সৎজীবন, পৃথিবীর কল্যাণকর; সৎসাহিত্যও পৃথিবীর কল্যাণকর। সাহিত্য,—জীবনের প্রতিবিম্ব। জীবন মলিন হইলে, জীবনের প্রতিবিম্ব সাহিত্যও মলিন হইয়া থাকে।

এই মলিনতা কি? উত্তরে অনেক কথা আসে। তন্মধ্যে প্রথম কথা ও প্রধান কথা,—ভাণ।

ভাণ কি? যাহা তোমার নাই বা যাহা তুমি নও, তাহা দেখাইবার চেষ্টা। সুতরাং এই ভাণ,—সরলতা ও আন্তরিকতা বিবর্জ্জিত। সরলতা ও আন্তরিকতা বিবর্জ্জিত যে বস্তু, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ভাণও বর্জ্জনীয়;—জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ।

ভাণে জীবনকে অধোগামী করে; ভাণে সাহিত্যেরও অধোগতি হয়। তুমি বরং সরল সর্পটি পাষণ্ড হও, অবস্থা বিশেষে তোমার পরিত্রাণ আছে, পরন্তু ভাণ বা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কস্মিন্‌কালে তুমি পরিত্রাণ পাইবে না। সাহিত্যেও তেমনই; তুমি বরং সরলভাবে সাদামাঠা কথা লিখিয়া সাধারণ ভাব ও চিন্তা প্রচার করিও, এক শ্রেণীর পাঠকের তাহাতে উপকার হইবে; পরন্তু যাহা তুমি জান না, যাহা তোমার জীবনে নাই, এবং যাহা তুমি কখন অনু-ভবও কর নাই, সেরূপ কথার আলোচনা করিয়া, মৌলিক তত্ত্ব প্রচার ব্যপদেশে একটা উদ্ভট সাহিত্যের সৃষ্টি করিও না। তাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তোমার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া মনে মনে হাসিবেন।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালো-চনা করিলে, এই ভাণেরই একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। বিগত ষোড়শবর্ষকাল অবিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গসাহিত্যের সংশ্রবে থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের সাধের সাহিত্য ক্রমেই যেন অসার আত্মম্ভরিতার একটা পরিচয়স্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। মনকে চোক ঠারিয়া, বাহিরে আমরা যত "উন্নতির" ধুয়া ধরি না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমের অবসান হইবার পর, আমাদের সাহিত্য উন্নত হয় নাই,—সাহিত্যের কতকগুলা আবর্জ্জনা বাড়িয়াছে মাত্র। সংখ্যায় ও বিভাগে অনেক পুস্তক হইতেছে বটে; কিন্তু প্রকৃত সৎ-সাহিত্য অতি বিরল। সে বিরল এত যে, অঙ্গুলিতেও তাহার গণনা করা যায়। কথাটা তিক্ত হইলেও খাঁটী। একটু উদার-চিত্তে এবং নিরপেক্ষ ভাবে কথাটার বিচার করিলে বাধিত হইব। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধ-লেখকও ঐ "আবর্জ্জনায়" বাদ পড়িতেছেন না,—কারণ লেখকের পুস্তকের সংখ্যা অনেকগুলি, এবং সম্ভবতঃ সেগুলিও উক্ত দোষ হইতে অধিক নির্ম্মুক্ত নহে।

যাহা সত্য ও সুন্দর, যাহা সার ও শুভপ্রদ, তাহাই সাহিত্য। বুকে হাত দিয়া বল দেখি ভাই, এই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ কাব্য উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে কয়খানা বাঙ্গলা গ্রন্থ উক্ত গুণ-বিশিষ্ট দেখিতে পাও? মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ অনেক থাকিতে পারে; চটকপূর্ণ রোচক লেখাও অনেকে লিখিয়া থাকিবেন; 'শেষ না করিয়া থাকা যায় না'—এমন গ্রন্থও অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে জানি; তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিব,—স্থায়ী সাহিত্যে উহার স্থান নাই। বালক ও স্ত্রীলোকের কাছে,—চটকপ্রদ "রূপকথা" খুব রোচক, মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে; পরন্তু চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি কতক্ষণ তাহা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারেন? সুতরাং বলিতে হয়, চটকপূর্ণ বা রোচক এবং মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক হইলেই,—সাহিত্য ভাল হইল না,—সাহিত্যের উহা একটা মহাগুণও নয়। এ কথায় কেহ এমন না বুঝেন, আমরা "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" গোছের নীরস সাহিত্যের পোষকতা করিতেছি! সাহিত্য সরস হউক এবং সর্ব্বথা তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে; কিন্তু তা বলিয়া আলোচ্য বিষয়, কেবলমাত্র ভাষার ছটায় ও বর্ণনার ঘটায় ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহার স্বরূপত্ব অপ্র-কাশ রাখা কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। ন্যায়, যুক্তি ও মূল কথা চাপা দিয়া, অবান্তর কথায় শাখা প্রশাখা বাড়াইলে,—তাহা আর কি হইল? ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া একটা জিনিসকে অনেক বড় করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে যে, আসল জিনিসই চাপা পড়ে। ক্ষুদ্র যূথিকার গুচ্ছের উপর যদি অঞ্জলিপূর্ণ করবীর ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সেই যূথিকা আর সৌরভদানে সমর্থ হয়? রাশীকৃত করবীর দেখিয়া বালক মাতিতে পারে বটে; কিন্তু, যে ফুলের আঘ্রাণ বুঝিয়াছে, সে তাহাতে ভুলিবে কেন? সুতরাং বুঝা গেল, স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে, আপাত মনোহর চটকের হাত এড়াইতে হয়।

কেবল বাহবা পাইবার লোভে যে লেখে, তাহার না

লেখাই ভাল। কারণ আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে 'বাহবা' জিনিসটা এখন এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিরলে অশ্রুপাত করেন। বরং অবস্থা বিশেষে 'বাহবা' না পাইয়া, যে দুর্নাম পায়, সেও বুঝি দেশের একটা কাজ করিয়া থাকে!

আমাদের কথা এই;—যদি তুমি কিছু নূতন কথা বলিতে পার, তবে লিখ। যদি কোন নূতন আলোক, নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা, নূতন তত্ত্ব তোমার আয়ত্ত্বে থাকে, তবে তাহা লিপিবদ্ধ কর। যদি তুমি জগতে কোন সত্য প্রচারে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে 'লেখক' নাম ধারণে ধন্য ও কৃতার্থ হও। নহিলে ভাই, কেবলই নাম-কিনিবার ও বাহবা পাইবার লোভে ও বোকা ভুলাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের মতলবে, সাহিত্যের পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিও না। সাধনার যে ধন, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব লাভের যাহা প্রকৃষ্ট পথ, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির যাহা ভিত্তিস্বরূপ, তাহাকে বণিক্-বৃত্তির অঙ্গীভূত করিও না। যাহাতে একাধারে আনন্দ, শিক্ষা, জীবনের তৃপ্তি ও আত্মার স্ফূর্ত্তি, 'ভাবের ঘরে চুরি' করিয়া,—তাহাকে গোঁজামিল দিয়া যাইও না। যাহাতে মন প্রশস্ত হয়, বুকে বল বাড়ে, পরকে আপনার করা যায়, জগতের ও জীবনের অনেক দুঃখ ভুলিয়া থাকা যায়,—দোহাই ভাই! সে জিনিসটা লইয়া আর ন-কড়া ছ-কড়া করিও না। ইহাতে যে, তুমি একা মজিবে তাহা নহে,—তোমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুর্ভাগ্যও মজিবে। কিন্তু মনে রাখিও ভাই, সেই ফরাসী লেখকের সেই কাহিনী। *

শিশু যেমন পুতুলের গায়ে রাংতা পরাইয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে থাকে, এই শ্রেণীর লেখকগণ, ঠিক সেই ভাবে সাহিত্যকে প্রাণে মরিয়া, সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া, বাহিক চাক্‌চিক্যে মাতিয়া, আপনারাও প্রবঞ্চিত হয়, দেশকেও প্রবঞ্চিত করে। ইহারা আপনাদের নামের জয়ঢাক আপনি ঘাড়ে করিয়া বাজাইতে থাকে, কখন বা সমধর্ম্মা 'সাহিত্যিক' বন্ধুদ্বারাও একচোট বাজাইয়া লয়। বন্ধু যে বন্ধুকে বাড়ান, তাহার উদ্দেশ্য,—তিনিও সময়ান্তরে তাঁহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ রামের বন্ধু শ্যাম,—রামের গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন;—আর শ্যামের বন্ধু রাম,—শ্যামের গ্রন্থ লইয়া দেশ মাতাইলেন। শুধু আদান প্রদান সম্বন্ধ,—স্বার্থ বিনিময়,—তাহার অধিক একটুও নয়। রামের দ্বারা শ্যামের যতটুকু স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে; শ্যাম ঠিক সেই পরিমাণে, তুলাদণ্ডে চাপাইয়া রামের প্রশংসার মাপ ঠিক করিলেন; শ্যামও সুবিধা মত, নিক্তিতে ওজন করিয়া বন্ধুর সেই ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই স্বার্থ বিনিময় লইয়া, ঘটনা-সূত্রে যদি রাম ও শ্যামের মধ্যে একটু মনান্তর ঘটিল, তবে আবার তদ্দণ্ডেই রাম ও শ্যামের সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিবে। তখন আবার সেই রাম শ্যাম সহস্র-মুখে পরস্পরের দোষ কীর্ত্তনে ও নিন্দাবাদে রত হইবে। এবার শুধু গ্রন্থ লইয়া নহে,—গ্রন্থকারের পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক সমালোচনা চলিবে। যাঁহারা আজি কালের সাহিত্য বাজারের সঠিক সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন,

* এখানে একটি গল্প মনে পড়িল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সমসাময়িক এক লেখককে লক্ষ্য করিয়া, জনৈক নীতিবেত্তা উপদেশচ্ছলে এই গল্পটি করিয়াছেন। গল্পটির মর্ম্ম এই;—এক ফরাসী লেখক বহু গ্রন্থ লিখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। পরলোকে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার পাপপুণ্যের বিচার হইল। বিচারে লেখক মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহার ফলে উত্তপ্ত লোহ কটাহে উষ্ণ তৈলে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করা হইল। লেখকের পার্শ্বে ঐরূপ তপ্ত তৈলে আর একটি জীবও দণ্ডভোগ করিতেছিল। সে, দস্যু। কিন্তু তাহাকে বেশ শুষ্ক ইন্ধনসাহায্যে আগুন করিয়া তপ্ত তৈলে ভাজা হইতেছে। আর লেখক মহাশয়ের ভাগ্যে যত রাজ্যের কাঁচা কাঠ পড়িয়াছে। তাহার ফলে তিনি ধিকি ধিকি করিয়া, দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া সেই তপ্ত তৈলে পুড়িতেছেন। নিকটে রক্ষক দণ্ডায়মান। রক্ষককে দেখিয়া লেখক মহাশয় কাতরবচনে কহিলেন, "বাপু, এ তোমাদের রাজ্যের কিরূপ বিচার! ঐ দস্যু সারা জীবন পরের কাড়িয় খাইয়াছে; কত লোককে প্রাণে মারিয়াছে, আর আমি গ্রন্থকার, কত কষ্টে কয়েকখানা বহি লিখিয়া কোন রকমে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি; তা ওর আর আমার এক বিচার হইল?—বাড়ার ভাগে ওকে বেশ শুক্‌নো জ্বালানি কাঠ দিয়া জ্বাল দিবার ব্যবস্থা হ'য়েছে, আর আমার ভাগ্যে যত রাজ্যের কাঁচা কাঠ!—কেবলই ধোঁয়া, ধ'রেও ধরে না।—তপ্ত তেলে ঝলসে পুড়িয়ে ভেজে মারবে, এতেও ইতর-বিশেষ?" রক্ষক হাসিয়া উত্তর দিল,—"গ্রন্থকার মহাশয়! এমন সূক্ষ্মবুদ্ধি না হইলে আর আপনি গ্রন্থকার হন? বলি, ও তো ডাকাত, ওর মানুষ-মারার তো একটা সংখ্যা আছে, কিন্তু আপনার কাণ্ডটা কি, ভাবুন দেখি—জীয়ন্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোককে মারিয়াছেন, আবার মরণান্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণবধের বীজ পৃথিবীতে রাখিয়া আসিয়াছেন।—আপনার কেতাবের 'জড়' তো শীঘ্র মরিতেছে না!" পাঠক বুঝিবেন, তখন ফরাসী রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ভীষণ! লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; পরকালে আস্থা নাই, পাপপুণ্যের ধারণা নাই; উচ্ছৃঙ্খলতায়, অরাজকতায় ও যথেচ্ছচারিতায় তখন দেশ পূর্ণ; ভোগসুখ ও ইহকাল লইয়াই ফরাসী তখন দিশাহারা। সেই ভীষণ ভয়াবহ সময়ের চিত্র, সত্য ও অভ্রান্তভাবে প্রতিপন্ন করিয়া উক্ত লেখক মহাশয়, লোকের হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।—তাই বিধাতার বিধানে, লোকান্তরে তাঁহার এই দুর্গতি।

এ কথা একটুকুও অতিরঞ্জিত নহে। এ গেল, নিম্নস্তরের লেখকমণ্ডলীর কথা।

তারপর, উচ্চস্তরের লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও এ গুণের অভাব নাই! তাঁহাদের মধ্যেও দল আছে, দলাদলি আছে, ঈর্ষা, পরচর্চ্চা, নিন্দা এবং ঘোঁটও আছে। তবে ইঁহারা নাকি অপেক্ষাকৃত চতুর ও বুদ্ধিমান্,—সভ্যতার আবরণে ইঁহারা নাকি অনেক সময় আবৃত থাকেন, তাই ইঁহাদের প্রকটমূর্ত্তি সহসা লোকে দেখিতে পায় না। বিশেষ, ইঁহারা নিজে হাতে-কলমে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দেন না,—অনুগত শিষ্য-সেবক বা অনুচর পারিষদ দ্বারা কাজ সারিয়া লন। ইঁহাদের প্রশংসার দুন্দভিনাদ জন্য সংবাদ ও সাময়িক-পত্র-বিশেষ নিযুক্ত আছেন; স্থানে স্থানে বাঁধা দল আছে; সহরে নগরে সভা-সমিতিও আছে। সুতরাং সত্য কথা বলিতে গেলে, এ হিসাবেও নিম্নস্তর উচ্চস্তর দুই সমান। অবশ্য, প্রকৃত শক্তিশালী ও সত্যনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীর কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সমসাময়িক-পত্র-সম্পাদক ও পাঠকের মতামত বড় গ্রাহ্য করেন না;—তাঁহারা সকল অবস্থাতেই সাধারণ হইতে এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করেন;—নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহাদের নিকট দুই সমান। তাঁহারা সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করেন; সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন;—অন্য প্রকার লাভ লোকসানের খতিয়ান তাঁহারা করেন না। সেই জন্য সাহিত্যে গোঁজামিল বা ভাণও তাঁহাদের নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

যিনি যে বিষয়ের অধিকারী, তিনি যদি সেই বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলে আর এ জঞ্জাল থাকে না। সে হিসাবে, যিনি আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত মশা ও ছারপোকা-মারার দুটো ঔষধের কথাও গুছাইয়া লিখিতে পারেন, তিনিও সমাজের একটা কাজ করেন। তা নয়,—সকলেই যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা, ধর্ম্ম ও পরকাল-তত্ত্বের কথা, প্রণয় ও ভালবাসার কথা, 'শাদার পিঠে কালি' দিয়া বলিয়া যান, তবে লোকের তাহা ভাল লাগিবে কেন? সেই মামুলি মান্ধাতা আমলের অতি পুরাতন ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ বাঁধা ধরা কথায় এখন আর লোকের মন উঠিতে পারে কি? নূতন কথা নূতন রকমে কিছু বলিতে পার,—সচ্ছন্দে বলিয়া যাও; লোকে কাণ পাতিয়া শুনিবে,—শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। সাহিত্যের সরস উদার প্রশস্ত ক্ষেত্রে,—স্বাধীনতার এ মুক্তরাজ্যে,—তোমার অবাধ অধিকার। পরন্তু তোমার যদি সে শক্তি ও মৌলিকতা না থাকে, তবে কেন তুমি বৃথা প্রবঞ্চিত হও ও লোককে প্রবঞ্চিত কর?

আসল কথা,—"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" ইতি শীর্ষক অমর কবির এই শ্লোকটিই, এই শ্রেণীর লেখককে দিশাহারা করে। প্রধানতঃ যশের লোভে, মানের মোহে ও নামের ইচ্ছায় এই শ্রেণীর লেখকগণ লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। এই সঙ্গে একটু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান যদি ইঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে ঐ "নামের লোভ" বিশেষ নিন্দার জিনিস হইত না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই শ্রেণীর লেখকদের সে কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব জ্ঞান এতটুকুও নাই। তারপর সুদক্ষ ও সর্ব্বজনসম্মানিত সমালোচকেরও বড়ই অভাব। সে অভাবেও ইঁহারা লক্ষ্য স্থির করিতে পারেন না। না পারিয়া যা তা লিখেন,—আর পল্লীগ্রামের নিরীহ পাঠকমণ্ডলী তাহাই বিনা-ওজরে পাঠ করিতে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে পাঠকের রুচি-প্রবৃত্তির দোষ আমি দিব না। লোক-শিক্ষকের পদে যিনি আসীন, তাঁহারই ত কর্ত্তব্য,—পাঠকের মনকে উন্নত করা? তা সে কর্ত্তব্য কয়জন পালন করিতেছেন? সাধু সুষ্ঠু স্বাধীন চিন্তা, গভীর গম্ভীর ও পবিত্রভাব, উচ্চ আদর্শ,—কয়জন সুকুমার সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট করিতেছেন? যাহাতে জাতীয় জীবন ও সমাজ গঠিত হয়, যাহাতে লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও লোকহিতৈষণা-বৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে বিমল সৌন্দর্য্যবোধ ও সত্যের ধারণাশক্তি জন্মে, যাহাতে মানুষ মানুষ হইতে শিখে,—সেরূপ সার্ব্বজনীন উদার, উন্নত ও উচ্চ আদর্শপূর্ণ সাহিত্য-গ্রন্থ কয়খানা আছে? থাকিলেও পত্রসম্পাদক-গণের তাহা প্রচার করিবার নিঃস্বার্থ কামনা কোথায়? সাহিত্য-সমালোচকগণের তাহা নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তিই বা কৈ? আমি মাত্র দুইটি লোকের নাম করিব,—তাঁহাদের গ্রন্থের প্রচার বঙ্গদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা, সহৃদয় পাঠক তাহার বিচার করিবেন। মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়কে আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

বলুন দেখি, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, এবং চন্দ্রশেখরের বেদান্ত-সমালোচনা, পরলোকতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি অসাধারণ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থগুলি,—বাঙ্গালার কয়জন লোক পাঠ করিয়াছেন? ভূদেবের প্রবন্ধের ত তবু কথা আছে; কিন্তু চন্দ্রশেখর বসুর নাম পর্য্যন্তও অনেকে জানেন না। অথচ এই দুই জন অসাধারণ প্রতিভাশালী মনস্বী ব্যক্তি,—বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে কি অমূল্য মণি-মাণিক্যই প্রদান করিয়াছেন! কৈ, ইঁহাদের গ্রন্থাবলী লইয়া কোথায় তেমন নিরপেক্ষ ও উদার সমালোচনা? ইঁহাদের গ্রন্থাবলী প্রচার উদ্দেশ্যে, কৈ, কোথায় পত্র-সম্পাদকগণের কর্ত্তব্য-পালন? অথচ এ হিসাবে, রামচাঁদের কবিতা-লহরীর কত অধিক প্রচার! —শ্যামচাঁদের উপন্যাস-মালার কিরূপ বিস্তৃত সমালোচন! কবি রামচাঁদের কাব্য-সমালোচন আর ফুরায় না,—ঔপন্যাসিক শ্যামচাঁদের যশের জয়-ঢাক আর থামে না! তাই বলিতেছিলাম, পাঠকের রুচিপ্রবৃত্তির দোষ আমি দিব না। দোষ তাঁহাদের,—যাঁহারা কেবলমাত্র নামের খাতিরে বহি লেখেন; দোষ তাঁহাদের,—যাঁহারা স্বার্থের খাতিরে সমালোচন করেন; আর ঘোরতর অপরাধ তাঁহাদের,—যাঁহারা প্রকৃত মানীকে উপেক্ষা করিয়া অমানীকে কোল দেন। পাঠকের দোষ কি? পাঠক তৈয়ারী করিবার শক্তি ত লেখকেরই হাতে।

এই গেল,—সাধারণ লেখক, পত্র-সম্পাদক ও সমালোচকদিগের কথা। ইহার উপর আর এক দল প্রবীণ সাহিত্য-সেবী,—সাহিত্যের কিছু অনিষ্ট করিতেছেন। যে কারণে হোক্, সমাজে ইঁহাদের একটু নাম-ডাক আছে, একটু পদ-মর্য্যাদা আছে, সাহিত্য-বিষয়ক দুই এক খানি গ্রন্থেও ইঁহারা একটু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রসিদ্ধি ও প্রবীতণাই ইঁহাদের কাল-স্বরূপ হইয়াছে। ইঁহারা যখন তখন বড় বেশী রকমের বিজ্ঞতার ভাণ করেন; নব্য লেখকদের প্রতি অতিমাত্রায় মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকেন; আর এটা সেটা খুটীনাটী অছিলা ধরিয়া অভ্যুত্থানশীল লেখককে সদাই চাপা দিবার চেষ্টা করেন;—পাছে সেই লেখক তাঁহার বহু-যত্ন-সঞ্চিত মানের মাপ অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয়! ইঁহারা কখন বৈয়াকরণ সাজেন; কখন ভাষা-তত্ত্ববিৎ হন; আর আবশ্যক বোধে কখন বা নীতিবেত্তা ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ হইয়া বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাদের যত ঝোঁক ও আক্রোশ,—কবিদের উপর। কবিরা আদর্শকে খাটো করিল, নীতি নষ্ট করিল, ধর্ম্ম আচার ও চরিত্রকে জাহান্নমে পাঠাইল,—ইহাই এই দলের ধূয়া। কবিদের কাব্য পড়িয়া ইঁহারা অতি সতর্কতার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া, এই সব ভুল বাহির করেন,—আর তাহা লইয়া সমাজে, সাহিত্যে ও বৈঠকে দিবারাত্র জল্পনা করিতে থাকেন। প্রতিবাদ করিবার যো নাই, তাঁহারা বয়সে প্রবীণ এবং সমাজেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত; অধিকন্তু প্রতিবাদে তাঁহারা বড়ই চটিয়া যান। ইঁহাদের কটি বাঁধা গৎ ও চিরপ্রচলিত অতি পুরাতন নিয়ম কানুন যিনি না মানিয়া চলিলেন, তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই। সেই অতি সতর্ক বৃদ্ধ পলোনিয়াস্‌ও ইঁহাদের নিকট হারি মানেন। অথচ যে কারণেই হোক্,—ইঁহারা সাহিত্যের ও সমাজের অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছেন। আসল কথা,—ইহাঁদের যাহা কিছু পুঁজি পাটা ছিল, তাহা যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে, দুই একখানি গ্রন্থেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এখন বয়সের স্বধর্ম্মে ও অতিমাত্র বিজ্ঞতার ভাণে কোন নূতন চিন্তা বা ভাব ইহাঁদের মনে আর জাগে না;—তাই ধর্ম্ম ও নীতির ধূয়া ধরিয়া, পবিত্রতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া সহজে আসর জমাইয়া সাফ্ গোঁজামিলে ইঁহারা "সাহিত্য-জীবন" অতিবাহিত করিতেছেন, এবং তাহার ফলে, বিনা ওজরে সাহিত্যেও রাশি রাশি ভাণ চালাইয়া যাইতেছেন! অবশ্য কবিদের যে মূলে দোষ নাই এমন কথা বলি না;—কোন কোন কবির দোষ যথেষ্টই আছে এবং নানাকারণে থাকিবারও কথা;—তবে তাহা বলিবার ও বুঝাইবার পদ্ধতি ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। কতকটা ঈর্ষার জন্যও বটে, আর কতকটা বয়োধর্ম্মের বিচার-হীনতা-নিবন্ধনও বটে।

কিন্তু হায়! ইঁহাদের সেই বিষম ভ্রান্তিতে সাহিত্যের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা সম্যক্‌রূপে দূরদর্শী চিন্তাশীল সাহিত্য বান্ধবগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিরলে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। এ অশ্রুপাতের কারণ,—সাহিত্যকে তাঁহারা প্রাণের সমান ভালবাসেন। তাঁহারা জীবনে এবং ব্যবহারে বুঝিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি বিনা, জাতীয় জীবন কিছুতেই গঠিত হইতে পারে না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, রাজনীতি বাঙ্গালীর ধাতে সহে না; সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি খুব ভাল হইলেও তাহা সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। অগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি না হইলে, ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা সকলই পরিচালিত করিতে হইবে। সত্য অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তু নাই;—সেই সত্য সাহিত্যের অন্তস্তরে নিহিত। ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম বন্ধু আর কেহ নাই;—সেই ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চতর সোপান। উচ্চে উঠিবার অগ্রে আপনাকে, তথা সাহিত্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। কিন্তু ভাণে এ কাজ হয় না। সেই জন্যই প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছি, জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই,—ভাণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

১৯এ ভাদ্র, ১৩০৬।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

'গার্সি' ব্রত।

পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখা ভাল যে, শীর্ষোল্লিখিত 'গার্‌সি' শব্দটা পারসি, আরবী বা চীন দেশীয় নহে। শব্দটা আমাদের বঙ্গ ভাষারই দেশজ শব্দ। উহার কোন ভাল নাম আছে কি না, অথবা কোন্ শব্দের অপভ্রংশ দুর্দ্দশায় ঐ শব্দটার উৎপত্তি, সে বিষয় লেখক অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং যেরূপ শুনিয়া আসিতেছি, সেইরূপ আকারেই উহাকে উপস্থিত করিলাম। শব্দবিৎ পাঠকবর্গ যদি একটা philological research এর দ্বারা শব্দটার মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তবে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

'গার্‌সি' একটি বঙ্গীয় ব্রত। বঙ্গের সর্ব্বস্থানে ইহার অনুষ্ঠান আছে কি না জানি না, তবে ফরিদপুর জেলার অনেক স্থানে এবং নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে যে ইহার অনুষ্ঠান আছে তাহা বিশেষ অবগত আছি। ইহার স্থূল বিবরণ বিবৃত করিতেছি, পাঠকবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে ইহার অনুষ্ঠান আছে কিনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

এই গার্সি ব্রত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে ভোরবেলায় অনুষ্ঠিত হয়। দুই এক দণ্ড রাত্রি থাকিতে আরম্ভ হইয়া ঠিক ভোরে শেষ হয়। পূর্ব্ব দিবসই ইহার সাজ সরঞ্জাম ঠিক করিয়া রাখা হয়। সাজ সরঞ্জামের মধ্যে প্রধানতঃ এক খানি পাত্রে, আদার কুচি, হলুদের কুচি, মটর কলাই ভিজা, বেতের ডগা, নারিকেল, পাটের পাতা (অর্থাৎ নাল্‌তে পাতা) কাঁচা তেঁতুল, পক্ক কদলি, তালের আঁঠির শাঁস, তেল, প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হয়। আর কয়েক খানা কুলা ও কাঠি ঠিক করিয়া রাখা হয়। তারপর ২।১ দণ্ড রাত্রি থাকিতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী উঠিয়া বাটীর সকলকে জাগাইয়া দেন। এ সময় নিদ্রিত থাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সকলে উঠিলে সাধারণতঃ বালকবালিকাগণ প্রত্যেকে একখানি কুলা এক হাতে ধরিয়া একটি কাঠির দ্বারা তাহাকে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিতে করিতে ঘরে ঘরে ভ্রমণ করে এবং মুখে এই শ্লোক পাঠ করিতে থাকে—"পোকা মাকড় দূর যায়, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ঘরে আয়।" অনবরত উচ্চরবে এই শ্লোক আবৃত্তি এবং ততোধিক উচ্চ শব্দে কুলার বাদ্যে বাড়ীটি মুখরিত করিয়া তুলে। পোকা মাকড় সে তাড়নায় বাড়ী ত্যাগ করিয়া 'দূর' যায় কিনা, পাঠক ও বাদকদিগের তাহা দেখিবার অবকাশ বা আবশ্যক নাই। তাহারা মহানন্দে বাজাইয়া ও গাহিয়াই সন্তুষ্ট। এইরূপে পোকা মাকড় দূরীকরণ এবং লক্ষ্মীর আবাহন শেষ হইলে তখন সকলকে জাগাইবার পালা পড়িয়া যায়। গোয়ালের গরু বাছুরকে 'জাগ', 'জাগ' বলিয়া জাগান হয়, বৃক্ষ লতাকেও নাড়া দিয়া জাগিতে বলা হয়, মুদ্রাধারস্থ মুদ্রাকে ঝন্ ঝনা দিয়া তাহাকে জাগান হয়, গোলার সঞ্চিত ধান্যাদিকে জাগান হয়। এইরূপে চেতন, অচেতন, ও উদ্ভিদ সমস্ত পদার্থকে জাগান হয়। তারপর যে সমস্ত বৃক্ষাদি ফল ধারণের সময় হইয়াও ফলিত হয় নাই, বাটীর একজন এক খান দা কি কুঠার হস্তে লইয়া মহাক্রোধে তাহাকে পাতিত করিতে প্রস্তুত হন, অমনি অন্য জন 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাহাকে এই হত্যা ব্যাপার হইতে নিরস্ত করিতে থাকেন, শেষে সাব্যস্ত হয় যে ইহাকে এক বৎসর সময় দেওয়া হউক; তাহাতেও যদি এই বৃক্ষ ফল প্রসবে উদাসীন থাকে তবে তাহাকে বিনা ওজরে নিপাত করা হইবে। তখন এই সব বৃক্ষের কটিদেশ আশুধান্য-খড়-নির্ম্মিত কাঞ্চীদাম দ্বারা সুশোভিত করা হয়। প্রবাদ যে এইরূপ প্রসাধিত হইলে

বৃক্ষ নিশ্চয় ফল প্রসব করিবে। এদিকে প্রাঙ্গণে পাট-কাঠিদ্বারা একটি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং তাহাতে কাঁচা তেঁতুল নিক্ষেপ করা হয়। বাটীর সকলে এই অগ্নিতে পর্য্যায় ক্রমে নিজ নিজ হস্ত, পদ, ও কর্ণদ্বয়ে সেক দেন। এটাও একটা অবশ্যকরণীয় বিষয়। লম্বা পাটকাঠির এক দিকে অগ্নি সংযোগ করিয়া অপর দিকে মুখ লাগাইয়া টানিয়া তামাক খাওয়া হয়। এইরূপ সেক, তাপ, তামাক ও পান সেবন হইয়া গেলে কজ্জল প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দেওয়া হয়। আজ কাল বড় বড় ছেলেরা বা নব্য মেয়েরা কজ্জল পরেন না, তবে সেকালের বৃদ্ধাদের অনেকে এখনও সেই প্রৌঢ়, বিলাসবিভ্রমহীন নয়নযুগলকে কজ্জল ভূষিত করেন, আর শিশুগণের তো কথাই নাই। নীচ জাতীয় পুরুষগণ পর্য্যন্ত এখনও চক্ষু কজ্জলিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তারপর একটু মল্ল যুদ্ধ হওয়াও আবশ্যক। ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েরা পরস্পরে মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে, অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে গৃহিণীরাও মল্লযুদ্ধ বা 'মালাম্' করেন। সরস্বতীদেবীকেও সে দিন জাগাইতে হয়। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহাদিগকে সেই শুভ মুহূর্ত্তে কোন পুস্তক পাঠ, ঈশ্বরের নাম লিখন এবং স্তবাদি পাঠ করিতে হয়। বাদকগণ নিজ নিজ যন্ত্র বাজাইয়া এবং গায়কগণ গান গাহিয়া সঙ্গীত বিদ্যাকে জাগাইয়া থাকেন।

এই সময়টা মন্ত্রাদি শিখিবার পক্ষে অতিপবিত্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এ জন্য সর্প মন্ত্র, এবং অন্যান্য 'ঝাড়ন কাড়নের' মন্ত্রাদি ওস্তাদের নিকট হইতে শিক্ষার্থী এই সময়ই শিক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত সমাধান হইলে পর অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তেঁতুল কিয়ৎপরিমাণে আহার করা হয়, অন্যান্য বস্তুও সে সময় অনেকে খাইয়া থাকে। তারপর অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া এই পর্ব্ব শেষ হয়। প্রাতে লাঠিয়াল ও মল্লগণ তাহাদের নিজ নিজ বিদ্যার কৌশল প্রদর্শন করিতে তৎপর হয়। গ্রাম্য ভদ্রলোকদিগের অনেকের বাটীতেই এই লাঠি খেলার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, আর খেলোয়াড়গণও তৎপরতার সহিত স্বীয় স্বীয় ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই দিন অর্থাৎ ১লা কার্ত্তিক সকলকেই স্নান করিয়া প্রথমে বেতের ডগা, তারপর কাঁচা হলুদ, কলাই ভিজা ও আদা এবং নারিকেল খাইতে হয়। এটাও একটা আচার। যে সমস্ত রমণী এই ব্রতের ব্রতী, তাঁহারা এই দিন অন্নাহার করেন না। ভুরার ভাত, কি রুটি খাইয়া থাকেন; নারিকেল তাঁহাদিগকেও অবশ্য খাইতে হয়। এইরূপে এই ব্রতের অবসান হয়। এই ব্রতের 'কথা' আছে। তাহার ভাব এইরূপ ঃ—এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র-বধূ ছিল। বধূটি লক্ষ্মীস্বরূপিণী। অলক্ষ্মী ঠাকুরাণী এক রমণীর বেশে ব্রাহ্মণকে ভুলাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ লক্ষ্মীরূপিণী বলিয়া অলক্ষ্মী ব্রাহ্মণ-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, এজন্য কিরূপে বধূকে লক্ষ্মীছাড়া করিবেন এই চিন্তা তাঁহার প্রবল হইল। শেষে তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, তোমার পুত্রবধূ যদি 'গারসি' সংক্রান্তিতে অন্নাহার করে তবেই আমি তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি। নতুবা আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব। ব্রাহ্মণ তাঁর প্রেমে বদ্ধ। সুতরাং পুত্রবধূকে তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিলেন যে ঐ দিন তাঁহাকে অন্নাহার করিতে হইবে। চতুরা পুত্রবধূ তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু অন্নাহার করিলে শ্বশুরের বিপদ হইবে জানিয়া, নারিকেল বেশ করিয়া কুরিয়া ভাতের মত করিয়া বাড়িয়া লইলেন, এবং ব্যঞ্জনচ্ছলে আদা, কলাই ভিজা, বেতডগা, নালিতাপাতা, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি লইলেন। শ্বশুর প্রতারিত হইয়া মনে করিলেন পুত্রবধূ অন্নই আহার করিতেছেন। এ দিকে পুত্রবধূ বেত ডগাতে কামড় দিবামাত্র অলক্ষ্মীরূপিণীর হাত খসিয়া পড়িল, কাঁচা হলুদে কামড় দিবামাত্র পা খসিয়া পড়িল, যেমন নারিকেল খাইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি রমণী স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করিয়া দাঁড় কাকের আকারে ছটফট করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রবধূকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রবধূ সব খুলিয়া বলিলেন এবং তিনি অন্নাহার করিলে যে অলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘরটা ছারখারে দিত তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর গুণে প্রীত হইয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। সেই হইতে এই দিন অন্নের পরিবর্ত্তে নারিকেলাদি আহার প্রচলিত হইল, এবং 'গারসি' ব্রত প্রচার হইল।

এই ত গেল ব্রতের স্থূল বিবরণ। এখন এই ব্রতটার নাম ও উদ্দেশ্য লইয়া একটু বিচার করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। 'গারসি' এই নামটা কোথা হইতে আসিল তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমার বোধ হয়, 'গ্রীষ্ম' কথাটার অপভ্রংশে 'গারসি' হইয়া পড়িয়াছে। কার্ত্তিক মাস হইতে হেমন্ত কাল আরম্ভ হয়। এই সময়ই গ্রীষ্মের অর্থাৎ গরমের সম্পূর্ণ অবসান এবং শীতের সঞ্চার হয়। শরৎ কালেও রৌদ্রের প্রখরতা বেশ থাকে। এজন্য বোধ হয় যে গ্রীষ্মের মৃত্যু এবং শীতের সঞ্চার এই উভয় ঘটনা প্রখ্যাত করিবার জন্যই এই পর্ব্বের সৃষ্টি। খৃষ্টিয়ানদিগের দেশে যেমন পুরাতন বর্ষের মৃত্যু ও নববর্ষ আরম্ভ লইয়া খৃষ্টমাস, আমাদের বঙ্গেও সেইরূপ গরমের অবসান ও শীতের আবির্ভাব লইয়া এই 'গারসি'। খৃষ্টানেরা যেমন ঢক্কা বাদন করিয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া নূতন বর্ষকে আবাহন করিয়া আনে, বঙ্গের দরিদ্র কৃষকসঙ্কুল দেশেও সেইরূপ গ্রীষ্মের সহচর পোকা, মাকড়, মশা, মাছি, সর্প ইত্যাদিকে কুলার বাদ্যে তাড়িত করিয়া হৈমন্তিক লক্ষ্মীকে আবাহন করিয়া আনে। হেমন্ত কাল আমাদের দেশে ধান্য সঞ্চয়ের একটা প্রধান সময়; এই আনন্দের সময় লক্ষ্মীদেবীকে ঘরে আনিবার আবাহন নিশ্চয়ই বিশেষ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। নিম্ন বঙ্গ বর্ষাকালে জল প্লাবিত হইয়া যায় এবং তৎকালে মশা, মাছি এবং সর্পাদির উপদ্রব অত্যন্তই হইয়া থাকে। শরতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে সব অনেকটা দূর হয়। মাঠে সুন্দর শীর্ষসমন্বিত ধান্যক্ষেত্র লক্ষ্মীর আবির্ভাব প্রতিক্ষণে দর্শকের মনে দৃঢ় করিয়া দেয়; সুতরাং এই আনন্দ প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ এই পর্ব্বের সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই পর্ব্বে যে সব বস্তু আহার করিবার বিধান আছে, তাহাও নিরুদ্দেশ্য নহে। বেতের ডগা, নালিতা পাতা ইত্যাদি তিক্ত পদার্থ একালে খাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সময় জ্বরের প্রাদুর্ভাব খুব হইয়া থাকে, তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে প্রত্যহ খালি পেটে তিক্ত দ্রব্য সেবন বিশেষ উপকারী। কাঁচা হলুদ রক্ত পরিষ্কারক, চুলকণানাশক এবং লোণানাশক। বর্ষায় শরীর কতকটা লোণা হইয়া যায় এবং পাচড়া চুলকণা শীতে খুব হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে হলুদ বড় প্রতিষেধক। আদা এবং মটর ভিজা যে বলকারী ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক তাহা প্রসিদ্ধ। নারিকেলও বলকারক এবং রক্ত পরিষ্কারক। শীতের সময় ব্যায়ামও যথেষ্ট উপকারী, তাই মল্লযুদ্ধের অবতারণা। সেক, তাপও প্রয়োজনীয়। এই সব দেখিয়া আমার বোধ হয় যে, এই সমস্ত শুভোদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই কোন অজ্ঞাতনামা মহা পুরুষ এই ব্রত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ না করিলে বলবৎ হইবে না বলিয়াই ইহাকে একটা ব্রতরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। এইরূপ আরও যে সব ব্রত নিয়ম আছে সে গুলিও কোন শুভোদ্দেশ্যপ্রসূত। আমরা এখানেই উপসংহার করিয়া নিবেদন করি ঃ—"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

নীরা।

(আরম্ভ)

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য একবার আমার পশ্চিমোত্তর প্রদেশে যাইতে হয়। তিন মাস এটোয়ায় অবস্থান করিবার পর, দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। শরীর বেশ সারিয়া উঠিয়াছে—গরম পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—পশ্চিমে লু বাতাসের সম্বন্ধে একটা ভয় বরাবরই ছিল, কাজেই প্রবাসের বাসা ভাঙ্গিয়া দিলাম।

কাণপুরে আমার এক সহপাঠী বাল্যবন্ধু ছিলেন। অনেক দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলিত বটে, কিন্তু প্রমোদকুমার কতবার আমায় আসিতে লিখিয়াছিল—তাহার সে অনুরোধ এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি নাই। তাই সংকল্প করিলাম ফিরিবার পথে কাণপুরে নামিব।

তিন দিন হইল কাণপুরে আসিয়াছি। প্রমোদের যত্ন, প্রমোদের স্ত্রীর যত্ন—বড়ই আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। সেই ছেলেবেলা যখন প্রমোদের বাটীতে গিয়া খেলা করিতাম, কত সুখে দিন কাটিত—কত ভবিষ্যৎ আশা, ভবিষ্যৎ কল্পনার চিত্রবিচিত্র পট আঁকিয়া আবার তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতাম—সেই সুখের দিন মনে পড়িল—সেই শৈশবের শোভাময় স্মৃতিরশ্মি অনেক দিনের পর আমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল।

প্রমোদ কাণপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কণ্ট্রাক্টর।

তাহার প্রতি মা লক্ষ্মীর বেশ অনুগ্রহ—পাঁচ জনে তাহার সৎ-স্বভাবের গুণে মুগ্ধ—সকলেই তাহাকে ভালবাসে। প্রমোদকুমার বাল্যে যাহা ছিল, এখনও তাই। প্রকৃতি যেন তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন-সাধনই করিতে পারে নাই। সেই সুগঠিত দেহের সঙ্গে সমানুপাতে সুন্দর মানসিক বৃত্তিগুলি সরলতার বেড়ার মধ্য দিয়া বেশ সতেজ—সরস ভাবে গজাইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীপ্রেম, প্রতিবেশীর স্নেহ, বন্ধুর ভালবাসা, অনুগত জনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লইয়া প্রমোদ মনুষ্যজীবনের সার সুখ সম্ভোগ করিতেছিল।

কখনও বই পড়িয়া, কখন তাস পাশা খেলিয়া, কখনও ঘুমাইয়া, কখন বা নানা গল্পে দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। প্রমোদের বন্ধুগণ অবসর ক্রমে প্রতিদিনই বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেন—তাঁহাদের সকলের সহিত আমার ক্রমে ক্রমে বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গেল।

শ্যাম বাবু নামে প্রমোদের একজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার খুব বনিবনাও হইল। অনেক সময় চোখের দেখা—শুভ বা অশুভক্ষণে হয়। কাহারও সহিত একবার সাক্ষাতেই, একবারের আলাপনেই তাহাকে কত চিরপরিচিত কত আপনার বলিয়া বোধ হয়—আবার কাহারও সহিত আজীবন কাটাইয়াও এক দিনের জন্য প্রীতির বাঁধ বাঁধিতে পারা যায় না। শ্যাম বাবু অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী। মুখে সরলতামাখান। বাহিরেও যেমন রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে—অন্তরও সেই আভ্যন্তরিক গুণাবলীর সৌন্দর্য্য কিরণে জ্যোতির্ম্ময়।

শ্যাম বাবু সকল দিন আসিতেন না। কিন্তু যে দিন আসিতেন সে দিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতেন। তিনি মাঝ খানে বসিতেন—আমরা তাঁহাকে চারি ধারে ঘেরিয়া বসিতাম। সাহিত্য-প্রসঙ্গ, সমাজ-প্রসঙ্গ, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে নানা কথা তুলিয়া আসরটা তিনি এত জাঁকাইয়া ফেলিতেন, যে যাহারা তাস পাশা লইয়া দিবারাত্রি মত্ত—"কিস্তিমাৎ" বলিয়া চীৎকার করিয়া সেই বৈঠক খানার ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিত—তাহারাও শ্যাম বাবুর গল্পের সময় খেলা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত।

শ্যাম বাবু যখনই আসিতেন, প্রায়ই রাত্রে আসিতেন। তাঁহার চক্ষে সর্ব্বদাই এক "স্কাইকলারের" চস্‌মা থাকিত। তিনি গৃহে আসিলেই ল্যাম্প্‌টীর জ্যোতিঃ কমাইয়া দিয়া ঘরটী অপেক্ষাকৃত অন্ধকার করা হইত। প্রথম প্রথম ভাবিতাম—কেরোসিন্ ল্যাম্পের তীব্র আলোকে, ঘর বেশী গরম হইয়া উঠিবে বলিয়া আলো কমাইয়া দেওয়া হয়—কিন্তু পরে শুনিলাম, তাহার অন্যতর কারণ আছে। এ সম্বন্ধে আমি এক দিন প্রমোদকে গোপনে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু প্রমোদ ভিতরের কথা বলিতে বড় ইচ্ছুক নয় বলিয়া আমি এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

একদিন প্রকৃত রহস্যোদ্ভেদের পূর্ণ সুযোগ ঘটিল। শ্যাম বাবু তাঁহার বাড়ীতে রাত্রে আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

সতীচোরা ঘাটের চারি রশি দূরে গঙ্গার ধারে একখানি সুন্দর বাঙ্গলায় শ্যাম বাবু বাস করেন। পরিষ্কার ফিট্‌ফাট্ বাঙ্গলা খানি। প্রবেশ মাত্রেই বোধ হয় কোন ইংরাজের গৃহ। গৃহগুলিও সাহেবি কেতায় সজ্জিত। কলিকাতা হইতে ভাল ভাল আসবাব বহুব্যয়ে লইয়া গিয়া শ্যাম বাবু কক্ষগুলির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়াছেন। কতকগুলি আলমারিতে রাশিকৃত সুন্দর বাঁধান, ইংরাজি বাঙ্গলা পুস্তক। একটী বৈঠকখানা, একটী পড়িবার ঘর, দুইটী শয়ন ঘর। বাহিরের পশ্চাতেই অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে কোনও অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন কিনা—তাহা জানিতে পারি নাই। পরে যাহা জানিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্যামকুমার বাবু আমায় নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন। দেখিলাম—রাত্রিকালেও সেই বৈঠকখানার সবুজ রেসমী পরদাগুলি ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঘরে খুব দূরে একটী সবুজ ডুমওয়ালা কেরোসিন্ বাতি। আমি বন্দোবস্ত দেখিয়া বুঝিলাম—তীব্র আলোক তাঁহার চক্ষে সহ্য হয় না। শ্যাম বাবুর নিশ্চয়ই চক্ষু সম্বন্ধীয় কোন পীড়া আছে।

শ্যামকুমার বাবুর সহিত আমার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। সাহিত্য প্রসঙ্গই অধিক। আজকালকার বাঙ্গলা সাহিত্যের রেষারেষি, দলাদলি ভাবের প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথাই বলিলেন। তাহার পর আহারাদির ডাক পড়িল।

আহারান্তে দুই জনে আবার সেই নীল পরদাওয়ালা ঘরে প্রবেশ করিলাম। সুবাসিত অম্বুরী তামাকের গন্ধে গৃহ আমোদিত হইতে লাগিল। শ্যামবাবু এ কথা সে কথার পর আপনা আপনি বলিলেন—"দেখুন, প্রথম দর্শনেই—প্রথম আলাপেই, আপনার উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছে—আমি আপনাকে সহোদরের মত দেখি। আপনি মধ্যে মধ্যে পরদাগুলির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন—নিশ্চয়ই ইহাতে আপনার একটা কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে। আমার জীবনের ঘটনাগুলি অতিশয় রহস্যপূর্ণ। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন নহি—কিন্তু কতকগুলি কারণে আমার দর্শনশক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে। আমায় বাহিরে আপনি প্রফুল্লচিত্ত দেখেন, কিন্তু অন্তরে আমার তিলমাত্র সুখ নাই। প্রাণের ভিতর নিশি দিন রাবণের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আমার জীবনের কাহিনী সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। জগৎ জানে না—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা জানে না—আমার জীবনে কি ঘটিয়াছে। আপনার বন্ধু, প্রমোদ বাবু কতক জানেন। আমি আজ আপনাকে আমার জীবনের কথাগুলি বলিব। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন—আমার জীবনে কতই না অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে। ঘটনাগুলি প্রকাশ হইলে জগতের অনেক উপকার হইতে পারে। আমার এরূপ ইচ্ছা নহে, এ সব ঘটনা সাধারণে যথাযথ প্রকাশ হয়। তবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত অভিনেতাদের নাম গোপন রাখিয়া, আপনি উপযুক্ত বুঝিলে ঘটনাটী প্রকাশ করিতে পারেন।" শ্যামবাবু একখানি সুন্দর বাঁধান বহি আলমারি হইতে বাহির করিয়া আমায় দিলেন। পুস্তকখানি হাতে লেখা। ডায়ারী ধরণে শ্যামবাবু নিজের জীবনের ঘটনা তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হইল। বহিখানি পড়িবার পূর্ব্বে শ্যামবাবুকে যাহা দেখিয়াছিলাম—পড়িবার পর তাঁহাকে যেন ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিলাম। জগতে মানুষের যাহা কিছু থাকিলে মানুষ সুখী হয়, শ্যামবাবুর তাহা ছিল—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মত দুর্ভাগ্য অতি অল্পই দেখিয়াছি। এই কুটিল জগতে সরল হইলে অনেক ভুগিতে হয়। বিষয়ের বিষ অতি ভয়ানক। দুরাশা, নরকের পথ-প্রদর্শক। বিষয়ের জন্য—অর্থের জন্য, লোকে না করিতে পারে এমন কাজই নাই। এ সব ঘটনাগুলি না ঘটিলে শ্যামবাবু হয় ত জগতের অনেক কাজে লাগিতে পারিতেন। তাঁহার সেই শক্তি, সেই শিক্ষা, সেই উদ্যম, সেই প্রতিভা, ঘটনাচক্রে পেষিত হইয়া তাঁহাকে যেন জড়পদার্থে পরিণত করিয়াছে।

পুস্তকখানি শেষ হইলে—আমি একবার শ্যামবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এখনও যে অতীত স্মৃতি তাঁহাকে ভীষণ যাতনা প্রদান করিতেছে, তাহা সেই দীর্ঘ নিশ্বাসেই প্রতিপন্ন হইল। যবনিকা ফেলা থাকিলে, এই বিশাল বিশ্ব-সংসারের অভিনয় ক্ষেত্রে আমরা অনেক মানুষকে দেবভাবাপন্ন দেখিতে পাই। কেহ সাধু, কেহ ভণ্ড, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেহ দয়ালু, কেহ নিষ্ঠুর—কেহ সংযমী, কেহ লম্পট, কিন্তু প্রকৃত যবনিকা উত্তোলিত করিলে অনেক বিসদৃশ চিত্র আমাদের লোচনপথবর্ত্তী হয়। শ্যাম বাবুর আত্মজীবন-কাহিনী প্রথমে আমার উপন্যাস বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বড়ই বিস্ময় বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সে দিন রাত্রে আর একটী ঘটনা দেখিয়া আমি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম—আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল।

পুস্তক পাঠ শেষ হইলে শ্যামবাবু অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার মুখ যেন একটু মলিন। যেন আরও এক বিষাদময় দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তিনি একটী ক্ষীণ বর্ত্তিকা হাতে লইলেন। আলমারির মধ্য হইতে একটী চাবি লইয়া অন্দরের দিকে চলিলেন।

অন্দরের অর্দ্ধ পথে—উপস্থিত হইয়া, আমরা এক ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইলাম। কে যেন বলিতেছে—"অই—অই—আগুণ! আগুণ! বিশ্বাসঘাতকতা—ছুরী বিষ—সাবধান! সাবধান!

আমি স্তম্ভিত হইয়া সেই খানে দাঁড়াইলাম। আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না। শ্যামবাবু বলিলেন—"ভয় পাইবেন না। বই খানি পড়িয়াছেন—হাতের লেখা, এই বার অশ্রুময় অক্ষরে—সেই বিচিত্র ঘটনার—সজীব চিত্র ও উপসংহার দেখুন।

শ্যামবাবু এক কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কক্ষটী অন্ধকার। শ্যামবাবুর হাতের আলো সেই কক্ষে গিয়া পড়িল। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বিস্মিত, ভীত, ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম।

গৃহ মধ্যে এক অতুলসৌন্দর্য্যশালিনী রমণী। বয়স আন্দাজ—১৬ কি ১৭। অতি সুন্দর মুখ, অতি সুন্দর চোখ্—আগাগোড়াই সৌন্দর্য্য। নির্জ্জনে যেন বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া—পরে নিজের ভ্রম বুঝিয়াছেন। জগতে এত সুন্দর কিছু করিতে নাই—এই ভাবিয়া তিনি যেন সেই সুন্দরীর বুদ্ধিবৃত্তি হরণ করিয়াছেন।

গৃহ প্রবেশ মাত্রই—সেই উন্মাদিনী বিকট হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল—"আবার আগুণ! পালাও—পালাও বিশ্বাসঘাতক! বিষ! আগুণ! ছুরি!"

শ্যাম বাবু কাছে গিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। সেই উন্মাদিনী যেন একটু স্থির হইল। তখন শ্যাম বাবু বলিলেন—"নীরা! ডাক্তার বাবুকে এনেছি। তোমার কি ব্যায়রাম একবার এঁকে বল।"

উন্মাদিনী কঠোর দৃষ্টিতে আমার আদ্যোপান্ত দেখিল। বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"মহাশয়! আমার প্রধান পীড়া—যে আমি পাগল নই। পাগল হইলে আমার সব ব্যায়রাম সারিয়া যায়। মাথা ঠাণ্ডা হয়—গায়ের জ্বালার নিবৃত্তি হয়—প্রাণের জ্বালা থামে। দুই শত মুদ্রা আপনার পুরস্কার। একটু পাগল হইবার ঔষধ দিতে পারেন?"

উন্মাদিনী—ঘোর উন্মাদিনী! শ্যাম বাবুর অন্দরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখিয়া—অন্তরে শিহরিয়া উঠিলাম। দ্বার বন্ধ হইল—শ্যাম বাবু বলিলেন—"এই সেই নীরা—দেখুন ইহার অবস্থা!!"

রাত্রি অনেক হইয়াছে—কাজেই ঘরে ফিরিলাম। শ্যাম বাবু সঙ্গে লোক দিলেন। সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। মনে কেবল সেই নীরা—আর শ্যাম বাবুর জীবনের বিষাদময় কাহিনী! হায়! হায়! এ সোণার সংসারে এমন ভয়ানক ঘটনাও ঘটিতে পারে? মানুষ শুনিয়াছি ঈশ্বরের আকৃতির ছায়া—মানুষ এত পিশাচ হইতে পারে?

সহসা কোন সাংসারিক কারণে আমায় কাণপুর ছাড়িতে হইল। আসিবার সময় শ্যাম বাবুর সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। "পাত্র পাত্রীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ঘটনাটী প্রকাশ করিতে পারি"—এ সম্মতি শ্যাম বাবুর নিকট অতি অল্প চেষ্টাতেই পাইলাম।

শ্যাম বাবুর নিজের কথাতেই তাঁহার রহস্যময় জীবন-কাহিনী—প্রকাশ করিলাম।

শ্যামকুমারের কথা।

[১]

কলিকাতায় আমার পৈত্রিক বাসস্থান। পিতৃদেব কমিশেরিয়েট-গোমস্তা ছিলেন---কাজেই আজীবন আমরা সুখ ও বিলাসিতার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আমরা দুই ভাই—যদিও আমরা সহোদর নহি। হেমকুমার ভূমিষ্ঠ হইবার একমাস পরে আমার বিমাতৃদেবী সূতিকা রোগে স্বর্গগতা হন। আমার মাতৃদেবীই হেমকে লালনপালন করেন। আমার ও হেমের মধ্যে এক বৎসর বয়সের তফাৎ। আমার মাকে পিতা প্রথমে বিবাহ করেন। তাহার পর কোন ঘটনাবশে বাধ্য হইয়া, আমার বিমাতৃদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই—আমার বিমাতৃদেবীকে বিবাহ করিয়াই পিতা অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেন।

হেমকে মা বড় আদর দিতেন। নিজের মার কাছে ছেলে যেরূপ না আদর পায়, আমার মা বিমাতা হইয়াও হেমকে তদপেক্ষা বেশী আদর করিতেন। এই আদরের ফল পরে বিষময় হইয়াছিল। হেম বালককাল হইতেই দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিল। পিতা বিদেশে থাকিতেন—হেম আরও প্রশ্রয় পাইল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর হেম পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল। তাহার বিশৃঙ্খল ভাব বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। আমার মাতৃদেবী জররোগে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

মার মৃত্যুতে দুইজনে আবার মাতৃহীন হইলাম। পিতা মনের অশান্তিতে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলেন। ক্রমে ক্রমে হেমের কথা সব শুনিলেন। আমার এক বৃদ্ধা পিসি ছিলেন—তিনিই সংসারের অভিভাবিকা হইলেন।

পিতা দেশে আসিলেন বটে—চাকরি ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু দেশে তাঁহার মন বসিল না। চাকরি না থাকিলেও হেমকে কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য, তিনি

কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া পুনরায় লাহোরে বসবাস করিতে লাগিলেন।

আমি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। হেমকে পিতা লাহোর মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রাউল-পিণ্ডিতে আমাদের একখানি বাঙ্গলা ছিল, সেই বাঙ্গলায় আমরা বসবাস করিতে লাগিলাম।

হেম লাহোরে কালেজের বোর্ডিংএ থাকে। এণ্ট্রান্স পাস থাকিলে লাহোর মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হওয়া যায়। তাহা ছাড়া বোর্ডিংএ থাকিলে স্বভাব দোষ শুধরাইবে এই ভাবিয়া পিতা হেমকে মেডিকেল লাইনেই দিলেন। কালেজের অধ্যক্ষের সহিত পিতার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

একদিন কালেজের অধ্যক্ষের এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—"হেমকুমার প্রায় এক মাস হইল বোর্ডিং ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই প্রকার কামাই হইলে—তাহাকে কালেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

এক মাসের উপর হেম আমাদের চিঠি পত্র লেখে নাই। সে চিঠি দিতে এরূপ দেরী করিত। কাজেই প্রথমে আমাদের কোন সন্দেহ হয় নাই। উল্লিখিত সংবাদ পাইয়া পিতা নানা স্থানে টেলিগ্রাফ্ করিলেন—হেমের কোন খবরই পাওয়া গেল না।

এই ঘটনার এক মাস পরে—পিতা লাহোর ত্যাগ করিয়া কাণপুরে আসিলেন।

জগন্নাথ প্রেমদাস বলিয়া পিতার এক বন্ধু কাণপুরে বাস করিতেন। তিনি একজন কমিসেরিয়েট কণ্ট্রাক্টার। তিনি আমাদের থাকিবার জন্য গঙ্গার ধারে একখানি বাঙ্গলা মায় জমী দানপত্র করিয়া দিলেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না—পিতা এই দানগ্রহণে অস্বীকার করিলে তিনি আমার নামে লেখাপড়া করিয়া দিলেন। এই বাঙ্গলাতেই আমি সেই পর্য্যন্ত বাস করিতেছি।

পিতা নিদ্রিত—আমি লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছি—সহসা হেম আসিয়া আমার গৃহমধ্যে দেখা দিল। তাহার মুখ মলিন—চক্ষু কোটরগত—চেহারার আর সে শ্রী নাই। মুখে মদের গন্ধ। আমি হেমের অবস্থা দেখিয়া বড়ই মনকষ্ট পাইলাম।

হেম জড়িতস্বরে বলিল—"দাদা"—

"আমি বলিলাম—কেন হেম? তোমার এ অবস্থা কেন?

হেম বলিল—"তোমরা থাকিতে আমি জেলে যাইব"—

আমি—শিহরিয়া উঠিলাম। হেম—মার সেই আদরের হেম—আমার সেই প্রাণের কনিষ্ঠ হেম—জেলে যাইবে—সহ্য হইল না।

আমি বলিলাম—"হেম হইয়াছে কি?"

হেম আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। বলিল—"দাদা আমায় ৫০০৲টাকা দাও। আমি দেনদার হইয়াছি; আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে টাকা না দিলে, নয় গুণ্ডায় আমার মাথা ফাটাইবে—না হয় জেলে দিবে।"

আমি নির্ব্বাক হইয়া হেমের মুখের দিকে দেখিতে লাগিলাম। তখনও সেই বিশীর্ণ গণ্ডে অশ্রুধারা প্রবাহিত। হেম আমার পায়ে ধরিয়া বলিল—"দাদা আমায় বাঁচাও।"

আমি বলিলাম—"হেম সমস্ত খুলিয়া বল। না বলিলে কি করিয়া বুঝিব? বাবা এখন ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া না হয় টাকার চেষ্টা করি।"

হেম অকপটে সমস্ত পাপ স্বীকার করিল। তাহার চরিত্র যে ভয়ানক দূষিত, তাহা এত দিনে বেশ জানিতে পারিলাম। সুরায়—হেমের মাথা বিগড়াইয়াছে—হেম বেশ্যাসক্ত—তাহারই জন্য এই দায়গ্রস্ত—বদমায়েসের চক্রে জড়ীভূত।

আমি বলিলাম—"হেম! স্থির হও—আমার ঘরে বস। আমি বাবাকে একবার বলিয়া দেখি।"

পিতার কাছে গেলাম। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আমায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পিতা বলিলেন—"কি হইয়াছে শ্যাম?"

আমি সমস্ত ঘটনা বলিলাম। পিতার মুখমণ্ডল রাগে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি বলিলেন—"হতভাগাটাকে লাথি মারিয়া বাহির করিয়া দাও। ও জেলে যাক্—আমার তাহাতে ক্ষতি নাই।"

হেম আমার পিছনে পিছনে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। আমি তাহা জানিতাম না; সহসা গৃহমধ্যে আসিয়া—বাবার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বাবা!

বাবা! রক্ষা করুন। আজ মা থাকিলে আপনি এরূপ কঠোর হইতে পারিতেন না।"

পিতাও হেমের মুখে মদের তীব্রগন্ধ পাইয়া আরও জলিয়া উঠিলেন। হেমকে পদাঘাত করিলেন। হেম ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"বাবা—"

পিতা বলিলেন—"হতভাগা! তোকে এক পয়সাও দিব না। তুই জেলে গেলে—আমি চিরজীবনের জন্য শান্তি পাইব।"

হেম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—"তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

হেম আর দাঁড়াইল না। বিদ্যুৎবেগে গৃহ ত্যাগ করিল। আমার দুই চারিটা কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল—তাহারও অবসর পাইলাম না।

পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"শ্যাম হতভাগাকে ফিরাও।"

আমি দ্রুতপদে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম—চারি দিকে খুঁজিলাম—হেমের সন্ধান পাইলাম না। মধ্যে মাসখানেক তাহার আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। একদিন পিতার ভয়ানক জ্বর—যাতনায় তিনি ছটফট্ করিতেছেন—এমন সময়ে এক রেজেষ্টরি চিঠি আসিল। আমি রেজেষ্টরী পত্র দেখিয়া তাঁহার নিকটে ধরিলাম। পত্রখানি কাহার হাতের লেখা ঠিক করিতে পারিলাম না। তবে দেখিলাম—তাহাতে "লাহোর" পোষ্টাফিসের শীল রহিয়াছে।

পিতা পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখমণ্ডল বিকট ভাব ধারণ করিল। পাঠান্তে পত্রখানি সবেগে মেঝের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন—"হতভাগা! শেষ আমার এই সর্ব্বনাশ করলি!!"

আমি ত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, হেমের সম্বন্ধে কোন ঘটনা। সভয়ে বলিলাম—"পত্রখানি পড়িতে পারিব কি?

পিতা ঘৃণার সহিত হাস্য করিয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে"।

পত্রখানি একবার দুইবার তিনবার পড়িলাম—বুঝিতে পারিলাম না আমি পৃথিবীতে আছি, কি কোন অপরিচিত রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। হেম—সেই হেম, আমার ভাই—সেই সরলহৃদয় হেম, তার আজ এই অবনতি! প্রাণের ভিতর বৃশ্চিক-দংশনবৎ যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আমি ধীরে ধীরে পিতার নিকট হইতে সরিয়া আসিলাম।

পত্রে লেখা ছিল—

"আপনার পুত্র হেমকুমার আমার কন্যা শ্রীমতী নীরাকে ধর্ম্মপত্নী করিয়াছে; অদ্য গির্জ্জায় বিবাহ হইয়া গেল। আপনি এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেন না, এই বড় দুঃখ রহিল। আমি একজন কর্ণভাট (খৃষ্টান)। আমাকে আপনার বৈবাহিক রূপে ও আমার কন্যাকে পুত্রবধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন মতেই বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না।

অনুগত—শ্রীপিটার বিশ্বাস।

এই পিটার বিশ্বাস যে একজন নেটিভ ক্রিষ্টান, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। হেম যে জাতিকুল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এতদূর অবনতির স্তরে নামিয়াছে—তাহা আজ বিশ্বাস করিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা আরও ভয়ানক কথা পত্রখানি পিটার, নিজহস্তে লেখে নাই। লেখা হেমের হাতের—সে আত্মগোপন জন্য আঁকা-বাঁকা করিয়া লিখিয়াছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। ভাবিলাম—"হেম! সেই সোনার হেম, আমার কনিষ্ঠ হেম—সেই এক সময়ের ধীর শান্ত বুদ্ধিমান হেম—আজ এক বিধর্ম্মীকে বিবাহ করিয়া, নির্ব্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। আবার সেই কথা নিজহস্তে পিতাকে লিখিয়া সয়তানীর যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। এই অসবর্ণ বিবাহে হেমের অন্য যে উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, পিতাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা যে তাহার মুখ্য কারণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম।

এই সময় হইতেই আমরা হেমের কথা ভুলিলাম। তাহার মোহনীয় মূর্ত্তি, অতীত গুণাবলী, শৈশবের সেই সুখময় স্মৃতিগুলি, বিস্মৃতির অতল গর্ভে ক্রমশঃ নিমজ্জিত করিতে লাগিলাম।

ইহার পর তিন বৎসর কাটিয়াছে। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমি এখন সংসারের কর্ত্তা—বিষয়ের মালিক। মাঝে মাঝে হেমের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু কোথায় সে—কেমন করিয়া তাহার সন্ধান করিব। তবুও বন্ধুবান্ধবকে ক্রমাগত চিঠি লিখিতে লাগিলাম। নিজেও দুইবার লাহোরের দিকে গেলাম—তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিলাম না।

(২)

হেমের এক সহোদরা ভগ্নী ছিল। তাহার নাম মহামায়া। মহামায়া বাঙ্গালাদেশেই থাকিত। তাহার স্বামীর সহিত কাশী দেখিতে আসিয়া মহামায়া কাণপুরে আসিল। সব কথা শুনিয়া প্রথমটা খুব কাঁদিয়া ভাসাইল। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বড় দাদা—কোন খবর পাওয়া গেল কি? আমি বলিলাম—"না দিদি কোন খবরই পাই নাই। চেষ্টা চের করিয়াছি। উপায় ত কিছু দেখিতেছি না।"

"তুমি যাওনা—দাদা। আর একবার পশ্চিম বেড়িয়ে এস। আমরা তোমার বাঙ্গালা আগলে থাকবো। এবার গেলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

আমি মহামায়াকে হেমের অপেক্ষাও ভালবাসিতাম। সকলের ছোট সে—একটী মাত্র ভগিনী। তাহার ন্যায্য আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। বলিলাম "কালই আমি হেমের সন্ধানে যাইব।"

মহামায়ার মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিল "দাদা—বাবা আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন—কিন্তু তোমার ভরসা আমরা খুবই করি।"

ভগ্নীপতি পরেশ বাবু বলিয়া উঠিলেন—"আমিও যাইব। তুমি একলা—কোথায় তাহাকে খুঁজিবে।"

মহামায়াকে একাকী চাকর-বাকরের কাছে রাখিয়া যাইতে ভরসা করিলাম না। সে আজন্ম বাঙ্গালাদেশেই আছে। এ দেশে একলা থাকা তার পক্ষে বড় কষ্টকর হইবে। ঘটনা পরেশ বাবুকে বুঝাইয়া বলিলাম। তাঁহার যাওয়ার আরজী ঐখানেই নিষ্পত্তি হইল।

কাশী যাইবার জন্য আমি জিনিসপত্র বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছি—দরোয়ান গাড়ী ডাকিতে গিয়াছে—বেলা প্রায় আটটা। সহসা হেম—আমার ঘরের দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান। আমি হাতে স্বর্গ পাইলাম। বুক দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মহামায়ার কাছে খবর গেল।

মহামায়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—"ছোট দাদা! তুমি বড় নিষ্ঠুর! এমন করে আমাদের কষ্ট দিলে কেন?" অন্যান্য কথা বলিলেও আমি হেমের সেই পত্র খানার কথা অবশ্য মহামায়াকে বলি নাই।

হেম নির্ব্বাক হইয়া রহিল। খানিকপরে একটা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর করিল।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"হেম কতদিন এখানে আসিয়াছ।"

"আজই আসিতেছি।"

দেখিলাম, হেম আজ কাল অতি অল্পভাষী, বড় অন্যমনস্ক। আমায় বলিল—"দাদা! তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে। গৃহান্তরে চল।"

আমি। এখানে আর কে আছে হেম? খালি মহামায়া বই ত নয়। এখানেই বলিতে পার।

হেম। মহামায়া বালিকা—তার সুমুখে সে সব কথা হতে পারে না। চল অন্য ঘরে যাই।

আমরা বৈঠক খানা ঘরে দুজনে বসিলাম। হেমের পরিধানে কোট ও প্যাণ্ট। নেকটাই কলার আঁটা। চোখে চসমা। মাথায় ক্যাপ। সাহেবী ধরণে চুল ছাঁটা। বুঝিলাম, সেই সোণার হেম—মাটি হইয়াছে।

হেম বলিল—"দাদা! কথাগুলা বেশ করিয়া শুনিয়া যাও। বাবা উইল করিয়া গিয়াছেন—তাহার নকল আমি লইয়াছি। আমায় কেবল তিনি মাসিক ২৫ টাকা মাসহরা দিয়াছেন। তাও জীবনস্বত্ব। তুমি সমস্ত বিষয়ই পাইয়াছ—মহামায়া কন্যা হইয়া যা পাইল—তাহার সিকি অংশও আমি পাইলাম না।"

আমি। হেম! বাবা যে সময়ে উইল করিয়াছিলেন তখন আমি জানিতে পারিলে এ সব ঘটিত না। তোমার অর্দ্ধেক তোমায় ছাড়িয়া দিতে বলিতাম। কিন্তু উইল রেজেষ্টারির পর আমি জানিতে পারি। তবুও বাবাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন—"যাহা দিয়াছি—তাহাই ঢের।"

হেম। বাবা নাই দিলেন—কিন্তু তুমি ত আমায় ভালবাস—তুমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িয়া দাও।

আমি। কোন আপত্তি নাই—কিন্তু আমি পাঁচ বৎসরের জন্য ট্রষ্টী মাত্র। তারপর আমার দখলে আসিবে। মহামায়া সাবালিকা হওয়া পর্য্যন্ত উইলের সত্ত্বে আমাকে সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে।

এ কথায় হেম রাগিয়া উঠিল। বলিল—"আদালত আছে বিষয় বাহির করিতে বেশী কষ্ট হইবে না!"

আমি। পাঁচ বৎসর পরে যখন স্বেচ্ছায় অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিতেছি, তখন আর আদালত কেন হেম? তুমি ভাই—এক পিতার সন্তান আমরা। আমার মা—তোমায় মানুষ করিয়াছেন।—তোমার মাতৃবিয়োগের পর—তুমি আমা অপেক্ষা মার স্নেহপাত্র হইয়াছিলে—আমি তোমার সঙ্গে আদালতে দাঁড়াইয়া বিষয় ভাগ করিব?

হেম। তবে এখনই লেখা পড়া করিয়া দাও।

আমি। এখনই! অসম্ভব! আর এক কথা উইল অনুসারে আমার দানসত্ত্ব বা অধিকার নাই? উইল—রেজেষ্টারি তাহাত জান। তার উপর তুমি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছ!

হেম। কে বলিল আমি ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছি?

আমি। তুমি খৃষ্টান কন্যা বিবাহ করিয়াছ?

হেম। বিবাহ করি নাই—বিষয় পাইয়া বিবাহ করিব। সে জোর না থাকিলে, তোমার কাছে আজ আসিতাম না।

আমি। তবে বাবাকে ওরূপ চিঠি কে লিখিয়াছিল?

হেম। যেই লিখুক না কেন—তা শুনিবার দরকার বোধ হয় এ ক্ষেত্রে নাই।

আমি বলিলাম—"হেম! তোমার ইচ্ছামতই কার্য্য করিব আমি কাল এটর্ণীর বাটিতে কাগজ পত্র লইয়া যাইব। কাল তুমি আসিও। না হয় আজ এখানে থাক।"

হেম থাকিল না—চলিয়া গেল। তৎপর দিন এটর্ণীর বাটীতে তাহার সহিত দেখা হইল। এটর্ণী যাহা বলিলেন তাহা হেমের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন "হেম বাবু! তোমার দাদার দানের অধিকার নাই—থাকিলেও আইনে বর্ত্তিবে না।"

ক্রোধে হেমের মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। রাগটা আমার উপর—এটর্ণীর উপর, কি আইনের উপর ভাল বুঝিতে পারিলাম না। হেম চলিয়া গেল—যাইবার সময় বলিয়া গেল—"দেখি বিষয় পাই কিনা?—আদালত আমার কি করিবে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম হেম নিশ্চয়ই উন্মাদ। তাহার বুদ্ধি নিশ্চয়ই বিকৃত হইয়াছে। নচেৎ সে এরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে কেন?

(৩)

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে, বরুণা পুলের নিকট আমাদের এক চালানী কারবার ছিল। কারবারটী ছোটখাট হইলেও তাহাতে বেশ দুপয়সা থাকিত। একজন কর্ম্মচারীর অধীনে কারবার চলিত। কর্ম্মচারীর নাম করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায়।

পর দিন মধ্যাহ্নে টেলিগ্রাম পাইলাম, "করুণাময় কলেরায় আক্রান্ত। পীড়া সাংঘাতিক।" কাজেই সেই দিনের ট্রেণেই কাশী যাইতে হইল। কাশীতে আমার এক নিকট আত্মীয় ছিলেন—তিনি বাঙ্গালীটোলায় থাকিতেন, তাঁহার বাড়িতেই নামিলাম।

করুণাময়কে দেখিতে গেলাম। কিন্তু আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই করুণাময়ের দেহ সৎকারের জন্য মনিকর্ণিকার পবিত্র ক্ষেত্রে নীত হইয়াছে। মনিকর্ণিকায় দৌড়িলাম—সেই বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত কর্ম্মচারিকে একবার শেষ দেখিবার জন্য ঘাটে গেলাম। কিন্তু আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সব-ছাই হইয়া গিয়াছে, আর দেখা হইল না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গদীতে ফিরিলাম। করুণাময়ের স্ত্রীপুত্রদের সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিতে ও কাজকর্ম্মের বন্দোবস্তে অনেক রাত হইল। ইচ্ছা ছিল না যে সে রাত্রে ফিরি। কিন্তু সেখানে থাকিবার কোন বিশেষ সুবিধা হইল না।

রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সদর সড়কে লোক মাত্র নাই। বিশেষতঃ গভীর রাত্রে এ অংশটী স্বভাবতই নির্জ্জন। পথের দুই পার্শ্বের বড় বড় গাছগুলা—চঞ্চল বায়ুতে শাখা প্রশাখা সঞ্চালিত করিয়া নৈশসঙ্গীতে যোগ দিয়াছিল। চারি দিকে ঘন অন্ধকার। আমি দ্রুত পদে পুলের রাস্তায় উপস্থিত হইলাম।

ক্ষীণ-স্রোত বক্ষে লইয়া, বরুণা নদী নীরবে—ভাসিয়া চলিয়াছে। তীর ভূমি একটু শুভ্র দেখাইলেও—রাস্তার দুই ধারে বড় বড় গাছপালা থাকার জন্য পোলের নীচের পথটা বড় অন্ধকার। আমি সবেমাত্র পোলের উপর উঠিয়াছি—এমন সময়ে তিন চারি জন লোক অন্ধকারে আমার পিছন হইতে আক্রমণ করিল। একজন আমায় জাপটিয়া ধরিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলাম না। সবলে তাহার চক্ষে এক ঘুসী

মারায়, সে আমায় ছাড়িয়া দিল বটে—কিন্তু পশ্চাৎ হইতে একজন ভীষণ যষ্টির দ্বারা মস্তকে প্রহার করিল। আমি সেই অন্ধকারের কোলে বরুণার কঙ্করময় পথের উপর মূর্চ্ছিত হইলাম।

(৪)

মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে দেখিলাম আমি এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে। দিবা রাত্রি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; গৃহমধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কোথায় আমি? অন্ধকারে নরকগর্ত্তে! ওঃকিসের এত যন্ত্রণা।"

আমার চক্ষু দুইটী দৃঢ়রূপে বাঁধা। চোখে আঘাত লাগিলে যেরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকে—সেইরূপে। চক্ষে ভয়ানক ব্যথা। পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলাম। পারিলাম না। সর্ব্বশরীরে ব্যথা—শক্তিমাত্র নাই। স্মৃতির পুনরায় বিকাশ হইল। সে দিনকার রাত্রের কথা মনে পড়িল। গৃহমধ্যে লোক আছে কি না জানিতে পারি নাই—চীৎকার করিয়া বলিলাম—"আমি কোথায়?"

প্রথমে কেহ উত্তর দিল না। তার পর কে যেন ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া আমার বিছানার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম "কে তুমি? দেবী, না মানবী, আমি কোথায় আছি বলিয়া দাও।" উত্তর পাইলাম না।

চোখের বাঁধন খুলিবার চেষ্টা করিলাম। একখানি কোমল, অতি কোমল—পুষ্পস্পর্শ হাত আসিয়া আমার হাত ধরিল—বলিল "চোখের বাঁধন খুলিবেন না—ডাক্তারে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে খুলিতে নিষেধ।"

চোখে কেন ব্যথা পাইতেছিলাম—তাহা বুঝিলাম। সে দিন কার রাত্রের সেই কথা মনে পড়িল। ডাকাত—গুণ্ডা কেন আমায় মারিল? কাহারও সহিত শত্রুতা করি নাই—সঙ্গে টাকা কড়ি ছিল না—বৃথা আঘাত করিয়া আমাকে এই সংঙ্কট অবস্থায় ফেলিয়া তাহাদের কি লাভ?

আমি এ চিন্তা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি যেই হউন না কেন? বলিতে পারেন আমি কোথায়?

সেই অদৃশ্য রমণীমূর্ত্তি—সেই অন্ধকার জগত হইতে বীণাবিনিন্দিতস্বরে উত্তর করিল—"আপনার ভয় নাই। আপনি নিরাপদ স্থানেই আছেন।"

"ডাকাতের বাড়ীতে আছি কি?"

"না—আপনি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে আছেন।"

"এখানে আসিলাম কিরূপে?

"সে অনেক কথা!"

"এখন বলুন না কেন—আমার প্রাণে বড় একটা কষ্ট হইতেছে। জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই।"

আবার সেই অদৃশ্য মূর্ত্তি—উত্তর করিল—"আপনি যাহা কিছু জানিতে চান, আর দুই ঘণ্টা পরে শুনিতে পাইবেন। আপনাকে দেখিতে ডাক্তার সাহেব এখনই

আসিবেন। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আপনার কাছে আসিয়া বসিব। সমস্ত কথা বলিব।"

আমি—বলিলাম—"এ নিঃসহায় অবস্থায়, আমার সেবা করিতেছেন—কে আপনি? আপনার কণ্ঠস্বরেত আপনাকে অতি দয়াময়ী বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

তিনি কোন উত্তর করিলেন না—আমার জ্বরসন্তাপিত গাত্রে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সে স্পর্শ অতি কোমল—কুসুম সুকুমার! সে স্পর্শ যেন স্নেহমাখা, সহৃদয়তা মাখা, সহানুভূতি মাখা। সেই কোমল হস্তের মৃদুসঞ্চালনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতরঙ্গে যেন মমতা মাখা। এত ধীরে, এত সন্তর্পণে, সেই ঠাণ্ডা, কোমল, পুষ্পস্পর্শ—হাত খানি আমার সেই সন্তাপিত দেহের উপর দিয়া চলিতেছিল যে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সেই ভীষণ জ্বরের সন্তাপ বিদূরিত হইয়া শরীর শীতল করিয়া তুলিতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কি বার?"

"শুক্রবার"

মনে সকল কথাই জাগিয়া উঠিল। বুধবার করুণাময় মরিয়াছে। বুধবার রাত্রেই আমি গুণ্ডার হাতে পড়ি। এখানে দুই দিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আজ শুক্রবার আমার চেতনা হইয়াছে।

সহসা বারাণ্ডায় জুতার শব্দ হইল। দুই জন লোকের পদশব্দ পাইলাম। তাহারা আমার গৃহেই প্রবেশ করিল। আমার কাছে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের পদশব্দ পাইয়াই যেন উঠিয়া গেলেন।

এই দুই জন লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াই—স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আর পদশব্দ হইল না। ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বার্ত্তা চলিল। একজন আমার নিকটস্থ হইয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু! কেমন আছ?"

আমি বলিলাম—"গুড—ডে—সাহেব।" প্রশ্নকারীর আওয়াজে ও কথার উচ্চারণে তাহাকে ইংরাজ বলিয়াই বোধ হইল।

তিনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। বক্ষ পরীক্ষা করিলেন; প্রেস্‌ক্রিপসান লিখিলেন। কারণ কলমের চড় চড় শব্দটা শুনিতে পাইতেছিলাম। শেষ আমায় বলিলেন "বাবু! আপনার আঘাত বড় গুরুতর। চোখে যে আঘাত লাগিয়াছে—তাহাতে চক্ষু দুইটী বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই প্রকার চোখ বাঁধা অবস্থায় ছয় মাস থাকিলে বোধ হয় আরাম হইতে পারে। আপনি শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনার মেরুদণ্ডে ভয়ানক আঘাত। উঠিতে গেলেই দাঁড়াইতে পারিবেন না—পড়িয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন—"জ্বরটা কি আর আসিবে? আজ অনেক চেতনা হইয়াছে দেখিয়া আমার আশা হইয়াছে। আমি যে অবস্থায় ইহাকে পথিমধ্যে পাই—বাঁচাইবার কোন আশা করিয়া গৃহমধ্যে আনি নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন—"ওটা সিম্‌প্যাথেটিক জ্বর। বোধ হয় আর হইবে না। ঔষধ যাহা দিতেছেন তাই দিবেন। আমি যেটা লিখিয়া দিলাম—ওটা রাত্রে দিবেন।"

টাকা গুণিয়া দেওয়ার শব্দ হইল। বুঝিলাম ডাক্তার ভিজিট লইয়া বিদায় হইতেছেন।

তাঁহারা দুই জনেই গৃহত্যাগ করিলেন। আমি গৃহস্বামীর সহিত কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম না। যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন—এত যত্নে শুশ্রূষা করিতেছেন, ডাক্তারের ভিজিট দিতেছেন, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না—মনে বড় কষ্ট হইল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "মহাশয়! আপনাকে শত শত ধন্যবাদ—আপনি পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলেন!" কোন উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম তাঁহারা ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

দিবা কি রাত্রি জানি না—আলোক কি জানি না, কেবল অন্ধকার—অন্ধকার—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! অন্ধকারসমুদ্রে আমি নিমজ্জিত। উঠিবার সামর্থ্য নাই—চক্ষে দৃষ্টি নাই—প্রাণে সুখ নাই—অন্ধকার আর ভালো লাগে না। আলো! আলো চাই! কে আমায় আলোক দেখাইবে? যাতনার চোটে—চীৎকার করিয়া উঠিলাম "কে আমায় আলো দেখাইবে?"

চীৎকার আর কেহ শুনিল কি না জানি না। এক জন আমার কাছে বসিল। ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—"ভয় কি? শীঘ্রই আরাম হইবেন।"

আমি বলিলাম—কে তুমি! কে তুমি! দেবী—না মানবী, আমার দুঃখে দুঃখী কে তুমি আসিয়াছ? তোমার পরিচয় দাও।

"আমি নীরা।"

"নীরা—নীরা—আহা নামটী বড় মিষ্ট। কিন্তু তোমার নাম ত কখনও শুনি নাই। তুমি এ বাড়ীর কে?"

"আমার কথা শুনিয়া আপনার কাজ নাই। জগতে আমার কেউ নাই—আমি—সমস্ত জগতকে আপনার করিয়া ভালবাসিতে শিখিতেছি। জগতের লোকের সেবাই আমার ধর্ম্ম। আপনি ত সেই জগতের এক জন!"

"তবু আমায় পরিচয় দিবে না—আমার জীবনরক্ষয়িত্রীর পরিচয় জানিবার কি আমার অধিকার নাই!"

"এখন নয়—সময়ে সব পাইবেন?"

আমার জন্য দিনরাত এত খাটিতেছ কেন? আমার সেবায় তোমার কি লাভ?

"লাভের জন্য আমি সেবা করিতেছি না—কর্ত্তব্য বোধে করিতেছি।"

"এ কর্ত্তব্য তোমায় কে বুঝাইয়া দিল?

"প্রথমে জগদীশ্বর—তার পর এই গৃহস্বামী।

আচ্ছা নীরা—পরিচয় দিলে না—কিন্তু আমি কোথায় আছি এটা বলিয়া দাও।"

"তা—না জানিলে আপনার ক্ষতি কি?

"জানিলেই বা ক্ষতি কি?"

"ও কথাটা এখন বলিতে আমার নিষেধ আছে।"

"কে নিষেধ করিল?"

"ডাক্তার—আর গৃহস্বামী।"

"বেশ—আমায় সকল বিষয়েই অন্ধকারে রাখিতে চাও!"

"কি করিব বলুন—আমার স্বাধীনতা নাই।"

"কিছু মনে করিও না নীরা, তোমার সহিত গৃহস্বামীর সম্পর্ক কি?"

"এখন কিছুই নাই—শীঘ্র ঘটিবে।"

অদ্ভুত রহস্যময় কথা! কি যেন একটা প্রহেলিকার মধ্যে পড়িলাম। কে এই নীরা, কে এই গৃহস্বামী, কেনইবা এরা আমায় কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলে না—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। গৃহস্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। পরিচয়ও জানি না। অযত্নের ত কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। কিন্তু লোকে কখনও এরূপ সন্দেহের অবস্থায় পড়িয়াছে কিনা জানি না।

নীরা খানিক পরে বলিল—"এখনই আপনার খাবার আনিয়া দি। আহারান্তে একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "নীরা—এখন দিবা কি রাত্রি—"

নীরা বলিল—"এখন দিবা ভাগ প্রায় বারটা বাজিয়াছে।"

"আমার ঘরে সূর্য্যকিরণ নাই কেন।"

"আপনার চোখের অসুখের জন্য ঘর দ্বার সব বন্ধ।"

আমি ভাবিলাম, আমার দিবাও নাই রাত্রিও নাই। সবই সমান।

আহারান্তে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘোর মানসিক চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে একমাস কাটিল। কিন্তু একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। নীরার যত্নে, শরীরে খুব বল পাইয়াছি। কিন্তু চোখের বাঁধন খুলিতে পাই না। ডাক্তারও রোজ আসেন, গৃহস্বামী নিজেও একজন ডাক্তার। এ সব পরিচয় ক্রমে ক্রমে নীরার নিকট পাইয়াছি। আমি যাঁর বাড়ীতে আছি—তাঁহার নাম H. Roy. নীরার সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিলাম লোকটা সাহেবী পসন্দের। যে বাঙ্গালার মধ্যে আমি আছি—সে বাঙ্গলা তাঁরই। বেনারসের নিকট ফুলপুরের এক পল্লীতে এই বাঙ্গলা অবস্থিত।

গৃহস্বামী ডাক্তার রায়ের সহিত কয়েকবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি অতি অল্পভাষী। দিনরাত নিজের "রোগী" লইয়া ব্যস্ত, এইজন্য সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। নীরার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়াও প্রকৃত উত্তর পাই নাই। তিনি যাহা বলেন তাহাতে বুঝিলাম যে নীরা আমার সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

গৃহস্বামীকে আমার পরিচয় দিয়াছি। তিনি লোক দ্বারা আমার সংবাদ আমার বাড়ীতে পাঠাইয়াছেন বলিয়াছিলেন।—তাহাতেই আশ্বস্ত আছি। সংসারে আমার আপনার কেহ নাই, মা নাই, বাপ নাই, আত্মীয় পরিজন

কেহ নাই। সরকার গোমস্তা দাস দাসী—তাহারা সংবাদ পাইতেছে, নিশ্চিন্ত আছে। আজ ১৪ই পৌষ—ঠিক দেড় মাসের উপর আমি ফুলপুরের বাঙ্গলায়। কতক-গুলি বিশেষ কথা বলিব বলিয়া ডাক্তার রায়কে আজ মধ্যাহ্নে আসিতে বলিয়াছিলাম। তিনি আসিয়াই আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছেন?" আমি বলিলাম "সেই রকমই। আমার চোখের বাঁধনটা কবে খুলিয়া দিবেন?"

ডাঃ—রায়। আজ যদি দিতে পারি ত কালকের অপেক্ষা করি না। কিন্তু সিবিল সাহেব বলেন, আরও দুই এক মাস দেরী করিতে হইবে। আপনার যদি এখানে থাকিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয়, তবে না হয় আপনাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিই। কিন্তু পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের উপর যে আঘা-তটা পাইয়াছেন, তাহা না সারিলে পাঠাই কি করিয়া?"

আমি। আমিত বেশ বল পাইতেছি—বোধ হয় দাঁড়াইতে পারি। চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না?

ডাঃ—রায়। না—না—তাহলেই সর্ব্বনাশ হবে। দেখুন আপনার "কেস" শক্ত বলেই ডাঃ গ্রিফিৎসকে দিয়েছি। তা না হলে—আমি নিজেই চিকিৎসা কর্ত্তে পার্তুম।

আমি। আপনার কাছে যে আমি কত ঋণী তা বলতে পারি না। কিন্তু একটা কথা—অনেক দিন আপ-নাকে বলিয়াছি—সেটার সম্বন্ধে ত কোন মনোযোগই করিলেন না।

ডাঃ—রায়। কি বলুন।

আমি। এই এত খরচ পত্র হইতেছে, আপনি, ঘাড়ে লইতেছেন কেন? আমি দরিদ্র হইলে না হয় ধর্ম্মার্থে করিতেন। আমার যখন যথেষ্ট বিষয় আছে, তখন খরচটা আমার কাছেই লইতে হইবে।

ডাঃ—রায়। আচ্ছা—আপনি যদি তাইতেই সন্তুষ্ট হন তাই হবে। বাড়ী গিয়ে যা হয় কিছু সাহেবকে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি। না—না—তা হবে না। আপনি আজই আমার কাছ থেকে পাঁচশত টাকার চেক্ নেন। যে কুরিরায় ব্যাগটী আমার সঙ্গেই পেয়েছেন বলেছিলেন, সেটি এনে দেন—তার মধ্যে আমার চেক্ বই আছে।

ডাঃ—রায়। আজ না হয় থাক না।

আমি। কোন আপত্তি শুনিতেছি না। যদি আপনি চেক্ না নেন, তবে আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

জেদ দেখিয়া ডাঃ—রায় সম্মতহইলেন। ব্যাগ আনিয়া চেক্‌বই বাহির করিয়া দিলেন। সহী করিবার স্থান দেখাইয়া দিলে, আমি স্পর্শশক্তি দ্বারা সহী করিলাম। চোক বাঁধা-সহী ঠিক হইল কিনা জানি না। তার পর দিন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হইতে ডাক্তার রায় টাকা আনিতে চলিয়া গেলেন।

মধ্যাহ্নে নীরা আসিয়া আমার কাছে বসিল। নীরা নীরা—জানি না কেন সে আমার কাছে না আসিলে সুস্থ থাকিতে পারি না। জানি না—কেন তাহাকে অল্প-ক্ষণের জন্য না দেখিলে, তাহার মিষ্ট কথা না শুনিলে অস্থির হইয়া পড়ি। সেই সুখময় স্পর্শ, সেই কলসঙ্গীত পূর্ণ কণ্ঠস্বর, তত মায়া, তত দয়া, তত স্নেহ, কেন একাধারে?

নীরা কে—তাহা জানিতাম না। নীরা কিশোরী কি যুবতী, সুন্দরী কি কুৎসিতা, তাহাও জানিতাম না। জানিতাম—তাহার সদয় ব্যবহার, মিষ্ট কথা, কোমল স্পর্শ! এক এক সময় মনে হইত; চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলি—জন্মান্ধ হইয়া থাকি সেও ভাল—তবু নীরাকে একবার চোখ খুলিয়া দেখি। দিন নাই—রাত নাই যে অক্লান্ত ভাবে আমার সেবা করিতেছে—আমার ক্ষুধার সময় আহার যোগাইতেছে—জানি না সে নীরা কেমন?

নীরা—আমার গায়ে হাত বুলাইতেছিল। কপালে

বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমিয়াছে—কখনও বা তাই মুছাইতে ছিল—কখনও ঔষধ খাওয়াইতে ছিল—কখনও বাতাস করিতেছিল—আমি ডাকিলাম "নীরা—"

নীরা বলিল—"কি বলুন।"

তুমি দিনরাত আমার কাছে থাক—আমার প্রতি কি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে? এ হতভাগ্যের কেহ নাই—তুমি কেন তাহাকে এত স্নেহ করিতেছ?"

নীরা। আমারও কেহ নাই—আমিও জগতে একাকী। এত দিন আপনাকে বলি নাই—আজ বলি। প্রাণের ভিতর চিতার আগুণ জলিতেছে—আর সহ্য করিতে পারি না। যাহা এত দিন বলি নাই, আজ তাহা বলিব।

আমার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িল। আমি আবেগ ভরে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নীরা আমায় বলিল, উঠিবার চেষ্টা করিবেন না। ডাক্তারের নিষেধ। উত্তেজিত হইবেন না। যাহা বলিব তাহা অদ্ভুত, সমস্ত ঘটনাই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে!

নীরা বলিতে লাগিল—"আমি পিতৃমাতৃহীন। ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পিতামাতা কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল না। গবর্ণমেণ্টের রিলিফ ওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত একজন খৃষ্টান কর্ম্মচারী আমাকে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। তাঁহারা আমায় লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—মানুষ করিয়াছেন—কিন্তু শেষটা আমার উপর বড় অবিচার করিলেন। তাঁহাদের বিশৃঙ্খল খরচের দরুণ অনেক দেনাপত্র হইয়াছে। টাকার জন্য চারিদিক হইতে মহাজনে নালিশ করিতে লাগিল। তাঁহারা অন্য উপায় না দেখিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

আমি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—"সেকি নীরা—তোমার সর্ব্বনাশ! তুমি এত ভাল; তোমারও শত্রু আছে?"

নীরা বলিল—"দেখুন আমি খৃষ্টানের আশ্রয়ে ঘটনা-বশে পালিত—কিন্তু অন্তরে আমি খৃষ্টান নহি। আমি এ পর্য্যন্ত গির্জ্জায় যাই নাই—খৃষ্টানিমতে আমার দীক্ষা হয় নাই। আমি হিন্দুর কন্যা—ব্রাহ্মণ কন্যা—যখন খৃষ্টানের অন্ন খাইয়াছি—সমাজের চক্ষে আমার জাতি গিয়াছে। কিন্তু আমার মন এখনও হিন্দু। আমি দুঃখে পড়িলে দেব দেবীকে ডাকি, যদিও খৃষ্টানের অন্ন খাইয়াছি—কিন্তু তাহারা অখাদ্য খাইত না। বাঙ্গালীর গৃহস্থের মত চলিত।

"আমি যাঁহাকে পিতা বলিতাম—এক দিন তাঁহার কাছে একটী বাবু আসিলেন। এই যুবককে আমি প্রথমে দেখিয়াই চেনা চেনা মনে করিলাম। আমরা যে বাড়ীতে থাকিতাম, উহার পাশের বাড়ীতেই ইঁহাকে দেখিয়াছি মনে হইল। কিন্তু তখন চুপ করিয়া গেলাম। আমি সন্ধ্যার সময় ছাদে বেড়াইতে উঠিলেই—এই আগ-ন্তুক বাবুকে ছাদের উপর পাইচারি করিতে দেখিতে পাই-তাম। তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। আমি লজ্জায় নীচে নামিয়া আসিতাম। তাঁহার সে দৃষ্টি বড়ই কলুষিত!

বাবুটী আসিবার পর আমি জানিনা—কি কারণে আমার সেই খৃষ্টান পিতা মাতা তখন সেস্থান হইতে আমায় সরাইয়া দিলেন। রাত্রে কিন্তু সব জানিতে পারিলাম। আমার মাতা আমায় ডাকিয়া বলিলেন—"নীরা! তোমার যে বিবাহ, আমরা আশা করি—তুমি বিবাহে সুখিনী হও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

কথা শুনিয়াই আমি অবাক্! লজ্জাতে আমার গণ্ড-স্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। মাতা পুনরায় বলিলেন—"আজ সকালে যিনি আসিয়াছিলেন—তিনিই তোমাকে বিবাহ করিবেন। তিনি একজন ধনী-সন্তান। তোমার পিতা (তাঁহার স্বামী) অনেক সন্ধান করিয়া এই পাত্র যোগাড় করিয়াছেন।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ—আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয় তাহা বুঝিয়া লউন। জনকতক লোকের স্বার্থের মুখে আত্ম-বলিদান, কতদূর ভয়ানক বুঝিয়া লউন। তাঁহারাও ছাড়িবেন না—আমিও বুঝিব না। তাঁহারা নানাপ্রকারে আমায় কষ্ট দিতে লাগিলেন। অগত্যা মনে মনে সংকল্প আঁটিলাম তিন মাস সময় লই।

তাঁহারা আর আমায় তাঁহাদের গৃহে স্থান দিলেন না। বাধ্য হইয়া আমি এখানেই আসিলাম। এই ডাক্তার এইচ্ রায়ই আমার ভবিষ্যৎ স্বামী। তিন মাসের এক মাস

গোলমালে কাটিয়াছে। এখনও দুই মাস বাকী। জানি না ঘটনাস্রোত আমায় কোথায় লইয়া যাইবে। আমি ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিয়া এখানে পড়িয়া আছি। ডাক্তার রায় স্বেচ্ছায়—আপনার সেবার জন্য আমায় নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ত আপনার সেবা করিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছি।

নীরা আর বলিতে পারিল না—দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু আমার বুকের উপর পড়িল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া নীরার জীবনের অদ্ভুত কাহিনীর কথা ভাবিতেছিলাম, আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। আমি বলিলাম—"নীরা! তুমি কাঁদিতেছ? কাঁদিয়া কি করিবে? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

সেই দুইটী বক্ষপতিত উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু মুছিয়া দিয়া নীরা নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়াছি। কাছে কেহই নাই। আকাশ পাতাল কতকি ভাবিতেছি। ডাক্তার রায়টা কে—তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহার,নীরাকে বিবাহের প্রস্তাব, আমার প্রতি ডাক্তারের এত যত্ন—এই সব একে একে আমার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য ঘরের ঘড়ীতে যখন একটা বাজিল—তখন একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম।

একটু তন্দ্রা আসিল। কিন্তু সে তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। যেন কে আমার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখ ঝুকিয়া আমার নাসিকার কাছে হাত দিয়া আমি নিদ্রিত কিনা পরীক্ষা করিতেছে। তাহার মুখে তীব্র বিলাতি মদিরার গন্ধ পাইলাম। বুঝিলাম এ নীরা নহে—নিশ্চয়ই ডাক্তার রায়। ডাক্তার রায়ের সম্বন্ধে—যে একটা সংবিশ্বাস ছিল—সেটা নীরার কথাতেই টলিয়াছে।

আমি অল্প অল্প নাক ডাকাইতে লাগিলাম। লোকটা আমায় অল্প অল্প নাড়া দিল—যখন দেখিল যে মৃতের মত ঘুমাইতেছি তখন চলিয়া গেল।

পার্শ্বের ঘরে দুজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। একটী স্বরই আমি চিনিলাম। একটী ডাক্তার রায়ের অপরটী কার তাহা জানি না।

ডাক্তার রায় বলিতেছেন—আপাততঃ আপনি দুই হাজার টাকা নিন্। তারপর আর সব কাজ শেষ করে বাকী টাকা আপনাকে পনের দিনের মধ্যে দিব।" অপর ব্যক্তি বলিল—"দেখ—রায়, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। মহাজনে আর থাকে না। এই সপ্তাহের মধ্যে টাকা না দিলে নালিশ করবে। তুমি কালই শ্যাম বাবুর কাছ থেকে কৌশল করে সহী করিয়ে লও। দলিল লেখাত ঠিক আছে। নীরাকে দিয়ে শ্যাম বাবুকে বলাতে হবে। একবার সহীটা হয়ে গেলে বাস্—ওষুধটা ঠিক্ দিচ্ছ ত!

রায় বলিল—হাঁ রোজইত আর্সেনিক দিচ্ছি। নীরা জানে না রোগীও জানে না। দেখুন এতকাণ্ড কল্লুম—গুণ্ডা দিয়ে নিকাশ করে ফেলবার চেষ্টা কল্লুম, কিন্তু কোথাকার ঘটনা কোথায় দাঁড়াল! আমি ওর ভিতরের অবস্থা এমনি করে আন্‌ছি যে সহীটা একবার নিতে পাল্লে হয়। তারপর একটু চড়ামাত্রায় দিলে দু দিনেই নিকাশ।"

আমি শুনিয়া ত অবাক্ হইলাম। আমার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কোথায় আমি? যাহাদের মিত্র ভাবিতেছি তাহারাই আমার জীবন ঘাতক শত্রু? জানিনা কে এই সর্ব্বনেশে ডাক্তার রায়। আর কে এই সর্ব্বনেশে লোক। নীরার সমস্ত কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম—অপর লোকটী নিশ্চয়ই নীরার পালক পিতা।

আর একটু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহারা আবার ফিস্ ফিস্ আরম্ভ করিল। অপর ব্যক্তি বলিল "দেখ! নীরা কোথায়? সেত আমাদের ভিতরের কথা জানিতে পারে নাই?

ডাঃ রায় বলিল—"আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। নীড়া বড় বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমি তার উপর খুব একচাল চালিয়াছি। আমি কেবল তার রূপের জন্যই আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করিতে উদ্যত। বিষয়টা হাতে না আসিলে ত কিছু করিতে পারি না। নীরাকে যতদুর আদরে রাখিতে হয় তাই রাখিয়াছি। সে বই পড়িতে ভালবাসে—ভাল ভাল বাঙ্গলা বই আনাইয়া দিয়াছি। সে শ্যাম বাবুর সেবা করিতে ভালবাসে—তাহাও দিতেছি। কোন কাজে তাহাকে বাধা দিই নাই। তাহার মনটা নরম করানই আমার দরকার।

ঘড়ীতে দুটা বাজিল। এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এই একঘণ্টা আমার যেন একযুগ বোধ হইল। মনে মনে

এক একবার হইতে লাগিল—এ ত হেম নয়? ডাঃ রায় ত হেম নয়? না—অসম্ভব! হেম থাকে লাহোরে—নীরার মুখে শুনিয়াছি এরা এখানকার অধিবাসী। তাহা ছাড়া হেমের আওয়াজ ত ভুলি নাই? কিন্তু ডাক্তার রায়ের কণ্ঠস্বর ত তার মতন নয়! না—না—হেম এতদুর করিতে পারে না। বিষয় ত আমি তাহাকে আপনিই দিতে চাহিয়াছিলাম।"

খানিকক্ষণ পরে শব্দে বুঝিলাম, যে তাহারা চলিয়া গেল। নীরা একঘরে ঘুমাইতেছে—আমি এখানে একাকী পড়িয়া। নীরাকে ডাকিতেও পারি না। আমি অন্ধ—কোথায় যাইব? কাহাকে ডাকিব?

মনে মনে ভাবিলাম আজই এখান হইতে পলাইব। বাঁচি আর মরি আর এখানে থাকিব না। চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলি। এ কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা আজন্ম অন্ধ হওয়া ভাল।

আমি আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিলাম। একবারে উঠিতে ভয় হইতে লাগিল। পাছে পিঠের ব্যথায় লাগে। একটু একটু করিয়া উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। দেখিলাম কোন ব্যথাই নাই। ভরসা হইল উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শরীরটা প্রথমতঃ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু বল সঞ্চয় করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। কি আশ্চর্য্য! আমার মেরুদণ্ডে ত কোন বেদনা নাই! ঈশ্বর কি এই দুঃসময়ে আমায় নীরোগ করিয়া দিলেন?

সিগারেট খাইবার জন্য আমার মাথার নীচে প্রায়ই দেশালাই থাকিত। আগে চোখের বাঁধনটা—খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। বাঁধন খুলিলেই অন্ধ হইব এই একটা ভাবনা! অনেক ভাবিয়া শেষ খুলিয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম।

ধীরে ধীরে—ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চোখের ব্যাণ্ডেজটা খুলিয়া ফেলিলাম। দেশালাই জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যস্থ জিনিস পত্র বেশ দেখিতে পাইতেছি। ঐত চেয়ার দুখানা—ঐত বাতিদানে বাতিটা—ঐত আমার কুরিয়ার ব্যাগ্—ঐত দুইটী গ্লাস। কে বলিল আমি অন্ধ! হা ভগবান আমি কি ভীষণ চক্রান্তে পড়িয়াছি। রক্ষা কর! হে দেবাদিদেব সকল কথা বুঝাইয়া দাও।

বাতিটা জ্বালিয়া লইলাম। কুরিয়ার ব্যাগটা সংগ্রহ করিলাম। ঘরের চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিলাম। সহসা অতি মৃদু পদশব্দ হইল। আমার পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম। আমি বলিলাম—"কেও নীরা আসিয়াছ—ভালই হইয়াছে। আমি আরও তোমায় খুঁজিতেছিলাম।"

নীরা অস্ফুটস্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আপনি তা'হলে ত বেশ দেখ্‌তে পান্—কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন কেন! ডাক্তার যে নিষেধ—

"রেখে দাও তোমার ডাক্তার—ভয়ানক চক্রান্ত। "নীরা বলিল—"আজ আমি সব জানিয়াছি। সব শুনিয়াছি চলুন—আপনার সঙ্গে আমিও পলাই। আজ রাত্রে আমার সেই পালক পিতা আসিবেন জানিতাম। তাই আড়ি পাতিয়া সব কথা শুনিয়াছি। আপনি আজই পালান—নচেৎ আপনাকে উহারা বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে।"

"বিষ—বিষ—বিষ—নীরা নীরা। কি সর্ব্বনাশ? আমি উহাদের কি করিয়াছি? আমায় মারিয়া ফেলিলে উহাদের বেশী কি লাভ হইবে?"

নীরা বলিল—"বেশী কথা কহিবার অবসর নাই চলুন—পলাইয়া গিয়া বাহিরে নিরাপদ স্থানে সকল কথা হইবে। আমার গোটাকত জিনিস আছে এখনই আনিতেছি—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান।"

সহসা ধূমরাশিতে ঘরটা আচ্ছন্ন হইল। কাপড় পোড়ার গন্ধ পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখি—মেজের উপর পাটকরা দুইখানি লেপ অগ্নিসংযোগে দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। নীরা বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ করিয়াছেন? বাতিটী টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন। আলগা বসান ছিল পড়িয়া গিয়া লেপ জলিয়া উঠিয়াছে। লেপগুলি ঐ খানেই পাট করা থাকিত।"

আমি—ভয়ে ব্যাকুল হইলাম—চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"জল—জল! নীরা জল আন।"

নীরা তখন থরথর কাঁপিতেছে। আমি তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিলাম। নীরা বলিল—শীঘ্র পালান আপনি—আপনার প্রাণ আজ নিশ্চয় যাবে। জল ঘরের মধ্যে কোথাও নাই—আর একটু জলে কি হবে—ঐ দেখুন বাঙ্গলার বেড়া ধরিয়া উঠিল। আপনি সুমুখের দোর খুলিলেই সিঁড়ি দেখিতে পাবেন। সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করুন। আমি দুই মিনিটের মধ্যে জিনিসগুলি লইয়া আসি।"

নীরার উপদেশ মতে কার্য্য করিতে হইল। আমি সিঁড়ি হইতে সবে নামিয়া নীচে পৌঁছিয়াছি—অমন সময়ে নীরা বলিতেছে— "পালাও— পালাও ছুটিয়া পালাও—"

তখন বাঙ্গলার বেড়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছি। নীরা দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া—আর একজন তাহাকে জোর করিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। নীরা যথাশক্তি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরুদ্ধে বল প্রকাশ করিতেছে।

আমি নীরার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলাম, আর থাকিতে পারিলাম না! শরীর দুর্ব্বল—মাথা ঘুরিতেছে—সম্মুখে আগুণের হাপ্‌রা ও ধোঁয়ায় পথ বন্ধ—অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তবু সেই সিঁড়ির উপর পুনরায় উঠিতে লাগিলাম। আমায় অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে নীরার বুকে ছুরিকাঘাত করিল।

নীরা সেই আঘাতে সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িল।

আমি নীরার দেহ কোলে করিয়া লইলাম। আঘাতকারী কে তাহা চিনিতে পারিলাম না। লোকটা ছুটিয়া জলন্ত ঘরে প্রবেশ করিল।

জল—জল—কে জল দিবে? জনপ্রাণী নাই—সাড়া শব্দ নাই। বাঙ্গালার এক পার্শ্ব জলিতেছে—ক্রমে তাপ বড় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আমি নীরার রক্তাক্ত দেহ কোলে করিয়া দূরে আনিলাম। নিজের উত্তরীয় ছিড়িয়া তাহার আহত স্থানের মুখ বাঁধিয়া দিলাম। নীরা বলিল "যাই—বড়ই যন্ত্রণা—"

আমি বলিলাম—"নীরা—নীরা—কে এই সর্ব্বনাশ করিল। কোন্ দুর্ব্বৃত্ত এই কোমলা বল্লরীকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।"

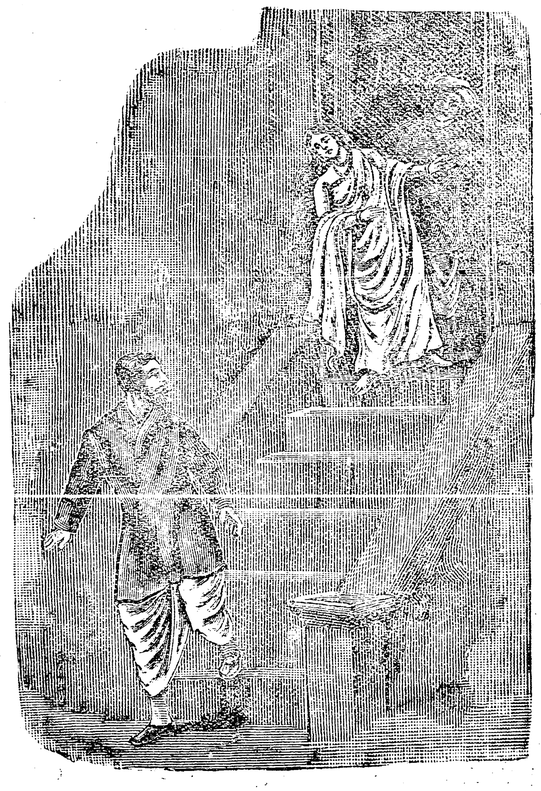

নীরা বলিল—"আর—কে, সেই ডাক্তার রায়!—শ্যাম বাবু—জল দিন প্রাণ যায়।"

কুরিয়ার ব্যাগটী পাতিয়া তাহার উপর নীরার মাথা রাখিলাম। জলের চেষ্টায় বাহির হইলাম। অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার--কিন্তু ভগবান তাহাতে আলো করিয়া দিয়াছেন। দহ্যমান বাঙ্গলার আলোকে দূরে একটী ইঁদারা দেখিতে পাইলাম। একটী লোহার জলপাত্র দড়াতে বাঁধা সেখানে রহিয়াছে—"ধন্য জগদীশ্বর ধন্য তুমি!"

জল লইয়া দ্রুতপদে নীরার কাছে পৌঁছিলাম—তাহাকে জল খাইতে দিলাম।

জলপান করিয়া নীরা বলিল—"শ্যাম বাবু! আমি জন্মের মত চলিলাম। মরিবার আগে—প্রাণের কথা এতদিন যাহা তীব্র অনল শিখার ন্যায় হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম—আজ তাহা জগৎকে প্রকাশ করিতে আপত্তি কি? আমার সব আশা ফুরাইয়াছে। জীবনে বাঁচিবার সাধই ছিল—না, তোমায় দেখিয়া বাঁচিতে সাধ হইয়াছে। আশাহীন—লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিতেছিলাম—তোমায় ধ্রুবতারা রূপে পাইয়াছিলাম। বুক ফাটিয়া যাইত—বলি বলি করিয়াও এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। ডাক্তার রায়ের বাঙ্গলায় আমি এতদিন থাকিতাম না। কেবল তোমার জন্যই ছিলাম। সে যে দুর্ব্বৃত্ত—নরপিশাচ—তাহা তার এক দিনের ব্যবহারেই অনুমান করিয়াছিলাম। আমার সময় শেষ হইয়া আসিতেছে। শ্যাম বাবু! তোমায় গোপনে ভালবাসিয়াছিলাম— সেই ভালবাসা হৃদয়ে লইয়া পরলোকে চলিলাম।

আবেগভরে আমি বলিয়া উঠিলাম "নীরা—নীরা—তোমায় বাঁচাইবার কি কোন উপায়ই নাই –"

নীরা বলিল—"বড়—পিপাসা—জল—জল।" জল দিলাম।

সেই অন্ধকারে নীরার রুধিরাক্ত দেহ কোলে করিয়া আমি প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। বাঙ্গলার একাংশ তখনও থাকিয়া থাকিয়া জলিতেছে—সে আলোক চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আগুণটা যখন বড় জোরে জলিতেছে—তখন আলোক খুব হইতেছে—আবার নিবিয়া যাইতেছে। এক এক বার আমি—সেই উজ্জ্বল আলোকে নীরার মুখখানি অতি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দুর্ব্বলতা বশতঃ নীরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ "রক্ষা কর—রক্ষা কর"—বলিয়া এক জলন্ত মনুষ্য-মূর্ত্তি বাঙ্গলার ভিতর হইতে লাফ দিয়া পড়িল। "কে আছ—রক্ষা কর—পুড়িয়া মরিলাম—" দ্রুতবেগে জ্বালার চোটে সেই মূর্ত্তি বাঙ্গলার মাঠের দিকে ছুটিল। আমি সুপ্তিমগ্ন নীরার মস্তকখানি ধীরে ধীরে নামাইয়া—সেই মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। যদি তাহার প্রজ্বলিত বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তখনও তাহাকে বাঁচাইতে পারি। আমি দ্রুত গিয়া তাহাকে ধরিলাম। তাহার মুখ দেখিয়াই চিনিলাম। আমার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"হেম! হেম! আজ তোমার এই দশা! ভাই রে আমার? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?"

আর কথার অবসর নাই—সাধ্যমত কতকগুলা জলন্ত বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলাম—আগুণটা নিভিল। কিন্তু হেম দাঁড়াইতে পাড়িল না। মাটিতে পড়িয়া গেল।

আমি হেমের মাথা কোলে লইয়া বসিলাম। বড় সৌভাগ্যের কথা—বাঙ্গলায় এক বৃদ্ধ চাকর ছিল—সে হেমের চীৎকারে—সেখানে আসিয়া পড়িল। তাহার সাহায্যে অনেক কষ্টে—হেমকে বাঙ্গলার এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলাম।

হেম বলিল—"দাদা—মৃত্যু—আসিতেছে। ঐ—ঐ—আর বাঁচিব না। আমায় ক্ষমা কর। আমি তুচ্ছ বিষয়ের লোভে তোমার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তোমার পিছনে গুণ্ডা লাগাইয়া তোমায় কি অবস্থায় রাখিয়াছিলাম—তাহা ত সবই জানিয়াছ। জাল মানুষ সাজিয়া—চেক জাল করিয়া—তোমার খাদ্যে মৃদু বিষ মিশাইয়া অনেক পাপ করিয়াছি। বড় কষ্ট—যে যাহার মন্ত্রণায়—এত দুষ্কর্ম্ম করিলাম, তাহাকে আজ দেখিতে পাইলাম না। তাহা হইলে জলন্ত বাঙ্গলায়—জলন্ত অঙ্গারে তাহাকে দগ্ধ করিতাম। ছার বিষয়ের জন্য আমি স্ত্রীহত্যা করিয়াছি—ভ্রাতৃহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম—"হেম! আমার জন্য তুমি কিছু ভাবিও না। আমি তোমায় প্রাণের সহিত মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু একটা কথা হেম! নীরাকে কেন আঘাত করিলে? তাহার অবস্থা শঙ্কাজনক। হয়ত সে বাঁচিবে না।

হেম বলিল—"দাদা! দাদা! বড় ভুল করিয়াছি, নীরা নির্দ্দোষী—নিষ্কলঙ্কিতা। তাহার দুর্বৃত্ত পালক পিতা অর্থ লোভে নীরাকে আমার কাছে বিক্রয় করিয়াছিল। তাহারই পরামর্শে আমি এই সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। নীরা—নীরা—তুমি তবে এখনও জীবিত আছ? ঈশ্বর করুন, তুমি আরোগ্য লাভ কর। আমি যে স্ত্রী হত্যাকারী নহি ইহা জানিলে সুখে মরিতে পারিব।"

আমি হেমের অনুতাপপূর্ণ কথায় বালকের মত কাঁদিতে লাগিলাম। হেম নির্দ্দোষ—অপরিণতবুদ্ধি। আমার কাছে সে বালক-বুদ্ধির দোষে—ভ্রমে পড়িয়া এই সব দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। আমি যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যদি হেমকে ফিরিয়া পাই—নিজের জীবন দিয়াও যদি হেমকে ফিরিয়া পাই—তাহাতেও এখনি প্রস্তুত। আমি বলিলাম—"হেম—হেম—তুমি কি আমায় ছাড়িয়া যাইবে?"

হেমের জ্বালা বড় বাড়িতেছিল। ডাক্তার আনিতে একজন লোক পাঠাইয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই ডাক্তার আসিল। কিন্তু হেম তখন কোথায়? হেম তখন জন্মের মত ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নীরার শুশ্রূষায় ডাক্তারকে নিয়োগ করিয়া আমি ভূমে পড়িয়া হেমের শোকে বালকের মত কাঁদিতে লাগিলাম।

নীরা বাঁচিলে, কিন্তু বুদ্ধিশক্তি আর পাইল না। পাগলিনী নীরাকে আমি সঙ্গে করিয়া আনিলাম। যতদিন বাঁচিব সঙ্গে লইয়া ফিরিব। আহা, কখনও কি নীরা আরোগ্যলাভ করিবে না?

সমাপ্ত

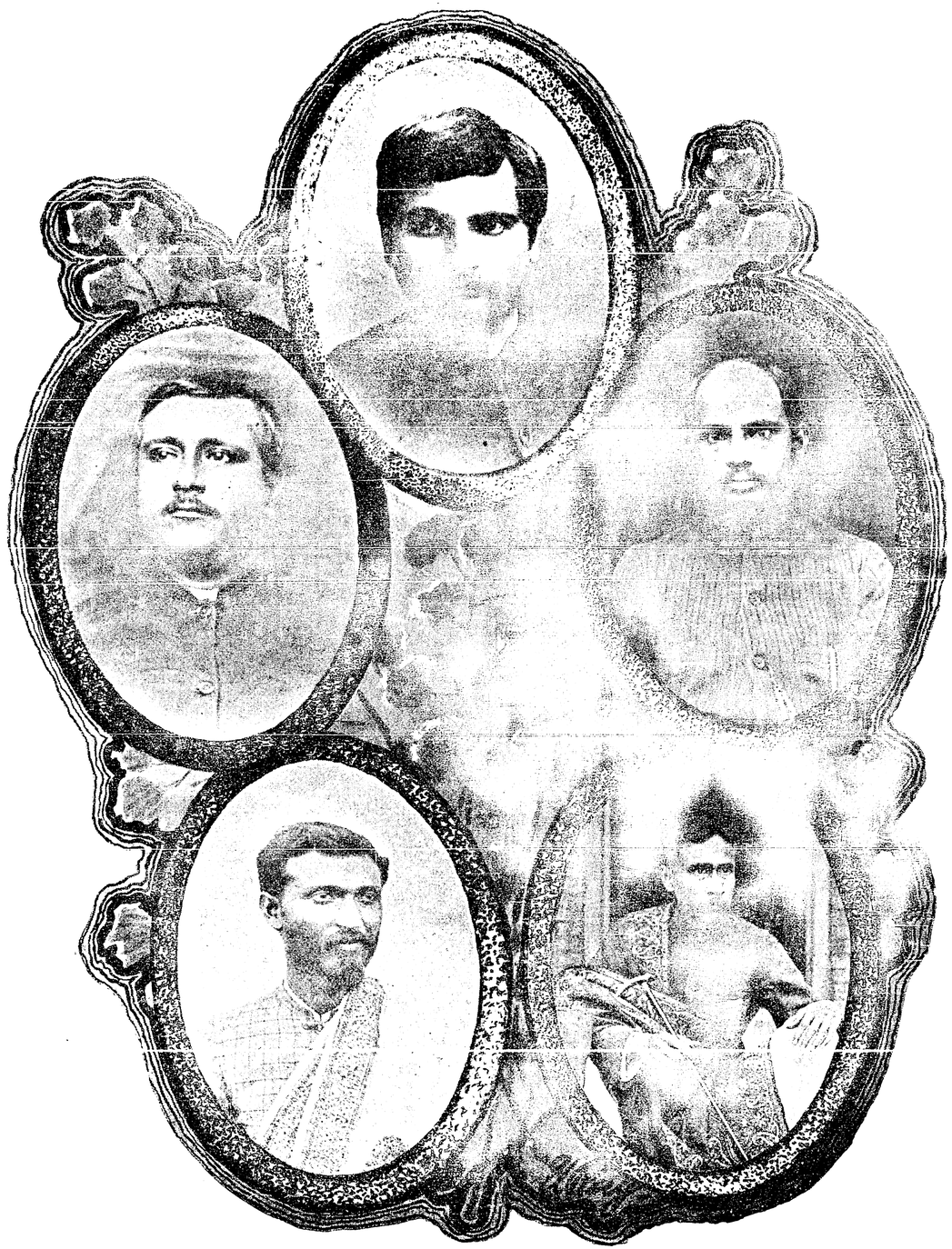

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বি, এ।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

FONTALINE PRESS

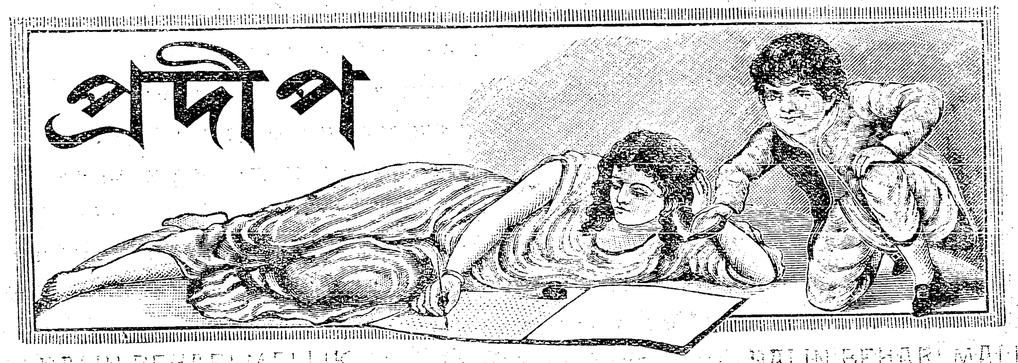

NALIN BEHARI MALLIK.

NALIN BEHARI MALLIK.

দ্বিতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। ১২শ সংখ্যা।

নিঃসম্বল।

সুখে দুঃখে এ জীবন, হে জীবন-স্বামী,
তিলমাত্র দুঃখ তাহে নাহি গণি আমি।
হ'ক সুখ হ'ক দুখ, তোমারি সে দান,—
কভু বা বিকাশে ঊষা কভু অবসান।
বসন্ত হাসিয়া ফিরে নাহি তার লাজ,
বরষা যে কেঁদে সারা সেই তার কাজ।
যে হাসে যে কাঁদে আর যেবা যায় চ'লে,
সবাই দাঁড়ায় শেষে সিংহাসন-তলে;
সুখদুঃখ হাসি-অশ্রু যাহা আছে যার
তোমার চরণ প্রান্তে দেয় উপহার।
রিক্ত এ পরাণ মোর শূন্য সব ঠাঁই,
আমি যাব কি লইয়া ভাবিতেছি তাই;
সুখ যাহা দিয়েছিলে দেখি নাই ভুলে,
দুঃখেরেও বরি নাই বক্ষে ল'য়ে তুলে!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

গীতগোবিন্দ।

রসাল মঞ্জরী'পরে ভৃঙ্গের গুঞ্জণ,
মধুর সঙ্গীতে আর মালতীর বাসে,
কোকিলের কলগীতে, মলয় বাতাসে,
বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশা করিতে যাপন,—
চাঁচর চিকণ কাল কুন্তলের পাশে
বাঁধি প্রাণ অতৃপ্ত যে মধুর যৌবন;
চঞ্চল ভ্রমর-আঁখি সুধার পিয়াসে
নিটোল চিবুকখানি করিতে ধারণ,—
এ সব মধুর—কিন্তু যে মধুরতর
ললিত কোমলতর বীণা কণ্ঠ গীত
শুনিলাম তাহে আজি পরাণ মোহিত!—
কি ছার ইহার কাছে উর্ব্বশী-অধর-
সুধায়-মণ্ডিত গান দেবের রচিত—
সহস্রলোচন যারে করেন আদর!

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

আলোক-তত্ত্ব।

সেকালের লোকে কেহ কেহ ভাবিত, চক্ষু হইতে আলোক-কণিকা বাহির হইয়া সম্মুখের বস্তুতে পড়িলে সেই বস্তু দীপ্তিমান্ ও প্রত্যক্ষ হয়। আঁধার ঘরে কোন জিনিষে দীপ্তি থাকে না কেন, তাহা এইরূপ ব্যাখ্যায় বুঝা কঠিন।

তবে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে কণিকা আসিয়া চোখে উপস্থিত হইলে সেই বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, এইরূপও ব্যাখ্যা চলিতে পারে; আলোক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং নিউটন এই মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন; অথচ এই মত তাঁহার ঠিক্ মনোমতও ছিল না। ষাটি বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় পণ্ডিতেরও এই মতে সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

ঠিক্ নিউটনের সময়েই আর একজন পণ্ডিত আলোকের উৎপত্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ইঁহার নাম হুইগেনস্। লোষ্ট্রক্ষেপে জলে যেমন ঢেউ জন্মে, তারে আঘাত দিলে বায়ুরাশিতে যেমন ঢেউ জন্মে, সেইরূপ দীপ্তিমান্ দ্রব্যের অণুগুলি বিশ্বব্যাপী আকাশ নামক পদার্থে ঢেউ জন্মায়; সেই ঢেউ হইতে আলোকের উৎপত্তি। শতাধিক বৎসর এই মতে কেহ আস্থা স্থাপন করে নাই।

আস্থা স্থাপন করে নাই কেন? আলোকের রশ্মি এক মুখে সরল রেখায় চলে। কিন্তু জলের ঢেউ বা বায়ুমধ্যে শব্দোৎপাদক ঢেউ সরল রেখায় চলে না; আলোকের রশ্মি যে মুখে চলিতে আরম্ভ করে, সেই মুখেই চলিতে চায়; তরঙ্গের কিন্তু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াই স্বভাব। একমুখে বাঁধা থাকিতে চাহে না।

শব্দের সঙ্গে আলোকের এইরূপ বিরোধ। খোলা জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া সম্মুখের দেওয়ালের গায়ে পড়ে, রৌদ্রের আশে পাশে ছায়া পড়ে। সম্মুখে দাঁড়াইলে গায়ে রোদ লাগে; পাশ কাটাইলেই ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু জানালার বাহিরে শব্দ হইতেছে; ঘরের ভিতরে যেখানে দাঁড়াওনা কেন, ঘরের কোণে দাঁড়াইলেও, শব্দ শুনিতে পাইবে। শব্দের 'ছায়া' পড়ে না। শব্দ বায়ুতরঙ্গ হইতে উৎপন্ন; তরঙ্গের স্বভাবই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া আলোক কখনই তরঙ্গজাত হইতে পারে না; নতুবা আলোক ছড়াইয়া না পড়িয়া একমুখে চলে কেন? আলোকের পাশে ছায়া কেন?

এই প্রশ্নে অনেক পণ্ডিত নিরুত্তর হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরুত্তর হওয়া উচিত ছিল না· কেন না এই কথাটাই ঠিক্ নহে। আলোকও বস্তুতই ছড়াইয়া পড়ে, আলোকও এক মুখে চলে না। নিউটন নিজেই উত্তর দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সে পথে যান নাই।

অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলোক আনিয়া একখানা শাদা কাগজে ফেলিলে দেখা যায়, ছিদ্রের সম্মুখে ত আলো পড়িয়াছেই, প্রত্যুত আশে পাশেও কিছু দূর পর্য্যন্ত আলোক আছে।

মধ্যে আলো, তাহার দুই পাশে সহসা পূর্ণ আঁধার না হইয়া আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ আঁধারে পরিণতি পায়। ফলে আলোক কিছুদূর পর্য্যন্ত আশে পাশেও বর্ত্তমান থাকে।

কিছুদূর পর্য্যন্ত থাকে কেন? শেষ পর্য্যন্ত আঁধার হয় কেন? উত্তর দেওয়া বড় কঠিন নয়। জলের ঢেউ দেখিয়াছ; এখানে উচু ওখানে নীচু; এখানে মাথা ওখানে পেট; মাথার পর পেট, পেটের পর মাথা এইরূপ পর পর চলিলেই তবে তরঙ্গ জন্মে।

দুই জায়গা হইতে তরঙ্গ আসিলে ঢেউ এর উপর ঢেউ পড়ে। এক স্থান হইতে সারি বাঁধিয়া ঢেউ আসিতেছে; মাথার পর পেট, পেটের পর মাথা; ওখান হইতে আর এক সারি তরঙ্গ আসিতেছে, মাথার পর পেট, পেটের পর মাথা। এক সারির মাথার উপর আর এক সারির মাথা পড়িলে সেই স্থানটা আরও উচু হইয়া উঠে। পেটের উপর পেট পড়িলে আরও নীচু হয়। কিন্তু মাথার উপর পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হইয়া উচুও হয় না, নীচুও থাকে না। তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি হইয়া দুই তরঙ্গই লোপ পায়। চৌবাচ্চার বা পুষ্করিণীর দুই জায়গায় জল নাড়িয়া দিলে এই তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি সহজেই দেখা যায়।

শব্দের তরঙ্গেও এইরূপ কাটাকাটি হয়; শব্দে শব্দে মিশিয়া একবারে নিঃশব্দতা। আলোকে আলোকে মিশিয়া একেবারে আঁধার হইবে আশ্চর্য্য কি?

দুই জায়গার পরিবর্ত্তে সহস্র জায়গা হইতে ঢেউ

আসিতে থাকিলে এই কাটাকাটি ব্যাপারটা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। যত অধিক স্থান হইতে ঢেউ আসে, কাটাকাটিও তত চলে। একটা বড় ছিদ্রের ভিতর দিয়া যখন আলো আসে, তখন ছিদ্রের প্রত্যেক বিন্দুই আলোকতরঙ্গের উৎপত্তি স্থল হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ বিন্দু হইতে তরঙ্গের সারি উৎপন্ন হইয়া শতধা বিকীর্ণ হয়। কিন্তু তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি হইয়া প্রায় সমগ্র প্রদেশটাই নিস্তরঙ্গ হইয়া যায়; কেবল প্রত্যেক বিন্দুর সম্মুখে একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া আলোক তরঙ্গ অক্ষত শরীরে অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। সেই জন্য আশে পাশে আঁধার বা ছায়া, আর সম্মুখেই আলোক। ছিদ্রটা খুব বড় না হইলে এই কাটাকাটি ব্যাপারটা তত সমারোহে ঘটে না; তখন সম্মুখে ত আলো থাকেই, আশে পাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত ক্ষীণ আলো বা আঁধারের মাঝে মাঝে ঈষদ্দীপ্ত আলো দেখা যায়। যেখানে তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি, সেইখানে আঁধার; যেস্থান কাটাকাটি ঘটিয়া একেবারে নিস্তরঙ্গ হইতে পারে না, সেইখানে ক্ষীণ আলো থাকে।

এই জন্য তরঙ্গ সত্ত্বেও ছায়ার উৎপত্তি। আলোকেরও আশে পাশে যাওয়াই স্বভাব, তবে সেখানে আলোকে আলোকে মিশিয়া গিয়া আঁধার ঘটে।

আলোকে আলোকে মিশিয়া যে আঁধার ঘটে, তাহা নিউটন জানিতেন; নিউটন দুইখানা কাচ—একখানার পিঠ সমতল, আর একখানা একটু কুব্জ—দুইখানা কাচ পরস্পর চাপিয়া ধরিয়া দেখিয়াছিলেন, দুই কাচের মধ্যে আলোর পর আঁধার, আঁধারের পর আবার আলো দেখা যায়। সূর্য্যের আলোতে নানা রঙ্গের আলো আছে; কাটাকাটি ঘটিয়া কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও সবুজ রঙের আলো একেবারে লোপ পায়; কাজেই শাদা রঙের বদলে হরেক রঙ দেখা যায়। জলের পিঠে তেল ভাসিলে তেলের সূক্ষ্ম একখানা পরদা জলে ভাসে; পরদার উপর হইতে এক সারি ঢেউ, পরদার নিম্ন হইতে আর এক সারি ঢেউ আসে; দুই সারিতে কাটাকাটি ঘটিয়া কোন না কোন রঙের আলো একবারে লোপ পায়; তেলের আস্তরণটাও রঙিল লাগে। সাবানের ফেণার রঙ সকলেরই পরিচিত। সেও এই কাটাকাটির ফলে।

ফলে আলোক এক রকম তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন, স্বীকার করিতে আর কোন বাধা নাই। সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া আলো চলিলে বস্তুতই আশে পাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত আলোক দেখা যায়। বড় ছিদ্র বা জানালা দিয়া আলো চলিলে কেবল সম্মুখভাগই আলোকিত হয়, আশে পাশে ছায়া পড়ে। শব্দের তরঙ্গগুলা বড় বড় তরঙ্গ; আলোকের ঢেউ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; শব্দের ঢেউ এক একটা দু হাত দশ হাত লম্বা। কাজেই আমাদের সাধারণ দরজা জানালার ছিদ্র আলোক তরঙ্গের পক্ষে বৃহৎ; শব্দ তরঙ্গের পক্ষে সঙ্কীর্ণ। আলোকের তরঙ্গ আশে পাশে কাটাকাটি করিয়া লোপ পায়; শব্দের তরঙ্গ কাটাকাটির অবসর পায় না; তাই ঘরের কোণে দাঁড়াইয়াও বাহিরের শব্দ শুনা যায়। শব্দের তরঙ্গ ও আলোকের তরঙ্গের প্রভেদ বৃহত্ত্ব লইয়া।

তরঙ্গ জন্মে কেন? যে সকল জড়কণিকা অবলম্বন করিয়া তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, সেই কণিকাগুলি একটা নিয়মিতকালে নাচিতে থাকে; সেই জন্য ঢেউ জন্মে। জলতরঙ্গ, বায়ুতরঙ্গ, আকাশতরঙ্গ, তিনেরই পক্ষে একই কথা।

সহজেই দেখিতে পার। স্কুলের ছুটীর পর ছেলের পালকে সারি বাঁধিয়া দাঁড় করাও। ছেলেগুলি সমবয়স্ক বা মাথায় সমান হইলেই ঠিক্ হয়। প্রত্যেককে শিখাইয়া দাও, সে একটি বার নৃত্য করিবে ও নৃত্যান্তে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের সহচরকে একটি চিমটি কাটিবে। সহচর চিমটি খাইয়াই স্বয়ং একবার নাচিবেন ও পরবর্ত্তী সহচরকে একটি চিমটি দিবেন। এইরূপে প্রত্যেকেই আপনার বামপার্শ্বের বন্ধুর চিমটির প্ররোচনায় একটি বার উল্লম্ফন দিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বের বন্ধুটিকে চিমটি প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকুক। মাষ্টার মহাশয় দেখিবেন, তাঁহার সম্মুখে ছেলেদের মাথার সারিতে ঢেউ খেলিতেছে।

জলতরঙ্গের মত, বায়ুতরঙ্গের মত, আকাশ তরঙ্গেরও নানা গুণ। জলের ঢেউ পুষ্করিণীর তীরে লাগিয়া ফিরিয়া আসে; বায়ু তরঙ্গ দূরের গাছপালায়, দেওয়ালে, লাগিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রতিধ্বনি জন্মায়; আকাশতরঙ্গ দর্পণপৃষ্ঠ হইতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে। আলোকের রশ্মি যে এইরূপে ফিরিয়া আসে; এই

ব্যাপারের একটা নাম দিব—'পরাগ্‌বর্ত্তন'। নামটা খুব জাঁকালো হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

আবার এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে প্রবেশকালে আকাশতরঙ্গ অন্যান্য তরঙ্গের মত ভিন্ন বেগে চলিতে থাকে। ফলে আলোকরশ্মি একটু ট্যারচা রাস্তায়, ভাল কথায় তির্য্যক্ পথে, চলিতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপারের নাম দিব—'তির্য্যগ্‌বর্ত্তন'।

আবার বায়ুমধ্যে ছোট বড় সকল রকম আকাশ তরঙ্গ এক বেগেই চলে। সেই বেগই বা কত? সেকণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ,—উচ্চারণ করা সহজ, কিন্তু মনে ভাবা কঠিন। কিন্তু বায়ু ছাড়িয়া জলে বা কাচে বা অন্য ঘন সান্দ্র পদার্থ মধ্যে প্রবেশ করিলে আর সকল ঢেউ সমান বেগে চলে না। সকলেরই বেগ একটু করিয়া কমে; বড় বড় লম্বা লম্বা ঢেউ গুলার—যে গুলা হইতে লাল রঙ্ হলদে রঙ্ জন্মায়—সে গুলার বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প কমে; কিন্তু ছোট ছোট ঢেউ গুলার—যে গুলা হইতে সবুজ রঙ, নীল রঙ জন্মে—তাহাদের বেগ আরও অধিক কমে। ফলে সকল রঙের আলোই এক মুখে প্রবেশ করে; কিন্তু প্রবেশের পর সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন মুখে চলিতে থাকে। প্রবেশ করে শাদা আলো; প্রবেশের পর শাদা আলো ভাঙ্গিয়া হরেক রঙের আলো হইয়া যায়। এই ব্যাপারের নাম 'বিশ্লেষণ'।

এক রকমের আলো আছে, তাহা কিছু নূতন ধরণের। টুর্মালীন নামক এক রকম স্বচ্ছ পাথর আছে; সূর্য্যের আলো, সেই টুর্মালীন যেরূপেই ধর না তার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত যাইবে। কিন্তু এই যে নূতন রকমের আলোকের কথা বলিতেছি, তাহা টুর্মালীন এক রকম করিয়া ধরিলে উহাকে ভেদ করিয়া যাইবে—কিন্তু টুর্মালীন খানা একটু ঘুরাইয়া ধরিলেই আর ভেদ করিয়া আসিতে পারিবে না। কতকটা এই রকম। একটা পয়সা কাত করিয়া দুইটা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া গলাইয়া দিলে অক্লেশে চলিয়া যায়; কিন্তু পয়সাটা চিত করিয়া ফেলিতে গেলে আর সেই ফাঁক দিয়া যাইতে পারে না। কিংবা মনে কর; এক গাছা লাঠি জানালার গরাদের ভিতর দিয়া লম্বালম্বি অর্থাৎ গরাদের সহিত সমান্তরাল করিয়া চালাইতে পারা যায়; কিন্তু আড়াআড়ি অর্থাৎ গরাদের সঙ্গে লম্বভাবে পার করিতে পারা যায় না। টুর্মালীন খানা যেন গরাদেওয়ালা জানালা; এবং এই আলোক যেন সেই লাঠি। আগে বলিয়াছি তরঙ্গের মধ্যে অণুগুলি কাঁপে বা নাচে। এই কম্পনটা বা নাচটা লম্বালম্বি হইতে পারে বা আড়াআড়ি হইতে পারে। টুর্মালীনের ভিতর যেন অদৃশ্যভাবে গরাদে সাজান আছে; আকাশ তরঙ্গের অভ্যন্তরের নৃত্য তাহার সমান্তরাল হইলে অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইবে; কিন্তু আড়াআড়ি হইলে আর চলিতে পারিবে না। এই নূতন ধরণের আলোকের সঙ্গে আমাদের সাধারণ সূর্য্যের আলোকের তফাত এই যে, ইহার মধ্যে কম্পন সকল সময়েই এক বাঁধা মুখে ঘটে; আর সাধারণ আলোকের কম্পনের কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধা মুখ নাই; সকল মুখেই সকল সময়ে কম্পন ঘটে। সূর্য্যের আলোক একখানা টুর্মালীনের ভিতর প্রবেশ করাইলে তাহার কতকটা বাহির হইয়া যায়; সেটা এই নূতন ধরণের আলোকে পরিণত হয়; আর কতকটা যাইতে পারে না; আট্‌কা পড়ে; তাহার কম্পন আড়াআড়ি ছিল বলিয়া। আলোকের এই নূতন ধর্ম্মপ্রাপ্তিকে "ধ্রুবতাপাদন" বলিব। ধ্রুব শব্দের অর্থ স্থির; এখানে কম্পনগুলি একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট মুখে ঘটিতেছে; আলোকটারও এক হিসাবে ধ্রুবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

উপরে বলিয়াছি আলোক নানা রকমের আছে; কোনটার তরঙ্গগুলি একটু লম্বা, কোনটার তরঙ্গ একটু খাটো; এই কারণে কোনটায় লাল রঙ, কোনটায় নীল রঙ জন্মে। কিন্তু লাল রঙের আলোর চেয়েও লম্বা ঢেউ ও নীল রঙের আলোর চেয়েও খাট ঢেউ আকাশে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই আলো আমাদের চোখে ধরা যায় না; সে আলোর কোন রঙই নাই। বরং সেই আলোককে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ে ধরিতে পারে; এবং থার্ম্মোমিটার যন্ত্রে ধরিতে পারে। চোখে যে সকল ক্ষুদ্র ঢেউ ধরা পড়ে না, একখানা কাগজের গায়ে খানিকটা কষ্টিক ও নুন মাখাইলে সেই প্রলেপে তাহারা ধরা পড়ে। গরম জিনিষ, যে জিনিষ গরম অথচ দীপ্তিমান্ নহে, আঁধার ঘরে রাখিলে চোখে দেখা যায় না, সেই গরম জিনিষ হইতে তাপ বাহির হইয়া দূরে যায়; জিনিষটা খুব গরম হইলে দূরে হইতেও গায়ে আঁচ লাগে। এই যে তাপ বিকীর্ণ হইয়া আসে ইহা বস্তুতঃ তাপ

নহে, ইহাও দৃষ্টির অগোচর আলো, লাল রঙের আলোকের ঢেউ চেয়ে লম্বা লম্বা ঢেউ। বস্তুতঃ আকাশমধ্যে নানা ধরণের ছোট বড় ঢেউ চলে; কতক চোখে ধরা যায়, কতক চোখে ধরা যায় না।

এই যে ছোট বড় আকাশতরঙ্গ ইহাদের এক একটা ঢেউ কত বড় লম্বা? আলোর তরঙ্গের বেগ কত, আগে বলিয়াছি। সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ। কিন্তু দৈর্ঘ্যের হিসাব করিতে হইলে আর ক্রোশের মাপকাঠি চলিবে না। গজেও চলিবে না, ইঞ্চিতেও চলিবে না; এক ইঞ্চিকে দশ লক্ষ ভাগ করিয়া মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হইবে। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মাপকাঠি অণুবীক্ষণেরও অগোচর। লাল আলোর ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য এই কাঠির ত্রিশ কাঠি; আর নীল আলোর ঢেউ এক একটার দৈর্ঘ্য সেই কাঠির ষোল কাঠি মাত্র। ষোলর চেয়েও ছোট ঢেউ আছে বটে; আবার ত্রিশের চেয়েও বড় ঢেউ আছে বটে; কিন্তু উভয়েই চক্ষুর অগোচর।

এই সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঢেউ আকাশ মধ্যে নিরন্তর সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে প্রবাহিত হইয়া আমাদের এই বিশ্বজগতের নানা বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে; কোটি কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের ও নীহারিকার সংবাদ আনিয়া দিতেছে; ও নানা প্রকারে মনুষ্যের জীবন রক্ষার কাজেও নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই আকাশেই যে দুই ইঞ্চি দশ ইঞ্চি লম্বা, দুই হাত দশ হাত লম্বা, সাধারণ আলোক তরঙ্গের তুলনায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উৎপন্ন হইতে পারে, ও সেই সকল ঢেউ সকল বিষয়েই সাধারণ আলোকের ঢেউয়ের মত, কেবল আকারে ও দৈর্ঘ্যেই বৃহৎ মাত্র, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই। অধিক দিনের কথা নহে, বার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এইরূপ প্রকাণ্ড আকাশতরঙ্গ মনুষ্য মাত্রেরই অপ্রত্যক্ষ ছিল।

অপ্রত্যক্ষ ছিল বটে, কিন্তু অকল্পিত ছিল না। বিংশ বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন, তিনি মানসনয়নে এই বিশাল আকাশোর্ম্মিগুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যের অপেক্ষা তাচ্ছীল্য করিয়া কেবল অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রভাবে জাগতিক রহস্যের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইঁহার নাম ক্লার্ক ম্যাক্সবেল। আইজাক নিউটনের পর এত বড় নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে অধিক নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

তিনি দেখাইয়াছিলেন, অথবা মানসনেত্রে দেখিয়াছিলেন, দুইটা বোতামের মধ্যে বা দুই খানা ধাতুপাত্রের মধ্যে একটা তাড়িত স্ফুলিঙ্গ চলিলেই চতুর্দ্দিকের আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিতে পারে, এবং সেই কম্পন চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ উত্থাপন করিয়া লক্ষ ক্রোশ বেগে দিগন্তাভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। এবং আশ্চর্য্য এই যে এই বৃহদাকার ঢেউগুলি দৈর্ঘ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই আমাদের চিরপরিচিত সাধারণ আলোকের সমানধর্ম্মবিশিষ্ট।

কিন্তু কি দর্শনেন্দ্রিয় কি ত্বগিন্দ্রিয় কোন ইন্দ্রিয়ই এই বিশাল ঊর্ম্মিগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্য চক্ষুঃসত্ত্বে এখানে অন্ধ।

ইংরাজী ১৮৮৭ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বে বার্লিন সহরে মহামহোপাধ্যায় হেলমহোল্‌ৎজের জনৈক তরুণবয়স্ক শিষ্য মনুষ্যজাতির এই অন্ধতা বিমোচন করিয়া দিলেন। তাঁহার যশঃধ্বনিতে বৈজ্ঞানিক জগৎ প্রতিধ্বনিত হইল। এই তরুণ যুবক এখন পরলোকগত; ইঁহার নাম হার্ৎজ্।

হার্ৎজ সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে দেখাইলেন এই তাড়িতস্পন্দনোদ্ভূত আকাশ তরঙ্গ ধাতুময় প্রাচীর হইতে 'পরাগ্‌বর্ত্তিত' হইয়া প্রতিফলিত হইয়া আসে; সান্দ্র পদার্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত' হয়, তরঙ্গে তরঙ্গে মিশিয়া উভয় তরঙ্গই বিলোপ প্রাপ্ত হয়; অথবা বর্দ্ধিত-বিক্রম হয়। অর্গান যন্ত্রের গভীর মন্দ্রধ্বনি যেমন দূরস্থ ধাতুতন্ত্রীতে আঘাত করিয়া উহাতে ঝঙ্কার উৎপন্ন করে, সেইরূপ তাড়িতযন্ত্রে উৎপন্ন এই সকল আকাশ-তরঙ্গ সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে প্রবাহিত হইয়া দূরস্থ তাড়িত-যন্ত্রে স্পন্দন উৎপাদন করে।

এই নূতন আবিষ্ক্রিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে হর্ষ-কোলাহল উৎপন্ন করিল। দেশে বিদেশে বৈজ্ঞানিকেরা হার্ৎজের পন্থাবলম্বী হইয়া তাড়িত স্পন্দন সাহায্যে সুবৃহৎ আকাশ তরঙ্গ উৎপাদনের ও আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কারের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হৃৎপিণ্ডের বেগে স্পন্দন আরম্ভ হইলে শিরাযোগে

ও ধমনীযোগে শরীরের সর্ব্বত্র সেই স্পন্দন সঞ্চালিত হয়। সমগ্র মানবদেহে রক্তধারা খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকসমাজশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়ব মধ্যে খরতর প্রবাহে রক্ত সঞ্চারিত হইয়া সেই স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল। কেবল এই ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত সমাজে সেই হৃৎস্পন্দন অনুভূত হয় নাই; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতসমাজ তখন পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকসমাজের অঙ্গীভূত ছিল না।

ধিক্কৃত, অবমানিত, ভারতবাসী স্বপ্ন দেখিতে পারে, ভাবুকতা ফলাইতে পারে, বাক্‌পটুতা দেখাইতে পারে; তাহার মস্তিষ্কবিজ্ঞানফলপ্রসববিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অনুর্ব্বর—তাহা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছিল। এবং সিমলাশিখরে ও দার্জ্জিলিংশিখরে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারিগণ ভারতবাসীর নির্ব্বুদ্ধিতার ও তাহার মস্তিষ্কের নিষ্ফলতার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া অধীন কৃষ্ণকায় কর্ম্মচারিগণের ভিক্ষালব্ধ রুটীর টুকরা কমাইবার জন্য পরামর্শ আঁটিতেছিলেন। ভারতবাসীর অক্ষমতার আলোচনা শ্বেতাঙ্গগণের সম্মিলনীতে ডিনারের পক্ষে হজমির কাজ করিতেছিল।

একদিন প্রাতে উঠিয়া সহসা সংবাদপত্রে দেখা গেল সুদূর সাগরপারে বৃটিশ এসোসিয়েসনের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে একজন হিন্দু যুবক আপনার প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত যন্ত্রসাহায্যে তাড়িতস্পন্দনোৎপন্ন আকাশতরঙ্গের গতিবিধি বিস্ময়াকুলিত দর্শকবৃন্দের প্রত্যক্ষগোচর করিতেছেন এবং জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠ লর্ড কেলবিনের সোল্লাস ঔৎসুক্যপূর্ণ তীব্র নয়নদ্বয়ের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ পূতসলিলা স্বর্গঙ্গার ধারার ন্যায় তাঁহার শ্যামাঙ্গের বর্ণকলঙ্ক ধৌত করিতেছে।

আশা করি ও প্রার্থনা করি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে জাতীয় জীবনের যদি কখনও নূতন অভ্যুদয় ঘটে, তাহা হইলে ঐ দিন শুভদিন বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

উপযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাবে আমরা বড় বড় আকাশতরঙ্গ প্রত্যক্ষসীমায় আনিতে পারি না; তবে উপযুক্ত যন্ত্রযোগে সেই তরঙ্গগুলির ফল প্রত্যক্ষগোচর করা যাইতে পারে। এইরূপ উপযুক্ত যন্ত্রের উদ্ভাবনাই এতদিন সমস্যা ছিল। হার্ৎজ প্রথমে এই উদ্ভাবনায় কৃতকার্য্য হয়েন। তাহার পর কেহ কেহ দেখিতে পান ধাতুচূর্ণের উপর তাড়িততরঙ্গ পতিত হইলে ঐ ধাতুচূর্ণের তাড়িত প্রবাহ পরিচালন ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। একটা নলে কতকগুলি লৌহচূর্ণ পূরিয়া তাহার মধ্য দিয়া তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত কর। ঐ তাড়িত প্রবাহ চুম্বকের কাঁটাকে তাহার স্বাভাবিক স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত করিবে। এমন সময় ঐ ধাতুচূর্ণে দুর হইতে তাড়িততরঙ্গ ফেলাইলেই চূর্ণের পরিচালন ক্ষমতা সহসা বৃদ্ধি পায়; তাড়িতের প্রবাহ সহসা বলবত্তর হইয়া উঠে; চুম্বকের কাঁটা সহসা আরও খানিকটা সরিয়া যায়। এইরূপ যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িততরঙ্গের অস্তিত্ব কেহ কেহ দেখাইতেছিলেন। কিন্তু সেই সকল যন্ত্র নিতান্ত স্থূল; কখন কাজ করিত, কখন করিত না। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে ধাতুচূর্ণের স্থলে কতিপয় স্প্রিংএর টুকরা সাজান ছিল। এই টুকরাগুলির উপরে আকাশ তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তাহাদের পরিচালন শক্তি বাড়িয়া উঠিত; তাড়িতপ্রবাহ তৎক্ষণাৎ প্রবল হইত, চুম্বকের কাঁটা তখনি সরিয়া যাইত।

যন্ত্রটি আকারে ক্ষুদ্র, ইহার নির্ম্মাণে কোন জটিলতা নাই; কিন্তু ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। আকাশ তরঙ্গের উৎপাদনে ও অস্তিত্ব প্রতিপাদনে ইহা অব্যর্থ। ঢেউগুলি দুর হইতে মাটির দেওয়াল ভেদ করিয়া চলিয়া আসে, মনুষ্য দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে; যথানিয়মে যন্ত্রের উপর পতিত হইয়া চুম্বকের কাঁটা ঠেলিয়া দেয়। ইতঃপূর্ব্বে উদ্ভাবিত সকল যন্ত্র ইহার নিকট পরাজিত।

হার্ৎজ সাহেবের ঢেউগুলি গজকাঠিতে মাপিতে হইত; এই নূতন যন্ত্রে ইঞ্চির ভগ্নাংশ হিসাবে যাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে হয়, ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিগুলিও অবলীলাক্রমে ধরা পড়ে। অদৃশ্য আলোকরশ্মির 'পরাগ্‌বর্ত্তন' 'তির্য্যগ্‌বর্ত্তন', এমন কি 'ধ্রুবতাপাদন' পর্য্যন্ত অক্লেশে সহস্র লোকের প্রত্যক্ষ করান যায়। অদৃশ্য আলোক-রাশ্মির পক্ষে এই যন্ত্র অভিনব চক্ষুর স্বরূপ। এই অভিনব চক্ষুর সাহায্যে অদৃশ্য আলোকের গতিবিধির অনায়াসে পর্য্যবেক্ষণ চলে। আকাশবাহী চর্ম্মচক্ষুর অগোচর তাড়িত রশ্মির রেখাগুলি কোথায় কেন্ রাস্তায় চলিতেছে, কোথায় মুখ ফিরাইতেছে,

কোথায় ধাক্কা খাইয়া প্রতিফলিত হইতেছে, অক্লেশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে যেন বলিয়া দেয়। আকাশ তরঙ্গের 'ধ্রুবতাপাদনের'জন্য হার্ৎজ মোটা মোটা তার সারি সারি সাজাইয়া 'গরাদেযুক্ত জানালা' বা তাড়িতের টুর্ম্মালীন তৈয়ার করিতেন। এখন আর সেরূপ আড়ম্বরের কোন দরকার নাই। একখানা বহি বা এক দিস্তা কাগজ বা এক গোছা চুলের বা একগোছা পাটের সাহায্যেই এই ধ্রুবতাপাদন সম্পাদিত হয়। একখানা কাঠের মধ্যে আঁশগুলি কোন্ দিকে লম্বালম্বি সাজান আছে, তাড়িত তরঙ্গ তাহা খুঁজিয়া ঠিক করিয়া লয়। বিবিধ শিলাখণ্ডের ভিতরে কোন্ রাস্তায় কিরূপে যাইতে হইবে, তাহা তাড়িততরঙ্গ আপনা আপনি ঠিক্ করিয়া লয়। কোন্ পদার্থের অভ্যন্তরে তাড়িত তরঙ্গের বেগ কতটা কমিয়া যায়, তাহাও অক্লেশে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আকাশরূপী সূক্ষ্ম পদার্থ সাধারণ জড়পদার্থের অভ্যন্তরে ও তাহার আশে পাশে কিরূপ বিকৃত অবস্থায় থাকে, তাহা এই যন্ত্রদ্বারা বুঝিবার সাহায্য হয়। জড়পদার্থের অভ্যন্তরে পরমাণুগুলি কিরূপে সাজান রহিয়াছে, তাহাও প্রতিপন্ন করিবার কতকটা উপায় হয়।

এই সকল তত্ত্ব সহজ কথায় বুঝান চলে না। স্থূলতঃ একটা কথা বলিয়া রাখিতে পারি। জড়পদার্থের গঠনপ্রণালী কিরূপ, ইহার নির্দ্ধারণ পদার্থবিদ্যার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আশী বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বব্যাপী আকাশ নামক পদার্থের কল্পনা কয়েক জনমাত্র বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মাথায় ছিল। সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলী এই আকাশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। প্রাচীন দার্শনিকগণ ও কবিগণ এইরূপ একটা পদার্থের কল্পনা করিয়া মাঝে মাঝে আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন মাত্র। আজকাল আকাশের অস্তিত্বে আর কেহই সন্দেহ করে না। ঘটী, বাটী, কাঠ, পাতর প্রভৃতির অস্তিত্বে আমার যতটা বিশ্বাস ও যেরূপ বিশ্বাস, আকাশের অস্তিত্বেও ততটা ও সেইরূপ বিশ্বাস স্থাপনে দ্বিধা করিবার কোনই কারণ সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই। এই আকাশই বিশ্ব-ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্তের সহিত অন্য প্রান্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। আকাশে ছোট ছোট ঢেউ উঠিলে তাহার ফলে আলোক জন্মে; আকাশে টান পড়িলে তাড়িতশক্তির আবির্ভাব হয়; আকাশে ছোট ছোট আবর্ত্ত বা ঘূর্ণী উপস্থিত হইলে চুম্বক-শক্তির বিকাশ হয়। সম্ভবতঃ এই আকাশযোগেই কোনরূপে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়াও প্রকাশিত হইয়া থাকে। মধ্যে আকাশের ব্যবধান না থাকিলে চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণবদ্ধ থাকিত কি না সন্দেহের বিষয়। পৃথিবী সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিত কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু আমাদের পরিচিত ঘটী, বাটী, কাঁসা, পিতল, কাঠ, পাতর এই সকল জড়পদার্থের সহিত আকাশের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র নানা উপায়ে এই সম্বন্ধ নিরূপণে ব্যগ্র রহিয়াছে। সাধারণ জড়দ্রব্য সকল যে সপ্ততি সংখ্যক মূল পরমাণুর সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই মূলপরমাণু সকলের পরস্পর মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা লইয়া বহুদিন হইতেই আলোচনা চলিতেছে। গভীর অন্ধকার মধ্যে এখানে ওখানে এক আধটু ক্ষীণ আলোকের সঞ্চার যেন আজকাল দেখা যাইতেছে। হয় ত একই উপাদানে, একই মশলায়, এই সত্তর রকম মূল পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই মশলা হয় ত তাড়িত কিছুই নহে, এই আলোকবাহী বিশ্বব্যাপী আকাশ মাত্র; আকাশই হয়ত কোনরূপে বিকৃত হইয়া সাধারণ জড়পদার্থে পরিণত হইয়া থাকিবে। আকাশেই কোনরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব গতি উৎপন্ন হইয়া জড়পরমাণু গঠিত হইয়া থাকিবে। জড়ের সহিত আকাশের সম্বন্ধনিরূপণ এই জন্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একটা প্রধান সমস্যা। বর্ত্তমান কালে ইহাকেই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়। পৃথিবীর মহা মহা পণ্ডিতগণের ধীশক্তি ও উদ্ভাবনশক্তি এই সমস্যার উত্তর দান করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিৎ মেন্দেলযেফ্ মূল পদার্থগুলির মধ্যে যে অভিনব সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন, তাহাতে রসায়ন বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সম্প্রতি বিবিধ মূল পদার্থের উপর তাড়িততরঙ্গের ক্রিয়ার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত আছেন। সেই পর্য্যালোচনার ফলে মেন্দেলযেফের আবিষ্কৃত তথ্য অচিন্তিতপূর্ব্ব সমর্থন লাভ করিবে বোধ হইতেছে। আমাদের বঙ্গদেশে আমাদেরই একজন স্বদেশীয় সহস্র বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া এতটা অগ্রসর হইয়াছেন—বৈদেশিক পণ্ডিতেরাও সর্ব্বত্র যেখানে যতদূর

অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন নাই, সেখানেও ততটা অগ্রসর হইতে সাহস পাইয়াছেন, ইহা মনে করিয়াও যদি আমাদের পুলকাবির্ভাব না ঘটে, তাহা হইলে আমাদের মত গম্ভীর-বেদী স্থূলচর্ম্মীর তুলনা আবিষ্কার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

শৈশব-লীলা।

পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণের আহার, বিহার, চেষ্টা ও বুদ্ধির আলোচনা করিয়া অনেকে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু এই আনন্দলাভটুকু সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। উপযুক্ত অবসর, সুযোগ ও ইচ্ছার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে, শিশুতত্ত্বের আলোচনা সম্বন্ধে কাহারও অবসর ও সুযোগের অভাব হয় না। পশুপক্ষীর তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা শিশু-তত্ত্বের আলোচনা যে কম আমোদজনক, তাহা কেহ যেন মনে না করেন। বরঞ্চ, এই আলোচনায় আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং উপকার লাভেরও সম্ভাবনা আছে। প্রায় সকল সভ্য-সমাজের কবি, ঔপন্যাসিক, লেখক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রভৃতি মহাশয়েরা মানবের বিশাল মনোরাজ্যের দিঙ্‌নির্ণয় ও সীমা নির্দ্দেশ করিতে এবং ঐ রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের মিলন, বিরোধ ও সংঘর্ষজনিত বিচিত্র লীলানিচয়ের যথাযথ চিত্র উপস্থিত করিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু শিশুর মন অবিকশিত বা অপরিণত বলিয়াই হউক, কিম্বা আর যে কারণেই হউক, অনেকে তাহাতে দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য বড় একটা কিছু দেখিতে পান না; সুতরাং শিশুতত্ত্ব এক প্রকার অনালোচিত আছে বলিলেই হয়। কিন্তু যে Child is father of the Man এবং যাহার মানস-কুসুমকোরক একদিন বিকশিত হইয়া তাহার মধুর, তীব্র বা বিকট গন্ধ দ্বারা লোক সমাজের নাসারন্ধ্রস্থিত স্নায়ুমণ্ডলীর নানারূপ সঙ্কোচ বিকোচ উপস্থিত করিবে, সেই চাইল্ড্‌কে উপেক্ষা করা বা তাহার মানসিক বিকাশের কারণ পরম্পরা অনালোচিত রাখা যে অগৌরব এবং একান্ত ক্ষোভেরও বিষয় বটে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মানব শিশুতত্ত্বের আলোচনা একদিনে বা একব্যক্তি দ্বারা কদাচই সম্পন্ন হইতে পারে না। মানব চরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও নানামুখী ও বিচিত্র গতি। নানাদিক্ হইতে না দেখিলে, শিশুচরিত্রের সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ অনেকটা সুসদৃশ চিত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সকলের সমবেত চেষ্টা হইলে, কালক্রমে শিশুচরিত্রের একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সঙ্কলিত হইলেও হইতে পারে।

শিশুগণের ক্রীড়া কৌতুক, আচরণ ব্যবহারাদির আলোচনা করিলে বিলক্ষণ আমোদিত হইতে হয়। শিশুদিগের স্ব স্ব জাতিজ্ঞান বোধ হয় স্বাভাবিক। কত বয়ঃক্রমে এই জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যেহেতু, ইহা অনেকটা শিক্ষা, সংসর্গ ও চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী দৃষ্টান্ত নিচয়ের উপর নির্ভর করে। একটী দেড় বৎসর বয়স্কা শিশু বালিকাকে ঘোমটা দিয়া বৌ সাজিয়া কাপড় পরিবার পক্ষপাতিনী দেখিয়াছি। বৌ সাজিতে তাহার এতই অনুরাগ যে, সম্মুখে গামোছা, তোয়ালে বা এক টুক্‌রা কাপড় পাইলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহা মস্তকে তুলিয়া ঘোমটা টানিয়া থাকে। এ দিকে সর্ব্বাঙ্গ নগ্ন, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই; তাহার মাথাটি ঘোমটা দ্বারা আবৃত হইলেই হইল। বাঙ্গালী গৃহের ভবিষ্যৎ বৌরূপিনী, অস্ফুটভাষিণী, নগ্ননিম্নাঙ্গী এই শিশুবালিকার ঘোমটা দিবার প্রবৃত্তিটি হয়ত তাহার জননী বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা আদরচ্ছলে জাগাইয়া দিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহা হইলেও, সে যে তাহার ক্রীড়ার সঙ্গী সমবয়স্ক শিশু বালকদের ন্যায় বেশভূষা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, ইহাই বিচিত্র। পূর্ব্বোক্তা বালিকা কখনও সৃষ্টিছাড়া হিন্দুকুলবধূরূপে এবং কখনও বা তাহার জনকের জননীরূপে তাহার বাল্যাভিনয়-মঞ্চে অবতীর্ণ হয়! বালিকার পিতা তাহাকে একবার "মা" বলিয়া ডাকিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার উদরের কিম্বা বক্ষের যে কোন দুই স্থানে দুই হস্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ কোমল চর্ম্ম টানিয়া দুইটী স্তনের সৃষ্টি করে এবং তাহার বৃদ্ধ সন্তানটিকে স্তন্যপানের নিমিত্ত "খা" "খা" বলিয়া বারম্বার অনুরোধ করে। ইহা প্রকৃত "মা"য়েরই কার্য্য বটে! ক্রীড়ার সময়েও সে বল্ অপেক্ষা পুঁতুলের এবং ছুরী অপেক্ষা বঁটির পক্ষপাতিনী হয়। জননীর যতগুলি অলঙ্কার আছে, একবার সমস্তগুলি তাহাকে না পরিতে দিলে, পাড়ার লোকের গৃহে ভিক্ষানো ভার হইয়া

উঠে! এই শিশুবালিকাটির আর একটি বিচিত্র ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময় চমৎকৃত হইয়াছি। ইহার অগ্রজ ভ্রাতার বয়ঃক্রম চারি বৎসর। কিন্তু তাহার যে সংযম নাই, বালিকাটির তাহা আছে। গৃহমধ্যে পিতার জন্য কোনও খাবার সামগ্রী সজ্জিত হইয়া থাকিলে, বালক পিতার অপেক্ষা না করিয়া তাহার দুই চারিটি উদরস্থ করিয়া ফেলে; কিন্তু "খুকুমণি" কখনও তাহা করে না। বিড়াল তাড়াইবার জন্য খুকুমণি অনেক সময় প্রহরণায় নিযুক্ত থাকে এবং পিতা স্বহস্তে তাহাকে কোনও দ্রব্য তুলিয়া না দিলে, সে তাহা চাহিবেও না, লইবেও না। প্রৌঢ়া বঙ্গ-ললনার সংযম ও ত্যাগ স্বীকারের ছায়া কি এই বালিকার মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে না?

এই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া আমার মনে হয়, স্ব স্ব জাতিজ্ঞান শিশুদের স্বাভাবিক। বালক বালিকাদের ন্যায় বস্ত্র পরিধান বা অলঙ্কার ধারণ করিতে ক্বচিৎ আগ্রহান্বিত হয়। সে বালিকাদের ন্যায় ক্রীড়াঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ক্বচিৎ রন্ধনাদির অভিনয় করে। সে "বাবার মত" কাপড় ও পোষাক ব্যবহার করিতে ভালবাসে; বাবার কাছে বহির্গৃহে থাকিতে ইচ্ছুক হয়; বাবার মত বই পড়িতে চাহে; বাবার মত গাড়ী ঘোড়া চড়িতে আকাঙ্ক্ষা করে এবং পুরুষোচিত ক্রীড়া ও কার্য্যাদির পক্ষপাতী হয়। বালক এইরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা স্বজাতি-জ্ঞানের অস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

সচরাচর দেখা যায়, এই জাতিপার্থক্যজ্ঞান শিশুদের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। স্থল-বিশেষে ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও, তাহা এত বিরল যে গণনার মধ্যে আইসে না।

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক হোল্‌মস্ সাহেব (Holmes) তাঁহার Autocrat of the Break-fast Table নামক গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন যে, সমগ্র মানবজীবনকে যেরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে বিভক্ত করা যায়, জীবনের এক একটী অংশকেও তদ্রূপ তিন তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার মতে বাল্যকালের আবার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে। এইরূপ যৌবন এবং বার্দ্ধক্যেরও যথাক্রমে বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য আছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে প্রভূত সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুদের জাতিপার্থক্যজ্ঞান তাদৃশ পরিস্ফুট থাকে না। স্ব স্ব জাতির প্রতি তাহাদের একটু স্বাভাবিক "টান" অনিবার্য্য থাকে বটে; কিন্তু প্রায়শঃ দেখা যায়, এই বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকারা অবাধে, অসঙ্কোচে ও নির্ব্বিকারচিত্তে পরস্পরের সহিত ক্রীড়াদিতে মিলিত হইয়া থাকে। ইহাকেই বাল্যকালের বাল্যকাল বলা যাইতে পারে। শিশুরা এই সময়ে যেরূপ সরল, পবিত্র ও সুন্দর আচরণ করে, তাহা দেবতারও বাঞ্ছিত। হিন্দু মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা এইরূপ অবস্থা লাভের নিমিত্তই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং মহাত্মা ঈশাও এই সরল, সুন্দর ও পবিত্র অবস্থার কথা মনে করিয়া নারীগণকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "এই শিশুগণকে আমার নিকটে আসিতে দেও; ইহাদেরই ন্যায় সরল, সুন্দর ও পবিত্রাত্মাগণকে লইয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত।"

এই অবস্থার পর, বাল্যকালের যৌবন আসে। এই সময়ে শিশুরা স্ব স্ব জাতিপার্থক্য অনেকটা বুঝিতে পারে এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়ে। এই সময়ে বালকবালিকাগণের অবাধ মিলনে কেমন একটু সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উভয়দলের একপ্রাণতা মধ্যে যেন একটা ব্যবধান আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এই সময় হইতেই পুরুষ ও নারীসমাজ মধ্যে একটী ক্ষীণ পার্থক্য-রেখার উৎপত্তি হইয়াছে। এই রেখাটিই কালক্রমে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট হইয়া, উভয় সমাজকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। উভয় দলের একপ্রাণতার মধ্যে একটী ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়াই যেন এই সময়ে উভয়দল পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী আবরণটি ভেদ করিতে উৎসুক হয়। এই ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিশোর-কিশোরীরা বাল্য-যৌবনে প্রকৃত যৌবনের অনেক লীলা-ভিনয় করিয়া থাকে। এ অভিনয়ে মান আছে, বিরহ-বিচ্ছেদ আছে, এবং মিলনও আছে? কৈশোর প্রেমের কথা অনেক মহাত্মা সমগ্র জীবনেও বিস্মৃত হইতে পারেন না এবং এই প্রেমের আকর্ষণে দুই একটী উজ্জ্বল রত্নও যে জীবনের গন্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ আবর্জ্জনারাশি মধ্যে বিলুপ্ত না হয়, তাহাও নহে।

সচরাচর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্যযৌবনের

সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সীমান্তবর্ত্তনী বাল্য লীলাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বাল্য-যৌবনের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের মধ্যে যদি কিঞ্চিৎও সত্য থাকে, তাহা হইলে এই সময়টিকে প্রকৃত যৌবনকালের ন্যায় কতকটা বিষম কাল বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, হিতাকাঙ্ক্ষী পিতামাতাদের এই সময়টিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বালকবালিকাদিগকে সুশিক্ষালাভে নিরত রাখিলেই তাহাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই সময় হইতেই অনেক বালক-বালিকা সঙ্গদোষে নানাপ্রকার কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনেক বালকবালিকা তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রতিভার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে না। কিন্তু ইদানীং সংবাদপত্রে দুই একটী অকালপক্ক বালকের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। জর্ম্মেণীতে একটী দুই বৎসরের শিশু লিখিতে পড়িতে পারে। শুকদেব গোস্বামীর মত মাতৃগর্ভ হইতে বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ না করিলে, দুই বৎসরের শিশু কিরূপে লিখিতে পড়িতে পারে, তাহা সহজে আমাদের বিশ্বাস হয় না। মার্কিন মুলুকে দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক একটী বারিষ্টার ও একটী ডাক্তার বালকের কথা পাঠ করিয়াছি। ডাক্তার বালকটি রোগাদি নির্ণয়ে এরূপ বিচক্ষণতা প্রকাশ করে যে, বড় বড় ডাক্তারেও তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়েন। সম্প্রতি ঐ দেশীয় ঐ বয়সের একটী Reader বালকের বিবরণ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এই বালকটিকে নবীন গ্রন্থকারদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিলেও চলে। এই বালকের পিতা, পিতামহের পুস্তক প্রকাশের একটী বৃহৎ কারবার আছে। কোনও নূতন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ইঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত বালকই তাহা প্রকাশযোগ্য কি না বলিয়া দেয়। তাহার অভিমত এরূপ সমীচীন যে, পুস্তক-প্রকাশকেরা কদাচ তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করেন না। কিন্তু এসব বালক সচরাচরের মধ্যে গণ্য নহে। ইহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

খুকুমণির ছড়া।

"উপরোধে ঢেঁকি গেলে" এই প্রবাদটি যে সত্য তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। আমি সমালোচনা করিতে একান্ত অপটু এবং সে বিষয়ে একান্ত বীতরাগ, কিন্তু কি করি, উপরোধে "ঢেঁকি গিলেতে" বসিয়াছি।

তথাপি সেই উপরোধের খাতিরে যদি মিথ্যা স্তব করিতে হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রবাদের অস্তিত্বসত্ত্বেও সমালোচনা করিতে আদৌ অস্বীকৃত হইতাম।

শাস্ত্রে আছে ;—

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম।
নানৃতঞ্চ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

আমার সৌভাগ্যের বিষয় যে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সমালোচনায় আমার 'সত্যমপ্রিয়ম্' অথবা 'প্রিয়মনৃতম্' বলিবার বড় দরকার হইবে না।

গ্রন্থখানির নাম 'খুকুমণির ছড়া'। ইহাতেই পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে গ্রন্থখানি, বঙ্গদেশে যে সকল ছেলে ভুলানো কবিতা বিক্ষিপ্ত আছে, তাহার সংগ্রহ। খুকুমণিকে ভুলাইবার জন্য বঙ্গভাষায় যেরূপ প্রচুর কবিতা রচিত হইয়াছে, সেরূপ অন্য কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহাতে বোধ করি বাঙ্গালীচরিত্রের স্বাভাবিক কোমলত্ব প্রকাশ পায়।

'খুকুমণির ছড়া' নামটিই মিষ্ট। খুকুমণির নামাশ্রিত কি না মিষ্ট?—খুকুমণির গোলাবসুন্দর অবয়ব, যাহা বক্ষে ধারণ করিলে বক্ষ শীতল হয়; খুকুমণির হাসিটুকু, যাহা দেখিবার জন্য খুকুমণির কত না খোসামোদ করি; খুকুমণির অর্দ্ধস্ফুট ভাষা, যাহা কবি বাইরণ সৃষ্টির একটি অতিমধুর জিনিষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; খুকুমণির অশিষ্ট উপদ্রব, যাহা হইলেও গোল, আবার না হইলেও চলে না;—'খুকুমণির' কি মিষ্ট নহে?

খুকুমণির কয়েকটি কার্য্যের মিষ্টত্ব সম্বন্ধে ভিন্নলোকের ভিন্নমত দেখা যায়। তাহার মধ্যে প্রধান খুকুমণির কান্না। সেই ক্রন্দন খুকুমণির ব্রহ্মাস্ত্র। পূর্ব্বতন যোদ্ধারা বিনা বিশেষ প্রয়োজনে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু খুকুমণির কথায় কথায় সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ। অনেক সময়ে তাহার একমাত্র ঔষধ এই ছড়া। তাই জননী কখন বা খোকনমণিকে অনুনয় করিতেছেন ;—

বুক জুড়ানো ধন,
আমার পদ্মলোচন!
কেঁদনারে সোণার যাদু,
থাম্ কিছুক্ষণ।
দুধ হয়েছে বলক তোলা,
মিছরি আছে হাটে ;
খাবে আমার সোণার যাদু—
যত পেটে আঁটে।

কখন বা প্রবোধ দিতেছেন,

কে বকেছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল
তাইতে খোকা রাগ করেছে, ভাত খায়নি কাল।

কখন বা ভয় প্রদর্শন করিতেছেন,

এক যে আছে একনড়ে
সে থাকে তাল গাছে চড়ে'
* * *
যে ছেলেটা কাঁদে
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে।

খোকনমণিকে বাধ্য করিবার উপায় (১) আদর (২) যুক্তি (৩) ভীতিপ্রদর্শন (৪) তাড়না ও (৫) প্রহার। বঙ্গীয় মাতা সাধারণতঃ প্রথমোক্ত তিনটি উপায়ই অবলম্বন করেন। তাহাতে কার্য্যোদ্ধার না হইলে, খুকুমণি একান্ত অবাধ্য ও অশিষ্ট হইলে, মাতা বিশেষ বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলে, তিনি অনন্যোপায় হইয়া খুকুমণিকে তাড়না ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, স্বকীয় মৃত্যুকামনা করেন ও খুকুমণির পিতার নামে অন্যায় ও অসঙ্গত দোষারোপ করেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ মানসিক অবস্থা যে বিকৃত অবস্থা সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জলদশ্যামা কিশলয় পেলব গজেন্দ্রগামিনী বঙ্গরমণীর উষ্ণভাব দেখি নাই, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সাধারণতঃ যে তিনি যেরূপ কোমলাঙ্গী সেইরূপ কোমলস্বভাবা, প্রেমময়ী ও স্নেহবতী, সে বিষয়ে আমি বহুতর প্রমাণ দিতে পারি এবং একাধিক নজীর উদ্ধৃত করিতে পারি।

অবাধ্য শিশুকে বাধ্য করা বড় সহজ কার্য্য নহে। খুকুমণি যখন বাঁকিয়া বসেন, তখন তাঁহাকে আয়ত্ত করা অনেক সহিষ্ণু পরিশ্রমের কাজ। তিনি যখন প্রতিকথায় সজোরে 'না' বলেন, তখন যিনি তাঁহাকে "হাঁ" বলাইতে পারেন, তিনি হয় পীর না হয় একজন আশ্চর্য্য মনুষ্য। "খোকনমণি ঘুমাবি?"—উত্তর 'না'। 'বেড়াইতে যাবি?'—'না'। 'হাসবি?'—'না'। 'কাঁদবি?—'না'। এরূপ সময়ে এই ছড়ার শরণাপন্ন হইতে হয়;

খোকনের দুধ খাইতে আপত্তি। মাতা বলিতেছেন—

খোকা বড় ভালো
আরো দুধ ঢালো।

খোকনের লেখাপড়ায় অমনোযোগ। মাতা বুঝাইতেছেন।—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই

অমনি খোকনমণির সমস্ত আপত্তি খণ্ডন। তাহাকে তাড়না কর সে কাঁদিবে, প্রহার কর, কাঁদিবে। কিন্তু এ সোহাগের কাছে সে অবিলম্বে পরাভূত হয় এবং তাহার উষ্ণ মেজাজ জল হইয়া যায়।

স্নেহের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! সভ্য ইয়ুরোপে হার্বার্ট স্পেন্সরের মত আশ্চর্য্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাহা অদ্য বুঝিতেছেন তাহা মাতার—অন্ততঃ বঙ্গীয় মাতার স্বতঃসিদ্ধ। অশায়েস্তা মেজাজকে কঠোর ব্যবহার দ্বারা খারাপ করা যায়, ভালো করা যায় না। তাহার দ্বারা তাহাকে বশ করা সম্ভব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বালপ্রকৃতির উত্তম মনোবৃত্তিসকল অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালী যে এত কোমলস্বভাব, এত স্নেহশীল, এত মধুরভাবাপন্ন তাহার মূলে এই অজস্র বিগলিত মাতৃস্নেহ।

খোকনকে হাসাইবার জন্য, খোকনকে খুসী করিবার জন্য, খোকনের মুখে কথা ফুটাইবার জন্য, মাতার কত উদ্যম; কত পরিশ্রম, কত আত্মোৎসর্গ। আবার খোকনের কচি অঙ্গের অঙ্গভঙ্গী দেখিবার জন্যই বা মাতার কত আগ্রহ।

তিনি কখনবা খোকনকে ভুলাইয়া হাঁটিতে শিক্ষা দিতেছেন—

হাঁটি হাঁটি পা পা
খোকা হাঁটে দেখে যা।

তিনি কখন বা খোকনকে 'তাই' দিতে শিখাইতেছেন—

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই।

কখন বা হাত ঘুরাইতে শিখাইতেছেন—

হাত ঘুরালে লাড়ু দেব
নৈলে লাড়ু কোথায় পাব।।

কখন বা তাহাকে দোলাইতেছেন—

দোল দোল দোল খাঁদা দোলে
তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলে

কখন বা তাহাকে নাচাইতেছেন—

সোণার নূপুর পায়
খোকা নেচে নেচে যায়।

অনেকগুলি ছড়া খুকুমণির অমিশ্রিত খোসামোদ। মাতা খুকুকে বিদায় দিবার সময় পোষাক পরাইতেছেন, আর তাহাকে সুরসংযোগে কহিতেছেন—

"খোকা যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে"

তিনি আবার খোকাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুধ ঢালিতে ঢালিতে গাহিতেছেন—

খোকা এল বেড়িয়ে
সোণার নূপুর হারিয়ে
* * *
দুধ দেও গো জুড়িয়ে

এই ছড়ার কতকগুলি আগাগোড়া মিথ্যা কথা। এমন কি সম্মানযোগ্য নারীজাতি কর্ত্তৃক তাহা উক্ত না হইলে তাহাকে গাঁজাখুরি বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। যথা—

"সোনার পটল ভেজে দেবো,
হীরের বেগুণ পোড়া।"

এরূপ অসম্ভব সুখের প্রত্যাশা খোকনমণিকে দেওয়া মাতার নিতান্ত অনুচিত কার্য্য।

"তাল গাছেতে হুসুর মুসুর
বাঁশ গাছেতে খানা
কাল কাসন্দার গাছে আছে
বাদসাহী বিছানা।"

ইহা এত হাস্যকররূপে অসম্ভব যে ইহার উপর কোন টীকা করিবার প্রয়োজন নাই।

"খোকা যাবে বিয়ে কর্ত্তে
হস্তী রাজার দেশে
তারা রূপার খাটে পা রেখে
সোণার খাটে বসে।"

এরূপ স্তোকবাক্য কি কেহ পূর্ব্বে শুনিয়াছেন?

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এলো বাণ
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো
তিন কন্যে দান।"

এ দস্তুর মত আষাঢ়ে গল্প!

কিন্তু খোকার ইহাতেই বিপুল আনন্দ। তাহার কি বিষবৃক্ষ ভাল লাগিবে? আরব্য উপন্যাস তদপেক্ষা তাহার বেশী ভাল লাগিবে। সে কি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের মর্ম্ম বুঝিতে পারে? হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন তাহা অপেক্ষা তাহার অনেক মিষ্ট লাগে। সম্ভব হইতে অসম্ভবে, সাধারণ হইতে অসাধারণে, তাহার আগ্রহ অধিক। জাতি অশিক্ষিত অবস্থায় যেরূপ নিরাকার ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারে না, শিশু সেইরূপ সূক্ষ্মমনোবৃত্তির গতি অনুসরণ করিতে পারে না। তাই এই সব অসম্ভব অনাসৃষ্টি ছড়ার সৃষ্টি।

অনেকগুলি ছড়া খোকনমণির চিত্ত বিনোদনার্থে গল্পের আকারে রচিত। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার কল্পিত ব্যক্তির উপন্যাস। যেমন—

তালগাছ কাটন বোসের বাটন গৌরী হেন ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি কর্ব্ব কি" ইত্যাদি।
"হচম বিবির খড়ম পায়" ইত্যাদি।

কতকগুলি ছড়া আবার খোকনমণির কল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনের আলেখ্য। তাহার মধ্যে প্রধান ব্যাপার খোকনমণির বিবাহ। তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বঙ্গীয় রমণী জীবনের মধ্যে একটি কার্য্যের খবর রাখেন। তাহা বিবাহ। তাঁহার খোকন যে ভবিষ্যতে কেশব সেন কি বঙ্কিম চাটুর্য্যে কি রমা বাই হইবে, এরূপ আশা জননীর মনে সাধারণতঃ উদিত হয় না। তাহার কিরূপ বিবাহ হইবে তাহাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"খোকা বাবু করবে বিয়ে
সোণার টোপর মাথায় দিয়ে"
"খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে
বাড়ীতে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে"

আর এক শ্রেণীর ছড়া ঘুমপাড়ানী গান।

ঘুমপাড়ানী গান পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে। খুকুমণির

নিদ্রায় একান্ত বিরাগ। যেন যতক্ষণ সে ঘুমাইয়া থাকে ততক্ষণ তাহার পক্ষে বৃথাই যায়। তাহার চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া না আসিলে সে ঘুমাইতে চাহে না! কোথায় সে গল্প শুনিবে, দৌরাত্ম্য করিবে, মাতার পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া মাতাকে দৌড়িতে হুকুম দিবে, চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিয়া পিতার কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে;—না,

সে কি ঘুমাইয়া এতখানি সময়টা অপব্যয় করিবে? খুকুমণির নিদ্রিত অবস্থা পাঠক পাঠিকারা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মুখে শান্তির ভাব নহে, বিশ্রামের ভাব নহে,—মুখে যেন পরাজয়ের ভাব। যেন সে মানুষটি নহে—নেহাৎ নিরীহ দুষ্টামি কাহারে বলে জানে না। যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে মাতার নিস্তার নাই। হয় গল্প বলিতে হইবে না হয় খেলা করিতে হইবে। এখন অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া খোকামণির সহিত ক্রীড়া করা বা কথোপকথন করা সকল সময়ে সব জননীর সুবিধা হইয়া উঠে না। তাই তন্দ্রালু অবস্থায়, নিমীলিত নেত্রে ফল্‌সেটোস্বরে চিমেতেতালায় জননীর গাইতে হয়—

"ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী ঘুম দিয়ে যেও।"

অমনি খুকুমণি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তেজ, নীরব, নিস্পন্দ। আমার মনে আছে আমার শৈশবে এই গানটি সুরসংযোগে অতীব করুণ লাগিত এবং গায়িকার প্রতি এত গভীর অনুকম্পার উদ্রেক হইত, যে আমি শুদ্ধকৃপাপরবশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

খোকা ঘুমাইলে বিশ্বজগৎ নিস্তব্ধ। সত্য সত্যই "খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো" এইরূপ প্রতীয়মান হয়। পিতা অব্যাহতি পান, মাতা অবসর পান, এবং 'ইতরে জনাঃ' নিষ্কৃতিলাভ করেন। তাই খুকুমণিকে ঘুমপাড়াইবার জন্য বিশ্বশুদ্ধ লোকের এত চেষ্টা ও এত ঘুমপাড়ানী গানের সৃষ্টি। তাই তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য কখন বা "বাটা-ভরে' পান" দিবার প্রলোভন দেখাইতে হয়, কখন বা "আয় রে পাখী আয়" বলিয়া কল্পিত বিহঙ্গের শরণাপন্ন হইতে হয়, কখন বা খোকনকে বর্গীর আগমনবার্ত্তা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিতে হয়।

এ গ্রন্থে কতকগুলি ছড়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর। সেগুলি অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত ছেলে পিলেদের খেলার বোল। যেমন—

এতল বেতল ইত্যাদি
ইক্‌ড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি ইত্যাদি—

বস্তুতঃ সংগ্রহকার যতদূর সাধ্য বঙ্গভাষায় বিকীর্ণ ছড়াগুলি একত্র করিয়াছেন। এত বৃহৎ সংগ্রহ পূর্ব্বে বোধ করি আর কেহ করেন নাই। আমি একটি ছড়াও জানি না যাহা এই গ্রন্থে নাই! কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখন শুনি নাই এরূপ বহু ছড়া ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। কতকগুলি ছড়া একটু বিভিন্নাকারে জানিতাম। বোধ করি উক্ত ছড়াগুলি বিকল্পে বিভিন্নস্থানে বিভিন্নাকারে প্রচলিত।

দুই এক স্থানে সংগ্রহকারের সহিত আমার মতের বৈষম্য আছে। তিনি দুই এক স্থানে এরূপ পাঠ আরোপ করিয়াছেন, যাহার সহজে অর্থবোধ হয় না। যেমন "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ" এটি আমার বিবেচনায় "নদেয় এল বাণ" এইরূপ হইবে। 'নদেয়'র অর্থ নবদ্বীপে। আর একস্থানে "সুবলকে নিয়ে যাব দিঙ্‌নগর দিয়ে" এটি "দীঘনগর" হইবে। দীঘনগর কৃষ্টনগর ও শান্তিপুরের মাঝামাঝি একটি গ্রাম। ইহাতে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটা দীর্ঘিকা থাকায় ইহার নাম দীঘনগর হইয়াছে। (ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিত দেখুন) দিঙ্‌নগর নামে কোন স্থানের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি অবগত নহি।

এই ছড়াগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বোধ হয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ইহাদের রচয়িত্রী রমণীজাতি। নবদ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি ছড়ার যে উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। "নদেয়" "দীঘনগর" "হরগৌড়ীর মাঠ" ইত্যাদির উল্লেখ তাহার এক প্রমাণ! দ্বিতীয় প্রমাণ সেই ছড়াগুলির পরিভাষা।

এই ছড়াগুলির রচনা সম্বন্ধে স্বীকার করিতে হয় যে এগুলিতে ভাষার পারিপাট্য নাই, ছন্দের মনোহারিত্ব নাই, কবিত্বের ছটা নাই! আর রচয়িত্রী হিসাবে তাহা আশা করা যায় না। এ ছড়াগুলি সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে কোন কোন ছড়ায় ভাবেরও সংলগ্নতা নাই। কিন্তু এই বিষয়োপযোগী এরূপ কবিতা বঙ্গভাষায় আর নাই! মাতৃস্নেহসিন্ধু মন্থন করিয়া এই সহজ সরল সুন্দর কবিতার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার জীবনের মিশ্রিত সুখ দুঃখের পাষাণ ভেদ করিয়া এই অমৃত উৎস উঠিয়াছে। ইহাদের তুলনা নাই।

পুস্তক খানির কাগজ ভালো, ছাপা সুন্দর, ছবিগুলি খাসা (১৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বোধ হয় ৮৮ পৃষ্ঠায় ছবি আছে), এবং ইহার বাঁধাই উত্তম। ইহার একটি গুরুতর দোষ ইহার বিচ্ছৃঙ্খল বিন্যাস এবং উদ্দেশ্যবিহীন সূচিপত্র। না গ্রন্থ হইতে না সূচিপত্র হইতে কোন ছড়া বাহির করিতে পারা যায়। আমার বিবেচনায় বিষয় অনুসারে পুস্তকখানি বিভাগ থাকা উচিত ছিল। যেরূপ ঘুমপাড়ানী গান, গল্প, খেলার ছড়া ইত্যাদি। সূচিপত্রে প্রতি ছড়ার বর্ণমালা অনুসারে প্রথম লাইনমাত্র দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি যোগীন্দ্র বাবু দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার যথাবিধি প্রতিকার করিবেন।

অপত্যবান পাঠক এবং অপত্যবতী পাঠিকা এ পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া পড়িয়া দেখিবেন যে ইহা অনেক গাঁজাখুরী গল্প, অনেক আত্মস্তব, এবং অনেক পরনিন্দাচর্চ্চা হইতে মিষ্ট।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

অষ্টেণ্ড কোম্পানী।

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে অষ্ট্রীয় নেদারলণ্ডবাসী কতিপয় বণিক পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করার উদ্দেশে দুইখানি জাহাজ ভারতবর্ষাভিমুখে প্রেরণ করেন। জাহাজ দুইখানি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া অন্যান্য বণিগগণ অষ্টেণ্ড নগরে * একটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন করার ইচ্ছা করিয়া ভিয়েনার রাজদরবারে অনুমতি প্রার্থনা করেন। উক্ত বণিগ্‌গণের আবেদন অনুসারে জর্ম্মান সম্রাট ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি দেন। † উক্ত বণিগ্‌গণকে অনুমতি প্রদানে বাধা দেওয়ার জন্য ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। জর্ম্মান সম্রাটের অনুমতিপত্রানুযায়ী উক্ত বণিকসম্প্রদায় "অষ্টেণ্ড কোম্পানী" নামে অভিহিত হয়। যে সময়ে অষ্টেণ্ড কোম্পানী সম্রাটের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে একখানি গুপ্ত জাহাজ ভাগীরথী-বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং চন্দননগরস্থ ফরাসীগণের সাহায্যে তাহা পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ ইউরোপ-যাত্রা করার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ অষ্টেণ্ড কোম্পানীর জন্য কুঠী নির্ম্মাণ করার ইচ্ছায় তদানীন্তন নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট ভূমি প্রার্থনা করেন। নবাব মুর্শিদকুলী আপন রাজ্য মধ্যে যাহাতে বাণিজ্য বিস্তার হয় তাহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণে এবং ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মতে, ইংরাজ বণিগ্‌গণের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার ইচ্ছায় * জর্ম্মান পোতাধ্যক্ষের আবেদন গ্রাহ্য করেন, এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে কলিকাতা হইতে ৭।৮ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ বাঁকিবাজার নামক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। † উক্ত স্থানের জন্য যথারীতি সনন্দও প্রদত্ত হয়।

অষ্টেণ্ড কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার প্রথম বৎসরে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে "এম্পারার চার্লস" নামক ত্রিংশৎ কামানবিশিষ্ট এক খানি অষ্টেণ্ড বাণিজ্যতরী বাঙ্গালায় উপস্থিত হয়, কিন্তু ভাগীরথীতে প্রবেশ করিতে না করিতে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত জাহাজের অধিকাংশ বোঝাই সামগ্রী কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারী ও নাবিকগণ বাঁকিবাজারে আশ্রয় লইয়া অস্থায়ীরূপে আপনাদিগের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর পর দুই বৎসর তিনখানি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর জাহাজ বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং বঙ্গদেশে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বাণিজ্যকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে থাকে। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা অল্প মূল্যে দ্রব্যাদির বিক্রয় করায় বঙ্গদেশে অল্প কালের মধ্যে তাঁহাদিগের কুঠীর নাম বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ কথিত আছে যে, তাঁহারা বনাত, মকমল, প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র চটের দরে বিক্রয় করিবেন বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম গোলাবৃষ্টি হওয়া মাত্র সেণ্টথেরেসা নামক ক্ষুদ্র অষ্টেণ্ড জাহাজখানি নিশান নামাইয়া দিলে, ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কলিকাতায় নীত হয়। কিন্তু বৃহৎ জাহাজখানি বাঁকিবাজার কুঠীর নিকট কামানের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করায় ইংরাজেরা উহা হস্তগত করার কোন প্রকার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর জাহাজখানি গোপনে পলায়ন করে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ওলন্দাজ ও ইংরাজগণ মিলিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে জর্ম্মান বাণিজ্য দূরীভূত করার ইচ্ছায় নবাবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। সেই সময়ে নবাব সুজাউদ্দীন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। * ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা হুগলীর ফৌজদারকে অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া, তাঁহা দ্বারা নবাবের নিকট এই মিথ্যা আবেদন প্রেরণ করেন যে, বাঁকিবাজারস্থ জর্ম্মান কুঠী অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত, সরকারী বন্দরের সন্নিকটে বৈদেশিকগণকে এরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মানে অনুমতি প্রদান করা কোনক্রমে কল্যাণকর নহে। ফৌজদারের এইরূপ আবেদনে জর্ম্মান বণিগ্‌গণের নামে কেল্লা ভূমিসাৎ করার এক পরওয়ানা ফৌজদারের নিকট আসিল। ফৌজদার উক্ত পরওয়ানা জর্ম্মান অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

ক্রমে ফৌজদার ও অধ্যক্ষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে ফৌজদার বাধ্য হইয়া মীরজাফর নামক তাঁহার নায়েব বা সহকারীকে তোপ লইয়া বাঁকিবাজার আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। মীরজাফর বাঁকিবাজারের কেল্লার সম্মুখস্থ ভূভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করেন। তিনি অবরুদ্ধ জর্ম্মানগণের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলে তাহারাও যথাসাধ্য তাহার প্রতিশোধ দিতে প্রবৃত্ত হয়। মীরজাফর আপন সৈন্যগণের রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। জর্ম্মানগণ সম্পূর্ণ রূপে ভাগীরথীর পথ বন্ধ করিয়া বসেন, কোন নৌকা বাঁকিবাজারের নিম্ন দিয়া গতায়াত করিতে পারে নাই। যাহাদিগকে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিতেন,

* অষ্টেণ্ড বেলজিয়ম দেশস্থ একটি সুরক্ষিত নগর ও উক্ত দেশের একটি প্রধান বন্দর।

† Modern universal History, vol. XI. p. 211.

* Stewarts History of Bengal. p. 423.

† 'তওয়ারিখ বাঙ্গালা' নামক গ্রন্থে জর্ম্মানদিগকে 'আনিমান' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, রিয়াজুসসলাতীনেও তাহাই আছে, তত্তয়ারিখের মতে আলিমানেরা ফরাসীদিগের মারফতে তেজারতি ও কারবার করিত, এবং তাহাদের সাহায্যে নবাব মুর্শিদকুলীকে নজরানা দিয়া বাঁকিবাজারে কুঠী নির্ম্মাণ করার সনন্দ প্রাপ্ত হয়।

করিতেন। * প্রথমতঃ উক্ত সম্প্রদায়ের বণিগ্‌গণ বাঁকিবাজারে বংশ, খড়, ও চেটাই নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন, পরে তাঁহারা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিয়া আপনাদিগের কুঠী প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টন করেন এবং তাহার প্রত্যেক কোণে বুরুজ স্থাপন ও গভীর পরিখা খনন করিয়া আপনাদিগের কুঠী সুদৃঢ় করিয়া তুলেন। † উক্ত পরিখা ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত ছিল, এবং তাহার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, এক মাস্তুল বিশিষ্ট পোত পণ্যদ্রব্য সহ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিত।

এই প্রকারে অষ্টেণ্ড কোম্পানী ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তিনটী ইউরোপীয় জাতি অর্থাৎ ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের তীব্র প্রতিবাদে জর্ম্মান সম্রাট অষ্টেণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে আপন অনুমতিপত্র প্রতিগ্রহণ করিতে বাধ্য হন, এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করেন যে, সাত বৎসরের জন্য তাঁহার অষ্ট্রীয় নেদারলণ্ডবাসী প্রজাবর্গের সহিত পূর্ব্ব ভারতের কোনরূপ বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারিবে না। এই নিষেধ আজ্ঞা বশতঃ কোম্পানীর কোন জাহাজ না আসিলেও কোন কোন জর্ম্মান বণিকের জাহাজ ভারতবর্ষে সচরাচর আগমন করিত। বঙ্গদেশের জর্ম্মান বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ কার্য্যদক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় তিনি ঐ সমস্ত জাহাজ পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেন। ‡

এই বাণিজ্য ব্যাপার গুপ্তভাবে পরিচালিত হইলেও ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে তাহা অন্তরালে অবস্থিতি করিতে পারে নাই। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিগ্‌গণ 'ফোর্ডউইচ' নামক রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন গস্‌ফ্রাইটের অধীন একদল নৌসেনা ভাগীরথীর পথাবরোধের জন্য প্রেরণ করেন। গস্‌ফ্রাইট যুদ্ধজাহাজ লইয়া অগ্রসর হইলে জানিতে পারিলেন যে, দুই খানি জর্ম্মান জাহাজ কলিকাতা ও বাঁকিবাজারের মধ্যে নঙ্গর করিয়া আছে। তিনি আপন অধীনস্থ দুইদল নৌসেনা প্রেরণ

* তওয়ারিখ বাঙ্গালা।

† তওয়ারিখ বাঙ্গালা, এবং Stewart's History of Bengal. p. 423.

‡ Stewarts History of Bengal p. 424.

* তওয়ারিখ বাঙ্গালা ও রিয়াজুস্ সালাতীনে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।

কেবল তাহারাই যাইতে সক্ষম হইত। চন্দননগরস্থ ফরাসীগণ গুপ্তভাবে গোলাগুলি, বারুদ ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ দ্বারা জর্ম্মানদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। * কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা দেখাইতেন।

ঐ সময়ে হুগলীতে অনেক মোগল সওদাগর বাস করিতেন। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যে ও সম্মানে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন ছিলেন না। খাজামহম্মদ ফাজেল কাশ্মিরী নামে একজন শ্রেষ্ঠ মোগল সওদাগর, ফৌজদার ও জর্ম্মান বণিকদিগের মধ্যে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মধ্যস্থতা করেন। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজামহম্মদ কামেলকে কতকগুলি সংবাদ লইয়া বাঁকিবাজারে যাওয়ার জন্য পাঠাইয়া দেন। কামেল যখন নৌকারোহণে বাঁকিবাজারে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফরাসীদিগের ইঙ্গিত অনুসারে † জর্ম্মানগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহারা উক্ত খাজাকে প্রতিভূস্বরূপ বন্দী করিয়া ছিলেন। সমস্ত মোগল, আরমানী ও ইউরোপীয় সওদাগরেরা তাঁহার উদ্ধারের জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেন। ফৌজদার মহম্মদ ফাজেলকে এরূপ শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার পুত্রের জন্য দুই তিন দিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। খাজা কামেল জর্ম্মানদিগকে টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারে অব্যাহতি পান। ‡ ফরাসীরা গুপ্তভাবে জর্ম্মানদিগকে যে সাহায্য করিতেছিলেন, ফৌজদার তাহা জানিতে পারিয়া, তাহা দিগকে শাসন করিয়া দেন, এবং তাহার পর ফরাসীরা জর্ম্মানদিগকে আর কোন প্রকার সাহায্য করিতে সাহসী হন নাই। §

মীরজাফর পুনর্ব্বার নূতন উৎসাহের সহিত জর্ম্মান-দিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার গোলা বৃষ্টিতে জর্ম্মানগণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। জল ও স্থল উভয় দিক্ দিয়া আক্রান্ত হওয়ায় জর্ম্মানগণের সমস্ত রসদ বন্ধ হইয়া যায়, তাহাদের সমস্ত দেশীয় লোকজন কুঠী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, এবং বাঁকিবাজারে খাদ্য দ্রব্যাদির অভাব হওয়ায় উক্ত স্থানের সমস্ত লোকই একে একে পলাইয়া যায়। কেবল কুঠীর জর্ম্মান অধ্যক্ষ তেরজন মাত্র ইউরোপীয়ের সহিত কুঠীতে অবস্থান করিয়া ফৌজদারের সৈন্যের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোলাবর্ষণে মীরজাফরের সৈন্যেরা কুঠীতে প্রবেশ করার অবকাশ পায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া এইরূপে উভয় পক্ষের গোলাবৃষ্টি চলিয়াছিল। অবশেষে মীরজা-ফরের শিবির হইতে সহসা একটি গোলা আসিয়া জর্ম্মান অধ্যক্ষের দক্ষিন হস্তে লাগায় তাঁহার বাহু ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পরিশেষে তিনি অনন্যোপায় হইয়া আপনার সহচর কয়েক জনের সহিত রাত্রিযোগে জাহাজে আরোহণ করিয়া, ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রাতঃকালে যখন মোগল সৈন্যেরা কুঠী মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহারা দেখিল যে, কতকগুলি তোপ ও গোলাগুলি মাত্র পড়িয়া আছে, কোন মূল্যবান্ দ্রব্যের চিহ্ন মাত্রও নাই। মীরজাফর কেল্লা ভূমিসাৎ করিয়া বাঁকিবাজার তাহার জমীদারের হস্তে দিয়া জয়োল্লাসে হুগলীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এইরূপে বঙ্গদেশ হইতে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বণিক্‌গণ বিতাড়িত হন, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা পরিত্যাগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। তওয়ারিখ বাঙ্গালা * ও রিয়াজুস সলাতীনে লিখিত আছে, যে, নবাব মুর্শিদ-কুলী জাফর খাঁর সময়ে আলিমানগণ বাঁকিবাজার হইতে পলায়ন করেন। অর্ম্মে সাহেবের মতে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বণিগ্‌-গণ তাঁহার কর্ত্তৃত্বে অবজ্ঞা করায় নবাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভাগীরথী নদী হইতে বিদূরিত হন। † ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে যে নবাব সুজাউদ্দীনের রাজত্বকালে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টেণ্ড কোম্পা-

* তওয়ারিখ বাঙ্গালা।
† তওয়ারিখ বাঙ্গালা।
‡ তওয়ারিখ বাঙ্গালা।
§ তওয়ারিখ বাঙ্গালা।

* Gladwin সাহেব তওয়ারিখ বাঙ্গালা 'Narrative of the Transactions in Bengal নামে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

† "In the year 1748, he (Allavardy) on some contempt of his authority, attacked and drove the factors of the Ostend company out of the river of Hughley" Ormes Indostan (Madras reprint) vol 11. p. 45.

নীর জাহাজ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়, ষ্টুয়ার্ট সাহেব অষ্টেণ্ড কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। * ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। অষ্টেণ্ড কোম্পানীর ভারত পরিত্যাগ করার পরও কোন কোন জর্ম্মান বাণিজ্য জাহাজ বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সেই সমস্ত জাহাজ বাঙ্গালায় আসিতে না দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই কারণে অর্ম্মে প্রভৃতি শেষোক্ত জর্ম্মান জাহাজগুলিকে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর জাহাজ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। লং সাহে-বের 'অপ্রকাশিত বিবরণ সংগ্রহ' নামক পুস্তকে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর লিখিত ইংরাজ বণিক-সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার ডসনের নামীয় পত্রে দেখা যায় যে, সেই সময়ে জর্ম্মানগণ বাঙ্গা-লায় আসিতে চেষ্টা করায়, নবাব তাহাদিগকে না আসিতে দেওয়া সম্বন্ধে ইংরাজগণকে আদেশ করিতেছেন, এবং তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে, যে, সুজা-খাঁর রাজত্ব সময়ে ইংরাজ ও ওলন্দাজ অধ্যক্ষগণ জর্ম্মান-দিগকে ধ্বংস করার জন্য নবাবকে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য জর্ম্মান অধ্যক্ষ এইদেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। † এই জর্ম্মান অধ্যক্ষ যে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর অধ্যক্ষ ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং নবাব সুজা উদ্দীনের সময়ে যে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর ধ্বংস উপস্থিত হয় তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। আলিবর্দ্দীখাঁর সময়ে অন্যান্য জর্ম্মান বণিগ্‌গণেরও বাঙ্গালায় আসা বন্ধ হয়। তাঁহার উক্ত ১৯শে আগষ্ট তারিখের পত্রের প্রত্যুত্তরে ইংরাজ বণিক-সমিতির প্রেসি-ডেণ্ট ডসন সাহেব লিখিয়া পাঠান যে, ইংরাজ জাহাজের পথ-প্রদর্শকেরা আলিমানদিগের কোন জাহাজের ভার গ্রহণ বা পথ প্রদর্শনের কার্য্য করিবে না। ফরাসী ও ওলন্দাজগণও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইবে। যদি জর্ম্মান জাহাজ বাঙ্গালায় আসে, তাহা হইলে হয় তাহা জলমগ্ন করা হইবে, না হয় ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কোর্ট-অব ডিরেক্টরদিগের নিকট হইতে এইরূপ পত্র আইসে যে, জর্ম্মান জাহাজের সঙ্গে ইংরাজ-দিগের কোন প্রকার বাণিজ্য-সম্বন্ধ রাখা না হয়। অতঃপর ইংরাজেরা বাঙ্গালার প্রভু হইয়া উঠিলে জর্ম্মান-দিগের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্বন্ধ একরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

* "It is however apparent, by the History of the Ostend Company, that their factory was in existence in A. D. 1730 and their last ships left Bengal in 1733. *See universal History vol. xi.*" [*Stewarts Bengal. p. 426.*)

† "For in time past in Sujah Cawn's time, the English, and Dutch chiefs both entered into methods for destroying the German chief and engaged him to join with you, on which account the German chief absconded. "(J. Long's Selections from unpublished Records. Vol. I. p. 26.)

বিলাতে ক্রিকেট খেলা।

গত বৎসর কুমার রণজিৎ সিংহের স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, তিনি ইংলণ্ডে পা দিতে না দিতে, লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একখানি সংবাদপত্র তাঁহার মন্তব্য গ্রহণের জন্য একজন বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরণ করেন। ভারতবাসিগণ ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে কেমন উৎসাহী, এই প্রশ্নের উত্তরে রণজিৎসিংহ বলিয়াছিলেন যে, বিলা-তের লোক খেলাকে যেমন গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্বের সহিত দেখেন ভারতে তেমন কিছুই নাই। কথাটা শুনে তখন ভাল লাগে নাই; রণজিৎসিংহকে লইয়া কলিকাতার লোকে এত ধুমধাম করিলেন, এত বাহবা দিলেন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাতে এত লেখালেখি হইল, তবু কিনা বলিলেন আমরা ক্রিকেটে উৎসাহী নই! কিন্তু পরে বুঝিয়াছি যে রণজিৎসিংহজী ঠিক কথাই বলিয়া-ছিলেন; এখানকার তুলনায় আমাদের উৎসাহ জ্যোৎস্না-লোকে জোনাকী পোকার ন্যায়! তার সাক্ষী স্বয়ং রণজিৎসিংহ। রণজিৎসিংহের মত ও তাঁহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ কত ভারতবাসী বিলাতে আসিতেছেন যাইতে-ছেন, কজন তাঁদের খোজ লন? ধনী, মানী, জ্ঞানী, রাজা, মহারাজা, বক্তা, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক কত রকম লোক ভারত হইতে এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু এখানকার বন্ধুগণকে বলিতে শুনিয়াছি "তোমাদের স্বদেশবাসীদের মধ্যে এখানে সকলের চেয়ে বিখ্যাত কে

এস্ রণজিৎসিংহ"। অধিক কি যখন লর্ড এল্‌গিন বিবিধ ঘটনাপূর্ণ সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলি ছোট একটী প্যারাগ্রাফেই তাঁর আদর অভ্যর্থনা যাহা কিছু সব শেষ করিয়াছে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু রণজিৎসিংহ যখন আসেন, তখন বিশেষ সংবাদদাতা পাঠাইয়া পূর্ণ দুইটী স্তম্ভে তাঁহার বিবরণ বাহির করিয়াছিল। শুধু যে রণজিৎসিংহ সম্বন্ধে এমন ব্যবহার করে তাহা নয়। জানুয়ারি মাসের আরম্ভ হইতে দেখিতেছি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম কাগজ থেকে আরম্ভ করিয়া ডেলি-নিউস্ ও টাইমস পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংবাদপত্র প্রতিদিন তিন চারি স্তম্ভ করিয়া ক্রিকেট খেলার রিপোর্ট বাহির করিতেছে। সন্ধ্যার সময় যখন ক্রিকেট ম্যাচ শেষ হয়, তখন প্রায় সকল কাগজেরই একটী নূতন এডিসন বাহির হয়; খবরের কাগজওয়ালাদের সেই একটী মরসুম—কাগজওয়ালা ছেলেগুলি "ক্রিকেট ম্যাচ" "ক্রিকেট ম্যাচ" চীৎকার করিয়া ছুটিয়াছে, আর পথ দিয়া যে যায় সেই এক খানি করে কাগজ কিনিতেছে। ৬টার সময় খেলা শেষ হয়। তারপর ১৫ মিনিটের মধ্যে ইংলণ্ড স্কটলাণ্ডের সকল সহরে তার খবর বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া যে ইহারা এত শীঘ্র সংবাদ বাহির করে স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করাই দায়। লণ্ডন হইতে ১০ মাইল দূরে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকার বাঁচ হইতেছে; বেলা ২টার সময় বাঁচ শেষ হইল; ২টা পাঁচ মিনিটের সময় লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় তাহার বিবরণ সম্বলিত খবরের কাগজ বাহির হইল। শুনিয়াছিলাম ইংলণ্ড খবরের কাগজের দেশ, কিন্তু কল্পনার চক্ষুতেও এতটা ভাবি নাই। কাউণ্টীতে কাউণ্টীতে, সহরে সহরে, পাড়ায় পাড়ায়, দুই খানি ও ততোধিক খবরের কাগজ; এই সব কাগজের একটী প্রধান উপাদান ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলার সংবাদ। এই সব সাধারণ ভাবের পাঁচমিশালী কাগজ ছাড়া শুধু খেলার সংবাদের জন্য আবার নানা ছাঁচের কাগজ, কোনটার নাম স্পোর্টিং নিউস, কোনটার নাম স্পোর্টিং ক্রনিকল, স্পোর্টিং টাইমস, ইত্যাদি ইত্যাদি। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন খেলার আবার কি খবর হবে, তার জন্যে আবার কে পয়সা খরচ করে কাগজ কিনিবে? সেই জন্যই রণজিৎসিংহজী বলিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণ খেলাকে তেমন গুরুত্বের চক্ষুতে দেখেন না। ইংলণ্ডে একজন উন্নতচরিত্র ও ক্ষমতাশালী ধর্ম্মযাজক, একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও একজন সুকৌশল ক্রিকেটিয়ার এই তিনের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, তাহা বলা সহজ নহে। একটী কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সিনিয়র র‍্যাংলার বা প্রথম শ্রেণীর অনারপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট অপেক্ষা একজন ব্লু (Blue) অর্থাৎ সম্মানিত খেলোয়ারের আদর কম নয়। আর খেলার নামে ইংরাজ পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করে না, সময়কে সময় জ্ঞান করে না। যে ইংরাজ সময়কে গায়ের রক্তের মত মনে করে বলিয়া প্রসিদ্ধ, তা'রাই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রিকেট ম্যাচ দেখিয়াও ক্লান্ত বা ক্ষুব্ধ হয় না। ম্যাচ ত অনবরতই লাগিয়াই আছে; স্কুলে স্কুলে, সহরে সহরে, কাউণ্টীতে কাউণ্টীতে, কত ম্যাচ যে খেলা হইতেছে তার সংখ্যা নাই; সেই জন্যই সাধারণ খবরের কাগজে কুলাইয়া উঠে না; শুধু খেলার সংবাদ দিবার জন্য খবরের কাগজ চালাইতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। এ বৎসর অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক দল ক্রিকেটিয়ার ইংলণ্ডে ম্যাচ দিতে আসিয়াছিলেন। মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট পর্য্যন্ত রবিবার ছাড়া আর একটী দিনও ইঁহাদের খেলা বন্ধ হয় নাই; এই সমস্ত ম্যাচ দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়; এক একটী ম্যাচে ৬০।৭০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। তবু ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নয়; প্রতি বৎসরই এইরূপ চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রতি তৃতীয় বৎসরে এক এক দল খেলোয়ার ইংলণ্ডে আসে, এইরূপ ইংলণ্ডের ক্রিকেটিয়ারগণও অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে যায়। বর্ত্তমান সময়ে প্রিন্স রণজিৎসিংহ একদল ইংরাজ ক্রিকেটিয়ার লইয়া আমেরিকায় ম্যাচ দিতে গিয়াছেন। যখন এই সব ম্যাচের জন্য খেলোয়ার মনোনীত হয়, তাহার ফল জানিবার জন্য অনেকে বোধ হয় মন্ত্রিসভা গঠন-সংবাদ জানার ন্যায় উৎসুক হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ানেরা এবার সমগ্র ইংলণ্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পাঁচবার ম্যাচ দিয়াছিলেন। কুমার রণজিৎসিংহ তাহার প্রত্যেকটীতে

খেলোয়াড় মনোনীত হইয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে এবার রণজিৎসিংহ খুব ভাল খেলিতে পারেন নাই; কিন্তু তবুও অনেক সপ্তাহেই তিনি লিষ্টে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। সপ্তাহের শেষে ভাল ভাল খেলোয়ারদের সমগ্র "রন্" যোগ করিয়া লিষ্ট বাহির করা হয়; এবং মর্সুমের (season) শেষে আর একটী লিষ্ট বাহির হয়। এবারকার ইংলণ্ডের ক্রিকেট মর্সুম শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর রণজিৎসিংহজীর যত "রন্" হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ক্রিকেটিয়ারের এত "রন্" হয় নাই। এখন বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিবেন খেলার জন্য কেন বিশেষ সংবাদপত্র প্রয়োজন। দিন দিন সপ্তাহ সপ্তাহ কত তালিকাই বাহির হইতেছে। রণজিৎসিংহজী সত্যই বলিয়াছেন যে, ইংরাজেরা খেলাকেও অতি গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্যের চক্ষুতে দেখে।

অনেকে আজকাল মনে করিতেছেন, ইংলণ্ডে খেলার নেশা বড় বাড়িয়া যাইতেছে। এবং তাহার জন্য জাতীয় জীবনের চিন্তাশীলতার ক্ষতি হইতেছে; সে কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু অপরদিকে ইহাও সত্য, ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনগঠনে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। শুনা যায় ডিউক অব ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন, "ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ইটন কলেজের খেলার জমিতে জিত হইয়াছিল"; এ কথা আমার নিকট অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। আজ যদি আমাকে ইংলণ্ডের সেনাপতি করিয়া দেয় তাহা হইলে ক্রিকেট খেলোয়ারদের মধ্য হইতে আমি আমার লেফ্‌টানাণ্ট বাছিয়া লই। ক্রিকেটই ইংলণ্ডের জাতীয় ক্রীড়া; অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোনও স্থানে ক্রিকেটের এত আদর নাই। ইংরাজেরা ক্রিকেটকে কেবলমাত্র শারীরিক ব্যায়াম মনে করে না। মানুষ তৈয়ারি করিবার জন্য এমন সুন্দর উপায় আর খুব কমই আছে। অবশ্য ইংরাজের আদর্শ ও আমাদের আদর্শে অনেক প্রভেদ। তা'রা তাহাদের যুবকগণকে "মানুষ" দেখিতে চায়; তা'রা শুধু কেরাণী ও পুঁথিপড়া পণ্ডিত তৈয়ারি করিতে চায় না। তা'রা তাহাদের বালকগণকে সবল, সহিষ্ণু, ক্ষিপ্রহস্ত, সর্ব্বতোদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিতে চায়। ক্রিকেটে এই সমুদায় গুণের যেমন অনুশীলন ও বিকাশ হয়, অতি অল্প উপায়েই সেরূপ হইয়া থাকে। ক্রিকেটিয়ার যখন ব্যাট হাতে করিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার সমস্ত মনোযোগ ঘনীভূত হইয়া খেলার জমিটুকুকে ছাইয়া ফেলে; "বল্‌টী"ত তার চোখের তারা হইয়া গিয়াছে; চোখ দুটী যেন বলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে; তা ছাড়া সমস্ত জমি ও প্রতিপক্ষের সমস্ত খেলোয়ারের প্রতি নজর রাখিতে হইতেছে; কোন্ দিক দিয়া বল্ চালাইবার সুবিধা আছে, কোথায় কে দাঁড়াইয়াছে, কখন দৌড়াইতে হইবে এ সব চক্ষুর নিমেষে ঠিক করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহাতে যদি চরিত্রগঠন না হয়, তবে আবার চরিত্রগঠন কিসে হইবে? আমাদের দেশে খেলায় দেখিয়াছি, তাঁহারা ব্যাট চালাইতে অনেক সময় যথেষ্ট পারদর্শী; কিন্তু ফিল্ডিংএ এখানকার খেলোয়ারদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনাই হয় না; এদের কাছে যেন একটা বলও ফাঁক যায় না; কোনখানটা দিয়া বল্ যাইবে তা যেন ইহারা অভ্রান্তরূপে জানে; একটী বলের জন্য এক জনের বেশী লোককে নড়িতেও হইতেছে না; বল্‌টী যেখান দিয়া যাইবে ঠিক সেইখানে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেশে দেখিয়াছি, একটী বলের পাছে একবার ৫ জন দৌড়াইতেছে, আর একবার কেহই যাইতেছে না, সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আমরা অনেক সময় কাঁদি, আমাদের organisation এর শক্তি জন্মিতেছে না; organisation এর শক্তি কি আর মাটী ফুঁড়ে জন্মায়; তার জন্য শিক্ষা চাই, তার জন্য চেষ্টা চাই। সম্মিলিত চেষ্টা ও কার্য্য করিবার শক্তি এরূপ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়। একটী দলের কাপ্তেন তাহার সঙ্গীদিগকে যে কৌশলের সহিত চালায়, যদি সকল সেনাপতি আপনার সৈন্যদিগকে সেই ভাবে চালাইতে পারে, তবে জয় লাভ করিবার বড় বিলম্ব থাকে না। কাহার কি শক্তি ও কি দুর্ব্বলতা, কে কোন্ খানে ভাল খেলিতে পারে, কাপ্তেন তাহা অব্যর্থদৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছেন। একজন নূতন খেলোয়ার ব্যাট ধরিতেই তাহার খেলার ভাব দেখিয়া নিমেষের মধ্যে বিদ্যুতগতিতে আপনার খেলোয়ারদিগকে এমন করিয়া সাজাইয়া লইতেছেন যে, আর একটী বলও ফাঁক যাইবার যো নাই। বাস্তবিকই ইঁহাদের খেলার সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া এক দিন আমি

ইহাদের খেলার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম। কৌরব রাজকুমারগণের অস্ত্র-শিক্ষা সমাপনান্তর, তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে বৃক্ষশাখাসীন একটী পক্ষীকে সন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। একে একে রাজকুমারগণ ধনুকে বাণ যোজনা করিলে আচার্য্য-দেব জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "তুমি কি দেখিতেছ?" কেহ বলিলেন আমি একটী গাছ দেখিতেছি, কেহ বলিলেন আমি একটী ডাল দেখিতেছি; অর্জ্জুনের সময় আসিলে তিনি বলিলেন আমি একটী পাখীর মাথা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। দ্রোণাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যের মস্তক চুম্বনান্তর বলিলেন, তোমার অস্ত্র-শিক্ষা সার্থক হইয়াছে। কৌরবাচার্য্যদেব আজ যদি ফিরিয়া আসিয়া ব্রিটিশ কুমারগণের ক্রিকেট পরীক্ষা দেখেন, তাহা হইলে তিনি কি বলেন, কল্পনা তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হয়। স্থির বস্তুতে লক্ষ্য করা ত বরং সহজ; কিন্তু বল্‌টী যখন বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে ফিরাইয়া আপনার মনোমত দিকে পাঠান বড় শক্ত কথা; প্রত্যেকটী বল্ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসিতেছে। কোনটী খুব জোরে, কোনটী মৃদুগতিতে, কোনটী উপর দিক দিয়া, কোনটী নীচের দিক দিয়া; নিমেষের মধ্যে বলের গতি ঠিক করিয়া সেই ভাবে ব্যাট চালাইতে হইবে। সমস্ত মনকে একত্র করিয়া ছুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ রাখা প্রয়োজন; একটু শিথিল মনোযোগ হইলে অমনি 'আউট'। তার পরে ভাবিতে হইবে বিশ হাজার লোক খেলোয়ারটীর উপর তাকাইয়া রহিয়াছে; সমস্ত ইংলণ্ড তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; নিজের মান, দলের মান, দেশের মান তাহার উপর নির্ভর করিতেছে; তখন যে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু একটু যদি বুক কাঁপিল তাহা হইলেই শেষ। অব্যবস্থিতচিত্ত ভীতমনা লোকদিগের ক্রিকেট ভূমিতে স্থান নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির যে সব গুণ চাই, বক্তৃতা মঞ্চে উচ্ছৃঙ্খল শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে বক্তার যে সব গুণ চাই, মন্ত্রণাগৃহে স্বপক্ষীয় লোকদিগকে পরিচালিত করিতে ও বিপক্ষের যুক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে খণ্ডন করিতে যে সব গুণ চাই, তাহার অনেক গুলি ক্রিকেট ভূমিতে প্রয়োজন। সেই গুলির অনুশীলন হয় বলিয়াই ইংলণ্ডে ক্রিকেটের এত আদর। সেই জন্যই ইংরাজ পিতামাতা আপনাদের সন্তানদের ক্রিকেটে পারদর্শিতা দেখিলে গৌরবান্বিত মনে করেন, সেই জন্যই ইংরাজসাধারণ ক্রিকেটের এত অনুরাগী; সেই জন্যই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিদ্বৎসমাজ ক্রিকেট খেলায় এত উৎসাহ দেন। হইতে পারে ঝোঁকটা বড় বাড়িয়া গিয়াছে; আমার মনে হয় বাস্তবিকই এরা বড় বাড়াবাড়ি করে; কিন্তু সে বিষয়ের সঙ্গে আজ আমার সম্বন্ধ নাই। আমি যেমনটি দেখিয়াছি তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিলাম।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

—o—

মার্জ্জনা।

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভাল বেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা!
ভীরু পাখীর মতন তব পিঞ্জরে এসেছি
ওগো তাই বলে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা!
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারিনি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখ তুমি ঢাক তুমি কর করুণা
ওগো আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা!
ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালবাসিতে
তবু ভালবাসা কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা!
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া পানে চেয়োনা বন্ধু চেয়োনা!
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত সরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু'হাতে ঢাকিব নগ্ন হৃদয়-বেদনা,
ওগো প্রিয়তম তুমি অভাগীরে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা!
ওগো প্রিয়তম যদি চাহ মোরে ভাল বাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জ্জনা কোরো মার্জ্জনা!
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসোনাগো সখা হেসোনা!
যবে রাণীর মতন বসিব রতন আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয় শাসনে,
যবে দেবীর মতন পূরাব তোমার বাসনা,
ওগো তখন হে নাথ! গরবীরে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা!

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪।

কলিকাতা-ক্রয়।

ঠিক দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা আমরা এই প্রবন্ধে বলিতে বসিয়াছি। এই দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যা হইলে বাঘ ডাকিত—চোর ডাকাতের ভয়ে লোকে দিনেও বাহির হইত না। চারিদিকে গাছ পালা ঝোপ, বন। বড় বড় বাঁশ ঝাড় ও বাবলার বন—তখনকার কলিকাতার শোভাবৃদ্ধি করিত। কলিকাতায় অতবড় কেল্লা—জাহ্নবী-সমীর-চুম্বিত—সিংহাঙ্কিত লোহিত পতাকা—অত সুন্দর-শকটাদি পরিপূর্ণ—গঙ্গার ধারের রাস্তা, এত বৈদ্যুতিক আলো ও গ্যাসের আলোর সংমিশ্রণ—এত লোক জন—কলকারখানা—নৌকা জাহাজ, বজরা, ডিঙ্গী, এত বড় বড় বাড়ী কিছুই ছিল না। তখন কেবল—সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামক তিনখানি গণ্ডগ্রাম—বনজঙ্গলে সমাবৃত হইয়া, হিংস্র জন্তু ও তস্করের নিরাপদ আশ্রয় স্থানরূপে চিরতমসাবৃত ছিল।

তখন লোকজন যে কলিকাতায় আদতে ছিল না, তাহা বলিতেছি না। গঙ্গার ধারে—প্রাচীন দুর্গের আশে পাশের স্থানটায় কতকগুলা ইংরাজের কুঠী ছিল। কুঠিয়ালদের বাঙ্গলা ছিল—বাঙ্গলার চারি পাশে ছোট ছোট বাগান ছিল। গোবিন্দপুর, সুতানুটী অঞ্চলে লোকের বাস ছিল। শেঠ বসাকেরা তখন কলিকাতার প্রধান অধিবাসী। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে ছিল না এরূপ নহে। গোবিন্দপুরে যে সব ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহারা গোবিন্দপুরের দুর্গস্থাপনের পরই হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করেন।

তখন কলিকাতায় গাড়ী ছিল না। রাস্তা ছিল না, তা গাড়ী চলিবে কোথায়! সাহেবেরা জলপথে যাইতে হইলে, ছিপ্ বজরা, ভাউলে প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। স্থলপথে দূরাদূরে অশ্বাদি আরোহণে, পাল্‌কী, টোপওয়ালা ডুলী—বা তাঞ্জাম চড়িয়া যাইতেন। সর্ব্বত্রই কাঁচা রাস্তা—মাঝে মাঝে metalled road, তাহাও আবার ইটের।

হাট বাজারও ছিল। সুতানুটীতে সুতার হাট বসিত—দূর দূরান্তরের ব্যবসায়ীরা সুতা লইয়া যাইত। তখন দেশী কাপড়ের আদর ছিল, দেশী সুতারও দরকার ছিল। তাহা ছাড়া—কোম্পানীর কুঠীর দালালেরা ও এজেণ্টরা এই সব হাটে বাজারে ঘুরিতেন। দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকেরাও মাল খরিদের জন্য কলিকাতায় আসিতেন।

সেই বনজঙ্গলাবৃত—শ্বাপদসঙ্কুল জলাভূমিপূর্ণ, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা, আজ কালধর্ম্মে—ইংরাজের বৈজয়ন্তী-প্রতিম রাজধানী! তখন যাহা ভ্রূণাবস্থায় ছিল, আজ তাহা পূর্ণ বিকশিত। তখন যাহা জঙ্গল ছিল—আজ তাহা ধনধান্য সমৃদ্ধি পূর্ণ, জনস্রোত প্রবাহপ্লাবিত, বিচিত্র শোভাময়ী—আলোকমালা শোভিতা রাজধানী।

জব চার্ণকের আমলে—ইংরাজ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েক খানি গণ্ডগ্রাম ক্রয় করেন। এই কয়েক খানি গণ্ডগ্রামের ভূস্বামিত্ব হইতেই ইংরাজ ক্রমে ক্রমে এই সসাগরা ভারতের কর-সংগ্রাহক হইয়াছেন। এই তিন খানি গ্রামের ক্রেতা ছিলেন "লণ্ডন কোম্পানী", বিক্রেতা এদেশের জমীদার। কোম্পানীর দলই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের মূল পত্তন করিয়াছিল। কোম্পানীর দলই—বনজঙ্গল কাটিয়া কলিকাতায় প্রথম সহর পত্তন করিয়াছিল। সেই কোম্পানীর আমলের প্রারম্ভ হইতে দশশালা বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত—বাঙ্গলায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমস্ত কথাই যথাযথ আলোচনা করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তখনকার কয়েক সহস্র মুদ্রায় যে রাজলক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আজ কালকার কত কোটী মুদ্রায় তাহার পরিপুষ্টি, ইহা দেখাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে ১৬৯৮ খৃঃ অব্দ হইতেই বাঙ্গলার জমীর উপর ইংরাজের প্রকৃত খরিদাস্বত্ব ও ভূস্বামিত্ব জন্মে। এই সময়েই তাঁহারা ভূমির প্রকৃত অধিকারীর নিকট হইতে—কলিকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম কিনিয়া লন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা জমী জমা করিয়া লইয়া কুঠীর কাজ চালাইতেন। ফরাসী,

দিনেমার, ওলন্দাজ সকলেরই এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহারা সুবাদারদিগের নিকট জমী জমা করিয়া লইতেন ও তজ্জন্য খাজনা দিতেন। মোগলগবর্ণমেণ্টের জন্য আবার খাজনার হিসাবে কিছু পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইত।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ উপকূলে ১৬৯৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইংরাজের অনেক কুঠীর আড্ডা ও বিস্তৃত কারবার ছিল। বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে কোম্পানীর বরাবরই ইচ্ছা। আশা প্রতীক্ষায় অনেক দিন কাটিল বটে—কিন্তু সর্ব্ব-কার্য্যের নিয়ন্তা, সেই অসীম শক্তিশালী বিধাতা এক সামান্য ঘটনায়—ইংরাজের অদৃষ্ট পরিষ্কার করিয়া দিলেন। লণ্ডন কোম্পানীর * "হোপওয়েল" জাহাজের চিকিৎসক গ্রেব্রিয়েল বাউটান সাহেব এই সময়ে দিল্লীতে সাহজাহান বাদসাহ কর্ত্তৃক আহূত হন। তাঁহার কোন অন্তঃপুরিকার দুরারোগ্য পীড়া নিরাময় করিলে—বাদসাহ তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু নিস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিক বাউটান—নিজের জন্য কিছু না চাহিয়া, বাঙ্গলায় ইংরাজের বাণিজ্যের জন্য কয়েকটি স্বত্ব প্রার্থনা করেন। ইহার পরই বাউটান সাহেব রাজমহলে বাদসাহ পুত্র সাহ-সুজার বাটীতে চিকিৎসা করেন, তাহার ফলেও বাঙ্গালায় ইংরাজের বাণিজ্যক্ষমতা যথেষ্ট বলবৎ হইয়া পড়িল।

দুরাকাঙ্ক্ষার ন্যায় শত্রু নাই—বিপথে লইয়া যাইতে ইহার ন্যায় দ্রুতপথপ্রদর্শক আর নাই। বাঙ্গালার বাণিজ্য স্বত্ব পাইয়া লণ্ডন কোম্পানীর দল একটা দুরাশায় মাতিয়া উঠিলেন। যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালার জমীতে স্বত্ব স্থাপন করি-বার দুরাকাঙ্ক্ষা, এবার তাঁহাদের লক্ষ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িল। লণ্ডন কোম্পানীর ডাইরেক্টররা অবশ্য উন্মাদ নহেন—যে এরূপ অসম্ভব কল্পনায় মাতিয়া উঠিবেন। তাহাদের পশ্চাতে আর একটী তীব্র শক্তি দ্রুত হস্ত চালনা করিতেছিল। এই শক্তি—স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমস্। সৈন্য প্রেরণ করিয়া মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য জয় করিবার একটা উৎকট কল্পনা এই সময়ে তাঁহার মনকে বড়ই বিচলিত করিয়াছিল। কোম্পানীর ডাই-রেক্টারেরা এখান হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—আরাকান প্রদেশ—মোগলের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। মোগল রাজধানী হইতে আরাকান অনেক দূরে। এই দুরাশায় পড়িয়া ইংলণ্ডাধিপ দ্বিতীয় জেমস্, সৈন্য প্রেরণের আদেশ করেন। এই বিপুলবাহিনী নানা কারণে পথিমধ্যেই বিধ্বস্ত হইল—এবং বাউটানের অস্ত্র চিকিৎসায় যে স্বত্বগুলি লাভ হইয়াছিল, ইংলণ্ডাধিপের শস্ত্র চালনায় সেগুলিও হস্তচ্যুত হইল। বাঙ্গালা হইতে আবার ইংরাজের অধিকার উঠিল। *

বাণিজ্য রাজ্যেশ্বরের লক্ষ্মী। ইংরাজ জাতি আদর্শ বণিক। তাহারা বাঙ্গলায় থাকাতে নবাবের কোষাগার পরিপূরণে অনেক সহায়তা হইত। ইংরাজের অন্ন, বাঙ্গালা হইতে উঠিল বটে, কিন্তু নবাব তাহাদের অভাব অনুভব করিয়া পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন মোগল বাদসাহ স্তিমিতপ্রভাব। বাঙ্গলার নবাব অশেষ ক্ষমতাপন্ন। এই আহ্বানফলেই স্বনামখ্যাত জব চার্ণক—১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৪এ আগষ্ট তারিখে, ভাগীরথী তীরে—সুতানুটীতে পুনরায় পদার্পণ করিয়া ইংরাজপতাকা উড়াইলেন। এই শুভদিনেই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। † আজ যে আমরা এত সুখে মহারাণীর রাজত্বে বাস করিতেছি—উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ রাজপদ, দস্যু তস্করের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, মনের সুখে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি—ইহার মূলকারণ সেই জব চার্ণক। তাহার ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি,সহিষ্ণু, ভূয়োদর্শন সম্পন্ন—ইংরাজ সে সময়ে কুঠীর অধ্যক্ষ না থাকিলে তৎকালে ফরাসি প্রভৃতি

* Bruce's Annals. PP. 406, 463. Mill's British India. P. 48, Wheeler's Early Records P. 149, Stewart's Bengal. P. 160. ইহারা সকলেই বাউটানের এই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগের কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তারিখ সম্বন্ধে সকলের মতৈক্য নাই।

* The idea of going to war with the great Mogul inflamed the imagination of James II. The Directors of the company concocted a scheme for the conquest of Chittagong with the assistance of neighbouring Zaminders and Rajah of Arracan *** but this ambitious scheme was doomed to disastrous failure.—Bolts Considerations.

† The loss of the company's trade was however felt in the Nawab's Treasury' *** On the auspicious day of 24th August 1690, Mr. Charnok, agent of the company, with the leave of the Nawab, hoisted the standard of England, at the village of Sootanutty on the left bank of the Hoogly and laid the foundation of the city of Calcutta —Vide Bolts consideration of Indian affairs.—Minutes of the selcet comittee of the Company. 1760.

প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অধিকার স্থাপন করার পথে অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইত।

সুতানুটির কুঠী, সাধারণ কুঠীর মতই ছিল। কলকার-খানা বাণিজ্যাগার, আমদানী রপ্তানির দপ্তর, কর্ম্মচারি. বরকন্দাজ, সিপাহি, আপিস মালপত্র সবই ছিল। কিন্তু সহসা যদি কোন শত্রু আসিয়া কুঠী আক্রমণ করিত—তাহা হইলে এই সকল কুঠী রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। চার্ণক সাহেব অনেক দিন হইতেই দুর্গের মত একটু উঁচু করিয়া, গাঁথিয়া কুঠীটিকে আরও সুদৃঢ় করিবার মৎলব আঁটিতেছিলেন—সহসা এক অনুকূল কারণ ঘটিয়া উঠিল।

তখনকার বাঙ্গলার জমীদারেরা এখনকার মত নির্জ্জীব ও উদ্যমবিরহিত ছিলেন না। তাঁহাদের অধীনে শত শত লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা থাকিত. ফৌজও কোন কোন স্থলে থাকিত। সেকালে বাঙ্গলায় বাঁশের লাঠির জোর বন্দুক তরবারিকেও সময়ে সময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিত। বাঙ্গলার নবাবদের অত্যাচারে অনেক জমীদার মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মাথা তুলিবার উপযুক্ত অবসর খুজিতে লাগিলেন।

বর্দ্ধমানের জমীদার শোভাসিংহ অতি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনিই দলের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নায়কত্বে—অন্যান্য জমীদারেরাও নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যাঁহারা ইংরাজের প্রথম আমলের ইতিহাস পড়িয়াছেন—তাঁহাদের নিকট শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটনা অপরিচিত নহে।

যাই হউক না কেন, শোভা সিংহ বিদ্রোহী হইলেন—সুবিধা হইল ইংরাজ কোম্পানীর। জব চার্ণক নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"চারিদিকে বিদ্রোহ বহ্নি জলিয়াছে। আমরা রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক দূরে। বর্দ্ধমানে বিদ্রোহীদের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া কুঠী লুঠতরাজ করার ভয়টা আমাদের যথেষ্ট জন্মিয়াছে। আমাদের কুঠীর মালামাল ঢের ও অন্যান্য বণিকদের সহিত তুলনায় প্রকৃত পরিমাণে অরক্ষিত। আপনি যদি অনুমতি দেন আমরা একটু গড়খাই করিয়া প্রাচীর তুলিয়া আত্মরক্ষার উপায় করি।" *

* Mr Job Charnock, who was a man of clear foresight, and rare ability, distinctly saw that in case of a rebellion, it was not safe and advisable to keep company's warehouses and offices in that unprotected state and clearly put forward a petition to the Nabob, for fortification—in an ordinary way. Luckily enongh the prayer was granted.—Selections from old Records vol. VI.

নবাব এই পত্রের লিখিত বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করি-য়াই উত্তর দিলেন। জব চার্ণক মনের মত করিয়া কলি-কাতার কুঠী সুরক্ষিত করিবার উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কুঠী অরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। মাঝখান হইতে তত্রাচ এই অছিলায় কলিকাতা একটী ছোটখাট দুর্গদ্বারা সুবেষ্টিত হইল।

উদ্যম যার—লক্ষ্মী তার। অনুদামী চিরকাল কষ্ট পায়। সেকালের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের শত শত দোষ থাকিলেও, কয়েকটী গুণ অতি জাজ্বল্যমান ভাবে তাঁহাদের শরীরে বর্ত্তমান ছিল। তা না হইলে তাঁহারা এত বড় একটা রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিতে পারিতেন না। ফরাসী প্রভৃতি, ইংরাজের প্রতি-দ্বন্দীদের মধ্যে এরূপ শক্তিশালী লোক সেই সময়ে না থাকাতে—তাঁহাদের পশ্চাদ্‌পদ হইতে হইয়াছিল। জব চার্ণক দুর্গদ্বারা কুঠী সুরক্ষিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—তিনি কলিকাতার মধ্যে ভূস্বামীত্ব লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখন আওরঙ্গজেব বাদসাহের আমল। বাদসাহ তাঁহার পৌত্র আজীম ওসমানকে এই সময়ে বাঙ্গলা বিহার উড়ি-ষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। বাদসাহের নীচে সুবাদারেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারা বাদসাহ বংশধর, তাঁহার প্রতিনিধি—প্রাদেশিক শাসন কার্য্যে সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতারই একছত্র অধিকারী। হুগলীতে অবস্থান কালীন এক মুসলমান ফৌজদারের সহিত জব চার্ণকের খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই ব্যক্তি রাজকুমার আজিমের একজন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী। চার্ণক ইহার নিকট হইতে অনেক গুহ্য সংবাদ পাইয়া সাহায্যাবলম্বনে ওয়াল্‌শ নামক এক কর্ম্মঠ অবস্থাভিজ্ঞ কর্ম্মচারীকে বর্দ্ধমানে পাঠাইলেন। বিদ্রোহদমন জন্য, সাহজাদা সসৈন্যে তখন বর্দ্ধমানেই অবস্থান করিতেছিলেন।

বিদ্রোহের হাঙ্গামে কিছুদিন গোলমালে কাটিল।

তখন জানুয়ারির প্রারম্ভ। এই হাঙ্গাম লইয়া জুলাই মাস অবধি অতীত হইয়া গেল। জুলাইয়ের পর অনুমতি পত্র বাহির হইল। খেলাত, নজরাণা প্রভৃতি হিসাবে ১৬ হাজার টাকা উড়িয়া গেল। তখনকার বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষে এ টাকাটা বড় একটা সহজ কথা নহে।

বাদসাহপৌত্র—কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি তিনখানি গ্রাম কিনিতে ইংরাজকে অনুমতিপত্র দিলেন বটে, কিন্তু উক্ত গ্রামত্রয়ের অধিকারী জমীদারদের তাহা দেখাইবা মাত্র তাহারা গ্রাম তিনখানি ছাড়িতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহাদের আপত্তি, সম্মতিপত্রে সুবাদারের দেওয়ান বাহাদুরের শীলমোহর নাই। আবার সেই অনুমতিপত্র সুবাদারের দরবারে পাঠান হইল। এরূপ করিতে করিতে বৎসর কাটিয়া আসিল—বৎসরের শেষাশেষি, ইংরেজ কোম্পানী সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামধেয় তিনখান গ্রামের খরিদাসূত্রে দখলীকার হইলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

—o—

দাবা খেলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"এখন জাঁহাপনার অভিপ্রায় কি?"

"নূতন কিছুই নাই। আর একবার খেলা আরম্ভ হউক।"

"কি আছে—আমার, জাঁহাপনা, যে আমি আবার খেলিতে সাহসী হইব? এতদিন আপনার উজিরী করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা ত গিয়াছে। এখন আমি পথের ভিখারী। ভিখারীর সহিত বাদসার কি খেলা শোভা পায়!"

"কেন তোমার উজিরি ত যায় নাই,—টাকা গিয়াছে, আবার হইতে কতক্ষণ? এ পর্য্যন্ত বাজে লোকের সহিত খেলিয়া তাহাদের কাঁচা মাথাগুলি কাটিয়া—মনে বড়ই ঘৃণা হইয়াছে। তার চেয়ে একটা উজীরের সহিত খেলায় অনেক আনন্দ। কেন তোমার ত কন্যা আছে, শুনিয়াছি সে পরমা সুন্দরী——"

কথাটা হইতেছিল, বাদসা সেকেন্দার লোদি, ও তাঁহার উজীর সমসের খাঁর মধ্যে। "আরাম বাগ" নামক এক সুবিস্তৃত প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়ে কথোপকথনে নিযুক্ত। বাদসাহের মুখে কন্যার নামোল্লেখ শুনিয়া উজীরের মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। বাদসার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—ইহা ভাবিয়া উজীর সমসের খাঁ, একটু সমঝাইয়া লইলেন।

সেকেন্দারসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমসের ভাবিতেছ কি? তোমার কন্যাকে কি দিল্লীর বাদসা, এই হিন্দুস্থানের মালিক—সেকেন্দার সাহা নিজের অন্তঃপুরে আশ্রয় দিতে পারেন না—?"

"নিশ্চয়ই পারেন—তার অপেক্ষাও শত শত সুন্দরী বাদসাহের পদপ্রান্তে গড়াগড়ি যাইতেছে। কিন্তু এ দরিদ্রের কন্যা হয়ত সে সৌভাগ্য পছন্দ করিবে না। কিম্বা এ গোলাম হয়ত—"

"বুঝিয়াছি। তোমার কন্যাকে পণ রাখিয়া খেলিতে তুমি সম্মত নও। সমসের তুমি জান কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি কথা কহিতেছ?

"বেশ জানি—দীনদুনিয়ার মালিক বাদসাহ সেকেন্দারসাহ লোদি। আমার প্রভু—এই বিশাল হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাঁহার সহিতই তাঁহার দাস কথোপকথন করিতেছে।"

"আমার প্রবৃত্তি ত জান। আমি যে ইচ্ছা প্রকাশ করি তাহা অসম্পূর্ণ থাকে না। তোমায় আবার খেলিতে হইবে।"

"এ দাসের প্রতি এ নিগ্রহ কেন—প্রভু? এক নিশ্বাসে—উজীরির স্বপ্ন ত শেষ করিয়াছি। প্রাণাধিকা কন্যা এ হতভাগ্যের জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, আমিনাকে একটা সামান্য ক্রীড়ার পণের উপযুক্ত বিবেচনা করি না। জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাপ্ করিবেন। দিল্লীর বাদসা অনেক বড়, আমি তাঁর উজীর—নীচতায় প্রবৃত্তি হইবে কেন?"

"আচ্ছা—তবে বড়র মতই চাল আরম্ভ কর। আমি আমিনাকে চাই। শুনিয়াছি সে বড় সুন্দরী।"

"খেলার পণে তাহাকে লাভ না করিয়া অন্য উপায়ে ত পারেন! লোকে কি বলিবে?"

"কতকগুলা অপদার্থ কাপুরুষকে হিন্দুস্থানের বাদসাহ যে ভয় করেন, তাহা নয়। আমি এখনই বলপূর্ব্বক আমিনাকে আনিতে পারি। কিন্তু তাহা করিতে চাই না। ক্রীড়ার পণরূপে আমিনাকে পাইলে—যে আনন্দটুকু হইবে—তাহা উপভোগ করিতে চাই।"

"তাহাই হউক! সম্রাট্ সেকেন্দারসাহের অভিলাষই পূর্ণ হউক। কোন দিকেই যখন আমার পরিত্রাণ নাই, তখন আর একবার অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিয়া দেখিব।"

তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে। আরাম বাগের সুসজ্জিত কক্ষগুলি সুগন্ধি দীপে উজ্জ্বলিত হইয়াছে। গবাক্ষ পথ দিয়া সেই চঞ্চল আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়া—উদ্যানের আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমসের খাঁ বলিলেন—"তবে চলুন।"

উভয়ে—গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাহার পূর্ব্বেই দশবারজন উমরাহ সেই খেলার—আসর জাঁকাইয়া আছে। তাহাদের শিরোদেশস্থ উজ্জ্বল পাগড়িগুলির উপর—গৃহমধ্যস্থ লাল, নীল বাতির আভা পড়িয়াছে। বাদসাহকে দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বসোরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পেটের উপর—হীরা মোতির কাজ করা—মখমল মোড়া এক সুন্দর বিছানা। তাহার উপর বাদসা সেকেন্দার সাহ উপবিষ্ট হইলেন। দর্শকরূপী ওমরাহগণ আশে পাশে ঘিরিয়া বসিল। সম্মুখে এক হস্তিদন্তনির্ম্মিত উচ্চ আসনের উপর—শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর

নির্ম্মিত দাবার ঘর। তাহার উপর পালিস করা হস্তী দন্তের সুন্দর ঘুঁটিগুলি। খেলা আরম্ভ হইল।

সকলেরই সোৎসুক দৃষ্টি সেই ঘুঁটির 'চালে'র উপর। কয়েক 'চালে'র পর উজীরের 'চাল' বিগড়াইল। উজীর হারিলেন। পার্শ্বচরেরা আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল "বাদসাহের জয়"।

"বাদসাহের জয়" শব্দ কক্ষ-মধ্যে ভীষণ প্রতিধ্বনি লইয়া ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। উজীর সমসের খাঁর কর্ণে তাহা বজ্রধ্বনিবৎ প্রবেশ করিল। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশের যাহা বাকি ছিল—তাহাই হইয়া গিয়াছে। প্রাণাধিকা কন্যা, রূপসী-শ্রেষ্ঠা আমিনা—আজ তাঁহারই নির্ব্বুদ্ধিতাবশে এক খামখেয়ালি বাদসাহের উপভোগ্যরূপে পরিগণিত হইল। "হায়, হায়, আমিনাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায়ই নাই?"

চিন্তামগ্ন উজীর।

কে যেন প্রতিধ্বনি করিল "উপায় আছে।" উজীর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, বাদসাহই বলিতেছেন "উপায় আছে।"

"উপায় আছে জাঁহাপনা? আপনি বিশ্ববিজয়ী হউন। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। বলুন কি উপায়ে আমার আমিনাকে আবার ফিরিয়া পাই!"

বাদসাহ বিদ্রূপপূর্ণস্বরে বলিলেন, "উজীর সমসের খাঁ! উপায় আছে—কিন্তু তুমি তাহাতে স্বীকৃত হইবে কি? তোমার সাহসে কুলাইবে কি?"

উজীর কম্পিতস্বরে বলিলেন—"অগাধ ঐশ্বর্য্য ছিল, পথের ভিখারী হইয়াছি। পণ পূর্ণ করিতে সর্ব্বস্ব হারিয়াছি। বাদসাহ সেকেন্দার সার উজীর হইয়া—আজ আমার একটী আসরফির জন্য পরের কাছে হাত পাতিতে হইবে। থাকিবার মধ্যে আছে আমার এই আঙ্গরাখা, এই পায়জামা, এই অসার উজীরির ছায়াবাজির শেষ চিহ্ন এই উষ্ণীষ—আর এই ঘৃণিত জীবন। বাদসাহ ইহার মধ্যে কোন্‌টী চান?"

"তোমার ওই ঘৃণিত জীবনই চাই।"

"এই তুচ্ছ প্রাণ! এখনই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমিনা পথের ভিখারিণী হউক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। একটা বিকৃত-মস্তিষ্ক বাদসাহের বিলাসের পাত্রী হইয়া কলঙ্কিত জীবন বহন করা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুই আমার স্পৃহণীয়। আমি জীবন পণই করিলাম।"

বাদসাহ মনে করিয়াছিলেন, প্রাণের মায়াই সকলের শ্রেষ্ঠ। উজীর প্রাণের ভয়ে নিশ্চয়ই সুন্দরীশ্রেষ্ঠ আমিনাকে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবে। যখন দেখিলেন সমসের খাঁ অন্য উপাদানে নির্ম্মিত, তাঁহার হৃদয় তাঁহার অপেক্ষাও উচ্চ প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, তখন তাঁহার হীন মস্তিষ্কে একটী ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দিল। মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। পার্শ্ববর্ত্তী আমীরেরা এইবার প্রমাদ গণিলেন। উজীরের আর রক্ষা নাই।

বাদসাহ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"সমসের! এখনও বিবেচনার সময় আছে। এখনও ভাবিয়া দেখ।"

উজীর দৃঢ়তা পূর্ণস্বরে বলিলেন "জাঁহাপনা! নীচ রক্তে জন্ম নহে। নীচবংশীয় হইলে, এত বড় একটা রাজ্যের উজীর হইবার স্পর্দ্ধা রাখিতাম না। এই দিল্লীর সমস্ত প্রজা আজ আমায় পিতার মত, বন্ধুর মত ভাবিত না। আপনার এই অসন্তুষ্ট প্রজাবৃন্দের মনে, এত বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিতাম না। আপনি যখন বাদসাহী চাল ছাড়িতে পারিতেছেন না, আমি আমার উজীরি চাল ছাড়িব কেন? এই ঐশ্বর্য্যহীন, সম্ভ্রমহীন, হেয় জীবনে কি লাভ? গৌরবজনক মৃত্যুই আমার স্পৃহণীয়।"

সেকেন্দার লোদির মনের মধ্যে একটা মহা ঝটিকা বহিল। তিনি জানিতেন, প্রজারা প্রকাশ্যে না হউক—মনে মনে উজীরকে বিশেষ সম্মান করে। দিল্লীর সিংহাসনও অভিশপ্ত। আজ আছে কাল নাই। এই পাপিষ্ঠ উজীর অধিক দিন জীবিত থাকিলেই কোন দিন না কোন দিন এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে। তিনি উজীরকে বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বলিলেন, "তবে প্রাণ ভিক্ষা চাও না?"

"না—কখনই না।"

"মরিতে চাও, আচ্ছা তাহাই হইবে।" বাদসাহ হাঁকিলেন "কে আছিস্?"

এক গোলাম পরদা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দিল্লীশ্বর কারাধ্যক্ষকে ডাকিতে আদেশ করিলেন।

কারাধ্যক্ষ লতিফ আসগর খাঁ কাঁপিতে কাঁপিতে বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া কুর্ণিস করিল। উজীরের মলিন ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, বাদসাহের বিরক্তিভাব, ওমরাহদের চিন্তারেখাঙ্কিত বদনমণ্ডল দেখিয়া কারাধ্যক্ষ বুঝিল ব্যাপার সহজ নয়। তখনও সেই গজদন্ত নির্ম্মিত ঘুঁটিগুলা, সেই মর্ম্মর নির্ম্মিত ঘরের উপর বিশৃঙ্খলভাবে গড়াইতেছিল।

বাদসাহ গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "ইহাকে কারাগৃহে লইয়া যাও। আর ইহাকে উজীর বলিয়া ভাবিও না। সামান্য অপরাধীর

ন্যায় ইহাকে দেখিবে। কাল প্রাতেই ইহার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা পৌছিবে! তদনুযায়ী কার্য্য করিও।"

পার্শ্ববর্ত্তী ওমরাহেরা মনে মনে "হায়! হায়!" করিয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া বলিতে তাহাদের সাহস হইল না। উজীর, বধাজ্ঞা শুনিয়া একটুও টলিলেন না। স্থির, নিশ্চল, নিষ্কম্প, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলে এক ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলভাব দেখা দিল। উজীরের যবনিকা এইখানেই পতিত হইল। যে আমিনার জন্য এত কাণ্ড, হায় ভাগ্য, সে আমিনার সঙ্গেও শেষ দেখা হইল না। বিনা দোষে দণ্ডিত হতভাগ্য সমসের খাঁর চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহের পরিবর্ত্তে কেন যে রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল না, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠককে একটু পূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বাদসাহ সেকেন্দার লোদিকে ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। নানা কারণে সেকেন্দারের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। রাজ্য মধ্যে অশান্তি, প্রজাবিদ্রোহ, মন্ত্রীর প্রজাপ্রিয়তা, দিবারাত্রব্যাপী ব্যসন, প্রজার উপর অত্যাচারজনিত অনুশোচনায়, সেকেন্দার সাহ এক প্রকার ক্ষণিক উন্মত্ততা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে নানাবিধ খেয়াল জুটিতে লাগিল। এই দাবা খেলার খেয়াল তাহাদের অন্যতম।

তিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠদরের খেলোয়ার। তাঁহার উপর চাল চালে, এরূপ লোক যে হিন্দুস্থানে ছিল না, এরূপ নহে। তাঁহার সমযোগ্য খেলোয়ার থাকিলেও তাহারা বড় এক্‌টা কাছে ঘেঁসিত না। সেকেন্দার সাহের সমস্ত কল্পনাই উদ্ভট-গোছের। তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন, "যে বাদসাহের সহিত দাবা খেলায় জিতিবে, তাহাকে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দেওয়া যাইবে, কিন্তু পরাজিত ব্যক্তির মাথা যাইবে।" এই নিদারুণ পণ দেখিয়া সহসা কেহ অগ্রসর হইল না। সর্ব্বনেশে পণ! দীন্ দুনিয়ার মালিক, হিন্দুস্থানের এত বড় একটা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বাদসা, তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সেই ভীষণ কটাক্ষ, সেই তোষামোদে পার্শ্বচর ওমরাহদের প্রত্যেক চালেই "বহুৎ খুব জাঁহাপনা" বলিয়া চীৎকার, এ সব সহ্য করিয়া কোন খেলোয়ারই উজীরি লইতে সাহস করিল না।

এ দিকে লোকও জুটে না, বাদসাহের খেলার সখও মেটে না। সেই ক্ষণিক উন্মত্ত ভাবটা আবার একটু জাঁকিয়া উঠিল! দিন যেমন তেমন করিয়া কাটে, কিন্তু অতবড় বাদসাহী জীবন যেন ভয়ানক আমোদ শূন্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার একটা সামান্য খেয়াল উঠিয়াছে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য দেশের হতভাগ্যেরা অগ্রসর হইল না, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। সেই সুবাসিত গোলাপবারিসিক্ত পুষ্পপাত্রার হাওয়া বিষবৎ বোধ হয়, বেগমগুলার নীল ওড়না, সবুজ আঙ্গ রাখা পরা মূর্ত্তিগুলি যেন সংএর পুতুলের মত বোধ হয়। খেলিতে না পাইলে বাদসাহের কিছুই ভাল লাগে না। খালি খেলা নয়, জেতাও চাই। বাদসাহ ভাবিতেছিলেন, তাঁহার দিল্লীর মণি খচিত সোণার তক্তটা যেন পিতলের ও ঝুটা পাথরের হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার প্রেয়সীরা যেন লাবণ্য ও রসবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সখের বাগানের ফুটন্ত ফুলগুলা যেন মলিন ও গন্ধহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মাহিনা-করা এসরারী, সারেঙ্গী ও বেহালাদারেরা সুর ভুলিয়া গিয়াছে। নহবত বেসুরা বাজিতেছে, সুমিষ্ট সরবৎ তিক্ত হইয়াছে। পালিত আঙ্গুর বৃক্ষের সুমিষ্ট আঙ্গুরগুলা যেন তিক্তস্বাদ আমলার মত হইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুতঃ ব্যসন এইরূপই বটে। মৌতাত এইরূপ ভয়ানক জিনিসই বটে। নেশার মৌতাত আছে, আর খেলার মৌতাত নাই, একথা স্বীকার করিতে পারি না। আজও এক একটা দাবার আসরে কতই না লোক জমে? সামান্য লোকেরই যখন এত ঝোঁক, এত সখ্ হয়, তখন দীন্ দুনিয়ার মালিক, একটা প্রবল পরাক্রান্ত বাদসাহ যে এরূপ সখে মাতিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বাদসাহ নূতন আদেশ প্রচার করিলেন, প্রথমবারে হারিলে ক্রীড়া সহচরকে জীবন-পণ-স্বত্বে রেহাই দেওয়া হইবে। তিনবার উপর্য্যুপরি হারিলে জীবন দিতে হইবে। একবার জিতিতে পারিলেই রাজ্যের উচ্চপদ।"

এই ঘোষণায় একটু ফল ফলিল। আমজাদ খাঁ বলিয়া এক দুঃসাহসিক দরিদ্র পাঠান, উজীরির লোভে বাদসাহের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেরূপ বহুদিন পরে শিকার দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, সেকেন্দার সা, এই নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য আমজাদ খাঁ বার বার তিন বারই পরাজিত হইল। বাদসাহের কঠোর আদেশে, এক অদ্ভুত খামখেয়ালিতে, সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তির মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। শুধু তাই? তাহা হইলেও আপদ চুকিয়া যাইত। তাহার সেই ছিন্ন মস্তকটা হাতে লইয়া প্রধান ঘাতক, নবাবের রাজপথের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে ভীষণ দৃশ্যে বাদসাহের নিরীহ প্রজা, সেই দিল্লী-নগরবাসীরা মহা শঙ্কিত হইল।

খেলোয়ার বলিয়া যাহাদের একটু প্রতিপত্তি ছিল, তাহারা প্রাণ ভয়ে রাতারাতি সহর ছাড়িল। কে জানে কখন কাহাকে বাদসা ডাকিয়া ফেলেন। যাহারা জানিত না, তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিলেও, আকস্মিক বীভৎস ঘটনার ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল।

উজীর সমসের খাঁ নিজগুণে লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। সেই সন্দিগ্ধ-

চিত্ত অত্যাচারী বাদসাহ উজীরের এই লোকপ্রিয়তার কথা শুনিয়া একটা ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সন্দেহে আকুলিত হইলেন। কৌশলে উজীরের যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়া, তিনি তাহাকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আহ্বান করেন। তার পর কি হইল, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদসাহ সেই রাত্রেই কারাধ্যক্ষের নিকট পরোয়ানা পাঠাইলেন। তাহাতে আদেশ ছিল—"সমসের খাঁকে, ফাঁস দিয়া বিনষ্ট করিবে। এই কার্য্য কোন প্রকাশ্য স্থানে হইবে না।"

বাদসাহের ভয় ছিল, উজীরের লোকপ্রিয়তা। হয়তঃ এই ভয়ানক ঘটনায়, অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত প্রজারা একটা অনিষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে! কাজ কি অত হাঙ্গামে, গোপনে শত্রুনাশ করাই ভাল। বলা বাহুল্য বাদসাহের আদেশ গোপনেই যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল। এক প্রহর অতীত হইয়াছে, বাদসাহ নিজ কক্ষে সংবাদের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থিত। এক পদাতিক আসিয়া সংবাদ দিল, "কাজ শেষ হইয়াছে। সমসেরের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য এক মুসলমান ফকির দ্বারা তাঁহার কন্যা গোপনে লইয়া গিয়াছে।" সেকেন্দার সাহ একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

উজীর মরিল—পাপ গেল। সিংহাসনটা অনেকটা নিষ্কণ্টক হইল। একটা নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া তিনি যে সেই আসমানের মালিক সেই অনন্তশক্তিমানের কাছে ঘোর অপরাধী হইলেন, একথাটা একবারও তাঁহার মনে আসিল না! এই বাদসাহী—এই দুনিয়াদারী, এই হীরামতি খচিত তক্ত, এই সাচ্চায় মোড়া—মতির শেরপাচওয়ালা উষ্ণীষ—সবই যে দুদিনের জন্য, একথা তাঁহার মনে উঠিল না।

প্রাতে যে ঘটনায় অনুতাপ হয় নাই, অপরাহ্নে ক্রমাগত চিন্তায় বাদসাহের সেই বিকৃত মস্তিষ্ক একটু উত্তেজিত, একটু চঞ্চল হইয়াছে। সন্ধ্যার পর সে দিন তিনি কাহাকেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই। গভীর রাত্রে সেই অনুশোচনা, সেই অতীত স্মৃতি তাঁহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রজ্জ্বলিত আলোকগুলি একপ্রহর অতীত না হইতেই নির্ব্বাপিত হইল। তবু যেন সেই গৃহে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। শয্যা যেন কণ্টকিত। হৃদয় যেন কি একটা ভারে বিষম ভারগ্রস্ত। মনে কেবল সেই এক কথা, "হায়! কেন এ কাজ করিলাম।" বাদসাহ স্থির ভাবে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

* * * * *

গভীর অন্ধকার। রাত্রিও তৃতীয় প্রহর। আরাম বাগের কক্ষগুলির অসংখ্য আলো অনেকক্ষণ নিভিয়া গিয়াছে। আনন্দ কোলাহল সে দিন অনেকক্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে। উজ্জ্বলিত কক্ষগুলির উষ্ণতা সে দিন অনেক ক্ষণই অপসৃত হইয়াছে। সেই গৃহে সে দিন আর ভৃত্যেরা ফুলের মালা ঝুলাইয়া দেয় নাই। গৃহ মধ্যস্থ কৃত্রিম ফোয়ারাগুলি, সেদিন আর তেমন করিয়া চারিদিকে মৃদু শব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করে নাই। রমণীয় কলকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতের মদিরাময় উচ্ছ্বাস, সে সেদিন সেই কক্ষ প্রতিশব্দিত হয় নাই। আনন্দ, বিলাস, যেন সেদিন আরাম বাগের বাহিরে গিয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছিল।

এই তামসী নিশীথে, আরাম বাগের উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বিনিদ্র-নেত্রে দাঁড়াইয়া এক মনুষ্য মূর্ত্তি। তাহার ঊর্দ্ধে অন্ধকার, পার্শ্বে অন্ধকার, সম্মুখে অন্ধকার, হৃদয়ে অন্ধকার! সেই ব্যক্তি নিশাচরের ন্যায় সেই নগ্ন সৌন্দর্য্যময়ী সুপ্ত প্রকৃতির বক্ষদেশ প্রবাহিত অন্ধকার স্রোতের ভিতর দিয়া চারিদিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

সেই অন্ধকারে সতাসত্যই শেষ আলোক দেখা দিল। ক্ষীণোজ্জ্বল দীপ রেখায় আরামবাগের সীমান্তসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের একাংশ পরিদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই বাতায়নপথবর্ত্তী পুরুষ-মূর্ত্তি যেন, সেই ভীষণ সমাধিক্ষেত্রে সহসা আলোকের আবির্ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সেই ব্যক্তি অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"তোমরা স্বর্গরাজ্য হইতে আলোক হাতে লইয়া কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ, তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না।" এই অস্ফুট আর্ত্তনাদেই, সেই আলোকরেখা সহসা অন্তর্হিত হইল। এই বাতায়নপথবর্ত্তী অন্ধকারবেষ্টিত পুরুষ আর কেহ নহেন, স্বয়ং দিল্লীশ্বর সেকেন্দার সাহ।

আরামবাগের পার্শ্বেই এই সমাধিক্ষেত্র। সেই দিন প্রাতেই সমসেরখাঁর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া সেই দিন অপরাহ্নেই বাদসাহ এক নবসৃচিত সমাধি দেখিয়াছিলেন। তাহাই সমসেরখাঁর গোর। এই গভীর রাত্রে আবার সেই সমাধির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সহসা এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে নৈশান্ধকার মধ্যে আলোকমালা দেখিয়া তাঁহার মন এক বিসদৃশ কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

তিনি যে খানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানেই স্থির হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, আবার সেই অপসৃত আলোকরেখা আবির্ভূত হইয়াছে। দেখিলেন, একটি রমণী মূর্ত্তি ও একটি পুরুষ মূর্ত্তি সেইখানে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান।

সমসেরের প্রাণদণ্ডের পরই তিনি আমিনাকে আনিবার জন্য শিবিকা ও সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন। দূত আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল, উজীরের কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হয় ত তাহারাই আবার নির্জ্জনে, সমাধিপার্শ্বে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। সেকেন্দারের পাষাণ হৃদয় এইবার গলিল।

সেই সমাধিপার্শ্ববর্ত্তিনী, রমণীমূর্ত্তি সেই ক্ষীণ-দীপালোকেও—সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছিল। সেই সুন্দর দেহযষ্টি, সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠনময় মুখ, সেই শ্বেত শুভ্র বসনাবৃত ক্ষীণালোকোজ্জ্বলিত, অর্দ্ধান্ধকার বিজড়িত কায়া—বাদসাহ বড়ই সুন্দর দেখিলেন। বাদসাহ আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই তুমি আমিনা। আমিনা! আমিনা! অতসুন্দর তুমি! এই অন্ধকারেও তোমার এতরূপ! সহস্র সমসের মরুক তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু আমি তোমায় চাই। সহস্র

[illegible] হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিল্লী চক্রান্তে ভাসিয়া যাক্—শোণিতস্রোতে প্লাবিত হউক—তবুও আমি তোমায় চাই।"

বাদসাহ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সে স্থানটী একটু দূরবর্ত্তী। তিনি দালানের মধ্য দিয়া ছাদের বারান্দায় আসিলেন। এখান হইতে গোরস্থান দুইরশি দূরে। দেখিলেন, সেই আদৃত সমাধি খনিত। তাহা হইতে শবাধার উত্তোলিত। শবাধার শূন্য। সেই শবাধার হইতে শব উঠিয়া অতিকষ্টে একবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই পাংশু-মলিন মুখ, সেই বিশীর্ণ গণ্ড, সেই কোটরান্তর্গত বিমগ্ন চক্ষু, সেই উচ্ছৃঙ্খল উষ্ণীষ বিরহিত—শববৎ মুখ দেখিয়া বাদসাহ চিনিলেন—এ উজীর সমসের খাঁ!

মরা মানুষেও যে গোর ছাড়িয়া উঠিতে পারে, যাহাকে তিনি ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়াছেন, সে লোক আবার গোর হইতে উঠিতে পারে! যাহার মৃতদেহ তিনি নিশ্চলভাবে ভূপতিত হইতে শুনিয়াছেন; সে দেহ আবার সজীব হইতে পারে, এ চিন্তা বাদসাহের শিরোবেদনা উপস্থিত করিল।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ভ্রমও ত অনেক হয়। অনেক সময়ে ত ছায়া দেখিয়া মানুষ জ্ঞান হয়। সেই ছায়ার মানুষেরও আকার হাত পা সবই থাকে। ছি! ছি! আমিনা দিল্লীশ্বর সেকেন্দর সাহের! এতবড় দেশটা হিন্দুর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলাম, আর এই সোজা কথাটার মীমাংসার জন্য এইখানে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভীত হইতেছি! আল্লা আমায় একি করিলে!

সহসা তাহার চঞ্চল হস্ত কটিদেশনিবদ্ধ সুতীক্ষ্ণ তাতারি ছোরা ধরিতে অগ্রসর হইল। হায়! কটিদেশে অস্ত্রমাত্রও নাই! ভ্রান্তিতে তিনি তাহা কক্ষে ফেলিয়া আসিয়াছেন।

বাদসাহ সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে সোপানরাজি অবতরণ করিয়া নীচে আসিলেন। সদর দ্বারে প্রহরী ছিল, সে তাঁহার আকৃতি দেখিয়া ভয় পাইল। উন্মাদ! উন্মাদ! বাদসা উন্মাদ হইয়াছেন। নচেৎ মাথার পাগড়ী ফেলিয়া বিনা অস্ত্রে, বিশৃঙ্খল বেশে, এতরাত্রে একাকী কোথায় যাইতেছেন?

সে মস্তকাবনত করিয়া সেলাম করিল। বাদসাহ বাহির হইয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গেল। পশ্চাৎ দিকে পদশব্দ শুনিয়া বাদসাহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পরুষকণ্ঠে বলিলেন "কে তুই—?"

"জাঁহাপনার গোলাম। এতরাত্রে একাকী যাইতেছেন, সঙ্গ লইয়াছি।"

"শয়তানের বাচ্ছা, নিজের কাজে যা। দিল্লীর বাদসার রক্ষার জন্য তোর মত কুকুরের সহায়তার আবশ্যক নাই।"

প্রহরী ভয়ে পলাইয়া গেল।

দিল্লীশ্বর সেই গভীর অন্ধকারে সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সে আলোও নাই—সেই ক্ষীণবর্ত্তিকাধারিণী কল্পিত সুন্দরী আমিনাও নাই, সেই নূতন জীবনীশক্তি সমন্বিত অনুমিত শবদেহও নাই। সে স্থানের সব সমাধিগুলিই প্রস্তরমণ্ডিত। স্থান লক্ষ্য করিয়া নূতনটী খুঁজিয়া লইতে বাদসাহকে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। সমাধির উপর ঘাসের স্তর যেরূপ ভাবে সাজান ছিল, তাহাই আছে।

সেকেন্দর সাহ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন। "এত ভ্রমও মানুষের হয়? এতবড় রাজ্যের বাদসা হইয়া আজ কি ছেলেমানুষীটাই না করিয়াছি?—ভাবিয়া তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। কিন্তু এতটা ভ্রম, সহজ মানুষেরা করিতে পারে, তাহা ত সম্ভব নয়। নিশ্চয় সমসেরের দেহ এই কবর হইতে কে সরাইয়াছে। চক্রান্ত! ভীষণ চক্রান্ত!! আমারই চাকরে নিমকহারামী করিয়াছে!! কালই এর ব্যবস্থা করিব। সব হতভাগাদের জীয়ন্তে পুতিব।"

মনের সন্দেহ যায় না। ছিন্নবস্ত্র সঞ্জাত অগ্নির ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠে। বাদসাহ মনে মনে ভাবিলেন, সমসের যদি প্রকৃতই জীবিত থাকে, তবে তাহাকে অভয়দান করিলেই সে ত আমার কাছে আসিতে পারে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার উদ্ধারকারীরা তাহাকে লইয়া পলাইবে কি করিয়া?

বাদসাহ সেই সমাধিক্ষেত্রে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন—

"সমসের খাঁ!"

কেহ উত্তর দিল না।

"সমসের ফিরিয়া আইস। আমি দিল্লীর বাদসাহ তোমায় ডাকিতেছি, আর তোমার অনিষ্ট করিব না। তোমায় উজীরি দিব। আল্লার নাম লইয়া বলিতেছি।"

কেহই আসিল না। সেকেন্দর লোদি শূন্য মস্তিষ্ক লইয়া আরামবাগে ফিরিয়া আসিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারি দিকে বনজঙ্গলের দুর্ভেদ্য পরিখায় পরিবৃত এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের বুকের উপর কয়েক খানি মৃৎকুটীর। কুটীরগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়াও পরস্পর সংলগ্ন। কুটীরের সম্মুখে বিঘা দুই সমতল ভূমি। মানবের জীবিকার উপযোগী—শাক শবজী ও তরীতরকারী তাহাতে উৎপন্ন হয়।

পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে এই কুটীর কয়েকখানি দেখিবার যো নাই। সেখানে যে লোকের বসবাস আছে, তাহাও কেহ বিশ্বাস করে না। সে স্থান সম্পূর্ণরূপে লোক সমাজের বহিঃকেন্দ্রে নিক্ষিপ্ত। বড় বড় বন্য বৃক্ষের শাখা প্রশাখার বহুল বিস্তারে সেই অংশের বাহ্যদৃশ্য মধ্যাহ্নেও অন্ধকারময়।

পাহাড়ের দক্ষিণদিক বাহিয়া এক ক্ষুদ্র গিরিনদী। নদীতে স্বচ্ছ জল। গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া তীরদেশ পর্য্যন্ত আগাগোড়া ছোট বড় প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের উপর হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া এই প্রস্তরগুলি নদীগর্ভে পড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

এই ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী; যেন কাহারও আশাপথ চাহিয়া আছে। কে যেন দূরে গিয়াছে,এখনি ফিরিয়া আসিবে। তাহার যেন আসিবার সময় হইয়াছে, এইরূপ আশা বুকে লইয়া, মুখে

সেই আকুলিত ভাব প্রকাশ করিয়া, সেই সুন্দরী আরও সুন্দর হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছেন।

সহসা কতকগুলি বনফুল উত্তরীয়ে বাঁধিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া, একজন পিছন হইতে রূপসীর সুন্দর চক্ষু দুটি মৃদুভাবে আবরণ করিল। সেই ষোড়শী হাসিয়া বলিলেন, "রহস্য রাখ আলিয়ার, আমি নদীর দিকে চাহিয়া আছি। তুমি পিছন হইতে আসিলে কিরূপে?"

আলিয়ার হাত ছাড়িয়া দিল। বস্তুতই সে আলিয়ার! তা না হইলে হাত ছাড়িয়া দিবে কেন?

উত্তরীয়নিবদ্ধ পুষ্পগুচ্ছ লইয়া আলিয়ার বলিল, "আমিন্! আসিবারপথ অনেক। যে যাহাকে ভালবাসে, সে ভালবাসার জিনিস্‌কে দেখিবার জন্য কি পথের অভাব অনুভব করে? আমি নগর হইতে বসিয়াছি অনেকক্ষণ। তুমি যখন কুটীর হইতে নদী তীরে আমায় অন্বেষণ কর, আমি তখনই জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমায় এতক্ষণ কষ্ট দিতাম না। এই ফুলগুলির জন্য এত দেরী হইল।"

সেই অঞ্চলগ্রাহ্যবিমুক্ত সুন্দর বনফুলগুলি সত্বরেই আমিনার কুণ্ডলীকৃত সম্বদ্ধ বেনীর শোভাবর্দ্ধন করিল। আলিয়ার বলিল, "পিতার নিকট একজন আগন্তুক রহিয়াছেন। আমিন্! এখন ত বাড়ী ফিরিবার যো নাই। এইখানে বসি এস! সূর্য্যত অস্তাচলে গেলেন। এই পাহাড়ে নদীরধারে পাথরের সিংহাসনে বসিয়া বনের বিমুক্ত বাতাস খাওয়া কত সুখকর?"

দুইজনে বসিল। যেন প্রেম আসিয়া অনুরাগকে আলিঙ্গন করিল। জ্যোতিঃ আসিয়া দেহকে আশ্রয় করিল। সৌন্দর্য্য আসিয়া শোভাকে কোলে লইয়া বসিল। আলিয়ার আমিনার সেই অযত্নক্লিষ্ট অথচ রক্তাভ গণ্ডে একটী আকাঙ্ক্ষিত চুম্বনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। আমিনাও ছাড়িবার পাত্র নহে। সে বনের তরুলতা, উন্মুক্ত আকাশ ও কলনাদিনী নির্ঝরিণীকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিশোধ লইল।

আমিনা বলিল—"আলি! বাবা কি করিতেছেন?"

"তিনি একটা গোপনীয় মন্ত্রনায় ব্যস্ত। দিল্লী হইতে এক গুপ্তচর আসিয়াছে।"

"কিছু শুনিলে কি?"

"কতক শুনিয়াছি, ফিরিয়া গিয়া সবই শুনিব।"

"আর কিছু শুনিলে না? পিতাকে যেরূপ কৌশলে রক্ষা করিয়াছি, বাদসা কি তাহা জানিতে পারিয়াছেন? সমাধি খননের রহস্য কি আজও প্রকাশ পায় নাই?"

"না, বাদসা ত ধরিতে পারেন নাই। আমরা যে দিন চলিয়া আসি, সে দিন তখনই বাদসা নাকি সেখানে আসিয়াছিলেন। একজন প্রহরীর মুখে আমাদের গুপ্তচর এ সংবাদ শুনিয়াছে। বাদসাহ কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন গোলমাল করেন নাই।"

"বস্ নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু আলি এমন করিয়া কতদিন চলিবে? বড়বংশে জন্মিয়া, সুখে পালিত হইয়া, দুঃখীর মত, চোরের মত, আর যে লুকাইয়া থাকিতে পারি না। পিতার কষ্টে যে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তিনি একটী বাদসার উজীর ছিলেন!!"

"আমিন! আল্লাকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি জীবন ফিরিয়া পাইছেন। আর সেই হিন্দু ফকীরকেও ধন্যবাদ দাও। ফাঁস হাত নামাইয়া যখন তাঁহাকে গোর দিতে আনে, তখন তিনিই ত মুসলবেশে পিতার দেহ পরীক্ষা করিয়া টের পান যে তিনি অর্দ্ধমৃত! তিনি আমাদের সহায়তা করেন।"

"বাস্তবিক আলি, সেই দিন হইতেই ত সেই মহাপুরুষের দেখা নাই। কিন্তু তিনি ত বলিয়াছিলেন, আবার প্রয়োজন মত দেখা দিবেন। পিতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল।"

আলিয়ার বলিল, "তাঁহাদের কথা মিথ্যা হয় না। তিনি হইলেই দেখা দিবেন।"

"আচ্ছা আলি, আমি তোমার উপর আজ রাগ করিব।"

"কেন আমিন্?"

"তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে কবে?"

"কিসের প্রতিজ্ঞা?"

"প্রতিহিংসার সহায়তা- মনে নাই?"

"এইবার সময় হইয়াছে। আজই সব স্থির করিব।—আমাদের মাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী আমীর মহব্বত খাঁই যে আমাদের প্রতিনিধি, আর তিনিই যে পিতার কাছে এসেছেন, তা কি তোমায় খুলে বলতে হবে আমিনা?"

"মহব্বত খাঁ, তাঁর এত দয়া? তিনিই পিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।"

"মহব্বত বলেন, বাদসাহ এখনও খেলার বাতিক ছাড়েন নাই, দিন দিন আরও উগ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিতেছেন। এই এক মাসের মধ্যে আরও দুইজন নব নিযুক্ত উজীরের মাথা গিয়াছে। এখন পণ হইয়াছে প্রথমবার হারিলে মাথা যাইবে না, কিন্তু জিতিলে উজীরি প্রাপ্ত হইবে দ্বিতীয় বারে পদচ্যুতি, তৃতীয় বারে মস্তকচ্যুতি।"

"আল্লা এই দুষ্কর্ম্মা সেকেন্দর সাহকে সুমতি দিন। নূতন উজীর করিয়া তাহার এইরূপ কৌশলে মাথা কাটিবার সখ্ কেন? করুণাময় আল্লা এমন নরপশুকেও সিংহাসনে বসাইয়াছেন!"

"আমিনা! কিজান, ও একটা ব্যাধি! তাঁহার প্রতিকার জন্য এমন উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রয়োজন! কিন্তু সে চিকিৎসক মেলাও দুর্ঘট। বাদসাহকে খেলায় হারাইবে, এই সাহস কার?"

"খেলায় হারিলেই কি তার চৈতন্য হইবে?"

"হওয়া খুব সম্ভব। জানিনা এত শক্তি কাহার যে সে আবার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে?"

"আছে, শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

"তুমি তবে ভবিষ্যৎ গুণিতে জান! কোথায় আছে বলনা কেন?"

"এইখানেই আছে, এই তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।"

"কে তুমি—আমিনা?" আলিয়ার হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিনদী, বৃক্ষতল, পর্ব্বত গুহায় সেই দূরবিক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি প্রবেশ করে।

আমিনা পুনরায় হাসিয়া বলিল, "আলিয়ার! আমি বাল্যাবধি তোমার কাছে খেলা শিখিয়াছি। তিনি হারিয়াছেন বলিয়া কি আমিও হারিব? আমার সহিত সখ করিয়া খেলিয়া তিনি কতবার হারিয়াছেন।"

"আচ্ছা আমিন! তুমি যে বাদসাকে হারাইবে তার আর বিচিত্র কি? অমন দুটি চোক যার তার আর ভাবনা কি? যদি এক দিনও ঐ মাথা কাটা উজীরিই করিতে পার, তাহা হইলে আমি উজীরনীর মা হওয়ার গৌরবটা পাইব।"

আমিনা গম্ভীরভাবে বলিল,—"না আলি! তামাসা করিতেছি না। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার দুঃখ বিমোচন করিব। যাকে হারাইব। যদি পুত্র হইয়া জন্মিতাম, তাহা হইলে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতাম? শাণিত অস্ত্রে বাদসাহের বক্ষের উপর এ অত্যাচারের শোধ লইতাম। আলি তুমি আমার সহায় থাকিলে আমার ভয় করি না।"

আমিনার মুখ দেখিয়া আলিয়ার বুঝিল, সে রহস্য করিতেছে না। বাল্যকাল হইতেই সে আমিনাকে চিনিত। কাজেই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য বলিল. "আমিনা! পরের কথা পরে হইবে; এখন অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে———"

এই সুখকর প্রসঙ্গে বাধা পড়িল। সহসা কে গম্ভীর কণ্ঠে দূর হইতে ডাকিল—"আমিনা" "মাই—বাবা!" বলিয়া আমিনা মরাল-গতিতে সেই শিলাতল ত্যাগ করিয়া ধাবমান হইল।

তখন অল্প অন্ধকার হইয়াছে। আলিয়ারও অন্য পথে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পাঠক! এই নির্জ্জনবাসী জীব কয়েকটীকে চিনিয়াছেন কি? বীর সমসের খাঁ, তাঁহার কন্যা রূপসী আমিনা, আর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলিয়ার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কন্যা বলিতেছে, পিতঃ! আমায় বাধা দিবেন না। আমার সংকল্প পবিত্র। কে যেন কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে—"আমিনা! অগ্রসর হও কোন ভয় নাই।"

পিতা সমসের খাঁ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন—"মা! তোমায় লইয়া আমি এত কষ্টেও সুখী। বাদসার উজীরি পাইয়াছিলাম, তাহা খোয়াইয়া মরিয়া বাঁচিয়া বন্যপশুর প্রতিবাসী হইয়াছি। তুমি স্ত্রীলোক—শক্তিহীনা—তোমার সাধ্য কি মা সেই দুরাচারের অত্যাচারপথ রোধ কর?"

"পিতঃ! আপনা হইতে এ ছার রমণী দেহ পাইয়াছি। পুত্র হইলে আপনার এ দুর্দ্দশা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি বুদ্ধিহীনার মত কাজ করিতেছি না। সেই হিন্দু ফকীর মহাত্মা সে দিন আবার আমায় দেখা দিয়া এ বিষয়ে সাহস দিয়া গিয়াছেন।"

"ফকির—হিন্দু ফকির! কে তিনি? কেন তিনি আমাদের প্রতি এত অনুরক্ত?"

"মহাজনের স্বভাবই এই বাবা! তাঁরা আত্মপর ভেদ রাখেন না। জাতি নির্ব্বিশেষে পাত্রাপাত্র ভেদ বিরহিত হইয়া বিপন্ন লোকের উপকার করেন।"

"কোথায় তুমি সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

"এই পাহাড়ে কাল গভীর রাত্রে তিনি আমায় দেখা দিয়াছেন। আমায় কুটীর হইতে ডাকিয়া লইয়া কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছেন। শুনিবেন তাঁহার জীবনের কাহিনী—?"

আমিনা চুপে চুপে সমসের খাঁর কাণে গুটিকয়েক কথা বলিলেন। সেই মলিনমুখ উজীরের মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আর তোমায় বাধা দিব না। কিন্তু এ স্ত্রীবেশ"—

আমিনা বলিল—"তার জন্য ভাবিবেন না। সে ভারও তিনি লইয়াছেন। বেশ পরিবর্ত্তন কিছু বেশী আশ্চর্য্যের কথা নহে।"

সমসের খাঁ যুক্ত করে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে বলিলেন—'প্রভো! এত দিন তোমায় চিনিতে পারি নাই, আজ চিনিয়াছি। আজও যে হতভাগাকে ভুলিতে পার নাই, এই আমার সৌভাগ্য। এখন বুঝিতেছি—কেন তুমি আমায় বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

আমিনা বলিল "পিতঃ এ কার্য্যে আরও দুই জনের সহায়তা চাই। আপনাকে ও আলিয়ারকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবেক। এত দুঃখ কষ্টে আপনার অদৃষ্টের যে বিসদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে কেহই আপনাকে চিনিতে পারিবে না। তার উপর ছদ্ম বেশ। আর আমি চাই আলিয়ারকে?"

"তোমার যাহা অভিলাষ আমিনা। কিন্তু সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবে কোথায়?"

"মহব্বত খাঁর বাটীতে। সেখানেই আপাততঃ আমাদের থাকিতে হইবে।"

"কালই তবে যাত্রা করি—কি বল?"

"তা আর বলিতে? এই সে দিন নূতন আদেশ প্রচার হইয়াছে—সেই খাম খেয়ালি বাদসাহ শীঘ্রই পরিবর্ত্তন করিতে পারে।"

আমিনা পিতার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উজ্জ্বলিত কক্ষ। দ্বারের মাথার উপর সোণার হল করা নানাবিধ চিত্র। খিলানের বক্ষঃভেদ করিয়া অসংখ্য স্ফটিক দীপাধার গৃহ মধ্যে বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের চারি ধারে কারুকার্য্যময় স্বর্ণ পাত্র রক্ষিত। সোণার বাঁধান ফলফুলের কাজ করা পাথরের সুন্দর চৌবাচ্চা। তাহাতে নানা রঙ্গের মৎস্য গুলি ক্রীড়া করিতেছে। গৃহের স্থানে স্থানে রজত-নির্ম্মিত ধূমাধারে অগুরু, প্রভৃতি মনোরম সুগন্ধি মৃদু অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া সুগন্ধ বিকীরণ করিতেছে। ফুলের সুগন্ধ, সেই সুবাসিত স্নেহ দ্রব্যের সংগন্ধ, আর কৃত্রিম প্রস্রবণের ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বারিধারার সুখময় ঘ্রাণ সেই বাদসাহী কক্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

বাদসাহ মধ্যে বসিয়া; আশে পাশে সাত আট জন প্রণয়িনী। কেহ বা পদসেবা করিতেছে, কেহ বা, গ্রীষ্ম না থাকিলেও, ওড়না ঘুরাইয়া বাতাস করিতেছে, কেহ বা মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত সরবতের পাত্র অসগ্রর করিয়া দিতেছে, কেহ বা চুপ করিয়া পিছনে বসিয়া অপরাপরের প্রতি সরোষ কটাক্ষপাত করিতেছে, আবার কেহ বা দুই একটা রহস্যের কথা বলিয়া দিল্লীশ্বরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে।

এই সুখের সময়েও বাদসাহের অবিশ্রান্ত সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। এক গোলাম আসিয়া খপর দিল, "মহব্বত খাঁ বাহিরে দাঁড়াইয়া।"

"মহব্বত খাঁ? অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছি তবুও নিস্তার নাই!! ডাক তাহাকে।"

বাদসাহ বেগমদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পরীর দল অদৃশ্য হইয়া গেল।

মহব্বত খাঁ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কুর্ণীস করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাদসাহ বলিলেন—"খপর কি মহব্বত? আবার বিদ্রোহ নাকি?"

"না জাঁহাপনা, বিদ্রোহ নয়! কিন্তু এক সুন্দরমূর্ত্তি যুবক মহা বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে। সেত কোন মতেই আমার কথা শুনে না। বলে আমি রাত্রে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বিশেষ প্রয়োজন।"

"এত রাত্রে—কে সে? তাড়াইয়া দাও তাহাকে। কাল সাক্ষাৎ হইবে। না শোনে, প্রহরীদের হুকুম দাও ফটকে পুরিয়া রাখুক।"

"জাঁহাপনা! অমন সুন্দর মূর্ত্তি যুবক আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি-নাই। তাহাকে তাড়াইবার কৌশল অনেক করিয়াছি; কিছুতেই যাইতে চাহে না।"

"আচ্ছা আমি দেওয়ান কামরায় যাইতেছি। তাহাকে সেই খানে লইয়া যাও। এত রাত্রে বড় তাক্ত করিল দেখিতেছি।"

বস্তুতঃ তখন সবে সন্ধ্যামাত্র। বাদসাহী কাণ্ড সবই অদ্ভুত!

* * * * * *

বাদসাহ সেকেন্দার সাহ দেওয়ানি কক্ষে উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট। মহব্বত খাঁ এক সুন্দর মূর্ত্তি যুবককে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

উন্মুক্ত তরবারি ও উষ্ণীষ সিংহাসনের নীচে রাখিয়া বাদসাহের ভূলুণ্ঠিত বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিয়া আগন্তুক যুবক প্রশ্নের অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল।

সে কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া বাদসাহ মনে মনে খুব তারিফ করিলেন। সেই কোমল বয়স, সেই গৌর কান্তি, সেই আগত শ্মশ্রু মুখমণ্ডলের তেজোব্যঞ্জক ভাব, সেই বিস্ফারিত লোচন যুগলের তেজস্মিতা—সেই সরল মুখের সরল হাসি দেখিয়া বাদসাহ কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"যুবক! কি চাও! এ রাত্রে তোমার কিসের প্রয়োজন?

"জাঁহাপনা—আপনার উজীরি করিতে চাই।"

"উজীরি সর্ব্বনাশ! কে তোমায় এ মন্ত্রণা দিল? অমন সুন্দর মুখ! এই নবীন বয়স!"

যুবক সসম্ভ্রমে উত্তর করিল—"সব জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছি।"

"উজীরির মূল্য কি জান?"

"জানি, ক্রীড়া পরাজয়ে ছিন্ন মস্তক। জয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য।"

"কিসে তোমায় এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী করিল!"

"উচ্চ আশা—দারিদ্য!"

"উচ্চ আশা সফল হইবার সময় পাইবে কই?

"ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে দুঃখ দূর হইবে না। কিন্তু জীবনও বড় জ্বালাময় হইয়াছে। আত্মহত্যা মহাপাপ। উজীরি না পাই রাজদণ্ডে জগৎ সংসারের জ্বালা এড়াইব।"

"ছি! ছি! অবোধ যুবক, অমন কথাও মুখে আনিও না।"

"যতই ভয় দেখান না কেন, নিরস্ত হইব না। জাঁহাপনা! ভদ্র বংশে জন্মিয়া আজন্ম সৈনিক ব্রতে দীক্ষিত হইয়া আর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি না। এবার একবার অদৃষ্টের শক্তি পরীক্ষা করিব। বাদসাহের কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিব।"

"আচ্ছা কালই তোমার পরীক্ষা হইবে। কালই আমার সঙ্গে এক বাজি খেলিতে হইবে। আজই আমি তোমায় বাহাল করিলাম। কোষাধ্যক্ষকে বলিয়া দিতেছি, ভবিষ্যৎ উজীরের বাহালী মুদ্রা দশ সহস্র আসরফি, সে তোমাকে এখনই দিবে।"

"একটী নিবেদন আছে, জাঁহাপনা আমার সঙ্গে একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকেও সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।"

"তোমার অমন সুন্দর মুখ! অমন মিষ্ট কথা। এই বয়সে অত সাহস! আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইয়া কথা কহিতে অতি সাহসী লোকও সঙ্কুচিত হয়। আজ কিনা তুমি আমায় যা বলিতেছ, তাই শুনিতেছি!"

যুবক সঙ্কিত বদনে উত্তর করিল—"সে জাঁহাপনার অনুগ্রহ। অধীনের আর একটী আরজ আছে। আমি দিল্লী দুর্গের মধ্যে থাকিতে চাই না, অনেক কারণ। সহরের মধ্যে নিজে বাড়ী পছন্দ করিয়াছি। সেই বাটীতেই অবস্থান করিব।"

"তাহাই হইবে। আর আমি বসিতে পারি না। অনেক রাত্রি হইয়াছে। যুবক! এখন বিদায় হও, কাল সাক্ষাৎ হইবে। তোমার মুখ দেখিয়া আমার বড় মায়া হইয়াছে। আল্লা করুন, তোমার সহিত

খেলায় আমিই যেন হারিয়া যাই। আমার নিদারুণ পণ তোমার সুন্দর দেহের উপর আধিপত্য করিবে, ইহা যেন না হয়। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।"

যুবক উজীর মস্তকাবনত করিয়া বিদায় লইলেন। মক্কবত খাঁর সহিত একবার চোখা চোখি হইল। যদি কেহ সেই সময়ে একটু মনোযোগের সহিত দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত—উভয়ের অধরোষ্ঠে একটু অস্ফুট হাস্য রেখা প্রতিভাত হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে দিন সহর বড় 'সরগরম'। এক অল্প বয়স্ক নবীন উজীর বাদসাহের সহিত পুনরায় খেলিবে—এই উত্তেজনায় দিল্লী সহরটা পরিপূর্ণ। সবে তিন দিন মাত্র উজীর সাহেব দিল্লীতে আসিয়াছেন; অনেক লোক তাঁহাকে ভাল করিয়া এ পর্য্যন্ত দেখিতেও পায় নাই। প্রাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে তাহার দর্শনাশায় অনেক লোক রাজপথে জড় হইতে লাগিল। কাহারও দর্শনাশা মিটিল না। খেলা দেখিবার জন্য নহে, খেলার পরিণাম ভাবিয়াই সকলে আকুল ও উদ্বিগ্ন; নূতন উজীর নাকি বড় সুপুরুষ, অতি নবীন বয়স্ক, তাই তাঁহার দিকে লোকের এত সহানুভূতি। তাই দলে দলে নগরস্থলোকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য জনতা করিতেছে। কিন্তু প্রহরীরা সে জনতা ভাঙ্গিয়া দিল। দিনের বেলায় কাহাকেও বাঘে লইয়া গেলে, যেমন সকলে আশঙ্কিত হয়, খেলার সংবাদে লোকে সেইরূপ হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ সমসের খাঁর মৃত্যুর পর আরও দুইজন এইরূপে মাথা দিয়াছে।

নবাবের ত এই অবস্থা। দিল্লীর রাজভবনেও এইরূপ একটা উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া। যাহারা উজীরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহারা সকলেই বিষণ্ণ। সকলেই মনে মনে নিষ্ঠুর বাদসাহকে অভিসম্পাত করিতেছে।

বাদসাহ এত দিন বেশ ঠাণ্ডা ছিলেন। খেলার কথা ভুলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু শিকার বিহীন ব্যাঘ্র শোণিতাস্বাদে যেরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে, সম্রাট সেকান্দার সাহ এখন সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন। একটা অজাতশ্মশ্রু বালক তাঁহাকে ক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া এত লোকের সম্মুখে অপমানিত করিতে চাহে—এই চিন্তায় তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্ক ভয়ানক উত্তেজিত। তাঁহার হৃদয় হইতে অনুতাপ চলিয়া গিয়াছে। আবার তিনি সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

খেলা আরম্ভ হইবে—রংমহালের সীমান্তবর্ত্তী সেই সাবেক ঘরে। যাহারা চাল বুঝে, বিচার করিতে জানে, তাহারাই জনকতক সেই গৃহে থাকিবে। বাদসাহের চিরসহচর তোষামোদেরা—যাহারা কেবল গোল মাল করিয়া এত লোকের মাথা খাইয়াছে—তাহাদের নীচ অন্তঃকরণও নবীন উজীরের জন্য ব্যথিত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বলিত কক্ষে খেলা আরম্ভ হইল। বাদসাহ ও তাঁহার সম্মুখে নবীন উজীর। চারি পাশে অমাত্যবর্গ। গৃহ ভিত্তি অবলম্বিত উজ্জ্বল আলোকে সকলের মুখই পরিদৃশ্যমান। উদ্‌গ্রীব হইয়া খেলার চাল দেখিতেছে।

বাদসাহের চির অভ্যস্ত হাত আজ যেন কি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চাল খারাপ হইতে লাগিল। নবীন উজীর ক্রমশঃ জয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমীরের তোষামোদেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি আরম্ভ করিল। শেষ চালে বাদসা পরাজিত হইলেন। দুই এক জন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—"বহুৎ আচ্ছা"—

বাদসাহ তাহাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি করিলেন। তাহাদের মুখ হইতে সহসা কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেটা একটা উত্তেজনার ফল। তাহারা বেশ সমজাইয়া গেল। একবারে মুখ বন্ধ করিল।

বাদসাহ হারিয়াও হারিতে চাহেন না। মনে একটা ঘৃণার সঞ্চার হইল।

"কখনও হারি নাই, আজ একটা অজাতশ্মশ্রু বালকের সহিত পরাস্ত হইতে হইল, সেকেন্দার বাদসার এ কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"আবার খেলা আরম্ভ হউক।" এইবার সকলে আরও ভীত হইল।

হস্তিদন্তময় দাবার ঘুঁটি গুলি পুনরায় সাজান হইল। এবার খেলার অবস্থা দেখিয়া সেই সব পার্শ্ববর্ত্তী উমরাহেরা "বাদসাহের জয়" বলিয়া একটা ভীষণ চীৎকার করিল। সে চীৎকারে, সেই লোহিত প্রস্তরময় কক্ষ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বাদসাহ সেবার হারিবার মুখে জিতিলেন।

নবীন উজীরের মুখ শুকাইল। তিনি দেখিলেন, মৃত্যু তাঁহার শিয়রে। বাহ্যিক একটা খুব উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা গেল, কিন্তু যদি কেহ তাহার অন্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ক্ষেপণ করিত, তাহা হইলে বুঝিত তিনি এ পরাজয়েও আনন্দিত।

বাদসাহ উল্লসিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উজীর, এইবার!" ব্যাঘ্র শীকার ধরিয়া যে রূপে নিরাশাকাতর মুখের দিকে একবার উল্লাস পূর্ণ দৃষ্টি করে, বাদসাহ সেইরূপ উল্লসিত।

উজীর ভগ্নহৃদয়ে মলিনমুখে বলিলেন "যখন জানিতে পারিয়াই খেলিতে বসিয়াছি, তখন জীবন বিসর্জ্জনে ভয় করি না। জাঁহাপনা কিন্তু আমায় দুই দিন সময় দিন।"

বাদসাহের কঠোর হাস্যে সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। দুই একজন তাহার অনুকরণ করিয়া তাহার মন রাখিতেও ছাড়িল না। বাদসাহ বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হইবে। তোমার এই নবীন বয়স, সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তোমার উপর দয়া হইয়াছিল। কিন্তু তুমি আমায় প্রথমেই হারাইয়াছিলে ক্ষমা করিতে পারিতাম, কিন্তু————"

আর বলিতে হইল না। একজন প্রহরী আসিয়া বাদসাহের সম্মুখে এক খানি লোহিত মোড়কাবৃত পত্র ও একটী অঙ্গুরীয় ধরিল। বাদসাহ ধীরে ধীরে সেই পত্রখানি উন্মোচন করিলেন। তাহার সেই সহাস্য মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি পত্রখানি উজীরের হাতে দিলেন।

উজীরও মুখে খুব বিষণ্ণতার ভাণ দেখাইলেন। শুষ্ক মুখে বলিলেন "এখন উপায়?"

বাদসাহ অন্যান্য সকলকে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ক্রীড়াসন মন্ত্রভবনে পরিণত হইল। বাদসাহ বলিলেন "উজীর, পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাও। তোমার প্রাণদণ্ড আপাততঃ রহিত করিলাম। নূতন সেনাপতি আলিয়ার যদি এই বিদ্রোহীদের দমন করিতে পারে, দশ হাজার আসরফি পুরস্কার দিব। কিন্তু বিদ্রোহীদের সর্দ্দারকে জীবন্ত আনিতে হইবে। সেই পশুর জীবনের পরিবর্ত্তে তোমার জীবন ফিরিয়া পাইবে।"

নবীন উজীর আগ্রহের সহিত বলিলেন—"দেখি, আলা কি করেন? জাঁহাপনা! এ গোলাম চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। এই উপায়েও যদি আমার প্রাণ ভিক্ষা পাই, তাহাও মঙ্গলকর।"

পর দিন প্রাতে সকলেই দেখিল—"সেনাপতি আলিয়ার খাঁ সসৈন্যে নগর দ্বার হইতে বাহির হইতেছেন। নগরবাসীরা নবীন সেনাপতির বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তিনি কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন কেহই জানিল না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এক নির্জ্জন কক্ষে আমিনা উপবিষ্ট। নিকটে কেহ নাই, কেবল চিন্তাই আমিনার সঙ্গিনী। আমিনা মনে মনে ভাবিতেছে—"ঘটনাস্রোত কোথায় যে আমাদের লইয়া যাইতেছে, তাহাও জানি না। দুরাশায় ভর করিয়া সেই হিন্দু সন্ন্যাসীর কথায় ভুলিয়া, এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা অসম্ভব তাহা করিয়াছি। সন্ন্যাসী মহাশয় কে তাহা ত আজও বুঝিলাম না! তিনি অযাচিতভাবে, এ অভাগিনীর অনেক উপকার করিয়াছেন। পিতাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বধ্যভূমি হইতে ফকির বেশে, সরাইয়া আনিয়াছেন। আমরা ত তখন ভয়ে লুকায়িত, এ হতভাগাদের মুখের দিকে কেহ ত দেখিবার ছিল না। তিনিই ত পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে কঠিন শ্বাসরোধে পিতার চেতনাই অপসৃত হইয়াছিল। মৃত্যু হয় নাই। তিনিই ত সর্ব্বসমক্ষে দিবাভাগে সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য পিতার শবদেহ সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। কবরের মধ্যে শবাধারে কৌশলে বায়ু-প্রবাহ-পথ রাখিয়া, ঔষধ দ্বারা পিতার দেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার রাখিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু হইয়াও নির্ব্বিকার চিত্তে মুসলমানের সমাধিক্ষেত্রের সব কাজই করিয়াছিলেন। তিনিই ত সেই নীরব নিশীথে পিতাকে সমাধি হইতে উত্থিত করিয়া পুনরায় বাঁচাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয় তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত—না হয় কোন অদ্ভুত শক্তিশালী ব্যক্তি। আজ রাত্রে তিনি আমায় নির্জ্জনে দেখা করিতে বলিয়াছেন। যমুনার ঘাটে—দেখা হইবে। তাঁহার জীবনের কথা বলিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার সহিত একবার দেখা করা নিতান্তই প্রয়োজন।"

"প্রাণাধিক—প্রিয়তম আলিয়ারকে—শত্রুমুখে পাঠাইয়া অবধি আমার প্রাণ চঞ্চল হইয়াছে। জানি না আলিয়ার এখনও জীবিত আছে কি না? সেই সন্ন্যাসীই ত অদ্ভুত উপায়ে বাদসাহের কাছে বিদ্রোহ-সংবাদ পাঠাইয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন! মক্কবত খাঁ নিশ্চয়ই এ মহাপুরুষকে চেনেন। কিন্তু তিনিও ত কিছুই জানেন না।"

আমিনা ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া একবার মুকুরের নিকট দাঁড়াইলেন। নিজের কমনীয় মূর্ত্তি—সেই মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া একটু হাসিলেন। সহসা শিহরিয়া উঠিয়া—দ্বারের দিকে দেখিলেন, দ্বার বন্ধ; সুতরাং সে উদ্বেগের নিবৃত্তি হইল।

"এই বেশেই যাওয়া উচিত। রাত্রিও ত দ্বিপ্রহর হয়। আলিয়ারের সংবাদ তাঁহার মুখেই পাইব এই আশায় যাইতেছি—জগদীশ্বর মঙ্গল কর।"

আমিনা—এক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া—সেই গভীর নিশীথে একাকিনী—যমুনার তীরে চলিলেন। সেই নীরব নিশীথে যমুনার তীরে এক নিভৃত ঘাটের উপর আমিনা একাকিনী বসিয়া আছেন। সেই ভীষণ অন্ধকারের তীব্রতার সহিত—নিজের কৃষ্ণকায় মিলাইয়া—যমুনা আঁধারসঙ্গীত করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। নীল আকাশে তারাগুলি—যমুনার কৃষ্ণ সলিলের উপর নিজেদের উজ্জ্বল জ্যোতি নিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। নদীতীরস্থ বৃক্ষগুলিও পত্র সঞ্চালন বন্ধ করিয়াছে।

সহসা—সেই অন্ধকারে এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্ত স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন "আমিনা!"

ছদ্মবেশী উজীর বলিল—"আপনি আসিয়াছেন কিন্তু এত দেরী হইল যে।"

"একটু বাকি ছিল—সেটুকু সারিয়া আসিয়াছি। তোমায় বলিয়াছিলাম, শেষ এক দিন সাক্ষাৎ হইবে। আজ সেই দিন। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে! আমার প্রতিহিংসা ব্রত উজ্জাপিত হইয়াছে।

আজ তুমি যাহা করিলে না—আলিয়ার যাহা পারিল না, আমি তাহা শেষ করিয়া আসিলাম।"

"সব ভাঙ্গিয়া বলুন—না হ'লে বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমিনা! এ প্রতিশোধের ভার ন্যায়তঃ তোমার। কেন তাহা বলিতেছি। তাই কৌশলে তোমায় এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আলিয়ারও পারিবে না?"

"কেমন করিয়া জানিলেন আলিয়ার পারিবে না?"

"হিন্দুর যোগবল বলিয়া একটা জিনিস আছে। বিশ্বাস কর কি?—"

"আজ্ঞে খুবই করি। অপরের মুখে শুনিলে করিতাম না। আপনার মুখ হইতে কখনও অসত্য বাহির হয় না।"

"তা স্পষ্টই দেখিতেছি, আলিয়ার বিদ্রোহীর সর্দ্দারকে ধরিতে পারা দূরে থাক্, তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে। বিশ সহস্র আসরফি না দিলে তাহার জীবন রক্ষা হইবে না। তাহার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের উপর তোমার জীবন। না আসিলে এই দুষ্টবুদ্ধি বাদসাহ অন্যরূপ বুঝিবে। সে বিশ্বাস করিবে না যে আলিয়ার বন্দী হইয়াছে। মনে করিবে, প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।"

"আলিয়ারকে যদি ফিরিয়া না পাই, তাহা হইলে আমি মরিতে প্রস্তুত। আপনার কাছে বলিতে লজ্জা বোধ হয়, আমি আজও প্রবৃত্তি জয় করিতে শিখি নাই। আমি আলিয়ারকে ভালবাসিয়াছি। তাহাকে না পাইলে মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। অত টাকাই বা কোথায় পাইব? টাকাও হইবে না—আলিয়ারও ফিরিবে না!"

"মা! আলিয়ারের উদ্ধারের উপায় আমি করিয়াছি। টাকা কার—কে ভোগ করে! জগতে টাকা লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি। এ গরিবের অনেক টাকা ছিল। আমি আজীবন সন্ন্যাসী নহি।"

আমিনা সেই অন্ধকারবেষ্টিত দীর্ঘাকার মহাপুরুষের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা! রাত্রি পোহাইবার পূর্ব্বেই আমি নগর ত্যাগ করিব। দুরাচার সেকেন্দার সার মৃত্যু সংবাদ পাইলেই এ পাপ রাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমালয়পথবর্ত্তী হইব। আর তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমায় এক অদ্ভুত কথা শুনাইব।"

আমিনা সহসা বাদসাহের মৃত্যু সম্ভাবনা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইলেন। কাতর কণ্ঠে বলিলেন "প্রভো! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

"বৎসে! সকল কথা খুলিয়া না বলিলে কি করিয়া বুঝিবে?" আমিনা তোমার প্রকৃত নাম নয়। তুমি হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছ। তোমার নাম প্রভাবতী। সেকেন্দার সাহ যে সময় রাজনগর আক্রমণ করে, তখন তোমার বয়স তিন বৎসর। আমি জাতিতে শ্রেষ্ঠী। অগাধ টাকা আমার ছিল। আমিই রাজনগরের রাজার রত্নবণিক ছিলাম।" দুষ্ট রাজপুরী ধ্বংস করিয়া অর্থের আশায় আমার পুরীতে প্রবেশ করিল। সেই অগণিত সৈন্যপ্রবাহকে আমার লোকজন রোধ করিতে পারিল না। আমি তখন রাজ কার্য্যেই বারাণসীতে ছিলাম। যে দিন এই ঘটনা হয়, সেই দিনই বাড়ীতে পৌঁছি।

"রাজা যুদ্ধে নিহত; রাজা দস্যু হস্তগত। আমার স্ত্রীপুত্রও গৃহে নাই—ভাণ্ডার লুণ্ঠিত। পাগলের মত এক বস্ত্রে গৃহ ত্যাগ করিলাম। এক বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার এক মাত্র এক বৎসর বয়স্ক কন্যা ও আমার প্রধান কর্ম্মচারীর পুত্র কুমার সিংহকে অতি সংগোপনে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই আসিয়া পথিমধ্যে আমায় সংবাদ দিল। আমার সহধর্ম্মিণী (তোমার গর্ভধারিণী) শত্রুর আগমন সংবাদের পূর্ব্বেই বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

"আমি সেই শিশু কন্যা ও কুমার সিংহকে লইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলাম। যমুনার তরঙ্গবিহীন বক্ষে কখনও ঝড় হইতে দেখি-নাই। আমার অদৃষ্টক্রমে সেই দিন রাত্রে ঝড়ে আমাদের নৌকা ডুবিয়া গেল। আমি তোমাদের বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। শেষ অনেক কষ্টে জীবন লইয়া পর পারে পৌঁছাই। তখন আমার অর্দ্ধ চেতন অবস্থা। তীরে পৌঁছিয়াই মূর্চ্ছিত হইলাম।

"চেতনা সঞ্চারের পর বুঝিলাম, কাহারও সজ্জিত কক্ষে আমি শুইয়া আছি। শুনিলাম সে বাটী, একজন ধনী মুসলমানের। তাঁহার নাম সমসের খাঁ।

"তাহার ভৃত্য আমায় ব্যাকুল দেখিয়া বলিল, "আপনি উতলা হইবেন না। আপনার সেই দুটী শিশুকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। আমার প্রভু তাহাদের লইয়া নগরে গিয়াছেন। এখানে বড় ভয়। রাজনগর অধিকারের পর সেকেন্দার সাহ শীঘ্রই এদেশ লুঠ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমার প্রভু পূর্ব্বেই পলাইয়াছেন। বাড়ীতে আর কেহই নাই। তাঁহার আদেশে কেবল আমিই আপনার চেতনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আপনিও পলায়ন করুন—"

"কন্যাটী ও শিশুটী জীবিত আছে এই সংবাদেই তখন আমার অপার আনন্দ হইল। তাহাদের জাতি ও ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা আদৌ তখন মনে উঠিল না। আমি দুই এক দিন মধ্যে সুস্থ হইয়া—সেই ভৃত্যের সঙ্গে আমিরের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তাঁহাকে পাইলাম না। তার পর অনেক ঘুরিয়া দিল্লীতে তোমাদের সন্ধান পাই। আমার সেই এক বৎসরের কন্যা প্রভাবতী আজ তুমি "আমিনা"—আর সেই সুকুমার তিন বর্ষীয় শিশু কুমারসিংহই আলিয়ার। আর উজীর সমসেরখাঁই তোমার পালক পিতা।"

সেই অন্ধকার মধ্যে আমিনার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। আমিনা তখন বুঝিল কেন সেই হিন্দু সন্ন্যাসী তাহার জন্য—তাহার পালক পিতার জন্য এত করিয়াছেন। আমিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"পিতঃ, আমায় যদি ফিরিয়া পাইলেন—তবে কেন সংসার ত্যাগ করিবেন? আমাদের জাতি গিয়াছে—ধর্ম্ম গিয়াছে—কিন্তু সংসারে আসুন। আপনাকে দেখিয়াই আমাদের সুখ।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"না—মা! আর সংসারে থাকিব না। সংসারে

থাকিয়া পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নিতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া নরকের কীট হইয়াছি। তোমার জীবন রক্ষার জন্য, আলিয়ারের জীবন রক্ষার জন্য, প্রতিহিংসার জন্য, আজ যা করিয়াছি—তাহা আজীবন প্রায়শ্চিত্তেও যাইবে না।"

"পিতঃ, এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যার জন্য আজীবন প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন?"

"মা, যা করিয়াছি তাহা আর ফিরিবে না।"

"কি করিয়াছেন? পিতঃ?"

"আমি প্রতিহিংসাবশে বাদসাহকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছি।"

"কবে—কেন এ কাজ করিলেন?"

"এখনও এক প্রহর অতীত হয় নাই। তোমার মা'র সেই বিষাক্ত-দেহ মলিন মুখ আজও আমার মনে জাগিতেছে। তাঁহার সেই মৃত দেহের ছায়ামূর্ত্তি দিনরাতই আমার কাণে কাণে বলিতেছে "প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!!" তোমার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই তোমায় স্ত্রীবেশ ত্যাগ করাইয়া পুরুষ সাজাইয়াছি। পরে বুঝিলাম তোমায় কেন অযথা পাপভাগিনী করিব? অনেক ভাবিয়া আমিই নিজে এই কাজ হাতে লইয়াছি। যে নিষ্ঠুর ব্রত, পৈশাচিক কাণ্ডের সূচনা করিয়াছিলাম, আজ তাহা শেষ করিয়াছি।"

আমিনা আকুলকণ্ঠে বলিল—"পিতঃ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমি ত বালিকা মাত্র। কিন্তু প্রতিহিংসার বদলে ক্ষমা দেখাইলে বোধ হয় উপযুক্ত শাস্তি হইত। ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তাহার অবসর পাইলাম কই? যাহা করিয়াছি, তাহা আর ফিরিবে না। আমারই ন্যায় এক হতভাগ্য বাদসাহের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহার অন্তঃপুরে বাস করিতেছে। সেই আমার সহায়তা করিয়াছে। সেই বাদসাহের তাম্বুলের মধ্যে তীব্র স্বাদহীন বিষ রাখিয়া দিয়াছে। মা! যা করিয়াছি নিজহস্তে করি নাই। তবু ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। নিজের জন্য তুষানল ব্যবস্থা করিব।"

আমিনা অনেকক্ষণ কি ভাবিল—বলিল, "পিতঃ অতীতের অনুশোচনায় ফল নাই। একটী শেষ অনুরোধ যেন আর একবার আপনার দেখা পাই। আলিয়ার কি আজই ফিরিয়া আসিবে?"

"হাঁ আজই, শেষ রাত্রে। সে জন্য নিশ্চিন্ত থাক। অবস্থা বুঝিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। সন্ন্যাসী বস্ত্রমধ্য হইতে এক থলিয়া বাহির করিয়া আমিনার হাতে দিয়া বলিলেন, "মা! এই ক্ষুদ্র আধারটীর মধ্যে অনেক জিনিস আছে। কুমার সিংহের সহিত তোমার বিবাহ দিব বলিয়াই তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলাম। বিধাতা সে আশা সমূলে বিনাশ করিলেন। তাঁহারই লীলায় তোমরা জাতিপ্রাপ্য, ধর্ম্মচ্যুত আমার অঙ্কচ্যুত। সে সময়ে থাকিতে পারিব না। আজ কিছু যৌতুক দিলাম—সময় মত এই পেটিকা খুলিয়া দেখিও। সেই মঙ্গলালয়ের কৃপায়, তোমারা আজীবন সুখী হও।" সন্ন্যাসী আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। আমিনা সেই সন্ন্যাসীর পদবন্দনা করিলেন।

দূরে যেন কাহারও পদশব্দ শ্রুত হইল। আমিনা চমকিয়া পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে ফিরিয়া দেখেন সন্ন্যাসী সেই অন্ধকারে সহসা বিলুপ্ত হইয়াছেন।

সন্দিগ্ধচিত্তে আমিনা ঘাটের উপর উঠিলেন। দেখিলেন অদূরে এক ছায়ামূর্ত্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আমিনা এক বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইলেন। মূর্ত্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। আমিনা ত্বরিত বেগে পথ ঘুরিয়া নিজ বাটীর দ্বারের সম্মুখেই আসিলেন। দেখিলেন সম্মুখেই আলিয়ার!

"আলিয়ার—আলিয়ার, তুমি আসিয়াছ! কতই ভাবনা হইয়াছিল! তুমি শত্রু হস্তে বন্দী"—আমিনা সেই অবস্থাতেই আবেগ ভরে আলিয়ারকে আলিঙ্গন করিল। আলিয়ার সোৎকণ্ঠে বলিল—

"এ সব খবর তোমায় কে দিল আমিনা!"

"সেই মহাপুরুষ—তিনিই তোমায় মুক্তা দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন।"

"তাঁহাকে শত শত অভিবাদন করি? আমার বোধ হয় তিনি এ পৃথিবীর লোক নহেন। কোন স্বর্গীয় দূত। তা না হ'লে এই অভাগাদের উপর তাঁর এত করুণা কেন?"

আমিনা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"প্রিয়তম! সে অনেক কথা। সেই মহাপুরুষের আজ পরিচয় পাইয়াছি। সে সব কথা শুনিলে তুমি আরও আশ্চর্য্য হইবে। সে সব পরে হইবে—কিন্তু আর একটী মহৎ কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে। বিলম্বে সর্ব্বনাশ হইবে। তোমায় পাইয়া আমি সব ভুলিয়াছিলাম। আলিয়ার! বাদসাহের জীবন-সংকট—অবস্থা।"

আলিয়ার সবিস্ময়ে বলিল—"কেন? বাদসাহের কি হইয়াছে?"

আমিনা আলিয়ারকে দুই চারি কথায় সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন। দ্রুতপদে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমিনা ত্বরিত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। সেই গভীর নিশীথে দুই জনেই সেই লোক-সমাগম বিরহিত, দিল্লীনগরীর রাজপথ দ্রুতপদে অতিবাহিত করিয়া আরামবাগের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

আরামবাগের দ্বারে এক প্রহরী ঢুলিতেছিল। সে অতরাত্রে নূতন উজীর ও সেনাপতিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সঙ্গীন নোঙাইয়া সম্মান প্রদর্শন করিল।

আলিয়ার সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাদসাহ কোথায়? কেমন আছেন?"

প্রহরী আশ্চর্য্য হইল। সে অন্তঃপুরের কোন খবরই রাখে না।

আলিয়ার কুটীর মধ্যে গিয়া, প্রধান শরীর রক্ষীকে জানাইলেন। গোলমালে মীর মুন্সি ও আরও কয়েক জন কর্ম্মচারী জাগিয়া উঠিল। সকলেই দ্রুতপদে বাদসাহের কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল।

কক্ষমধ্যে তখনও সুগন্ধি দীপ উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে। তাঁহারা যে দৃশ্য দেখিলেন—তাহা অতি ভীষণ। তাঁহাদের সকলেরই মুখ উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

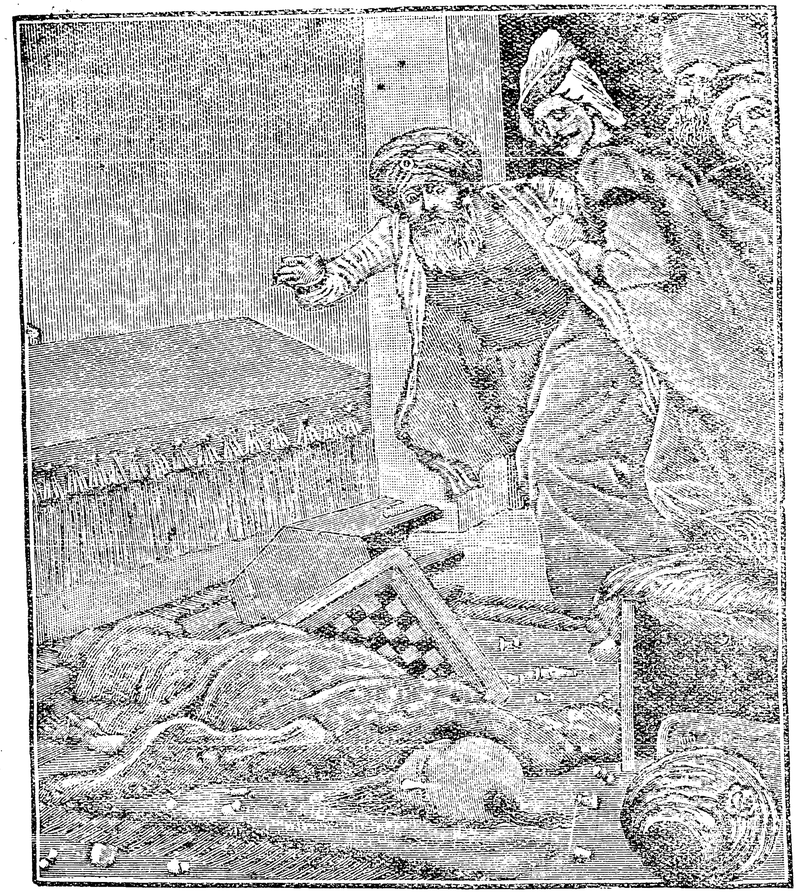

...র্শের বিছানা হইতে বাদসাহ সেকেন্দার সাহ কক্ষের মেঝের উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার মাথার উষ্ণীষ ঠিক্রাইয়া কক্ষমধ্যে গড়াগড়ি যাইতেছে। সেই সাধের দাবা খেলার ...ল ইতস্ততঃ কক্ষমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

...কলেই দেহ স্পর্শ করিলেন। সেই হিমাঙ্গ, মলিনমুখ, বিকৃত-...নিস্পন্দ নিস্পন্দিত দেহ-যষ্টি দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন—দিল্লীর ...হ সেকেন্দার সাহের বাদসাহী-লীলার শেষ হইয়াছে।

...খনই হাকিম ডাকা হইল। মানুষে যাহা পারে না তাহা তাহার দ্বারা হইবে কেন? হাকিম মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"বাঁচাইব কাহাকে—দুই ঘণ্টা হইল বাদসাহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন!"

দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল। সকলেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যথাকর্ত্তব্য মন্ত্রণায় সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন প্রভাত হইয়াছে। অন্ধকার পলাইয়াছে। প্রভাতী পক্ষীরা কূজন আরম্ভ করিয়াছে। শীতল সমীরে আরামবাগের কক্ষগুলি পুনরায় সজীব হইতেছে। হায়! হায়! দিল্লীর বাদসাহ সেকেন্দার সাহ, সেদিনের প্রভাত আর দেখিতে পারিলেন না। সব ফুরাইল।

সমাপ্ত